উপনিষদ রহস্য

বা

গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা

১ম ও ২য় অধ্যায়

উপনিষদ রহস্য

বা

গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা

১ম ও ২য় অধ্যায়

শ্রীমৎ [illegible] দেবশর্ম্মা

মূল্য ৩৲ টাকা।

ঃ-
শ্রীকুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
শ্রীগুরুমন্দির—
উপনিষদ্‌রহস্য কার্য্যালয়
কোঁড়ার বাগান, হাওড়া।

নিবেদন।

গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ইহা উপনিষদ্ রহস্য কার্য্যালয়ের অন্যতম নূতন গ্রন্থ। বস্তুতঃ ১৩১৬ সালে এই গ্রন্থখানি ধারাবাহিক রূপে পঞ্চম অধ্যায় পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল। তৎপরে নানাবিধ ঘটনাচক্রে পুস্তকখানির মুদ্রন-কার্য্য এযাবৎ স্থগিত ছিল, অধুনা সহৃদয় গ্রাহক ও সুধীভক্তবৃন্দের বিশেষ অনুরোধে গীতা পূর্ব্ববৎ প্রকাশিত হইতেছে।

ইতি-

শ্রীকুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীগুরুমন্দির—হাওড়া,

মাতৃ পূজা তিথি—১০ই পৌষ, ১৩৩৯।

উৎসর্গ।

গীতা আমার।

আমি গীতাকে নমস্কার করি।

আমার গীতাকে আমারই করে সমর্পণ করিলাম।

যে আমাকে চিনিয়াছে, তাহারই জন্য গীতা, অন্যের জন্য নহে।

আমি।

ভূমিকা।

গীতা লইয়া ধর্ম্মজগতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। কেহ বলেন, গীতা ইতিহাসের আদর্শ ধর্ম্মভাবযুক্ত একটী অপূর্ব্ব ঘটনা। কেহ বলেন, গীতা ঐতিহাসিক ঘটনা নহে, ইহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান—রূপক ছলে লিখিত। কেহ বলেন, গীতা কবির আদর্শ কল্পনা। কেহ বলেন, গীতা একখানি যোগশাস্ত্র। নানা চক্ষে গীতা জগতের সমক্ষে নানারূপে রঞ্জিত।

যিনি আমায় গীতা শুনাইয়াছেন, তিনি আমায় এ বাগ্‌বিতণ্ডা হইতে রক্ষা করুন।

গীতা কি—আমি জানি না। ভাষায় গীতার সম্পূর্ণ বর্ণনা করিতে আমি অক্ষম। যতটুকু শক্তি পাইয়াছি, দুই চারি জন সাধকের আগ্রহে তাহাই প্রকাশ করিলাম।

গীতা ঐতিহাসিক আদর্শ ধর্ম্মভাবযুক্ত ঘটনা—ইহাও সত্য। গীতা আধ্যাত্মিক যোগবিজ্ঞান—ইহাও সত্য। কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বিরাট্ পুরুষের একটী বিরাট্ লীলা। যোগচক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি যেমন আপনার শরীরের মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিবিম্ব দেখিতে পান, মনুষ্যদেহকে যেমন বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের একটী ক্ষুদ্র আদর্শ বলিয়া চিনিতে পারেন; বস্তুতঃ বিরাটে ও দেহ-ব্রহ্মাণ্ডে যেমন পরিমাণগত তারতম্য ছাড়া অন্য কোন প্রভেদ নাই, তেমনই গীতাসম্বলিত কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনের ঘটনা, এবং বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের মুক্তির দিকে বিরাট্ গতি ও জীবমাত্রের ব্যক্তিগত মুক্তিপথে সঞ্চারণ,—এ তিনেও কোন প্রভেদ নাই।

বিরাট্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণরূপে ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়া কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে এমন একটী অপূর্ব্ব লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন, যাহা প্রত্যেক পরমাণুতে ব্যষ্টিভাবে এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে সমষ্টিভাবে অভিনীত হইতেছে। জীব ধীরে ধীরে যে প্রকারে মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড যে প্রকারে মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে, সাধকপ্রবর অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্ররূপ আদর্শ-রণাঙ্গনে আদর্শ পুরুষ তাহারই একখানি আদর্শ-ছবি দেখাইয়া গিয়াছেন।

ইহাই **গীতা**।

গ্রন্থকার।

আহ্বান।

(১)

এস—এস রে করুণাপ্রার্থী
আর্ত্ত, দীন, দুঃস্বপ্নপীড়িত,
পথশ্রান্ত,—এস চিরসাথী
এস সখা, এস প্রিয়, এস প্রবঞ্চিত।

(২)

এস লুব্ধ চির-সহচর
এস ভীত, ধূলি-বিলুণ্ঠিত
এস ক্ষুব্ধ স্নেহের দোসর
এস মরমের ধন চির অপেক্ষিত।

(৩)

আবাহিত অন্তিমচরণ
মায়াচ্ছন্ন অংশটুকু মোর
এস আছি অপেক্ষায় তব—
কত কাল, কত কাল, যুগ যুগান্তর !

(৪)

এস ফিরি আনন্দ-মন্দিরে
ঝঙ্কারিত প্রণবের নাদে ;—
উচ্ছ্বসিত জ্যোতির সাগরে
ধৌত করি হৃদয়ের জ্বলন্ত বিষাদে।

(৫)

হের—
চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা অনন্ত
চির মোরে করে প্রদক্ষিণ ;
হের—জ্যোতিঃমণ্ডিত দিগন্ত
উছলি চরণে ঢালে জ্যোতিঃ চিরদিন।

(৬)

শুন—

অমরের চির-স্তোত্র-গীতি

সিদ্ধর্ষির ওঙ্কার গর্জ্জন

ভকতের হৃদিভরা প্রীতি

প্রেমে পূজে অবিরাম পদ অনুক্ষণ।

(৭)

হের—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কত

চরণে—লুটায় নতশির—

হের—বিশ্ববিন্দু শত শত

পদ আশে মুহূর্ত্তেক নহেক সুস্থির।

(৮)

এত ঐশ্বর্য্যের মাঝে আমি

ব্রহ্মাণ্ডের রাজরাজেশ্বর,

ভুলি নাই, ভুলি নাই তোরে

তুই মোর **এতটুকু চিরসহচর।**

(৯)

ল'য়ে হৃদিভরা ভালবাসা,

আঁখিভরা প্রীতি অশ্রুজল,

অপেক্ষায় আছি তোর তরে—

চাহি মুখ, মরমের বাঞ্ছিত সুন্দর।

(১০)

এত ডাকি শুনিতে না পাও?

মায়াঘোরে এত কি ঘুমাও?

দিব ছাড়ি নিজ সিংহাসন

এস হৃদে ক্ষুদ্র জীব হৃদয়ের ধন।

উপনিষদ্‌রহস্য

বা

গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা।

ব্রহ্ম-খণ্ড। *

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

বেদের সার—উপনিষৎ, উপনিষদের সারাংশ—গীতা। উপনিষদে যে সমস্ত রত্ন নিহিত আছে, গীতায় তাহাই রত্নহারাকারে গ্রথিত। গীতা মহৎ, গীতা শ্রেষ্ঠ, গীতা আধ্যাত্মিক জগতের দীপশিখা।

গীতা নিত্য, গীতা অপৌরুষেয়, গীতা অনাদি কাল ধরিয়া অনাদিহৃদয়ে উচ্ছ্বসিত। যেখানে জীব, যেখানে মুক্তিবন্ধনরূপ জীবন-মরণ সংগ্রাম, সেইখানেই ভগবানের আবির্ভাব, সেইখানেই সাধকের অভীষ্টসিদ্ধি, সেইখানেই গীতা ভগবৎকণ্ঠে ধ্বনিত। তুমি শুনিবে কি?

গীতা ভগবানের মুখের আশ্বাসবাণী, গীতা—জগন্মাতার স্তনধারা, গীতা—শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য-শঙ্খনাদ, গীতা—জীবের জীবন-প্রবাহের পথপ্রদর্শক, গীতা—দীপ্ত আলোকশিখা, ভবার্ণবের দিক্‌-নির্দর্শনযন্ত্র।

গীতায় আছে কি? গীতায় ভগবান্‌ কি শিক্ষা দিয়াছেন? কোন জীব ভগবদ্‌লাভের জন্য প্রকৃত ব্যাকুল হইলে, ভগবান্‌ তাহাকে তাহারই হৃদয়াভ্যন্তরে থাকিয়া, যে যে প্রকার কর্ম্মস্তরের ভিতর দিয়া লইয়া গিয়া আপন অঙ্গে

---

* ব্রহ্মখণ্ড নামে গীতার মর্ম্মটুকু প্রথমে আলোচিত হইবে। তারপর ব্যাখ্যায় শ্লোকের যৌগিক অর্থ প্রকাশিত হইবে।

মিশাইয়া লয়েন, গীতায় তিনি তাহাই বলিয়াছেন। প্রত্যেক জীবাত্মার হৃদয়ে থাকিয়া সেই বিরাট্ বিশ্বসারথী, বিশ্বকল্পনা বা মায়ার ভিতর দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তাহাকে বিরাট্ করিয়া তুলিতেছেন। ইহারই নাম বিশ্বরচনা। জীবকে নিজের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য সৃষ্টি-চক্র কল্পিত। আত্মা যতক্ষণ নিজের নিত্যত্ব, বিশালত্ব, অপরিণামিত্ব এবং একত্ব বুঝিতে না পারে, ততক্ষণই তাহার জীবভাব। ইহারই সাধারণ নাম বন্ধন বা মায়া বা ভ্রান্তি। বুঝিতে পারিলেই জীব শিবত্ব লাভ করে—ইহারই নাম মুক্তি। বস্তুতঃ বন্ধন বা মুক্তি বলিয়া কিছু নাই।

যাহা হউক, এই অজ্ঞান অবস্থা হইতে জ্ঞানময় অবস্থায় যাইতে হইলে, যে যে স্তর দিয়া যেমন করিয়া যাইতে হয়, তাহারই নাম যোগ-সাধনা। জন্ম, মৃত্যু, দেহাবস্থান, নানা যোনি ভ্রমণ, অনন্ত যুগ ধরিয়া বিশ্বে বিশ্বে ছুটাছুটি—এ সমস্তই যোগসাধনা মাত্র। সৃষ্টি—যোগমন্দির ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রতি অণু পরমাণু—ইহার সাধক, বিরাট্ বিজ্ঞানময় পুরুষ—ইহার দেবতা। যোগ অর্থে—বিরাট্ জ্ঞানময় পুরুষে যুক্ত হওয়া বা নিত্যযুক্তভাব উপলব্ধি করা। পাঠক! একবার মানস দর্পণে এই বিরাট্ যোগ-মন্দিরের কল্পনা ফুটাইয়া তোল একবার কল্পনার চক্ষে দেখ—ধূলিকণা হইতে আরম্ভ করিয়া, ধূলিকণা কেন—ব্যোমপরমাণু হইতে সূচনা করিয়া বিরাট্ সূর্য্য, এবং ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে সিদ্ধর্ষি পর্য্যন্ত সকলেই এক চিদ্‌ঘন, বিজ্ঞানময় যোগেশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য তাঁহারই শক্তির মঙ্গলময় আবর্ত্তনের তালে তালে ঘুরিয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে, তাঁহারই অঙ্গে লিপ্ত হইবার জন্য, তাঁহারই সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য, তাঁহারই সহিত একত্ব লাভ করিবার জন্য, তাঁহারই ইঙ্গিতে, তাঁহারই শক্তির আকর্ষণে স্রোতে তৃণের মত তাঁহারই দিকে চলিয়াছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে, মিলাইয়া যাইতেছে, আবার ফুটিয়া উঠিতেছে। কখনও হর্ষে, কখনও বিষাদে, কখনও বিস্মরণে, কখনও জ্ঞানে—স্বপ্নে, জাগরণে, সুষুপ্তিতে,—বিকাশে, স্থিতিতে, লয়ে,—এই ভাবে জীবমণ্ডলী যুক্ত হইতে চলিয়াছে। বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই, বিশ্রান্তি নাই, বুঝি বা এ মহাযোগের অবসানও নাই। এই যে গতি,—ইহার নাম যোগ-সাধনা।

তবে যতক্ষণ আমরা একত্ব বুঝি না, ততক্ষণ আমরা নিরুদ্দেশ্যভাবে জগতের ধূলিতেই জীবনের চরিতার্থতার উপলব্ধি করি। বস্তুতঃ, যোগী হইলেও তত দিন আমরা সাধারণ কথায় যোগিপদবাচ্য হই না। মনুষ্যজন্ম এ অবস্থার শেষ সীমা। যখন মানুষ হই তখন সেই বিরাট্ যোগেশ্বরের আকর্ষণ অনুভব করি। তখন জীব আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া ভগবদালিঙ্গনে বদ্ধ হইবার জন্য কাঁদিয়া উঠে। সাধারণ কথায় ইহাই যোগের প্রথম সূচনা বা যোগজ্ঞানের প্রথম বিকাশ। এই স্থল হইতে যে যে ভাবান্তরের ভিতর দিয়া, ভগবান্ জীবকে আকর্ষণ করেন, সাধারণ কথায় তাহাই যোগ বলিয়া উল্লিখিত। এত দিন বিশ্বজননীর ক্রোড়ে তাঁহারই স্তনদুগ্ধে পুষ্ট হইতে হইতে ঘুমাইয়া যাইতেছিল, এইবার জাগিয়া দেখিতে দেখিতে চলিতে শিখিল। এইখান হইতে তিনি প্রত্যেক হৃদয়ে তীর্থ-প্রদর্শকের মত অনন্ত ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার দেখাইতে দেখাইতে এবং মধুরস্বরে বলিতে বলিতে লইয়া যান। এইখান হইতে যাহা বলেন—যাহা করেন এবং করান, তাহাই গীতা। ভগবৎলাভের জন্য প্রাণের বিষাদময় ভাব হইতে সূচনা করিয়া সংযুক্তভাব অবধি গীতা। বিষাদ হইতে সূচনা করিয়া মুক্তি পর্য্যন্ত যে যে ভাব-পরম্পরা দ্বারা জীব পরিচালিত হয়, গীতায় তাহাই এক একটি যোগ নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু বুঝিও, এই মহাভাবরূপ আকর্ষণশ্রেণী বাঙ্ময় হইয়া মনুষ্য-হৃদয়ে পর পর প্রতিধ্বনিত হয়। যখন জীব শুনিতে পায়, তখন সে বুঝিতে পারে, তার আর অধিক বিলম্ব নাই।

বিষাদযোগ।

বস্তুতঃ ভগবানের জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রাণ যখন ব্যাকুল হইয়া উঠে, তীব্র বৃশ্চিকদংশনবৎ জীব যখন সর্ব্বপ্রথম ভগবদ্‌বিরহ উপলব্ধি করে, বৃথা জীবন অতিবাহিত হইতেছে ভাবিয়া, জীবের প্রাণ যখন হতাশের দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতে থাকে, সেইটী জীবের জীবনের একটী মহাসন্ধিক্ষণ।

সেই সময়ে কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনে অর্জ্জুনের মত, তাহার হৃদয়রূপ রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া এক পার্শ্বে সংসার-সংস্কারশ্রেণী—স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন, দেশ প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়-সঞ্চিত ভাব বা মায়ার মূর্ত্তিরাজি এবং অপর পার্শ্বে হৃতসর্ব্বস্ব রাজ্যচ্যুত আত্মশক্তিকে পর্য্যবেক্ষণ করে। ধীর, বিবেচক, বীর-সাধক সেই সময়ে একবার নিজের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে গিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। এক দিকে প্রাণাকুল পিপাসা, অন্য দিকে মায়ার সুদৃঢ় বন্ধন,—এক দিকে আত্মলাভ আশার উজ্জ্বল আলোক, অন্য দিকে পরার্থে আত্মত্যাগের কমনীয় ক্ষীণ জ্যোতীরেখা,—এক দিকে প্রভাত, অন্য দিকে সন্ধ্যা, সাধক এই দুই দিক্ দেখিতে দেখিতে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তাহার উদ্যমের ধনু খসিয়া পড়ে, শরীর অবসন্ন হইয়া আইসে, কণ্ঠ শুষ্ক হয়, সে মায়ার ফাঁসে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া পড়ে।

অনন্ত জীবনের মায়ার বন্ধন ছেদন করিতে গিয়া, এইরূপে মায়ার ফাঁস যখন শেষবারের মত তাহাকে জড়াইয়া ধরে, তখন তাহার সেই দুর্ব্বলতা বিজ্ঞতার ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া অর্জ্জুনের মত ভগবান্‌কে বলে—আমার ভালবাসার চির অধিকারী এই সমস্ত আত্মীয়গণকে হৃদয় হইতে উচ্ছেদসাধন করিতে হইবে বুঝিয়া, আমি স্থির হইতে পারিতেছি না, আমি সমস্ত বিপরীত দেখিতেছি। ইহাদের উচ্ছেদসাধনের আবশ্যকতা কি—আমি বুঝিতে পারিতেছি না। উহাদের জন্য আত্মমঙ্গলে জলাঞ্জলি দিলে, সে মহাত্যাগের কি মহাফল নাই? সংসার পালনরূপ মহাকর্ত্তব্য পালনে—এমন মহা স্বার্থত্যাগে কি মনুষ্যজীবনের চরিতার্থতা হয় না? পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, হৃদয় হইতে ইহাদের উচ্ছেদসাধন করিলে আমাতে কি মহাপাপ অর্শিবে না? না—না—আমি পারিব না—আমি আত্মমঙ্গললাভরূপ স্বার্থসাধনের জন্য স্বার্থত্যাগরূপ মহাধর্ম্মকে উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, আমি মহাপাপে লিপ্ত হইতে-ছিলাম। সংসার-ধর্ম্ম পালনে যদি আমার জীবনান্ত হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ—তাহাও আমার হিতকর।

সাধকের প্রাণ সর্ব্বপ্রথম এইরূপ ভাবান্তর বা ভগবদাকর্ষণে আন্দোলিত হয়। সন্দেহ-দোলায় তাহার প্রাণ এইরূপে কাঁপিয়া উঠে। সংসার ছাড়া কর্ত্তব্য, কিম্বা সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালনই শ্রেষ্ঠ, এই চিন্তায় তাহার প্রাণ ব্যাকুল হয়।

বিষাদে, সন্দেহে, আশঙ্কায় যথার্থ যখন সাধকের প্রাণ এইরূপে দিশাহারা হইয়া যায়, তখন আর ভাবিতে না পারিয়া তার বিষাদভরা ক্লান্ত হৃদয়টুকু লইয়া সে ভগবানের দ্বারস্থ হয়। জীবন-মরণের সঙ্গমস্থলে, মৃত্যুযন্ত্রণার মত বা ততোধিক যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সে ভগবানের উপর ভারার্পণ করে। তাহার প্রাণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া বলিতে থাকে,—"পতিতের পরিত্রাণ! আর ভাবিতে না পারিয়া তোমার উপর নির্ভর করিলাম, জগন্নাথ! দাও, পথ দেখাইয়া দাও। স্বার্থময় সংসারমরু মাঝে আর ত কাহাকেও খুঁজিয়া পাই না—সব যে স্বার্থান্ধ। দীননাথ! স্বার্থের মদিরায় সব যে অচেতন। একা এ দুরন্ত মরুর মাঝে, ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে হতাশ চক্ষু ফিরাইয়া দিগ্‌ভ্রান্ত, অনাথ, শরণাগত, বহু দিন পরে আজ তোমায় আশ্রয়স্থল বলিয়া চিনিতে পারিয়া কাতরে তোমায় ডাকিতেছি; আর ভাবিব না, আর কিছু করিব না। তুমি পথ দেখাইয়া দাও, তুমি আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দাও। তোমার উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিলাম।"

"বল—সংসার ত্যাগ করিব, কি সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিব? বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া হৃদয়রাজ্য হইতে পিতা, মাতা, স্ত্রী, আত্মীয় স্বজন উচ্ছেদন করিয়া দিয়া আত্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলে তবে আমি মুক্তিলাভ করিব,—কিম্বা আমার জীবনের সমস্ত স্বার্থ তাহাদের জন্য জলাঞ্জলি দিয়া, জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য, ভগবৎসাধনরূপ জীবনের মহাকর্ত্তব্য,—তাহাদের চরণে বলি দেওয়ায় স্বার্থত্যাগরূপ মহাধর্ম্ম সংসাধিত হইতেছে ভাবিয়া নিশ্চিন্তমনে মরণের জন্য অপেক্ষা করিলেই শান্তি পাইব?"

এইরূপে সেই মহামুহূর্ত্তে দুর্ব্বলের একমাত্র রক্ষক, আর্ত্তের ভরসা, বিপন্নের পরিত্রাতা, অনাথের বন্ধু, শরণাগতের চিরসখার শরণ লইতে হয়। জীব! তুমি কি সংসারমোহ ছেদনে উদ্যোগী হইয়াছ? তুমি কি আপনাকে আত্মীয়স্বজনের দ্বারা লুণ্ঠিতসর্ব্বস্ব ভাবিয়া আত্মরাজ্য উদ্ধারের জন্য সমরায়োজনে উদ্যোগী হইয়াছ? এ সোনার সংসার তোমার চক্ষে কি লুণ্ঠন ও ছলনার লীলাভূমি বলিয়া প্রতিফলিত হইতেছে? পত্নীর প্রেমধারা হলাহল বুঝিয়া তুমি কি আপনাকে বিষজর্জ্জরিত ভাবিতেছ? পুত্রস্নেহের হৃদয়গ্রাহী কমনীয়তা পাষাণের মত তোমার বুকে কি বাজিতেছে? আত্মীয় স্বজনের কলকণ্ঠ তোমার শ্রবণকুহরে কি বজ্রধ্বনির মত ঘর্ঘরিত? তুমি কি এ যন্ত্রণার

বোঝা বহিতে একান্ত অস্বীকৃত? আপনার জীবন বৃথা যায় দেখিয়া তুমি কি ব্যাকুল? ভীষণ মায়াবর্ত্তের তরঙ্গ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে অশক্ত ভাবিয়া তুমি কি নিরাশ হইয়াছ? মায়ার সমর-প্রাঙ্গণে মায়াহননে উদ্যোগী হইয়া তুমি কি মায়ার ছলনায় আবার ভুলিতেছ? তবে দাও, তোমার ইন্দ্রিয়-অশ্বযোজিত হৃদয়-রথের রজ্জু বিশ্বসারথীর হস্তে দাও। একবার রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে শুদ্ধ-হৃদয়ে দাঁড়াইয়া, নিজের কর্তৃত্বরূপ ধনু পরিত্যাগ করিয়া, করযোড়ে জ্যোতির্ম্ময় সারথীর নিকট কাঁদিয়া বল—প্রভু! সখা! আমি বিপন্ন, আমি মায়ামূঢ়, আমি সংসারমায়া হনন করিতে ইচ্ছুক হইয়াও পারিতেছি না। আমি স্ত্রীপুত্রের মোহের বন্ধন কাটিতে অশক্ত—আমায় রক্ষা কর, অমায় পথ দেখাও, আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া দাও।

দেখিবে, শুনিবে, তিনি নিজে স্বরূপে প্রকাশ হইয়া তোমার বিষাদ মোচন করিয়া দিবেন। গম্ভীর মন্ত্রনিনাদে তোমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে সেই অনাথের নাথ বলিয়া উঠিবেন,—"ভীত হইও না, তোমার দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ কর, আমি তোমার সহায়"—

ইহাই বিষাদযোগ। অর্জ্জুনের প্রাণে সর্ব্বপ্রথম এই ভাব উদিত হইয়াছিল। সাধকমাত্রেরই প্রাণে সর্ব্বপ্রথম এই ভাব উদিত হয়। তবে অর্জ্জুনে ও অন্যান্য সাধকে প্রভেদ কি? মহাসাধক অর্জ্জুন—সাধকের আদর্শ, তাই অর্জ্জুন ভগবান্‌কে অন্নময় বা স্থূলকোষে বা জড়দেহে উপভোগ করিয়াছিলেন, জড়দেহে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে দাঁড়াইয়া তাঁহার এই বিষাদ সর্ব্বপ্রথম বিনষ্ট করিয়াছিলেন। আর অন্যান্য সাধক—সাধকমাত্র; তাহারা শুদ্ধ মনোময় কোষে ভগবান্‌কে এইরূপে সম্ভোগ করিতে পায়। ভগবানের গীতা মনোময় ক্ষেত্রে মাত্র শুনিতে পায়। আদর্শ সাধক না হইলে স্থূল কোষে ভগবৎসম্ভোগ সচরাচর ঘটে না।

বিষাদযোগ সমাপ্ত।

সাঙ্খ্যযোগ।

সর্ব্বপ্রথম সাধকের প্রাণে যখন এইরূপ প্রশ্ন উঠে, তখন তাহাতে তাহার মায়ার গন্ধ থাকে, সেই জন্য ভগবান্ অগ্রে নিত্য এবং অনিত্য সম্বন্ধে চক্ষু ফুটাইয়া দেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বহুরূপত্ব ঘুচিয়া গিয়া তাহার চক্ষে প্রধানতঃ দুইটী বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডটা দুই ভাগে বিভক্ত বলিয়া তাহার ধারণা হয়। প্রত্যেক পদার্থে প্রত্যেক অণু পরমাণুতে দুই প্রকারের উপলব্ধি তাহার প্রাণে ফুটিয়া উঠে। যে কোন বস্তু তাহার ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহারই মধ্যে তাহার প্রাণ দুইটি স্তর উপলব্ধি করিতে প্রয়াস পায়। কোন ভাব বা বস্তু মনে প্রতিফলিত হইলে, তাহাতে নিত্য কতটুকু এবং অনিত্য কতটুকু, এই বিচারে তাহার প্রাণ ব্যস্ত থাকে। সে জগতের সমস্ত বিষয় সমস্ত পদার্থ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, চিরিয়া চিরিয়া তাহার ভিতর নিত্য কতটুকু, বাহির করিতে প্রয়াস পায়। প্রত্যেক পদার্থের ভিতর তাহার প্রাণ ভগবান্‌কে অন্বেষণ করে। প্রত্যেক পদার্থকে তাহার ইন্দ্রিয়সকল পদার্থ বলিয়া যেমনি উপভোগ করে, অমনি তাহার প্রাণ মূর্ত্তিমান্ ভগবান্‌কে তাহারই মধ্যে অন্বেষণ করে। প্রাকৃতিক শোভা দর্শনে, কুসুম আঘ্রাণে, সুকুমার পুত্র আলিঙ্গনে, জননীর স্নেহ-সম্ভাষণে অথবা মধুর রসাস্বাদনে, সর্ব্বত্র তাহার প্রাণ কাঁদিয়া বলে,—"কই প্রভু! কই জগন্নাথ! তুমি কোথায়? কোথায় তুমি নিত্য সর্ব্বব্যাপী মহাপুরুষ? কোথায় তুমি বিশ্বপ্রসবিনী জননী? ইহাতে তোমার অধিষ্ঠান কই? আমি তোমায় দেখিতে পাইতেছি না কেন? জানি তুমি ইহাতে আছ—জানি তুমি সর্ব্বভূতে বিরাজিত, শুনিয়াছি তুমি ভূতে ভূতে প্রতিষ্ঠিত, তবে আমি তোমায় চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেছি না কেন? জানি তুমি স্ত্রীতে আছ, জানি তুমি পুত্রে আছ, কিন্তু আমি স্ত্রীপুত্র মাত্র দেখিতেছি কেন? আমি যে কেবল পঞ্চভূতসমষ্টি মাত্র দেখিতেছি? তুমি মূর্ত্তিমতী হইয়া—জননি! কেন আমার ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছ না? ফুলটিকে ফুল বলিয়া আমার ইন্দ্রিয় চিনিতেছে কেন মা? আমার লালায়িত প্রাণ ইহাতে যে

তোমাকে অধিষ্ঠাতা দেখিতে চাহে, তবে কেন আমার ইন্দ্রিয় তোমাকে প্রত্যক্ষীভূত করাইতে পারে না? ফুলে ফুলে কই তুমি মা? পল্লবে পল্লবে, বৃক্ষে বৃক্ষে, পর্ব্বতে, অরণ্যে, চন্দ্রে, সূর্য্যে, আকাশে, পুত্রে, কলত্রে, উরগে, শ্বাপদে, জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে কই তুমি মা? শীতে, উষ্ণে, আলোকে, অন্ধকারে, রোগে, সম্ভোগে কই তুমি মা? শব্দে, স্পর্শে, রূপে, রসে কই তুমি মা? সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, সন্তাপে, শান্তিতে কই তুমি মা? সন্দেহে, বিশ্বাসে, সংশয়ে আশয়ে—হতাশে, আশ্বাসে, কই—কই তুমি মা? আমার ইন্দ্রিয় তোমায় খুঁজিয়া পায় না কেন?" এই ভাবে তাহার প্রাণ কাঁদিতে থাকে; অর্থাৎ যেমন একটী পল্লব দেখিবামাত্র তাহার বৃন্ত ও পত্র ভিন্ন ভিন্ন রূপে বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ সে প্রত্যক পদার্থে কোন্‌টুকু ভগবান্—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে। কেবল মাত্র পদার্থে নহে, ক্রমশঃ সে পদার্থের শক্তিতে ও মানসিক ভাবের মধ্যে ভগবান্‌কে দেখিতে প্রয়াস পায়। ভগবান্‌কে পাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠে।

তখন ভগবান্ তাহার চক্ষু আরও একটু উন্মীলিত করিয়া দেন। জগৎ ছাড়িয়া আপনার দিকে তাহার লক্ষ্য পড়ে। এক অভিনব বিশাল ব্যাপার তাহার হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। মায়ার কেন্দ্র কোথায়? মায়ার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে, কার্য্যতঃ কত দূর উচ্ছেদিত হয়? মায়া কত—কত দূর বিস্তৃত, তাহা সে জানিত না। এই সন্ধিক্ষণে সে দেখিতে পায়, সংসার ত্যাগ করিলেই মায়ার উচ্ছেদ হয় না। মায়া বাহিরে নহে, মায়া ভিতরে। বহির্জ্জগতে মায়া বলিয়া কিছুই নাই, মায়ার ক্ষেত্র তাহারই অন্তরে। ইন্দ্রিয়সকল বহির্জ্জগৎ হইতে যে সমস্ত জিনিষ আনিয়া তাহার অন্তরে সংস্কারাকারে সাজাইয়া দিয়াছে, সেই সংস্কারগুলির সহিত তাদাত্ম্যভাব মায়া। মায়ার উচ্ছেদসাধন অর্থে—এই তাদাত্ম্যভাবের উচ্ছেদ। এইরূপ বুঝিয়া সে আরও কাতর হইয়া উঠে। তবে আমি কি লইয়া থাকিব? ইন্দ্রিয়াদি বিষয়-সকল উচ্ছেদিত হইলে, আমার আমিত্বের অস্তিত্ব কত দূর সম্ভবপর,—এই মহাপ্রশ্ন তাহার হৃদয়ক্ষেত্রকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলে। সে আপনাকে আপনারই ভিতর খুঁজিতে থাকে। তন্ন তন্ন করিয়া আপনাকে চিরিয়া, তার আমিত্বটুকু কোথায়—দেখিতে চেষ্টা করে।

এইরূপ কিছু দিন অন্বেষণ করিতে করিতে সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারে, এ জগতের সমস্ত পদার্থ আর কিছুই নহে, কেবল এক মহাশক্তির মাত্রার তারতম্য

মাত্র। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রথমতঃ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচ প্রকার তন্মাত্রার সমষ্টি মাত্রে পরিণত হয়। তারপর জ্ঞান উপলব্ধির আরও উচ্চ স্তরে আরোহণ করিলে সে বুঝিতে পারে, এই পাঁচ প্রকার উপলব্ধিও বস্তুতঃ পাঁচ প্রকার জিনিষ নহে, একটী অনন্তব্যাপিনী শক্তিতরঙ্গের ইতরবিশেষ স্পন্দনমাত্র। যেমন সমুদ্রের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরঙ্গের মধ্যে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, কেবল স্পন্দনের ইতরবিশেষ, তদ্রূপ জগতের শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি বিভিন্ন অনুভূতিও কেবল স্পন্দনের ইতরবিশেষ মাত্র।

সাধক বুঝিতে পারে, যেমন সূর্য্য হইতে জ্যোতিস্তরঙ্গরাশি অনন্ত যোজন ব্যাপিয়া চারি ধারে অহর্নিশ তরঙ্গের পর তরঙ্গে প্রধাবিত হইতেছে, জ্যোতির তরঙ্গে তরঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাত পাইয়া যেমন অসীম, অনন্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গবিভাগে ব্যোমমণ্ডল অবিরত তরঙ্গময় হইয়া রহিয়াছে, বস্তুতে বস্তুতে সূর্য্যের সে তরঙ্গরাশি প্রতিহত হইয়া যেমন অনন্ত প্রকারের বর্ণরঞ্জনার অপূর্ব্ব সৃষ্টিবৈচিত্র্য সংঘটিত হইতেছে,—একই সূর্য্যালোক যেমন প্রতিরোধ বা আঘাতের তারতম্যে বিভিন্ন বর্ণে প্রতীয়মান হইতেছে,—যেমন জগতের লাল, নীল, পীত, হরিৎ, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিন্যাস বস্তুতঃ আর কিছুই নহে, একই সূর্য্যালোকরাশির নানা মাত্রার বা নানা প্রকারের তরঙ্গভঙ্গমাত্র—অর্থাৎ একই সূর্য্যালোক নানা বস্তুতে অল্পবিস্তর মাত্রার তারতম্যে নানাপ্রকারে প্রতিহত হইয়া যেমন বিভিন্ন বর্ণরাশি জগতের চক্ষে ফুটাইয়া তুলিতেছে, তেমনই কোন এক অব্যক্ত কেন্দ্র হইতে একপ্রকার স্পন্দনে এক মহাশক্তি অহর্নিশ স্ফুরিত। তাহার হৃদয়ে কোথায় কোন্ দূর অব্যক্ত কেন্দ্র হইতে শক্তির স্পন্দন অহর্নিশ স্ফুরিত হইয়া, তাহার সংস্কাররাশিতে প্রতিঘাত পাইয়া অনন্ত প্রকারের তরঙ্গভঙ্গ সৃজন করিতেছে—অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ অপূর্ব্ব জড় জগদ্ভ্রান্তি বা জীবত্বানুভূতি এই প্রকারে তাহার হৃদয়ে অহর্নিশ রচিত হইতেছে।

শুধু শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময় জড়জগৎ নহে—কাম, ক্রোধ, লোভ, ভক্তি, করুণা, প্রীতি ইত্যাদি মানসিক বিকারসমষ্টিও বা মনোময় জগৎও বিভিন্ন প্রকারের স্পন্দনমাত্র বলিয়া সে চিনিতে পারে। জ্ঞানে ও বর্ব্বরতায়, ভক্তি ও বিতৃষ্ণায়, করুণা ও নিষ্ঠুরতায়, দয়া ও কার্পণ্যে, অথবা কামে, ক্রোধে ও লোভে বা ভক্তি, স্নেহ ও প্রেমে,—সে বস্তুগত কোন তারতম্য দেখিতে পায় না। কেবলমাত্র প্রতিঘাত বা স্পন্দন বা মাত্রার তারতম্য বলিয়া উপলব্ধি হয়। যেমন

সমুদ্রের একই জলে ছোট বড় তরঙ্গ, যেমন সূর্য্যের একই আলোকে পীত লোহিত ইত্যাদি বিভিন্ন মাত্রার তরঙ্গ—তেমনই এ সমস্ত মানসিক বৃত্তিও সেই একই শক্তির বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দন বলিয়া পরিলক্ষিত হয়।

বস্তুতঃ, আমরা যাহা কিছু দেখি, শুনি বা অনুভব করি, সে সমস্ত বাহিরে নহে—ভিতরে; আমার নিজের হৃদয়ে কোন এক অব্যক্ত স্থানে সে সমস্ত উপলব্ধি হয়। সাধারণতঃ আমাদের মনে হয়—বহির্জ্জগৎ যেন আমরা বাহিরে দেখিতেছি, শুনিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, আঘ্রাণ করিতেছি বা আস্বাদন করিতেছি; কিন্তু বস্তুতঃ হইতেছে কি? বহির্জ্জগৎ আমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বর্গে স্পৃষ্ট হইয়া আমার সংস্কারপুঞ্জে গিয়া ধাক্কা দিতেছে। সেই ধাক্কায় আমার সংস্কারচক্র নানা প্রকারে স্পন্দিত হইতেছে। সেই নানা প্রকারের স্পন্দন রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি নানাপ্রকার অনুভব জন্মাইয়া দিতেছে। স্নেহ, প্রেম, ভক্তি বা ক্রোধ, কাম ইত্যাদি যেমন বাহিরে নহে, ভিতরে,—তেমনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ইত্যাদিও বাহিরে নহে ভিতরে। তাহা যদি না হইত, তবে একই বস্তু বিভিন্ন হৃদয়ে বিভিন্ন প্রকারে অনুভূত হইত না। তুমি তোমার স্বীয় হৃদয়ে এক প্রকারে, পুত্রের হৃদয়ে এক প্রকারে, আত্মীয়-হৃদয়ে অন্য প্রকারে, শত্রু-হৃদয়ে অন্য এক প্রকারে প্রতিফলিত হও কেন? তোমার স্ত্রী তোমায় দেখিলে তাহার হৃদয়ে তোমার সম্বন্ধীয় যে সংস্কাররাশি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, সেইগুলি ফুটিয়া উঠিয়া স্বামিত্বের অনুভূতি ফুটাইয়া তোলে। তোমার পুত্রের হৃদয়ে তোমার সম্বন্ধীয় যে সংস্কাররাশি প্রচ্ছন্ন আছে, তোমার দর্শনে সেই-গুলি পিতৃ-অনুভূতি ফুটাইয়া দেয়। এইরূপে একই তুমি বিভিন্ন হৃদয়ে সংস্কারের তারতম্যে কোথাও পিতা, কোথাও ভ্রাতা, কোথাও শত্রু, কোথাও মিত্র ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে ফুটিয়া উঠ। এইরূপ সমস্ত—ব্রহ্মাণ্ড উপলব্ধি এইরূপে হয়। বাহিরে কিছু নাই, কেবলমাত্র এক বিশাল শক্তির নামরূপক্রিয়াময় তরঙ্গভঙ্গ আছে। আর সেই শক্তিতরঙ্গরাশি, সেই শক্তিসমুদ্রের আবর্ত্তনসকল মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারপুঞ্জে বা জীবভাবে প্রতিহত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুভূত হইতেছে মাত্র।

এইরূপে সে সাধক আপনার হৃদয়াভ্যন্তরে কেন্দ্রের বা নিজের স্বরূপের ঈষৎ আভাস পায়। সে নিজের ভিতরে এক অব্যক্ত আদি সনাতন অথচ কেন্দ্র—আর তাহার উপর চেতনার বা চৈতন্যশক্তির অবিশ্রাম স্ফুরণ—সেই নিজ চৈতন্য-

স্ফুরণের সহিত বহির্জ্জগতের বিরাট স্ফুরণের ঘাতপ্রতিঘাত—সেই উভয় তরঙ্গ-সংঘাতের ফলস্বরূপ নিজের চৈতন্যতরঙ্গের বিভিন্নপ্রকার আন্দোলন ও তাদাত্ম্যবোধ—তাহাতে জগৎরূপ নানা দৃশ্যের বিকাশ—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, মিত্র,শত্রু ইত্যাদি নানা কল্পনা-বৈচিত্র্যের মুহূর্ত্তের ব্যক্তভাব,- এবং ক্ষণকাল পরে সে কল্পনারাশির অব্যক্তে মিশাইয়া যাওয়া—এইগুলির ধীরে ধীরে আভাস পাইয়া থাকে।

কিন্তু সহসা যেন বিদ্যুতের মত আর একটী অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ তাহার হৃদয়ে ঝলসিয়া উঠে। জন্ম-মৃত্যু-অবস্থান, এ সমস্ত কিছুই নহে—বসন পরিবর্ত্তনের মত কেবল শক্তি বা সংস্কারের পরিবর্ত্তন মাত্র। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, এ সব চিত্তের ভাববিপর্য্যয় ছাড়া কিছুই নহে। কি আশ্চর্য্য! এ ভাবের প্রহেলিকা নিত্য জন্মাইতেছে, নিত্য লুপ্ত হইতেছে, ছুটিতেছে, নিবিয়া যাইতেছে,—ইহার জন্য শোক কি? ইহাতে চিন্তার বিষয় কি আছে? আমি এই জ্ঞানে যুক্ত হইয়া থাকি না কেন? সংসার ছাড়ি বা সংসারে থাকি—তাহাতে আমার আসে যায় কি? এ কি—এ আবার কি সমস্যা! আমার আবার সুখ দুঃখ কি? লাভ অলাভই বা কি? মায়ার উচ্ছেদসাধন করিলে, সংসাররণক্ষেত্রে থাকিয়া ইন্দ্রিয়-সংগ্রামে বিজয়ী হইলে, আমার আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে সত্য, যাহাদিগকে ত্যাগ করিতে কাতর হইয়াছিলাম, সে সকল ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়বিকারের উচ্ছেদসাধনে আমার কোন ক্ষতি নাই সত্য, সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে সমান ভাবিয়া, আমি আত্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া, ইন্দ্রিয়গণের উচ্ছেদসাধনে যত্নপর হইতে পারি সত্য; কিন্তু তাহাতে আমার থাকিবে কি? অনাত্ম পদার্থই আত্মীয়রূপে প্রকাশ পাইতেছে—ইহাদিগের উচ্ছেদ অবশ্যই সংসাধ্য। কিন্তু এ সব ছাড়িলে আমার যাহা থাকিবে, তাহাতে সুখ কি—আত্মস্বরূপে এমন কি প্রাপ্তি আছে, যাহার জন্য এত প্রত্যক্ষ সুখময় আমিত্বকে উচ্ছেদিত করিব?

আত্মানাত্মবিচারকালে অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবের আত্মমহিমা জানা না থাকায় এইরূপ সমস্যা উদিত হইতে থাকে।

সাঙ্খ্যযোগ সমাপ্ত।

ওঁ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

বিষাদযোগ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—সঞ্জয়! মৎপক্ষীয়গণ এবং পাণ্ডবেরা যুদ্ধার্থী হইয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিলেন?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—

ভগবদ্গীতা কি?—ভগবানের গান। অনন্ত অফুরন্ত সঙ্গীতলহরী।

এ বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের ঝঙ্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। সে অপূর্ব্ব সঙ্গীতস্রোত অনন্ত কাল ধরিয়া সপ্তলোকের দিগ্দিগন্ত ব্যাপিয়া ধ্বনিত—অনন্তের পরমাণুতে পরমাণুতে উচ্ছ্বসিত। সে সঙ্গীত মহাশক্তির প্রথম অভিব্যক্তি। নাম তাহার প্রণব—আকর্ষণ তাহার সুর সৃষ্টিবিকাশ তাহার মূর্চ্ছনা—লয় তাহার ভাব বা লয়। শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় তাহার তিনটী তাল—ব্রাহ্মণ—শূন্য বা মান।

সে আকর্ষণ বা সুর ষড়্‌জ, ঋষভ আদি সাত ভাগে বিভক্ত। সেই সাত ভাগে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ আদি সপ্তলোক রচিত, প্রতিষ্ঠিত, অনুপ্রাণিত। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তাহার মাত্রা।

তোমরা সে গানের মোহন ঝঙ্কার শুনিবে কি?

সে গান প্রতি মনুষ্য-হৃদয়ে শুনিতে পাওয়া যায়;—সে গানের অমৃতস্রাব প্রত্যেক জীবকে অহর্নিশ অভিষিক্ত করে; তবে মনুষ্য-হৃদয়ে তাহা স্ফুটতর। সে গানের মোহন ঝঙ্কার একবার শুনিলে—সুররেখা একবার কানে গিয়া

বাজিলে—আর জীব থাকিতে পারে না। চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের মত জীব কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। কেন না, আকর্ষণই সে সুরের ধর্ম্ম। কোন গৃহে কতক-গুলি তারের যন্ত্র এক রকম সুরে বাঁধিয়া রাখিয়া, একটী যন্ত্রে ঝঙ্কার দিলে, যেমন সমস্ত যন্ত্রে সে ঝঙ্কার প্রতিধ্বনিত হয়, তেমনই ভগবানের সে অপূর্ব্ব বীণার ঝঙ্কার বা গান কুরুক্ষেত্ররূপ প্রতি মনুষ্যহৃদয়ে অহর্নিশ প্রতিধ্বনিত।

তুমি সে ঝঙ্কার শুনিয়াছ কি?

সে ঝঙ্কারের রূপ আছে—সে ঝঙ্কার জ্যোতির্ম্ময়! সহস্র বিজলি আলোক একত্রে দীপ্তি পাইলেও তাহার তুলনা হয় না; সূর্য্যালোক তাহার ম্লান অংশমাত্র। জ্যোতিঃই সে সুরের প্রাণ। বায়ুর তাড়নায় যেমন সাগরবারিরাশি বিশাল তরঙ্গে আন্দোলিত হয়, সুরের তালে তালে সে জ্যোতির সাগর তেমনই দল্ দল্ আন্দোলিত। তরঙ্গে তরঙ্গে অপূর্ব্ব চাক্‌চিক্যময় অনন্ত বর্ণের বিকাশ। স্রোতে যেমন জল চক্রাকারে আবর্ত্তিত হয়, সে জ্যোতিবিস্তারে তেমনই আবর্ত্তনে আবর্ত্তনে শুভ্র, পীত, হরিৎ, লোহিতাদি কত অপূর্ব্ব বর্ণবিশিষ্ট সূর্য্যরাশি প্রস্ফুরিত;—ফুটিতেছে, থাকিতেছে মিলাইয়া যাইতেছে। সব সেই একই সুরের তালে তালে।

তোমরা সে জ্যোতির সাগর দেখিবে কি? তবে অবহিতচিত্তে গীতা বুঝিতে চেষ্টা কর।

আবার বলি—গীতা সেই জ্যোতির্ম্ময় গান। ইহা তোমার হৃদয়াকাশে গীত—ধ্বনিত। প্রতি ঝঙ্কারে তোমার হৃদয় জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিতেছে,—প্রতি ঝঙ্কারে তোমার প্রাণশক্তি উজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। অথবা সেই ঝঙ্কারই তোমার প্রাণ, তাই তুমি জীবিত। জীব! দেখ! দেখ! শুন! শুন!

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে গানের সুর আকর্ষণ। কা'র আকর্ষণ, কিসের জন্য আকর্ষণ—স্থূল কথায় বুঝাইবার চেষ্টা করি।

সূর্য্যমণ্ডল হইতে স্ফুলিঙ্গবৎ জ্যোতিষ্কমণ্ডলসকল চারি ধারে প্রক্ষিপ্ত হইয়া গ্রহ উপগ্রহ আকারে যেমন তাহারই আকর্ষণে ঘুরিতেছে, এক বিরাট্ আকর্ষণ-শক্তির দ্বারা যেমন গ্রহচক্র সূর্য্যের সহিত সম্বদ্ধ, তেমনই চৈতন্যরাজ্যে চৈতন্যময়ী মায়ের আমার স্ফুলিঙ্গরূপ আমরা, তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহা হইতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া, তাঁহারই আকর্ষণে তাঁহার চারি ধারে প্রদক্ষিণ করিতেছি। চৈতন্যের প্রত্যেক পরমাণুতে পরমাণুতে নিজের বিরাট্‌ত্ব উপলব্ধি করাইবার জন্য, নিজের

অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যশোভা ফলাইয়া তুলিবার জন্য, আপন অঙ্গ হইতে বিকর্ষণশক্তি বা প্রবৃত্তি-প্রভাবে প্রক্ষিপ্ত করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণশক্তির দ্বারা মা আমার জীবসকলকে ধারণ করিয়া আছেন। মা যেমন শিশু সন্তানকে আনন্দিত করিতে উর্দ্ধে ছুঁড়িয়া দিয়া, হাত দুইটী পাতিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য অপেক্ষা করে, ঠিক তেমনই ভাবে বিশ্বজননী আমাদিগকে বিকর্ষণশক্তি-প্রভাবে বিক্ষিপ্ত করিয়া, আবার ক্রোড়ে ধারণ করিবার জন্য আকর্ষণশক্তিরূপ কর পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। বিকর্ষণশক্তি ফুরাইলে আবার আমরা আকর্ষণশক্তিপ্রভাবে মাতৃ-অঙ্কে সংযুক্ত হইব। সারা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণশক্তির ক্রীড়া চলিতেছে। এই দুইটী শক্তির সাধারণ নাম প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বলা যাইতে পারে।

কিন্তু বুঝিও, বিকর্ষণশক্তি কিছুক্ষণ কার্য্যকরী হইলেও আকর্ষণশক্তি তাহার ভিতর দিয়াও প্রবাহিত। আকর্ষণশক্তির বিরাম নাই। স্রোতের জল যেমন ধাক্কা বা রোধ প্রাপ্ত হইলে, ফুলিয়া উঠিয়া, আবার স্রোতে মিলাইয়া যায়, তেমনই বিরাট্ চৈতন্যময়ী মায়ের আমার চৈতন্যকণা যেখানে যেখানে অহংজ্ঞানের প্রতিরোধ প্রাপ্ত হয়, সেইখানে সেইখানে সে চৈতন্য জীবাকারে ফুলিয়া উঠিয়া, আবার সে রোধশক্তির অবসানে চৈতন্যস্রোতে মিশিয় যায়। মায়ের আকর্ষণ-শক্তির স্রোত এইরূপে অবিরত প্রবাহিত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐ আকর্ষণশক্তিই গীতা। প্রণবের ঝঙ্কার জীব-হৃদয়রূপ কুরুক্ষেত্রে গীতারূপে বাজিয়া উঠে। আকর্ষণশক্তি, প্রণব, সুর, নিবৃত্তি—এ সব প্রায় একই কথা। এবং এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণশক্তির বা নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সংঘর্ষণই কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ।

প্রতি জীব-হৃদয়ে প্রণব ধ্বনিত। গীতা—এই প্রণবের বিশ্লেষণ। জীব-হৃদয় যখন যথার্থ কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে পরিণত হয়, তখন হইতে ঐ প্রণব বিশ্লেষিত হইয়া কতকগুলি বাঙ্ময় শ্রেণীবদ্ধ ভাবরাশিতে ফুটিয়া উঠে। সেইগুলি গীতায় পর পর অধ্যায় আকারে বিভক্ত।

অর্থাৎ জীব যখন আপনাকে সাধক বলিয়া চিনিতে পারে, তখন সে সর্ব্ব-প্রথম এই প্রণব বা অনাহত নাদ শুনিতে পায়। সেই নাদ শ্রুতিগোচর হইবার পর হইতে প্রথমে বিষাদভাব, তারপর সাংখ্য বা নিত্যানিত্য বিচার বা প্রকৃতি-পুরুষ-বিচার-ভাব ; এই সকল ভাবশ্রেণী পর পর ফুটিয়া উঠিতে থাকে, তাহার প্রাণ সেই সকল ভাবে মগ্ন হইয়া যায়। সে আপনাকে ঐরূপ ভাবসমষ্টি মাত্র

বলিয়া প্রত্যক্ষ করে। সে অনাহত নাদ যেন গীতারূপ শব্দ বা সুরতরঙ্গে বিশ্লেষিত হইতে থাকে। ঝঙ্কারের পর ঝঙ্কার তাহার প্রাণকে মাতাইয়া তোলে। ভগবদাকর্ষণের প্রবল বন্যায় সে ভাসিয়া বিরাটে গিয়া পৌঁছায়, বিরাট্‌রূপ দর্শনে কৃতকৃতার্থ হয়। গীতার প্রথম এগারটি অধ্যায়ে এই অবধি আছে।

তারপর—তারপর, সমুদ্রে বিম্বস্ফোটনের মত ধীরে ধীরে সে সিদ্ধ সাধক মাতৃ-অঙ্কে মিলাইয়া যায়। গীতার দ্বাদশ অধ্যায় হইতে অবশিষ্ট অংশটুকু এই মিলনের স্রোত।

আবার বলি—জীব! তোমার হৃদয়বীণাকে বাঁধ। সুরে মিলাইয়া তন্ত্রীগুলি ঠিক করিয়া যদি বাঁধিতে পার, ভগবানের আকর্ষণ-গান তোমার বুকের ভিতর ঝঙ্কার দিয়া উঠিবে। শুনিবে,—যে গানের অমৃতধারায় বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত, যে গানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অনন্ত যুগ মগ্ন, সেই গান তোমার প্রাণ গাহিতেছে !!!

ধৃতরাষ্ট্র—

ধৃতরাষ্ট্র কে? যাহার দ্বারা রাষ্ট্র ধৃত বা অধিকৃত, তাহাকেই ধৃতরাষ্ট্র বলে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ বিশাল জগতে দুইটী শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে। একটী আকর্ষণীশক্তি—যাহা গীতারূপে মনুষ্যহৃদয়ে মধুর ঝঙ্কারে ধ্বনিত হয় এবং অপরটী বিকর্ষণীশক্তি, যাহা প্রত্যেক জীবাত্মাকে বা ভগবদংশকে জ্ঞানৈশ্বর্য্য লাভের জন্য ভগবান্ হইতে দূরে কিছু দিনের জন্য প্রক্ষিপ্ত করে। ভগবানের প্রত্যেক অণুতে অণুতে অহংজ্ঞান যত ফুটিয়া উঠিতে থাকে, তাঁহার ইচ্ছাশক্তি নিজের যোগৈশ্বর্য্য দেখিবার জন্য তত লালায়িত হয়। রাজা যেমন নিজের রাজ্য পরিদর্শন করে, তেমনি ভাবে ভগবানের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা জীবাত্মা নিজের অনন্ত মহিমা, অপূর্ব্ব যোগশক্তি দেখিবার জন্য বিরাট্ চৈতন্যময়ী ভগবৎশক্তির দ্বারা নিরঞ্জনভাব হইতে ভাবরঞ্জনাযুক্ত সঙ্কীর্ণ অহংজ্ঞানের সাকার সীমার ভিতর প্রবেশ করিতে থাকে। এই যে ভাবশূন্য অবস্থা হইতে চৈতন্যময় ভাবরাজ্যে প্রবেশ, ইহা ভগবানের বা জীবাত্মার বিক্ষেপশক্তির দ্বারা হইয়া থাকে। ইহারই নাম প্রবৃত্তি বা ধৃতরাষ্ট্র। এই অন্ধ প্রবৃত্তি অহংজ্ঞানের সঙ্কীর্ণ সীমায় চৈতন্যশক্তিকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়া সাকার জড় উপাধি-বিশিষ্ট জীবে পরিণত করে। "আমি আছি", "আমি আছি", ইত্যাকার জ্ঞান জীবের হৃদয়ে অহর্নিশ স্ফুরিত হয়। "আমি আছি", "আমি আছি" বা এই আমিত্বজ্ঞান যতই ক্রমশঃ স্ফুটতর হইতে থাকে, ততই সঙ্গে সঙ্গে "আমার"

"তোমার" ইত্যাকার জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হয়। ততই জীব উদ্ভিদ, ক্রিমি, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি জন্মান্তরের ভিতর দিয়া পূর্ণ আমিত্বের দিকে ছুটিতে থাকে। তাহার আমিত্বের তৃষা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে—চৈতন্য উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হয়।

এইরূপে শেষ জীব নরাকারে পরিণত হয়। এইখানে আমিত্বের পূর্ণবিকাশ ও বিশ্লেষণ। যেমন শিল্পী, প্রস্তরখণ্ড হইতে ইচ্ছামত কোন মূর্ত্তি খোদিত করিয়া লইয়া অবশিষ্ট অংশ দূরে প্রক্ষিপ্ত করে, তদ্রূপ এত দিন ধরিয়া জীব আমিত্ব-ভাবের যে একটী স্তূপ সঞ্চিত করিয়া আসিতেছিল, মনুষ্যজন্মে তাহা হইতে নিজের প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি অনুযায়ী একটী বিশিষ্ট আমিত্বকে খাড়া করে এবং অবশিষ্ট অংশ দূরে প্রক্ষিপ্ত করে। এইটী আমার, এইটী আমার নহে, ইত্যাদি ধারণা মনুষ্য-হৃদয়ে পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হয়।

জড়দেহের সাহায্যে জীব আমিত্বকে ঘনীভূত করিয়া তুলিতে থাকে;—তাহার চৈতন্যক্ষেত্রে একটী আমিত্বের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। প্রথমে এই মনোময় ক্ষেত্রে বা মনে—যেখান হইতে আমাদের ইন্দ্রিয়সকল স্ফুরিত - সেইখানে, তারপর বিজ্ঞানময় কোষে বা জ্ঞানবুদ্ধির কেন্দ্রে এই আমিত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। যখন ইন্দ্রিয়সকল নিরোধ করিয়া আমিত্বের অনুভব করিতে জীব সক্ষম হয়, তখন বুঝিতে হইবে, তাহার মনোময় দেহ তৈয়ারি হইয়াছে। সাধারণ মনুষ্য ইন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া যোগস্থ হইতে গেলে ঘুমাইয়া পড়ে; তাহার কারণ, সে এখনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তার আমিত্বের অনুভব করিতেছে মাত্র, মনোময় ক্ষেত্রে এখনও সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট হয় নাই। গর্ভে যেমন শিশু থাকে, তেমনই তার মনোময় কোষে সে এখনও শিশু। ইন্দ্রিয় সাহায্যে পুষ্টিলাভ করিয়া ক্রমে এই আমিত্ব বর্দ্ধিত, পুষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠবযুক্ত হইতে থাকে। ইহাও বলিয়া রাখি, এমন কতকগুলি প্রক্রিয়া আছে, যাহার দ্বারা এই আমিত্ব শীঘ্র সবল ও প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন ব্যায়ামের দ্বারা শরীর সবল হয়, তেমনই সেই সব মানসিক ব্যায়ামের দ্বারা মনোময় "আমি" সবল হইয়া উঠে। সাধারণ কথায় সেগুলিকে যৌগিক ক্রিয়া বলে।

যাহা হউক, যত দিন না এইরূপে আমিত্বের প্রতিষ্ঠা হয় তত দিন অন্ধ প্রবৃত্তি বা তৎপুত্র মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ক্ষেত্র অধিকার করিয়া, তাহার উপর আধিপত্য করে।

ক্রমে যখন মনোময় কোষে তার আমিত্ব ঘনীভূত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠে, তখন বিরাট্‌চৈতন্যময়ী আকর্ষণীশক্তি তাহাতে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইতে থাকে।

আকর্ষণীশক্তি এত দিন যে ছিল না, তাহা নহে ; সে শক্তি সমানভাবে বহিতেছিল, তবে যেমন বীণা বা সেতারের তার শ্লথ থাকিলে তাহাতে স্বরতরঙ্গ ধ্বনিত হয় না —সুচারুরূপে তারগুলি বাঁধিলে তবে তাহা হইতে মধুর ঝঙ্কার ছুটিতে থাকে,— তেমনই এই আমিত্ব এত দিন পরে সেই অনাদি-প্রবাহিতা আকর্ষণীশক্তি বা প্রণবের প্রতিঘাতে বঙ্কার করিয়া উঠে, গীতা-লহরী ফুটিয়া উঠিবার সূচনা হয়। হিত এবং অহিত, এই বিচাররূপে নিবৃত্তি-শক্তি প্রথম ঝঙ্কার দেয়— হৃদয়-রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় ; অর্থাৎ পাণ্ডবেরা যেন ইন্দ্রপ্রস্থরূপ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে। কুরুক্ষেত্রের এক অংশ কৌরবের বা প্রবৃত্তির এবং এক অংশ পাণ্ডবের বা নিবৃত্তির শাসনাধীন হয়।

নিবৃত্তির জ্ঞানরাজ্য ক্রমে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিতে থাকিলে প্রবৃত্তি পক্ষ তখন এক ভীষণ ছলনার ফাঁদ পাতিয়া একবার নিবৃত্তিপক্ষকে রাজ্যচ্যুত করে। জীব ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে প্রথমে একবার তার প্রবৃত্তি সিদ্ধিলাভের ভীষণ ছলনায় তাহাকে প্রতারিত করে। নিবৃত্তিপক্ষ রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হয়। সিদ্ধির আশায় মুগ্ধ হইয়া জীব প্রবৃত্তির দ্বারা প্রতারিত হয় ও মুক্তির পথ হইতে আবার দূরে গিয়া পড়ে।

তারপর নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, বিরাট্ চৈতন্যের সাহায্যে যখন স্বরূপে সে নিবৃত্তিপক্ষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তখন পুনরায় কুরুক্ষেত্রে প্রবৃত্তির সহিত ভীষণ সংগ্রাম সূচিত হয়। ইহাই কুরু-পাণ্ডবসমর বা জীবের ধর্ম্মযুদ্ধ বা আকর্ষণ ও বিকর্ষণশক্তির অপূর্ব্ব রণাবর্ত্ত।

ধর্ম্মক্ষেত্রে—

ধর্ম্মক্ষেত্র কাহাকে বলে? ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। যে চৈতন্যময়ী মাতৃশক্তি সৃষ্টিরূপ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলকে সৃজন করিয়া, ধারণ করিয়া রহিয়াছেন—তাঁহার নাম ধর্ম্ম। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে আকর্ষণী শক্তির কথা বলিয়াছি, তাহাই ধর্ম্ম। প্রণবই ধর্ম্ম। আর যে ক্ষেত্রকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যে ক্ষেত্রে সেই শক্তির অপূর্ব্বলীলার নিত্যানুষ্ঠান হইতেছে, সৃষ্টিচক্ররূপ সেই ব্রহ্মাণ্ডসমষ্টিকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলে।

অনন্তকোটি সূর্য্য-চন্দ্র-তারকায় শূন্যমণ্ডল পূর্ণ। প্রণব সেই অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলের প্রাণ, আর সেই সূর্য্য চন্দ্র-তারকাপুঞ্জ সেই প্রাণশক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

বিকাশমাত্র বা দেহ। আকাশে যেমন তড়িৎশক্তি বিদ্যুদাকারে ঝলসিয়া উঠিয়া আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয় তেমনই আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তির ঘর্ষণে ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে মাত্র। সূর্য্য-চন্দ্র-তারকারাশি আমার মায়ের লাবণ্যময় রূপতরঙ্গ।

আনন্দময়ী মায়ের আমার আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়া জ্যোতির আকারে ঝরিতেছে। সেই আনন্দের প্রস্রবণ স্থানে স্থানে আবর্ত্তিত হইয়া সূর্য্য, চন্দ্র, তারকাকারে বিরাজিত। বায়ুর আঘাতে যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গরাশি প্রক্ষিপ্ত হয়, তেমনই প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসে আনন্দময়ীর আনন্দলাবণ্য উচ্ছ্বসিত হইয়া স্ফুলিঙ্গ আকারে চারি ধারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—অনন্তযোজনব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল রচিত হইয়াছে। এই আনন্দবিস্তৃতি বা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল-সমষ্টিকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলে।

এই বিরাট্ জগৎই ধর্ম্মক্ষেত্র।

কুরুক্ষেত্র—

যে ক্ষেত্রে "কুরু"—"কুরু" অর্থাৎ "কর" "কর" রব প্রতিনিয়ত ধ্বনিত, তাহাকে কুরুক্ষেত্র বলে।

মনুষ্যের প্রবৃত্তি অহর্নিশ মনুষ্যকে কর্ম্মে "কুরু"—"কুরু" বলিয়া নিযুক্ত করিতেছে। কুরুপক্ষের দ্বারা বা প্রবৃত্তির দ্বারা মনুষ্যহৃদয় সাধারণতঃ অধিকৃত—ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রের উপর প্রবৃত্তির পূর্ণ অধিকার।

সেই জন্য যৌগিক কথায় মনুষ্যদেহকেই কুরুক্ষেত্র বলে।

বস্তুতঃ মনুষ্যহৃদয় ভগবানের লীলাভূমি—জীবাত্মা ও পরমাত্মার পূর্ণ মিলনের হিরণ্ময় মন্দির—বিরাট্ জগতের একটী আদর্শ ক্ষেত্র। বিরাটে যাহা আছে, মনুষ্যদেহে তাহাই পূর্ণরূপে প্রতিফলিত। মাতৃশক্তির প্রত্যেক স্ফুরণ, প্রত্যেক ঝঙ্কার মনুষ্য-হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। ফটোযন্ত্রের ক্ষুদ্র কাচখণ্ডে যেমন বিশাল আকাশের ছায়া পড়ে, তেমনই বিশাল জগতের প্রতিচ্ছায়া মনুষ্য-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত। লক্ষ লক্ষ ক্রোশ বিস্তৃত বিশাল সূর্য্য যেমন আমাদের চক্ষে একখানি ক্ষুদ্র সুবর্ণচক্রের মত প্রতিফলিত হয়, তেমনই ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ আদি সপ্তলোক মনুষ্যহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত।

যদিও জীবমাত্রেরই হৃদয়ক্ষেত্র অহর্নিশ উত্তেজিত হয়, কিন্তু মনুষ্যহৃদয়েই

তাহার পূর্ণ বিকাশ। অন্যান্য জীব-দেহে ইন্দ্রিয়সকল পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত নহে বলিয়া ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনাও পূর্ণভাবে হইতে পায় না।

পাঠক! এ কুরুক্ষেত্র যদি বুঝিতে চাও, তবে একবার স্থিরচিত্তে নয়ন মুদিত করিয়া উপবিষ্ট হও। ভাব—এক বিশাল আকাশ ব্যতীত আর কিছুই নাই। ঊর্দ্ধে, নিম্নে, সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, চারি ধারে যত দূর দৃষ্টি চলে, তোমার কল্পনার চক্ষু যত দূর তোমায় দেখাইতে পারে, ভাব—কিছুই নাই, কেবল শূন্য! শূন্য! শূন্য! অনন্ত অফুরন্ত আকাশ অনন্ত দিকে বিস্তৃত, আর কিছুই নাই। পৃথিবী, জল, স্থল, বৃক্ষ, পশু, পক্ষী, মনুষ্য কিছুই নাই কেবল শূন্য, শূন্য—আর সেই শূন্যে তুমি ভাসমান। আকাশে যেমন কপোতাদি উড়িতে উড়িতে এক একবার বায়ু-সমুদ্রের উপর ভর দিয়া স্থির হইয়া থাকে, মন্দস্রোতের তৃণের মত যেমন সে পক্ষী বায়ু-সমুদ্রের উপর ভাসিতে ভাসিতে, ধীরে ধীরে যায়, মনে কর—তুমিও তেমনই ঐ আকাশ-সমুদ্রে ভাসিতেছ। আর জলস্রোতের আন্দোলনে যেমন তৃণখণ্ড তালে তালে আন্দোলিত হয়, তেমনই তুমি সেই বিশাল আকাশ-সমুদ্রে তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলিত। যদি একবার এই ভাবে শূন্য কল্পনা করিয়া, কল্পনায় শূন্যে উপবেশন করিয়া, মন হইতে ভাবতরঙ্গরাশি মুছিয়া ফেলিতে পার, তবে দেখিবে—তোমার চিদাকাশে বিরাট জগতের ছায়া পড়িয়াছে। স্থির জলে চন্দ্রসূর্য্যের প্রতিবিম্বের মত তোমার চিদাকাশ ভূঃ, ভুবঃ আদি সপ্তলোকের প্রতিবিম্বে বিম্বিত।

দেখিবে, তোমারই হৃদয়াভ্যন্তরে ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি দেবতা যোগাসনে বসিয়া, মায়ের অনন্ত বিশাল বিরাট্ শক্তিতে সংযুক্ত হইয়া, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি মাতৃকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন—সব যোগে মগ্ন। বিরাটে যেমন সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার নিভিয়া যাইতেছে, তোমার হৃদয়েও তেমনই জ্যোতির স্ফুরণসকল উঠিতেছে, থাকিতেছে, মিলাইয়া যাইতেছে। তারহীন বার্ত্তাবহ যন্ত্র যেমন ঈথার বা ব্যোম-সমুদ্রের তরঙ্গে আন্দোলিত হয়, তেমনই তোমার মনোময় ক্ষেত্র বিরাট্ শক্তিস্ফুরণের তালে তালে আন্দোলিত হইতেছে। তোমার মনোময় ক্ষেত্রের ঐ সমস্ত তরঙ্গ আন্দোলনের নামই মানসিক বৃত্তি। ঐ তরঙ্গ-স্পন্দনসকল চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাকারে প্রস্থত হইয়া তোমাকে অহর্নিশ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছে। সেই জন্য জীব এক মুহূর্ত্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। সেই জন্য দেহকেই শাস্ত্র কুরুক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সমবেতা যুযুৎসবঃ মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব—

যুদ্ধেচ্ছু হইয়া সমাগত। মামকাঃ—অর্থাৎ প্রবৃত্তিপক্ষ এবং পাণ্ডবাঃ অর্থাৎ নিবৃত্তিপক্ষ। প্রবৃত্তিপক্ষ অর্থে—বিকর্ষণীশক্তি যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পাণ্ডবাঃ—নিবৃত্তিপক্ষ, আকর্ষণীশক্তি।

পূর্ব্বে যে প্রণব বা আকর্ষণীশক্তির কথা বলিয়াছি, তাহাই নিবৃত্তি বা আত্মাভিমুখী শক্তি। প্রবৃত্তি বা বহির্ম্মুখী চাঞ্চল্য বিগত হইলেই উহা সম্যক্‌ভাবে প্রকাশ পায়। সেই শক্তির দ্বারাই জীব পুনরায় শক্তিময়ী মায়ের আমার চরণে যুক্ত হয়। সেই জন্য উহাকে জীবের আত্মশক্তি বলে। ঐ বিকর্ষণীশক্তি বা প্রবৃত্তি বা জীবভাবীয় স্বসত্তা-বোধ যত দিন প্রবল থাকে, তত দিন জীব আত্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। জীবাত্মা আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা বা মাতৃ-অঙ্কে যুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষায় চেষ্টিত থাকে, মায়ের অঙ্কে উঠিবার জন্য লালায়িত হইয়া অহর্নিশ বিকর্ষণীশক্তিকে উচ্ছেদিত করিতে প্রয়াস পায়। প্রবৃত্তির ছলনার মোহে মুগ্ধ হইয়া সময়ে সময়ে জীবকে নিশ্চেষ্ট বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু জীবের অন্তরে অন্তরে অহর্নিশ পূর্ণমিলনের প্রবল আশা উদ্দীপিত থাকে। পাণ্ডবের নির্ব্বাসন বা অজ্ঞাতবাস ফুরাইলে আবার জীবাত্মার আত্মশক্তি স্ফুরিত হইয়া উঠিয়া প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করিতে প্রয়াস পায়। সাধারণ মনুষ্য পাণ্ডবের নির্ব্বাসিত অবস্থার মত প্রবৃত্তির দ্বারা আত্মরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া আছে। তদপেক্ষা যাঁহারা ঈষৎ উন্নত, তাঁহারা নির্ব্বাসন অবস্থা হইতে অজ্ঞাতবাস অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন অর্থাৎ নিত্যানিত্য-বিবেক হইয়াছে, কিন্তু নিত্য আত্মসত্তা তখনও উপলব্ধ হয় নাই—অজ্ঞাতই আছে। যাঁহারা তাঁহাদিগের অপেক্ষা উন্নত, তাঁহাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে সমরায়োজন সূচিত হইয়াছে। এই অবস্থায় জ্ঞানতঃ যোগের সূচনা হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আকর্ষণীশক্তি, প্রণব, নিবৃত্তি, এ সমস্ত একই কথা। ঐ আত্মশক্তি শরীরস্থ পঞ্চ কোষে পাঁচ ভাগে বিভক্ত। তাহাদিগকে সাধারণ কথায় পঞ্চ প্রাণ বলে। পঞ্চ পাণ্ডব এই পঞ্চ প্রাণ; তন্মধ্যে যে অংশটুকুর নাম প্রাণ, জীবের আত্মশক্তি তাহাতেই পূর্ণভাবে বিরাজিত। এই জন্য জীবাত্মাকেই অর্জ্জুন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সংগ্রাম অর্থে—প্রাণ বা হৃদয় ও মনের সংগ্রাম। প্রাণপ্রতিষ্ঠাই এ সমরের উদ্দেশ্য। হায়! এখনও গৃহে গৃহে প্রতিমা আসে—এখনও গৃহে গৃহে দেখিতে পাই—মাতৃপূজার আয়োজন হয়, এখনও গৃহে গৃহে মায়ের

মঙ্গল-ঘট সংস্থাপিত হয়, এখনও গৃহে গৃহে "মা মা" রবে সকরুণ ভক্তির উচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠিতে শুনিতে পাই, গৃহে গৃহে কোথাও দশভুজা—কোথাও চতুর্ভুজা—কোথাও দ্বিভুজা—কোথাও সিংহবাহনে—কোথাও শবাসনে—কোথাও পদ্মাসনে মায়ের আমার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া মাতৃদর্শনাকুল সন্তান মাকে এখনও দেখিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু মায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় কি? সাধক আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে, প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। প্রাণপ্রতিষ্ঠা না হইলে, মা প্রতিমাতে ফুটিয়া উঠিয়া দেখা দিতে পারেন না, আহূতা হইয়াও অনাহূতার মত দ্বার হইতে মা আমার ফিরিয়া যান। কিন্তু সে অন্য কথা—

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধারণতঃ জীব নির্ব্বাসিত অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ তাহার চিৎ বা চৈতন্যরাজ্যের উপর মনের আধিপত্য থাকে। প্রাণশক্তি অরণ্যে অজ্ঞাত-বাসে অবস্থান করে। যোগ অবস্থার সূচনা হইলে জীব, মনকে—বহির্ম্মুখী গতিকে চৈতন্যরাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়া, আত্মশক্তিকে বা প্রাণশক্তিকে চৈতন্য-রাজ্যে অধিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পায়।

আবার বলি, প্রণব বা আকর্ষণীশক্তি বা প্রাণশক্তির সমুদ্রে জীব মগ্ন হইয়া আছে। জীবের সংস্কার সে প্রাণশক্তিস্রোতকে অবরুদ্ধ করিয়া, সে শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না। কিন্তু জীবের সংস্কারের আবরণের ভিতর নিজের প্রাণশক্তিটুকু আছে, সেইটুকু ঐ বিরাট্ প্রাণশক্তিকে আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পায়। মন বা প্রবৃত্তিপক্ষ মধ্যে থাকিয়া তাহা করিতে দেয় না। বিরাট্ প্রাণশক্তির আঘাতে ক্ষুব্ধ হইয়া মানসিক বৃত্তির আকারে মন ফুলিয়া উঠে এবং নিজে বিরাট্ জগৎকে উপভোগ করে। এই জৈব মনের অবরোধ ভাঙ্গিয়া, জীবরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণশক্তিকে বিরাট্ বিশ্বজননীর প্রাণশক্তিতে মিলিত করিবার চেষ্টার নামই কুরুপাণ্ডব-সমর।

কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়—

জীবাত্মা এই যোগ-সংগ্রামের সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া, বিষাদ আদি নানা ভাব বা যোগের স্তরের ভিতর দিয়া শেষ যখন বিরাট্ বিশ্বশক্তিকে দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হয়, যখন দেখে—বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অণু পরমাণু সে বিরাট্ কেন্দ্রের দিকে ছুটিতেছে, সমস্ত উপাধি ভাঙ্গিয়া লয় প্রাপ্ত হইয়া এক বিরাট্ শক্তিতে মিলাইয়া যাইতেছে, দেখিয়া যখন তাহার সমস্ত সন্দেহ মিটিয়া যায়, তাহার প্রাণের আকুল পিপাসা যখন পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়, অপূর্ব্ব জ্যোতির দিগ্‌দিগন্তব্যাপী

প্রস্রবণ দর্শনে যখন সে অগাধ সুষুপ্তির মত পূর্ণ শান্তি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার প্রবৃত্তি প্রজ্ঞাকে সে অপূর্ব্ব দর্শনের ব্যাপার জিজ্ঞাসা করে ; অর্থাৎ যোগস্থ হইয়া বিশ্বরূপ দর্শনের পর, জীবাত্মা যখন আবার জীবভাবে ফিরিয়া আসে, তখন সে দর্শনের যে ঈষৎ আভাস স্মৃতিরূপে বর্ত্তমান থাকে, অন্ধ প্রবৃত্তি সেইটুকু শুনিবার জন্য ইচ্ছুক হয়। যোগাবস্থার পর জীব মনে মনে আবার সেই বিষয়ে আন্দোলন করে। তার প্রবৃত্তি যেন প্রশ্ন করে এবং স্মৃতি যেন সে দর্শনের আভাসটুকু সবিস্তারে বর্ণনা করিতে থাকে। প্রথম শ্লোকের ইহাই মর্ম্মার্থ।

এই অবধি যাহা বলিলাম, তাহার সারাংশটুকু আবার একবার বর্ণনা করিতেছি। কেন না, বিষয় বড় জটিল। প্রথমের এই সূচনাটুকু উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, গীতার ভিতর কেহ প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

কুরুপাণ্ডব-সমর অর্থে মন ও প্রাণের সংগ্রাম বুঝায়। মন ও প্রাণ, এ দুটী বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন শক্তি নহে, প্রাণশক্তির বহির্ম্মুখী অবিদ্যারূপ জীব-সংস্কারের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক কর্ম্মময় গতিকেই মন বলিতেছি। প্রণব, আকর্ষণীশক্তি ও প্রাণশক্তি যেমন একই কথা, সেইরূপ সেই প্রণব বা আকর্ষণীশক্তি বা প্রাণশক্তি জীবের সংস্কারাচ্ছন্ন হৃদয়ে প্রতিরোধ পাইয়া বহির্ম্মুখী যে গতি প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম বিকর্ষণীশক্তি, বিক্ষেপশক্তি, প্রবৃত্তি বা মন। এ কথা পূর্ব্বে সবিস্তারে বলিয়াছি।

যখন কেহ যোগস্থ হইয়া ভগবানে যুক্ত হইতে প্রয়াস পায় অর্থাৎ চৈতন্যরাজ্যে ঐ প্রাণশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক হয়, তখন তাহাকে মনের সহিত সংগ্রাম করিয়া, তাহাকে উচ্ছেদিত করিতে পারিলে, তবে সে নিজ প্রাণপ্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইতে পারে। এই প্রাণপ্রতিষ্ঠার নামই কুরুপাণ্ডবের সমরে কৌরবের সংহার এবং পাণ্ডবের রাজ্যপ্রতিষ্ঠা।

প্রাণশক্তি অর্থে এখানে কেহ বায়ু মনে করিবেন না। চৈতন্যশক্তির অন্তর্ম্মুখী গতির নামই এখানে প্রাণশক্তি।

তাহা হইলে মোটের উপর পাইলে কি ? তুমি একটি জীব, মায়ের আমার বিশাল শক্তিক্ষেত্রের বা ধর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে অধিষ্ঠিত। তুমি জীবাত্মা বা বিশাল মাতৃশক্তির একটী ক্ষুদ্র সংস্কারাচ্ছন্ন অংশ নির্ব্বাসিত পাণ্ডবের মত প্রবৃত্তির ছলনায় আত্মরাজ্য হইতে বঞ্চিত। তোমার যথার্থ স্বরূপে তুমি প্রকাশ হইতে পারিতেছ না। ইন্দ্রিয়রাশিসমন্বিত মন তোমার চৈতন্যরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। মা তোমায় ডাকিতেছেন ; বিশ্বজননী মা আমার প্রণবরূপ অমৃতময় স্নেহসম্ভাষণে অহর্নিশ

তোমায় ডাকিতেছেন। কিন্তু সে মাতৃআহ্বান তোমার প্রবৃত্তি ও মন কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া, জগদাকারে সাজিয়া, অনাত্ম জগদ্‌ভাগ গ্রহণ করিয়া, তোমার চক্ষে প্রতিফলিত হইতেছে। মায়ের আমার স্নেহময় সম্ভাষণ, জড় ফল ফুল, বৃক্ষ লতা, চন্দ্র সূর্য্য ইত্যাদিরূপে তোমার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইতেছে।

বস্তুতঃ জড় বা অনাত্ম স্বতন্ত্র জগৎ বলিয়া কিছু নাই, ব্রহ্মাণ্ড বলিয়াও কিছু নাই, এ সমস্ত বিরাটেরই কল্পনামূর্ত্তি। সেই কল্পনায় মুগ্ধ হইয়া, মাতৃ-অংশরূপ আমরা যখন মাকে হারাইয়া ফেলি, তখন হইতে এ বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণু অর্থাৎ আমরা "মা মা" করিয়া কাঁদিতে থাকি, আর তাহার প্রত্যুত্তরস্বরূপ মা আমার প্রণবাকারে উত্তর দেন,আমরা বুঝিতে পারি না—আমরা মায়ের সে উত্তর শুনিতে পাই না,—মায়ের সে আহ্বান আমাদের শ্রবণকুহরে আসিয়া পৌছায় না। তাই মা আমার নানাপ্রকারে আহ্বান করেন—যাহাতে শুনিতে পাই, এমনই করিয়া সে আহ্বানকে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে পরিণত করিয়া, ফল ফুল আদি নানা সাজে সাজাইয়া, আমাদের প্রাণের ভিতর সে আহ্বানের তরঙ্গ ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পান।

তোমার প্রাণ প্রত্যেক পদার্থের উপর ছুটিতেছে, প্রত্যেক পদার্থের উপর ঢলিয়া পড়িতেছে, মায়ের আহ্বানবাণীর আকর্ষণে প্রত্যেক পদার্থে মাকে অন্বেষণ করিতেছে, কিন্তু তোমার মন মাতৃ-আহ্বান বলিয়া পদার্থনিচয়কে চিনিতে দিতেছে না; সে মাতৃ-আহ্বানের উপর মাত্র ফল, ফুল, বৃক্ষ, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি নানারূপ ঐন্দ্রজালিক ছদ্মবেশ পরাইয়া তোমার চক্ষে প্রতিফলিত করাইতেছে। ভ্রমে পতিত হইয়া তোমার প্রাণ বুঝিতেছে—উহা মায়ের ডাক নহে, উহা ফল ফুল, স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অনাত্ম বস্তু।

ঐ যে একটী সুন্দর ফুল দেখিয়া তোমার চিত্ত মুগ্ধ হইল, তুমি অশেষ প্রকার যত্নে ফুলটী সংগ্রহ করিতে লাগিলে, যেন ঐ ফুল ছাড়া আর জগতে তোমার কোনও প্রিয় বস্তু নাই। এমনই ভাবে কিছু দিন সেই ফুল উপভোগ করিলে; তারপর দেখিলাম, আর সে ফুলের জন্য তোমার স্পৃহা নাই।

কেন এমন হইল? যথার্থ তোমার প্রাণ কি ফুলটী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল? তবে যে ফুল পাইতে একদিন তুমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলে, আজ আর তোমার কাছে তাহার আদর নাই কেন? তাহার সে আকর্ষণ কোথায় গেল? তোমার প্রাণকে আর কেন সে আকৃষ্ট করিতে পারে না?—তাহা নহে।

তোমার প্রাণ নূতন ফুল দেখিয়া মুগ্ধ হয় নাই। মাতৃ-অন্বেষী মৃগশিশুর মত তোমার প্রাণ মাকে অহর্নিশ অন্বেষণ করিতেছে। মায়ের অমৃতময় আহ্বানধ্বনি চারি ধার হইতে তোমার প্রাণকে টানিতেছে। চারি ধারে তোমার প্রাণ মাতৃ-অঙ্কে উঠিবার জন্য "মা" "মা" করিয়া ছুটিতেছে। মাতৃ-চরণলাভরূপ রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তোমার প্রাণ চমকিতভাবে অহর্নিশ অপেক্ষা করিতেছে। যখনই কোন নূতন বস্তু তোমার ইন্দ্রিয় আনিয়া তোমার প্রাণে উপস্থিত করে, অমনই তোমার প্রাণ 'ঐ বুঝি মায়ের আহ্বান' বলিয়া, তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। কিন্তু হায়! তোমার প্রাণ যে মনের দ্বারা আচ্ছাদিত। সে আচ্ছাদন সে জিনিষটাকে মাতৃ-আহ্বান বলিয়া চিনিতে দেয় না। সে তাহার সংস্কার বা অজ্ঞানানু-যায়ী সেটীকে অচিৎ জড় ফুল বলিয়া তোমার প্রাণের চক্ষে প্রতিফলিত করে। মনরূপ আচ্ছাদনটী অনাত্মজ্ঞানরূপ আর একটী আচ্ছাদন সৃজিত করিয়া তোমার প্রাণের চক্ষের উপর একটী সুদৃঢ় আবরণ ফেলিয়া দেয়। আর তুমি মাতৃ-আহ্বান বলিয়া সেটীকে চিনিতে পার না। তোমার প্রাণ, 'তবে বুঝি ইহা মাতৃ-আহ্বান নহে' বলিয়া,সে দিক্ হইতে ঘুরিয়া দাঁড়ায়। সাধারণ লোকে দেখে—ফুলের উপর আর তোমার স্পৃহা নাই, ফুল নূতনত্ব হারাইয়া তোমার চক্ষে পুরাতন হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে মনের দ্বারা প্রত্যেক পদার্থে তোমরা প্রবঞ্চিত হইতেছ। যেখানে নূতন, যেখানে মনের দ্বারা তোমার চক্ষু অন্ধ নহে, সেইখানেই তোমার প্রাণ ছুটিতেছে—সেইখানেই তোমার ক্ষুধার্ত্ত প্রাণ মাতৃ-স্তনধারা পান করিবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু হায়! গোপাল যেমন গোবৎসের মুখে জাল পরাইয়া ছাড়িয়া দেয়, তেমনই ভাবে তোমার প্রাণ মনের দ্বারা আবৃত। তুমি সে নূতন পদার্থটি নাড়িয়া চাড়িয়া, কিছু দিন তাহাতে মাতৃঅনুসন্ধান করিয়া, তারপর নিরাশচিত্তে তোমার মন কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া পড়, আর তাহাতে তোমার স্পৃহা থাকে না।

শুন! শুন! জীব! ঐ মা আমার তোমায় ডাকিতেছেন। যাহা দেখিতেছ—যাহা শুনিতেছ—যাহা আস্বাদন করিতেছ—যাহা কিছু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপভোগ করিতেছ, সে সমস্ত আর কিছুই নহে, আনন্দময়ী মায়ের আমার স্নেহময় আহ্বান। বিকারাচ্ছন্ন সন্তানকে তাহার মন অনুযায়ী প্রিয় জিনিষের নাম করিয়া, শয্যাপার্শ্বে অনিমিষ লোচনে বসিয়া, মা যেমন বলেন, "বৎস! একবার চাহিয়া দেখ! তোমার প্রিয় বস্তু আনিয়াছি, একবার—একবার মা বলিয়া আমায় সম্ভাষণ কর," কিম্বা

প্রিয় জিনিষের নাম করিয়া, যেমন তাহাকে ঔষধ পান করান, তেমনই ভাবে তোমার মন অনুযায়ী অনাত্মবিলাস ধরিয়া মা তোমায় ডাকিতেছেন, জ্ঞানৌষধ পান করাইতেছেন। শুন! দেখ! চন্দ্র—চন্দ্র নহে,—মাতৃআহ্বান, সূর্য্য—সূর্য্য নহে,—মাতৃ-আহ্বান, জগৎ—জগৎ নহে,—মাতৃ-আহ্বান। মাতা পিতা, স্ত্রী পুত্র—মাতা-পিতা-স্ত্রী-পুত্র মাত্র নহে—মাতৃ-আহ্বান। ঈর্ষা—ঈর্ষা নহে—মাতৃ-আহ্বান, ভালবাসা—ভালবাসা নহে, মাতৃ-আহ্বান, করুণা—করুণা নহে—মাতৃ-আহ্বান, স্নেহ—স্নেহ নহে—মাতৃ-আহ্বান, হিংসা—হিংসা নহে—মাতৃ-আহ্বান। অনন্ত দিক্ হইতে অনন্তরূপে মা তোমায় ডাকিতেছেন—অনন্ত দিক্ হইতে সে আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণশক্তিরূপ স্তনধারা ঢালিয়া দিতেছেন। মাতৃ-অন্বেষী শিশু! মায়ের আমার রক্তচরণে কে শির লুটাইতে চাহ—ছুটিয়া আইস! মাতৃস্তনধারা কে পান করিতে চাহ—ছুটিয়া আইস! মায়ের অঙ্কে কে যুক্ত হইতে চাহ—ছুটিয়া আইস।

কিন্তু মন তোমায় সে আহ্বান শুনিতে দিতেছে না—মন তোমায় সে আহ্বানের অমৃতময় আস্বাদন হইতে প্রবঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে—মন সে আহ্বানকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী উপভোগ করিতেছে; তোমাকে সূচ্যগ্রও দিতেছে না। ঐ মনকে দমিত কর—মনের বিপক্ষে সমর ঘোষণা কর; তুমি জয়ী হইবে। মায়ের বিশ্বরূপ দর্শনে কৃতার্থ হইবে।

তখন তোমার অন্ধপ্রবৃত্তি তোমার সঞ্চিত জ্ঞান বা স্মৃতিকে সাগ্রহে অথচ বিষণ্ণচিত্তে, বিষাদে অথচ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিবে,—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥

রণস্থলের সংবাদ বল ত? আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের জন্য পাণ্ডবরূপ প্রাণশক্তি, আমার পুত্র দুর্য্যোধনাদির বিপক্ষে যে সংগ্রাম সূচনা করিয়া, দেহরূপ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইল—হইয়া করিল কি? প্রাণ যখন যোগস্থ হইবার জন্য চেষ্টা করিল, এবং মন তাহাতে বিঘ্ন প্রদানে অগ্রসর হইল, তখন উভয় পক্ষের মধ্যে কি ঘটিল? দেহরূপ কুরুক্ষেত্ররণাঙ্গনে পঞ্চ প্রাণরূপ পঞ্চ পাণ্ডবই বা কি করিল, এবং মনরূপ দুর্য্যোধনই বা কি করিয়াছিল?

এখানে আবার বলি, কেহ যেন মনে না করেন, গীতা পুরাণের রূপকচ্ছলে লিখিত একটী যোগবিজ্ঞান মাত্র; বস্তুতঃ বুঝি কুরুপাণ্ডবযুদ্ধের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। কুরুপাণ্ডবসংগ্রাম একটী সম্পূর্ণ সত্য ঐতিহাসিক

ঘটনা। শুধু সত্য নহে, একটি চিরসত্য, সনাতন, ঐশ্বরিক নিয়ম, আদর্শ ঐতিহাসিক ঘটনারূপে সংঘটিত হইয়াছিল। ভগবান্ প্রত্যেক জীবকে মুক্তির দিকে লইয়া যাইবার জন্য তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, জীবাত্মার সারথ্য স্বীকার করিয়া যেমন তাহাকে লইয়া যান, তেমনই ভাবে তিনি কুরুক্ষেত্ররণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া, অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়া, পাণ্ডবপক্ষকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছিলেন। কুরুপাণ্ডব-সমর কল্পনা নহে। পাঠককে ভূমিকা দেখিতে অনুরোধ করি।

একটী জীব যে ঐশ্বরিক নিয়মে মুক্ত হয়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সেই একই নিয়মে মুক্তিলাভ করে। শুধু তাহা নহে, জীবের প্রত্যেক কার্য্যটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি তাহার ভিতর সেই একই নিয়মপ্রবাহ দেখিতে পান। কুরুক্ষেত্রেও সেই নিয়ম ঐতিহাসিক ঘটনারূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

সঞ্জয় কহিলেন,—তখন রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে ব্যূহিত দেখিয়া, আচার্য্যের নিকট গমন করিয়া কহিলেন।

দুর্য্যোধন—

যাহার সহিত যুদ্ধ করা দুঃসাধ্য, তাহাকে দুর্য্যোধন বলে। দুর্য্যোধন অর্থে —মন। মনকে জয় করার মত দুঃসাধ্য কর্ম্ম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রণক্ষেত্রে একজন বীর শত শস্ত্রধারীকে পরাজিত করিতে পারে, সেরূপ বীর-কাহিনীতে মনুষ্যের ইতিহাস পরিপূর্ণ; কিন্তু মনকে জয় করিয়াছে, এরূপ বীরের পরিচয় অতি অল্পই শুনিতে পাওয়া যায়। জগতের সর্ব্বকর্ম্ম অপেক্ষা মনোজয়ই সমধিক দুরূহ। মনের শরীর লৌহময়। এবং জীবের হৃদয়ক্ষেত্রে মনরূপ দুর্য্যোধনেরই একাধিপত্য। এই মন বা দুর্য্যোধনকে মারিবার একটী মাত্র কৌশল আছে। সে কৌশল—তাহার উরুভঙ্গ করা বা চলচ্ছক্তি রহিত করা। দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গেই ভারতযুদ্ধের অবসান হইয়াছিল। মনের চলচ্ছক্তি রোধ করিতে পারিলেই জীবের হৃদয়রূপ কর্ম্মক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের অবসান হয়।

বস্তুতঃ মনের মত চঞ্চল আর কিছুই নহে। মনের চঞ্চলতা যত দিন না রোধ হয়, যত দিন না মন ভগ্নপদ হইয়া চলচ্ছক্তিহীনভাবে হৃদয়ক্ষেত্রে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া থাকে, তত দিন পাণ্ডবের বা প্রাণশক্তির সমরবিজয় সম্পূর্ণরূপে সংসাধিত হয় না। মন যত দিন না স্থির হয়, তত দিন জীবের আত্মপ্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত। মন স্থির হইলে বা মনকে ভগ্নপদ করিতে পারিলে, আপনা হইতেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লৌহময় মনের মৃত্যু—চরণে। উরু ভাঙ্গিতে না পারিলে, মন মরে না। মনকে মারিতে হইলে, তাহার উরুদেশ বা তাহার গতিশক্তির উপর আঘাত করিতে হয়।

চঞ্চলতাই মনের জীবন। ঐ চঞ্চলতা যতক্ষণ না রোধ হয়, ততক্ষণই কুরুক্ষেত্র-সংগ্রাম। সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে সর্ব্বপ্রথম সাধকের ইচ্ছাশক্তিকে মনের গতি রোধ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করিতে হয়। লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী রাজসভায় দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের জন্য ভীমকে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন। ভীম—উদাননামক কণ্ঠস্থ ঊর্দ্ধাভিমুখী প্রাণশক্তি। এই কণ্ঠস্থ প্রাণশক্তির জপরূপ গদা বা অস্ত্রের আঘাতে মনরূপ দুর্য্যোধনের উরু ভাঙ্গিতে পারিলে তবে দুর্য্যোধনরূপ মন মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সাধক! যদি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহ, তবে যেন তোমার ইচ্ছা-শক্তিরূপ দ্রৌপদীর উত্তেজনায় কণ্ঠস্থ উদাননামক প্রাণাংশ, জপরূপ গদাঘাতে মনকে ভগ্নোরু করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়। সমরসূচনার পূর্ব্বে মনের উরুভঙ্গের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। কিন্তু জপরহস্য পরে বলিব।

পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দৃষ্ট্বা—

পাণ্ডবসৈন্যদিগকে ব্যূহিত দেখিয়া।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদিগের প্রাণশক্তি পঞ্চ কোষে পাঁচ ভাগে বিভক্ত—সেই পঞ্চ প্রাণকেই বা প্রাণের অংশকেই পঞ্চ পাণ্ডব বলে। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, পাণ্ডবেরা যেমন এই পাঁচ নামে পরিচিত, তেমনই আমাদের প্রাণশক্তির পাঁচ বিভাগকেও যথাক্রমে ব্যান, উদান, প্রাণ, সমান ও অপান নাম দাও। অপান ও সমান নামক অংশদ্বয়কে অশ্বিনীকুমারদ্বয় বা নকুল সহদেব বলিয়া অভিহিত কর। প্রাণ নামক হৃদয়স্থ অংশ অর্জ্জুন, উদান নামক কণ্ঠস্থ অংশ ভীম, এবং ললাটকেন্দ্রস্থ ব্যান নামক অংশের নাম যুধিষ্ঠির।

সাধারণ কথায় ব্যান, উদান, প্রাণ, সমান ও অপান নামক পঞ্চ বায়ু বা মনুষ্যদেহের পাঁচ প্রকারের স্নায়ুপ্রবাহকেই পঞ্চ প্রাণ বলা হয়। কিন্তু আমরা এখানে ঠিক সে ভাবে লইতেছি না। মুখ্য প্রাণশক্তির সূক্ষ্ম হইতে স্থূল প্রকাশ অবধি অবস্থানবিভাগ লক্ষ্য করিতেছি। চিতিশক্তির গতিই প্রাণ এবং উহা প্রথম ব্যাপ্তি, পরে ঊর্দ্ধমুখী, পরে ঊর্দ্ধনিম্নাকারে প্রবহমান, পরে ঊর্দ্ধাধভাববিহীন আবর্ত্তন ও পরে নিম্নমুখী—এইরূপ ক্রিয়াশীলা থাকে; উহাই এখানে লক্ষ্য করিতেছি।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধারণ মনুষ্যের প্রাণশক্তি নির্ব্বাসিত অবস্থায় অবস্থান করে; অর্থাৎ অন্তররাজ্য হইতে মনের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া শরীরের স্থূলাংশ অবলম্বন করিয়া থাকে। যত দিন সেই নির্ব্বাসন অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ যত দিন মনুষ্য যোগস্থ হইতে না পারে, তত দিন প্রাণশক্তিগুলি ঐ সাধারণ স্নায়ুপ্রবাহরূপে পরিচিত থাকে। এবং এই জন্যই "কলির জীব—অন্নগতপ্রাণ" বলিয়া পরিচিত আছে। ব্যান বায়ুও সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত বলিয়া পরিচিত, কিন্তু সাধনাপথে অগ্রসর হইলে ঐ প্রাণশক্তিগুলি স্ব স্ব কেন্দ্রে পুনরধিকার লাভ করে। এবং ব্যান নামক অংশ ললাট-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়।

ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ও মন, এই ছয়টী তত্ত্বের মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা, এই ছয়টী চক্র বা কর্ম্মকেন্দ্র। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ তন্মাত্রা লইয়া মন ললাটস্থ চক্রে বসিয়া, অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের ন্যায্য প্রাপ্য সিংহাসনে বসিয়া ভোগ করে। মন—মূলাধার ছাড়া অন্যান্য পাঁচটী চক্র হইতে পঞ্চ প্রাণকে বহিঃশরীরে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া, আপনি উপভোগ করিতে থাকে। কেবল মূলাধারে প্রাণশক্তির অন্য একটী অংশ স্বতঃ ক্রিয়াশীল থাকে। সেটীর নাম কর্ণ। কর্ণ—প্রাণশক্তিরই অংশ, পঞ্চ পাণ্ডবেরই সহোদর; কিন্তু মনের পক্ষে থাকিয়া কার্য্য করে। প্রাণশক্তির এই একাংশের সহিত মনের সখ্যতা না থাকিলে, মনের উপভোগরূপ ক্রিয়া সাধিত হইতে পারিত না। সমগ্র অন্তররাজ্যের মধ্যে মূলাধার নামক অঙ্গরাজ্যটুকু প্রাণশক্তির একটী অংশ অধিকার করিয়া থাকে। এবং মনকে আত্মরাজ্য অধিকার করিয়া রাখিবার পক্ষে সহায়তা করে। মূলাধারকে অঙ্গরাজ্য বলিবার কারণ—জীবদিগের অঙ্গাদির উপর এই অংশ সমধিক কার্য্যকারী।

কিন্তু আমাদিগের এ সমস্ত চিতিশক্তির বিদ্যাময় ও অবিদ্যাময় প্রকাশ বিশ্লেষণের এখন তত প্রয়োজন নাই। স্থূলভাবে শুধু মন এবং প্রাণ, এই

উভয় পক্ষ বুঝিয়া গেলেই গীতা বুঝিবার পক্ষে আমাদিগের যথেষ্ট হইতে পারে। শুধু সাধকদিগের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য একটু আভাস দিলাম।

ঐ পঞ্চ প্রাণশক্তি বা পঞ্চ পাণ্ডব একমাত্র দ্রৌপদীর বা ইচ্ছাশক্তির প্ররোচনাতেই আত্মরাজ্য ফিরিয়া পান। দ্রৌপদী—জীবের ঊর্দ্ধ বা অন্তর্মুখী ইচ্ছাশক্তি। দ্রুপদরাজার কন্যাকেই দ্রৌপদী বলে। "দ্রু" অর্থে ঊর্দ্ধ, পদ—গতি। ঊর্দ্ধমুখী গতির নামই দ্রুপদ; এবং তৎকন্যা ঊর্দ্ধ বা অন্তর্মুখী ইচ্ছাশক্তির নাম দ্রৌপদী।

জীব উন্নতিলাভের জন্য প্রয়াসী হইলে দ্রুপদরাজার লক্ষ্য ভেদ করিয়া, অর্থাৎ অন্তর্গতি লক্ষ্য করিয়া, ইচ্ছাশক্তিকে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিতে হয়। উন্নতির সর্ব্বপ্রথম উপাদান—উচ্চ লক্ষ্য। লক্ষ্যহীন মনুষ্যজীবন পশুজীবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলী লক্ষ্যহীন বলিয়াই সংসার এত বিষাদাপ্লুত—দুঃখের কাহিনীতে সংসার পূর্ণ। উচ্চ লক্ষ্যে প্রাণকে বাঁধিতে পারিলে আর সংসারকে দুস্তর বলিয়া বোধ হয় না। সংসারে শত সহস্র ঝঞ্ঝাবাত অবলীলাক্রমে অবহেলা করিয়া জীব নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারে। ঊর্দ্ধলক্ষ্য স্থির হইলে, তবে জীব অন্তর্মুখী ইচ্ছাশক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। সেই ইচ্ছাশক্তিকে সমগ্র প্রাণটুকুর একান্ত প্রিয় করিয়া তুলিতে হয়। তাই পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতাতেই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অন্তর্মুখী লক্ষ্যজাত প্রবল ইচ্ছাশক্তির সাহায্য না পাইলে, কি লইয়া জীব জীবনের চরিতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে? সাধক! যদি উন্নতিলাভে অগ্রসর হইতে চাহ, তবে মীনরূপী ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া, তোমার উদ্যম-ধনুতে কর্ম্ম-শর যোজনা করিয়া, তাঁহার দৃষ্টির দিকে লক্ষ্য স্থির কর। সে মৎস্যের নিম্নে তাঁহার বিরাট্ মায়াচক্র বিঘূর্ণিত। মীনরূপী ভগবানের চক্ষুরূপ দৃষ্টির দিকে প্রাণের লক্ষ্য স্থির কর। তিনি ঊর্দ্ধে মায়াচক্রের অন্তরালে অবস্থিত, নিম্নে সংসাররূপ মায়াজলাধারে তাঁহার মায়া-চক্রের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত। সেই মায়াচক্রের কেন্দ্রের ভিতর দিয়া তাঁহার চক্ষু তোমার দিকে অনিমিষে চাহিয়া আছে, তুমি সংসাররূপ মায়াচক্রের কেন্দ্র অন্বেষণ কর, দেখিতে পাইবে। কাতরপ্রাণে অতি দীনভাবে তাঁহার শরণাগত হইয়া, সেই চক্ষু-প্রতিবিম্বের প্রতি চাহিয়া, কাঁদিয়া বল, দীননাথ! দীনের লক্ষ্য স্থির করিয়া দাও, এ অনাথের জীবনপ্রবাহ তোমার সস্নেহ দৃষ্টির দিকে যেন স্থির লক্ষ্য রাখিতে পারে। মায়াচক্রের আবর্ত্তনে

ঠেকিয়া, আমার কর্ম্ম-শর যেন তোমার দৃষ্টিভ্রষ্ট হইয়া ফিরিয়া না পড়ে। সংসারাধারে প্রতিবিম্বিত মাতৃদৃষ্টির দিকে চাহিয়া কাতরভাবে এমনই করিয়া বল ; দেখিবে—সবিস্ময়ে দেখিতে পাইবে—মায়ের আমার নবঘনশ্যাম ব্রহ্মগোপাল রূপ সেই মৎস্যের উপর আবির্ভূত। তোমার উদ্যম ধনু হইতে কর্ম্ম-শর আপনি ছুটিয়া মায়াচক্ররূপ সুদর্শনের কেন্দ্রের মধ্য দিয়া, * মীনরূপী আত্মার দৃষ্টিতে যুক্ত হইয়া যাইবে। তোমার সকল কর্ম্ম ভগবানের চক্ষুর উপর সংসাধিত হইতেছে বলিয়া মনে হইবে। যখন তুমি অন্তর্দিকে মুখ ফিরাইবে, তখনই দেখিতে পাইবে—বিশালাক্ষী মায়ের আমার বিশালায়ত নেত্র হইতে স্নেহজ্যোতিঃ ঝর্ ঝর্ ঝরিয়া, অনবরত তোমায় অভিষিক্ত করিতেছে। তোমার কর্ম্মক্লান্তি দূর হইবে। নব উৎসাহে, নব আনন্দে, নবশক্তিতে তোমার কর্ম্মরাশি আনন্দময়ীর দিকে ছুটিতে থাকিবে। ঊর্দ্ধ বা অন্তর্মুখী দ্রৌপদীরূপিণী ইচ্ছাশক্তি আসিয়া তোমার গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিবে।

সাধক হইতে হইলে এইরূপে সর্ব্বাগ্রে ইচ্ছাশক্তিকে সংগ্রহ করিতে হয়। এই ইচ্ছাশক্তি আমাদিগের সাধনাপথে একমাত্র সহধর্ম্মিণী।

যাহা হউক, সাধারণ মানুষমাত্রেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, সময়ে সময়ে এমন মানসিক অবস্থা ঘটে, যখন প্রাণ কোন কাজ করিতে না চাহিলেও সংস্কারাচ্ছন্ন মন আমাদিগকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ফেলে। সেই মুহূর্ত্তের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, দুর্য্যোধনের রাজসভায়, অক্ষক্রীড়ায় পাণ্ডবের পরাজয়—দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা এবং দলিতফণা ফণিনীর মত সেই সভামধ্যে তাঁহার লোমহর্ষণ ভীষণ প্রতিজ্ঞার প্রতিচিত্র, প্রাণের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে প্রত্যেক মানুষেরই হৃদয়ে এইরূপ ঘটে। প্রাণকে ছলনায় ভুলাইয়া মন যখন নিজ অভ্যাসানুযায়ী অকর্ত্তব্য কার্য্যে আমাদিগকে নিযুক্ত করে, আমাদিগকে ইচ্ছাশক্তি তখন একান্ত রোধ করিলেও আত্মাভিমানরূপ দুঃশাসনের দ্বারা লাঞ্ছিতা ও অবমানিতা হয় ; এবং মনকে ধিক্কার দিতে দিতে আমরা সেই সময়ে যেন আত্মাভিমানের ধ্বংসের জন্য ইচ্ছুক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হই। দ্রৌপদীর দারুণ অবমাননা এবং তজ্জনিত তাঁহার ভীষণ প্রতিজ্ঞাই—কুরুক্ষেত্রসমরের একটী প্রধান

---

* আমাদের প্রাণপ্রবাহে আত্মারূপ ভগবান্ মীনরূপে বিচরণ করিতেছেন। প্রাণায়ামের দ্বারা উঁহার দিকে লক্ষ্য স্থির হয়। প্রাণায়াম অর্থে—কেহ হঠ-প্রাণায়াম বুঝিবেন না। এ কথা পরে সবিস্তারে আলোচিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রাণ-বিভাগের কথা সেইখানে বিশদভাবে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

গৌণ কারণ। তেমনই সাধক-হৃদয়ে ইচ্ছাশক্তির এইরূপ অবমাননা এবং তাহার আত্মাভিমান নাশের ভীষণ প্রতিজ্ঞাই তাহার আত্মরাজ্য লাভের একটী প্রধান কারণ বলিতে হইবে।

ইচ্ছাশক্তি অমোঘ। ইচ্ছাশক্তিকে সমগ্র প্রাণের সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ করিতে না পারিলে, জীব কখনও উন্নতিলাভ করিতে পারে না। সাধন-সংগ্রামে প্রবিষ্ট হইতে হইলে, আগে প্রবল ইচ্ছাশক্তি সংগ্রহ করিতে হয়। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

যাহা হউক, মনুষ্য যখন ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে ভগবল্লাভের জন্য সচেষ্ট হয়—যখন তাহার প্রাণে সমস্ত বিষয়ের উপর বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয়,—ভগবান্ ছাড়া যখন অন্য জিনিষকে তাহার প্রাণ চাহে না—যখন তাহার প্রাণ, তাহার হৃদয়স্থ কোন গূঢ় নির্জ্জন স্থানের অন্বেষণ করে—শান্তি বা আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যখন তাহার প্রাণ ইচ্ছাশক্তির প্ররোচনায় চারি দিক্ হইতে কুঞ্চিত হইয়া, আপনা আপনি বুকের ভিতর ঢুকিতে প্রয়াস পায়, তখন তাহার মন নিজ সংস্কারানুযায়ী নানাপ্রকারে তাহার সে শান্তিলাভে বিঘ্ন ঘটায়। তাহার মন তখন দ্রোণাচার্য্যের অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের শরণাগত হয়।

আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ।

দ্রোণাচার্য্য –

ইনি কে? যজ্ঞাদি শাস্ত্রীয় কর্ম্মকাণ্ড। কৌরব এবং পাণ্ডব বা মন এবং প্রাণ উভয়েরই শিক্ষাগুরু। আমাদিগের কর্ম্মকাণ্ড যদিও আমাদিগের আত্মিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু মনের দাসত্ব করাই তাহার অভ্যাস। তাহার আন্তরিক উদ্দেশ্য না হইলেও, তাহাকে বাধ্য হইয়া মনের প্ররোচনা অনুযায়ী মানসিক বৃত্তি-সকলেরই চালনাকার্য্যের নায়কত্ব করিতে দেখিতে পাই। দ্রোণাচার্য্য উভয় পক্ষের গুরু হইলেও দুর্য্যোধনেরই সেনানায়করূপে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের নিকট হইতেই সর্ব্বপ্রথম আমাদিগের প্রাণ সমরকৌশল বা আত্মোন্নতি লাভের জ্ঞান শিক্ষা করে। যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডজ্ঞানের শিক্ষাই আমাদিগের আত্মরাজ্য-লাভের পথে প্রথম সহায়।

সাধকের মন যখন দেখে—তাহার প্রাণ আত্মরাজ্যলাভের জন্য উদ্যোগী হইয়াছে, তখন সে যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের মায়ায় তাহাকে জড়াইয়া রাখিতে প্রয়াস

পায় অর্থাৎ শুধু স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজনের মায়া যখন সে সাধককে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না, তখন মন ক্রিয়াকাণ্ডের মায়ার অন্তরালে আত্মীয়-স্বজনাদি সংসারের মায়া সাজাইয়া প্রাণশক্তির বিপক্ষে—সাধকের আশার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় ; অর্থাৎ সাধকের মন তখন যেন এই রকম বুঝাইতে চেষ্টা করে— সংসারাশ্রমে থাকিয়া সংসারাশ্রম-সংশ্লিষ্ট ধর্ম্ম অর্থাৎ সংসার প্রতিপালন এবং শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডসাধন, শুধু ইহাতেই ভগবল্লাভ হইবে বা হইতে পারে। মন যেন ক্রিয়াকাণ্ডের মায়ার নিকটে গিয়া নিম্নলিখিতরূপে উভয় পক্ষের অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে থাকে।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩

আচার্য্য! তব ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ ব্যূঢ়াং পাণ্ডুপুত্রাণাং এতাং মহতীং চমূং পশ্য।

হে আচার্য্য! আপনার ধীমান্ শিষ্য দ্রুপদপুত্রের দ্বারা রচিতব্যূহ পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা দর্শন করুন।

দ্রুপদপুত্রেণ অর্থে সঙ্কল্পের দ্বারা। সর্ব্বপ্রথমে সাধক রণসূচনার অর্থাৎ মনের সহিত সংগ্রামের প্রারম্ভে আত্মশক্তিকে সঙ্কল্পের দ্বারা ব্যূহিত করে, অর্থাৎ আমি আত্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবান্ হইব, এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পে সংবদ্ধ হয়। ইচ্ছাশক্তির সহোদর—সঙ্কল্প। দ্রুপদপুত্র—দ্রৌপদীর ভ্রাতা।

সকল কর্ম্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে সঙ্কল্পের একান্ত প্রয়োজন। সঙ্কল্পের গণ্ডির ভিতর শক্তি সুচারুরূপে সমবেত না করিলে, কোন কার্য্যে অগ্রসর হওয়া যায় না। এ জন্য শাস্ত্রে পূজা, ব্রত, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে সঙ্কল্পের বিধান আছে। যে সাধক যত আগ্রহ সহকারে এবং সুচারুভাবে সঙ্কল্প করিতে সক্ষম হইবে, তাহার কার্য্য তত সুসম্পন্ন হইবে। শাস্ত্রীয় সঙ্কল্পপ্রণালীর ভিতর আত্মশক্তি চালনার কৌশল নিহিত আছে। এখনও পূজা, ব্রতাদি কার্য্যের পূর্ব্বে সঙ্কল্প পঠিত হয় সত্য, কিন্তু উহা প্রাণহীন মৃতদেহের মত ; সুতরাং ফলও প্রায় তদ্রূপই হইয়া থাকে। শুধু বাচনকি সঙ্কল্পে কাজ হয় না, এ কথা ইদানীন্তন পূজকেরা একেবারে বিস্মৃত। যে সঙ্কল্পের উপর নির্ভর কবিয়া পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা ভগবান্‌কে যজ্ঞক্ষেত্রে মূর্ত্তিমান্ হইয়া অবতীর্ণ করাইতে সক্ষম হইতেন, যে সঙ্কল্পের প্রভাবে

দেবতাগণ সাধারণ লোক-চক্ষু সমক্ষে স্বস্বরূপে প্রকাশ হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেন, এখনও সঙ্কল্পের সেই মন্ত্র বা বাক্যবিন্যাস আছে, কিন্তু সাকারে দেবতার আবির্ভাব হয় কি ? হায় ! আমরা পক্ষী ছাড়িয়া দিয়া শুধু পিঞ্জর ধরিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু সে অন্য কথা।

যাহা হউক, যখন সাধকের প্রাণ এইরূপে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়, তখন দুর্য্যোধন বা মন, কর্ম্মকাণ্ডের মায়াকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণশক্তি কিরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পে আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর, সেইটী বর্ণনা করিতে থাকে ; এবং সংসারের স্ত্রী-পুত্রের মায়ায় মুগ্ধ নহে দেখিয়া, সংসার প্রতিপালনাদি শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্মকাণ্ডের মায়ায় তাকে ভুলাইয়া রাখিতে প্রয়াসী হয়। দুর্য্যোধন বা মন যেন দ্রোণাচার্য্যের বা ক্রিয়াকাণ্ডের শরণাগত হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ক্রিয়াকাণ্ড হইতে জীব যদিচ আত্মোন্নতি লাভ করে, কর্ম্মমার্গ যদিও জীবের শিক্ষাগুরু, কিন্তু সাধারণতঃ সংসার-মায়াচ্ছন্ন মনের অধীনরূপে উহা অবস্থিত। অর্থাৎ সংসার পালন ও সংসারাশ্রমের কর্ম্মাদি যেন ঐরূপ কার্য্যানুষ্ঠান মাত্র, উহার অন্য কোন অন্তর্লক্ষ্য নাই, এমনই ভাবে সাধারণতঃ অনুষ্ঠিত হয়। সাধকের প্রাণ যখন ভগবান্‌কে অন্বেষণ করে, তখন তাহাকে ঐ কর্ম্মাংশের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। অর্থাৎ কর্ম্মের ভিতর কর্ম্মাংশ বস্তুতঃ কিছুই নহে, জ্ঞানাংশই উহার সার—কর্ম্মাংশ তাহার রক্ষণী মাত্র ; সাধককে এইরূপ বুঝিতে হয়। যতক্ষণ না বুঝিতে পারে, ততক্ষণই কর্ম্মাংশ তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান থাকে। সাধকের প্রাণ শুষ্ক কর্ম্মে মুগ্ধ থাকিতে চাহে না। তাই যেন মন, আচার্য্য বা ক্রিয়াকাণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া বর্ণনা করে, কিরূপ সঙ্কল্পে সাধকের প্রাণ তাহাদিগের হননে উদ্যোগী হইয়াছে। এই কর্ম্মাংশ বা ক্রিয়াকাণ্ডের মায়া জীবকে অতি কঠোরভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখে এবং অন্তর্মুখী দৃঢ় সঙ্কল্প না জন্মিলে, ইহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। মহাভারতে আছে, দ্রুপদ রাজা দ্রোণাচার্য্যের বধের জন্য যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞাগ্নির মধ্য হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কৃষ্ণা বা দ্রৌপদী জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এবং সেই সময়ে দৈববাণী হইয়াছিল এই ধৃষ্টদ্যুম্নই দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিবে, এবং কৃষ্ণা হইতে কুরুকুল ধ্বংস হইবে।

বস্তুতঃ ঊর্দ্ধমুখী গতিরূপ দ্রুপদ রাজার কন্যা, দ্রৌপদী বা অন্তর্মুখী ইচ্ছাশক্তি হইতেই জীব আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এবং অন্তর্মুখী

দৃঢ়সঙ্কল্পরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন না হইলে, যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের বাহ্য বা কর্ম্মাংশরূপ দ্রোণাচার্য্য নিহত হয় না। জীবের অন্তর্মুখী গতি এবং যজ্ঞাদি ক্রিয়া বা কর্ম্মমার্গ, ইহারা পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন হইলেও—অরি। জীবের অন্তর্মুখী গতি হইতেই কর্ম্মমার্গের প্রতিষ্ঠা হয়, আবার ঐ অন্তর্মুখী গতিজাত দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারাই নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হয়। মহাভারতে দ্রোণাচার্য্য ও দ্রুপদরাজকে এই জন্য প্রথমে সখ্যভাবাপন্ন এবং পরে অরিভাবাপন্ন দেখিতে পাই।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥৬

অত্র শূরাঃ মহেষ্বাসাঃ যুধি ভীমার্জ্জুনসমাঃ, যুযুধানঃ, বিরাটশ্চ মহারথঃ দ্রুপদশ্চ ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ বীর্য্যবান্ কাশিরাজশ্চ, পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ নরপুঙ্গবঃ শৈব্যশ্চ, বিক্রান্তঃ যুধামন্যুশ্চ বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাশ্চ সৌভদ্রঃ, দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বে এব মহারথাঃ ॥৪-৬

পাণ্ডবগণের ঐ ব্যূহমধ্যে ভীমার্জ্জুনসমান মহা ধনুর্দ্ধর বীরসকল, সাত্যকি, বিরাট, মহারথী দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান্, বীর্য্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ, অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীতনয়গণ—ইহারা সকলেই মহারথ।

যুযুধান—

যুযুধান অর্থে সাত্যকি। সাত্যকি—শ্রীকৃষ্ণের সারথী, সত্য অন্বেষণই—সাত্যকি। সত্যই ভগবান্‌কে বহন করে। ভগবান্ জীবের সারথী; সত্য—ভগবানের সারথী। যেমন বিদেশযাত্রা করিতে হইলে যান বা বাহনের প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ এই সংসারক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইতে হইলে ভগবান্‌রূপ সারথীর প্রয়োজন। তিনি ছাড়া দস্যুসঙ্কুল মায়াক্ষেত্রের পথভেদ করিয়া কেহ আমাদিগকে লইয়া যাইতে পারিবে না। আবার তাঁহাকে আনিতে হইলে সত্য অন্বেষণরূপ সারথী ছাড়া আর কেহ পারে না। সত্য—সাধকের

একান্ত সহায়। সত্যান্বেষণই সাধনার মূলমন্ত্র। সত্যস্বরূপ ভগবান্‌কে আনে বলিয়াই, সত্যান্বেষণের নাম সাত্যকি।

বিরাট—

বহির্জগৎ—বিরাট নামে অভিহিত। এই বিরাটের গৃহেই জীবের অজ্ঞাতবাস হয়। অর্থাৎ সাধক বা প্রাণশক্তি-সম্বলিত জীবের আত্মরাজ্যচ্যুত হইয়া নির্ব্বাসিতভাবে অবস্থান করিবার পর ও সাধনাপথে অগ্রসর হইবার সূচনায় তাহাকে কিছু দিন অজ্ঞাতভাবে বাস করিতে হয়। মনের ছলনায় যত দিন আমরা প্রবঞ্চিত হইয়া আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বঞ্চিত থাকি, তত দিনই আমাদের নির্ব্বাসন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহাই সাধারণ জীবের অবস্থা। তারপর ক্রমশঃ যখন প্রাণের অন্তর্মুখী গতি আরম্ভ হয়, ভগবল্লাভের জন্য প্রাণ যখন বিচঞ্চল হইয়া উঠে, তখন সে সাধক বিরাট জগৎচিন্তায় নিবিষ্ট হয়। অনন্ত সৃষ্টি-বৈচিত্র্য, সৃষ্টির অনন্ত বিশাল ভাব, তাহাকে আত্মহারা করিয়া ফেলে। বিশাল পৃথিবী. সমুদ্রের অসীম জলবিস্তার, প্রাণশক্তির আধার বিরাট্ বায়ুমণ্ডল, বিরাট্ আকাশ, বিরাট্ চন্দ্রসূর্য্য, বিরাট্ তারকাপুঞ্জ, সৃষ্টিশক্তির বিরাট্ মহিমরাশি—এই সমস্ত চিন্তায় তাহার প্রাণ নিযুক্ত থাকে, সে আপনাকে সেই বিরাট চিন্তা-সমুদ্রে হারাইয়া ফেলে। বিরাটের অনন্ত মহিমায় তাহার নিজ অস্তিত্ব যেন ছড়াইয়া পড়ে। বিরাটশক্তির বিরাট উদার বিস্তৃতির মধ্যে, সে আপনাকে সেই বিরাট চিন্তাসমুদ্রে হারাইয়া ফেলে। বিরাটের অনন্ত মহিময় তাহার নিজ অস্তিত্ব যেন ছড়াইয়া পড়ে। বিরাটশক্তির বিরাট উদার বিস্তৃতির মধ্যে, সে আপনাকে সেই বিরাটের তুলনায় অতি দীনহীন, বিরাটশক্তির ক্রীড়নক বলিয়া অনুভব করিতে থাকে। তাহার উদ্যম-ধনু, কর্ম্ম-শর ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, সে সেইরূপ কিছুদিন বিরাট চিন্তায় বিভোর থাকে। প্রাণে উৎসাহ থাকে না, কর্ম্মে উদ্যম থাকে না, আত্মচেষ্টা বলিয়া তাহার প্রাণে কোন ভাব স্থান পায় না। সে বিরাটশক্তির বিরাট স্ফুরণে মুহুর্মুহু আপনাকে বিরাটশক্তি-স্রোতের একটী তৃণখণ্ড বলিয়া উপলব্ধি করে—ইহাই অস্ত্রশস্ত্র প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া বিরাটের গৃহে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অর্থাৎ যথার্থ সাধন-সংগ্রাম সূচনা হইবার পূর্ব্বে, জীব স্থূলজগতের বিরাট্, বিশাল ভাবে মুগ্ধ হয়। স্থূলজগতের বিরাট্ বিশাল ভাব প্রাণের ভিতর ঢুকিয়া তাহার প্রাণকে উদার ও বিশাল করিয়া তুলে। স্থূল জড়শক্তির

বিশালতায় যখন সে এইরূপে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে থাকে, জড়শক্তির কাছে, যখন সে শক্তিহীন নগণ্য বলিয়া আপনাকে বিবেচনা করে, সেই সময়ে, প্রাণের সেই দুর্ব্বলভাবাপন্ন অবস্থায় এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা তাহার প্রাণের ভিতর ঘটিয়া যায়। নাস্তিকতা আসিয়া তাহার ইচ্ছাশক্তিকে গ্রাস করিতে উদ্যোগী হয়,—ইহাই কীচককর্ত্তৃক দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা।

খুলিয়া বলি,—জীব যত শক্তিকে উপলব্ধি করিতে থাকে, শক্তির অনন্ত মহিমায় যত তাহার প্রাণ বিভোর হইতে থাকে—এক বিশাল শক্তির দ্বারাই সৃষ্টিকার্য্য সমাধা হইতেছে বলিয়া, যতই তাহার প্রাণ সে শক্তিচর্চ্চায় ছড়াইয়া পড়ে, যতই তাহার বুদ্ধি, শক্তি-বিজ্ঞানের ভিতর ঢুকিতে থাকে, ততই ধীরে ধীরে তাহার অজ্ঞাতভাবে নাস্তিকতারূপ একটী দস্যুভাব উজ্জীবিত হয়। "এই জড়শক্তি ছাড়া স্বতন্ত্র ঈশ্বর আবার কি? চৈতন্য বলিয়া আমরা যাহা অনুভব করি, ইহাও বুঝি, এই জড়শক্তিজাত একটী অস্থায়ী বিকাশ," এইরূপ ভাব তাহার প্রাণের ভিতরে ঢুকিতে থাকে। "শক্তির বিশাল রাজ্যে শক্তির অতীত আবার চৈতন্য বলিয়া কোন নিত্য জিনিষ কি করিয়া থাকিতে পারে? অনন্ত মহিমময়ী বিরাট্ শক্তির চৈতন্যস্ফুরণও একটা অস্থায়ী উন্মেষ মাত্র। যেমন একাধিক দ্রব্যবিশেষ একত্র মিশ্রিত করিলে, তাহাতে অগ্নি উৎপাদন হয়, চৈতন্যও বুঝি তেমনই শক্তি-সংমিশ্রণে স্ফুরিত হয়।"—এইরূপ ভাব তাহার প্রাণের ভিতর আসিতে থাকে। আত্মা আবার কি? ঐ অনন্ত মহিমময়ী শক্তিরই একটী মহিমময় অস্থায়ী স্ফুরণ। জড়শক্তিতে জন্মিয়াছি, জড়শক্তিতেই মিলাইয়া যাইব,—এই ভাবে সে আত্মহারা হয়।

বস্তুতঃ, স্থূল জগতের এবং স্থূলশক্তির আলোচনা যদিও সর্ব্বপ্রথম সাধকের প্রাণে উদার ভাব ফুটাইয়া দেয়, যদিও সঙ্কীর্ণতা ঘুচাইয়া দেয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ ভাবের একটী মহাপরীক্ষা তাহার উপর আসিয়া পড়ে। অনেক মনীষী এইরূপে নাস্তিক হইয়া গিয়াছেন, আত্মোপলব্ধির পথ হইতে এইরূপে বঞ্চিত হইয়াছেন, সাধনার পথ হইতে এইরূপে কিছুদিনের জন্য অনেক দূরে পড়িয়াছেন। এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়—জপ। আমাদের প্রাণের অন্তর্মুখী ইচ্ছাশক্তি যখন কীচকরূপ নাস্তিকতার দ্বারা এইরূপে স্পৃষ্টা হইতে থাকে, তখন কণ্ঠস্থ ভামরূপী উদাননামক প্রাণশক্তির ভগবন্নামজপরূপ

অস্ত্রাঘাতে সে নাস্তিকতাকে ধ্বংস করিতে হয়—ইহাই বিরাটগৃহে ভীমকর্তৃক কীচক-বধ।

জীব! সর্ব্বপ্রথম ভগবদন্বেষণের সূচনায়, যখন ভগবৎশক্তির স্থূল বিকাশে মুগ্ধ হইবে, যখন তোমার উদার প্রাণ, শক্তিবিস্তারে ছড়াইয়া পড়িবে, অথচ এই স্থূলশক্তিই যে চৈতন্যময়ী,—এ ধারণা প্রাণের ভিতর আসিবে না, সেই সময় হইতে সাবধান! সেই সময় হইতে ভগবন্নামজপ যেন তোমার কণ্ঠে অহর্নিশ চলিতে থাকে। নতুবা শক্তির অনন্ত বিস্তারে তুমি আপনাকে হারাইয়া ফেলিবে, তুমি আত্মহারা হইবে; শেষে নাস্তিকতার কঠোর কবলে তোমার অন্তর্মুখী ইচ্ছাশক্তি চিরদিনের জন্য বন্দিনী হইয়া থাকিবে।

সাধারণ কথায় যাহাকে শক্তি-বিজ্ঞান বলে, সেই শক্তিবিজ্ঞান বা প্রকৃতি-বিজ্ঞান জীবের প্রাণে যখন প্রথম উন্মেষিত হয়, তখন হইতে তাহার সহিত ভগবদ্ভাব সংমিশ্রিত করিয়া না রাখিলে, জীব যথার্থই নাস্তিক হইয়া যায়। কেন না, সাধনা-সূচনার সেই আদি অবস্থায় সাধারণতঃ জীব প্রমাণের সাহায্যে অগ্রসর হইতে প্রয়াস পায়। সে অবস্থায় আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাধনার উচ্চ স্তরে আরোহণ করিতে না পারিলে, আত্মা প্রত্যক্ষীভূত হন না; সুতরাং জড়শক্তির অতীত আত্মাকে স্বীকার করিতে তাহার জড়শক্তি সম্বন্ধীয় জ্ঞান, তাহাকে শিক্ষা দিতে পারে না। সাধারণ জগৎ জড়শক্তি বলিয়া যাহা বুঝে, তাহাই যে চৈতন্যময়ীর বিকাশ,—এ জ্ঞান তখন জীবের হয় না। সুতরাং জীবের ইহা একটী সঙ্কটাপন্ন অবস্থা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যাহা হউক, ভগবন্নাম-জপরূপ ভীম নামক কণ্ঠস্থ প্রাণশক্তির ক্রিয়া এই নাস্তিকতাকে বিচূর্ণিত করে, অন্তর্মুখী ইচ্ছাশক্তিকে লাঞ্ছনার হাত হইতে পরিত্রাণ করে। এবং সেই সময়ে, সেই নাস্তিকতা বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আত্মপরিচয়ের বিমল আভাস ঈষৎ ফুটিয়া উঠে। অর্থাৎ জড়শক্তি—জড়শক্তি নহে, এক বিরাট্ চৈতন্যময় পুরুষের শক্তিপ্রবাহ, এবং আমিও সেই বিরাট্ চৈতন্যময় পুরুষের অংশ, সুতরা শক্তিমান্ বিরাট্ পুরুষ—এই জ্ঞানের নব উন্মেষ ভগবান্ তাহার প্রাণে ফুটাইয়া দেন। আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হইলেও, জীব বিরাটের গৃহে বিরাট্ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সেটুকু আত্মপ্রকাশের বাহ্য আভাস মাত্র। এইরূপ বিরাট্ ভাবাপন্ন হইয়া, তারপর মনের সহিত সাধন-সংগ্রাম সূচিত হয়।

তাহা হইলে প্রাণশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি ব্যতীত মোটের উপর আমরা এই দুইটী জিনিষ পাইলাম। সত্য অন্বেষণ ও আত্মা সম্বন্ধে বিরাট্ ভাব।

দ্রুপদ — ঊর্দ্ধমুখী গতি, — পূর্ব্বে বলিয়াছি। চেকিতান × কিত যঙ্‌লুক্ + চানশ = চেকিতান — তীক্ষ্ণ জ্ঞান; বাচনিক জ্ঞান নহে। সাধারণ কথায় যাহাকে জ্ঞান বলি, তাহা জ্ঞানের বাচনিক অংশ মাত্র। কিন্তু যখন জ্ঞেয় বস্তু অন্তরের ভিতর প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে বলিয়া অনুভব হয়, তখনই সে বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ হইয়াছে বুঝিতে হয়। জীবাত্মা যখন সাধনার পথে অগ্রসর হইতে চাহে, তখন তাহার প্রাণের ভিতর, মাঝে মাঝে শাস্ত্রীয় জ্ঞানের সারাংশসকল প্রত্যক্ষ-ভাবে ভাসিয়া উঠিতে থাকে। বিদ্যুতের মত এ জ্ঞানসকল জ্যোতির্ম্ময় আকারে থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠে। যখন প্রাণের ভিতর কোন সন্দেহ জাগে, যখন তাহার মীমাংসা করিতে না পাইয়া, সাধকের প্রাণ অস্থির হয়, তখনই ভগবানের করুণা ঐরূপ জ্ঞানাকারে প্রাণের ভিতর চমকিত হয়। বস্তুতঃ, সাধককে জ্ঞান-রাশি শাস্ত্র হইতে বড় একটা সংগ্রহ করিতে হয় না। তাহার যখন যেরূপ জ্ঞানের অভাব বা প্রয়োজন হয়, সে মহামূর্খ হইলেও, ভগবান্ তখনই তাহার প্রাণের ভিতর সেই সেই জ্ঞান উন্মেষিত করিয়া দেন। সে সবিস্ময়ে উহা সত্য কি না, জানিতে প্রয়াসী হইলে, সহসা একদিন কোন মহাপুরুষের মুখে বা কোন শাস্ত্রগ্রন্থে অবিকল সেইরূপ জ্ঞানোপদেশ পাইয়া দেখে, তাহার প্রাণে যাহা উদয় হইয়াছিল, তাহা একান্ত অভ্রান্ত। তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হয়, আনন্দে প্রাণ পূরিয়া যায়, সে ভগবচ্চরণে বার বার নমস্কার করিতে থাকে। আবেগে তাহার প্রাণ ফুলিয়া উঠে। সাধক বা জ্ঞানেচ্ছুমাত্রেই এরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

এইরূপ জ্ঞানবিকাশকেই চেকিতান বলে। ঐরূপ জ্ঞানজ্যোতিগুলি বিজ্ঞানময় মহাপুরুষ মহেশ্বরের অঙ্গজ্যোতিঃ বলিয়া মহাদেবকেও চেকিতান্ বলে।

সৌভদ্র — সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু। অ-ভি + মন্যু = অভিমন্যু। মরণে নির্ভীকতা এবং তজ্জনিত অহঙ্কার, — ইহাই অভিমন্যু শব্দের মৌলিক অর্থ। নির্ভীকতা — সাধনাপথের একটী প্রধান সহায়। প্রাণশক্তি — ইহার জনক। যাহার প্রাণ

যত দৃঢ় এবং বলশালী, তাহার নির্ভীকতা তত বেশী। কিন্তু আবার, সে নির্ভীকতা সাধারণতঃ একটু অহঙ্কার-জড়িত হয়। নির্ভীকতা যত বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারের আভাস তাহার হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। "আমি সাধনাপথে অগ্রসর হইতেছি—আমি সাধক", এইরূপ একটু অহঙ্কারের আবরণ তাহাকে মায়াচ্ছন্ন করে। এই সময়ে ঐশ্বরিক শক্তি লাভের মায়া তাহার প্রাণকে কিছুক্ষণের জন্য চঞ্চল করে। ইহাই মহাভারত-কথিত অর্জ্জুনের সহিত নারায়ণী সেনার সংগ্রাম। সাধক যেন সেই সময়ে ঐ ঐশ্বরিক শক্তিলাভের মায়ারূপ নারায়ণী সেনা জয় করিতে, কুরুক্ষেত্র হইতে একটু দূরান্তরে যায়। ঐশ্বরিক শক্তিলাভের আশা, তাহাকে কিছুক্ষণের জন্য সাধন-ক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত করে। সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ক্রিয়াকাণ্ডের মায়া দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ রচনা করিয়া প্রাণশক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিতে প্রয়াস পায়।

কর্ম্মের মায়া সেই সময়ে সাধককে জড়াইয়া ধরে। ঐশ্বরিক শক্তি লাভের মায়া প্রাণের ভিতর তিলমাত্র উজ্জীবিত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের মায়া আসিয়া পড়ে। কেন না, কর্ম্ম দ্বারাই শক্তি লাভ হয়। সাধক ভগবৎকৃপায় সেই ভীষণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ক্ষুব্ধ হয়। ঐশী শক্তিলাভের মায়া হৃদয় হইতে দূর করিয়া দেয় সত্য, কিন্তু অনুতাপে তাহার প্রাণ জর্জ্জরিত হয়। তাহার সাধক বলিয়া অহঙ্কার চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়। আবার মায়ার ফাঁদে পড়িতেছিলাম, আবার অধঃপতনে যাইতেছিলাম, আবার মন কর্তৃক পরাজিত হইতেছিলাম—এইরূপ অনুতাপে কিছুদিন সে পুড়িতে থাকে। ইহাই অভিমন্যুবধ এবং অর্জ্জুনের পুত্রশোক।

সাধক! সাধক হইয়াছ বলিয়া অহঙ্কার করিও না। সাধনা-পথে অগ্রসর হইয়াছ, আর পতন হইবে না, এরূপ নির্ভীকতাকে হৃদয়ে স্থান দিও না। যোগশক্তি লাভের মায়ায় মুগ্ধ হইও না। সাধনা যোগশক্তি লাভের জন্য নহে—ভগবল্লাভের জন্য, এ কথা যেন তোমার মর্ম্মে মর্ম্মে অঙ্কিত থাকে। যোগশক্তি সাধনাপথের ধূলি মাত্র। পথ চলিতে গেলে যেমন পথধূলি পদতলে লিপ্ত হয়, ভগবৎ-সাধনা-পথে গতি লাভ করিলে যোগশক্তিও তদ্রূপ আপনা হইতে তোমার অঙ্গে লিপ্ত হইবে। উহার মায়ায় মজিও না পথ হারাইবে!

কিন্তু উহা আসে। নির্ভীকতা, সাধকত্বের অভিমান ও যোগশক্তি লাভের

মায়া, এ সব ন্যূনাধিক মাত্রায় না আসিয়া থাকে না। তখন তুমি ভগবান্‌কে ভুলিও না। ভগবানের চরণ দৃঢ় করে ধরিয়া থাকিও, যোগশক্তির মায়াকে দূর করিয়া দিতে যত্নবান্ হইও; তোমার সেই মায়াক্রান্ত অবস্থায় যোগমায়া জগন্মাতা তোমায় কর্ম্মবিপাকে ফেলিয়া তোমার চির-মঙ্গলের জন্য অভিমানাদি বিনষ্ট করিয়া দিবেন। তুমি আত্ম-নির্ভরতা ছাড়িয়া পূর্ণভাবে ভগবানে নির্ভর করিতে শিক্ষা করিবে। বস্তুতঃ অভিমন্যু-বধ একটী বিস্ময়কর ঘটনা, ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একটী অপূর্ব্ব লীলা। "আমি সাধক হইয়াছি, আব আমি মায়াকে ভয় করি না" জীবাত্মা এইরূপ নির্ভীকতাটুকু হারাইয়া এই সময়ে যথার্থ ঈশ্বর-নির্ভরতা শিক্ষা করে।

দ্রৌপদেয়াশ্চ—দ্রৌপদীপুত্রগণ। প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকীর্ত্তি, শতানীক ও শ্রুতসেন। ঊর্দ্ধমুখী ইচ্ছাশক্তির গর্ভে এবং পঞ্চ প্রাণশক্তির প্রত্যেকের ঔরসে এক একটী করিয়া, ঐ পাঁচ প্রকারের আত্মচরিতার্থতারূপ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অভিমন্যুবধ অপেক্ষা ইহা আরও বিস্ময়াবহ ঘটনা। মহাভারতে আছে, ভগ্নোরু দুর্য্যোধনের সন্তোষবিধানার্থ দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা পঞ্চ পাণ্ডবের শিরশ্ছেদের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। রজনীর অন্ধকারে পাণ্ডবশিবিরে যখন সকলে নিদ্রিত, সেই সময় তাঁহাদের সেই অতর্কিত অবস্থায় তস্করের মত অশ্বত্থামা তাহাদের শিবিরে প্রবেশ করিয়া, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের শিরশ্ছেদন করিয়াছিল এবং ধৃষ্টদ্যুম্নাদি অনেক পাণ্ডবপক্ষীয় বীর সেই গুপ্ত আক্রমণে নিহত হইয়াছিলেন। পুত্রশোকবিহ্বলা দ্রৌপদীর উত্তেজনায় মহাবীর ভীম অশ্বত্থামাকে বন্দী করিয়াছিলেন এবং ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার শিরোদেশস্থ মণি শির হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া, শোকাকুলা দৌপদীকে অর্পণ করিয়া, তাঁহার সন্তোষবিধান করিয়াছিলেন।

অশ্বত্থামা—দ্রোণাচার্য্যের পুত্র। জন্মমাত্র অশ্বের মত উচ্চ চীৎকার করিয়াছিল বলিয়া, উহার নাম অশ্বত্থামা হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকাণ্ড বা সাধকের কর্ম্মমার্গের মায়াই দ্রোণাচার্য্য নামে অভিহিত; কীর্ত্তি বা কর্ম্মঘোষণা ইহার আত্মজ। যজ্ঞাদি কর্ম্মের ঘোষণা অবশ্যম্ভাবী; অতি সত্বর ইহা লোকমুখে চারি ধারে প্রচার হইয়া পড়ে। লোকচক্ষুকে ফাঁকি দিয়া কর্ম্মমার্গে অবস্থান অসম্ভব। কর্ম্মী বলিয়া কীর্ত্তি একবার জন্মাইলে, অশ্বধ্বনির মত চারি দিকে তাহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেই জন্য অশ্বত্থামা জন্মমাত্র অশ্বের মত চীৎকার করিয়াছিল

বলিয়া কথিত আছে। ঘোষণা, যশোরূপ মণি শিরে ধারণ করিয়া সাধককে বিচঞ্চল করিয়া তুলে। সাধকের পক্ষে কীর্ত্তিঘোষণা অতীব প্রবল শত্রু। কত সাধক এই ফাঁদে বদ্ধপদ হইয়াছে—কত সাধক স্খলিতচরণ হইয়া ধরণীতলে লুণ্ঠিত হইয়াছে—যশের মোহে পড়িয়া কত সাধক যুগ যুগান্তরের জন্য সাধনার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? কীর্ত্তিঘোষণায় একবার মুগ্ধ হইলে, যশের করতালি একবার চিত্তকে আকৃষ্ট করিলে সাধনার পিচ্ছিল সোপান হইতে স্খলিতচরণ হইয়া সাধক বহু নিম্নে আসিয়া পড়ে। কর্ম্ম ও ঘোষণা, এ দুইটি পিতাপুত্র সম্বন্ধে অর্থাৎ অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। "ঘোষণা চাহি না" এরূপ প্রতিশ্রুত হইলে, কর্ম্ম যেন দুর্ব্বল শক্তিহীন, বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ঘোষণার পথ রোধ করিলাম বা ঘোষণাকে মারিলাম, এরূপ ভাব প্রাণে উজ্জীবিত হইলে কর্ম্ম যেন শক্তিহীন, নিরস্ত্র হইয়া যায়—যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের মায়া যেন নিশ্চেষ্ট হইয়া আইসে; এবং সাধকের অন্তর্মুখী দৃঢ়সঙ্কল্প সেই মুহূর্ত্তে তাহার প্রাণনাশ করে।

বস্তুতঃ ঘোষণা কখনও মরে না। একবার জন্মিলে উহা অমর তুল্য হইয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডের মায়া হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে বা দ্রোণাচার্য্যের প্রাণনাশ করিতে হইলে "অশ্বত্থামা হত" অর্থাৎ "ঘোষণা চাহি না বা ঘোষণা মরিল" প্রাণে এইরূপ ভাব ফুটাইয়া তুলিতে হয়। ক্রিয়াকাণ্ডের মায়ারূপ দ্রোণাচার্য্য তাহা হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে; এবং সেই সময় অন্তর্মুখী দৃঢ় সঙ্কল্প বা ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করে।

"ঘোষণা সাধকের অজ্ঞাতসারে তাহার প্রাণের ভিতর প্রবিষ্ট হয়। গভীর নিশায় সাধক যখন নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যায়, অর্থাৎ সাধকের প্রাণশক্তি, ইচ্ছা-শক্তি, সঙ্কল্প এবং আত্মচরিতার্থতারূপ মোহ, ইহারা সকলে যখন নিশ্চেষ্ট থাকে, সেই সময়ে যশঃশীর্ষক অশ্বত্থামা তস্করের মত শিবিরে প্রবেশ করে। মনের সহিত সংগ্রামে মনপক্ষকে বিধ্বস্ত করিয়া, মনকে ভগ্নোরু করিয়া, সাধক যখন "আমার সঙ্কল্প প্রায় পূর্ণ হইয়াছে," এইরূপ ভাবাপন্ন হয়—এইরূপ ঈষৎ আত্মশ্লাঘার মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে সেই সময়ে কীর্ত্তিঘোষণার মায়া তাহাকে শেষবারের মত বিধ্বস্ত করে, অজ্ঞাতসারে তাহার প্রাণের ভিতর ঢুকিয়া, তাহার প্রাণের আত্মচরিতার্থতা বা আত্মতৃপ্তিরূপ পুত্রগণকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে। সহসা মোহনিদ্রাভঙ্গে সে দেখে—যশোঘোষণা তাহাকে লুণ্ঠিত করিতেছে—তাহাকে

বিপর্য্যস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে—যশের মায়া তাহাকে সাধনার পথ হইতে বিচ্যুত করিতেছে।

তাহার অন্তর্মুখী ইচ্ছাশক্তি "সাধক হইয়াছি" এইরূপ আত্মতৃপ্তি হারাইয়া কাঁদিয়া উঠে; ইচ্ছার আকুল ক্রন্দনে প্রাণের মোহচ্যুতি ঘটে। আবার প্রাণ-শক্তি জাগিয়া উঠে;—কীর্ত্তি-ঘোষণাকে মারিবার জন্য সাধকের প্রাণ সচেষ্ট হয়। কিন্তু যে ঘোষণা হইয়া গিয়াছে—তাহা অমর, ঘোষণার মৃত্যু নাই। প্রাণ ঘোষণার মস্তক হইতে যশোরূপ মণিটুকু কাটিয়া বাহির করিয়া লইয়া ইচ্ছাশক্তিকে কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করে অর্থাৎ উচ্চ ঘোষণারূপ অশ্বত্থামার শিরে যশোরূপ মণি যেন আর তাহার চক্ষে প্রতিভাত না হয়, এইরূপ ভাবাপন্ন হয়। যশই ঘোষণার শক্তি। কীর্ত্তি-ঘোষণার শিরে যশঃস্বরূপ মণি থাকে বলিয়াই উহা সাধকের বিঘ্ন-সাধনে সমর্থ। সেইটুকু কাটিয়া বাহির করিয়া দিতে পারিলে, কীর্ত্তিঘোষণা আর সাধকের অনিষ্ট করিতে পারে না। উচ্চঘোষণার শিরে যশের মায়া আছে বলিয়াই সাধককে সাবধান হইতে হয়।

ইহাই অশ্বত্থামার মণিহরণ; এবং চরিতার্থতা বা আত্মতৃপ্তিরূপ দ্রৌপদী-তনয়গণের নিধন।

সঙ্কল্পরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন ঐ সময়ে নিহত হয়। অর্থাৎ মনোজয় হইলে এবং যশের মায়া বর্জ্জন করিলে, আর সঙ্কল্প বলিয়া সাধকের কিছু থাকে না; এবং চরিতার্থতা অচরিতার্থতা, তৃপ্তি ও অতৃপ্তি বলিয়াও কিছুই থাকে না। যে যশটুকু একবার হইয়া গিয়াছে, সেইটুকু অপরিহার্য্য; ইচ্ছাশক্তি যেন আত্মচরিতার্থতারূপ পুত্র হারাইয়া সেইটুকু লইতে বাধ্য হয়। সেই জন্য মহাভারতে দেখিতে পাই—অর্জ্জুন অশ্বত্থামার মণি দ্রৌপদীকে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে প্রীতা করিয়াছিলেন।

সাধক! আবার বলি যশের মায়ায় ভুলিও না—জগতের করতালি শুনিবার জন্য তোমার শ্রবণকুহর বাড়াইয়া রাখিও না। কীর্ত্তিঘোষণার শির হইতে যশঃ (মণি) কাটিয়া বাহির করিয়া দাও। জয়-ঘোষণার উচ্চ রোল আসিয়া যত তোমায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতে প্রয়াস পাইবে, তুমি ততই সঙ্কুচিত হইয়া সুদৃঢ়-ভাবে ভগবচ্চরণ স্মরণরূপ অবিচল স্তম্ভ ধারণ করিও—প্রাণের ভিতর হইতে "মা" "মা" রব উত্থিত হইয়া, জগতের করতালি ও কোলাহলকে যেন ঢাকিয়া ফেলে। যত করতালি আসিতে থাকিবে, ততই তোমার "মা" "মা" আহ্বান

যেন উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে—নতুবা মজিবে। সেই করতালির স্রোত, কোথায় তোমায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়া—চক্রাবর্ত্তনে ফেলিয়া—অতলতলে নিমগ্ন করিবে।

যাহা হউক, আমরা মোটের উপর পাণ্ডবপক্ষে এই কয়টী প্রধান প্রধান সেনানী পাইলাম। মনোরূপ দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্যরূপ ক্রিয়াকাণ্ডের মায়াকে পাণ্ডবপক্ষের এই কয়টী প্রধান প্রধান সেনানীর কথা বলিলেন,—

১। যুযুধান—সাত্যকি—সত্যান্বেষণ।

২। বিরাট—জড়শক্তিচিন্তা।

৩। দ্রুপদ—উৰ্দ্ধগতি (বা জীবের ক্রমবিকাশ)।

৪। ধৃষ্টদ্যুম্ন—দৃঢ় সঙ্কল্প।

৫। চেকিতান—সাধকের স্বতঃপ্রসূত জ্ঞান।

৬। সৌভদ্র—সাধকের নির্ভীকতা এবং তজ্জনিত অহংকার।

৭। দ্রৌপদেয়—সাধকের সাধনাজনিত আত্মচরিতার্থতা বা আত্ম-তৃপ্তির মোহ।

তারপর বিপক্ষসৈন্য সমালোচনা করিয়া, দুর্য্যোধনরূপ মন নিজ পক্ষের সৈন্যসমাবেশ. দ্রোণাচার্য্যের নিকট বর্ণনা করিতেছেন,—

> অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
> নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥৭
> ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
> অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ॥৮
> অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
> নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯

দ্বিজোত্তম! তে (তব) সংজ্ঞার্থং (গোচরার্থং) তান্ ব্রবীমি, অস্মাকং যেতু বিশিষ্টা মম সৈন্যস্য নায়কাঃ তান্ নিবোধ।৭।

ভবান্, ভীষ্মশ্চ, কর্ণশ্চ, সমিতিঞ্জয়ঃ কৃপশ্চ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণশ্চ, তথৈব চ সৌমদত্তিঃ মদর্থে ত্যক্ত-জীবিতাঃ নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ অন্যে বহবঃ শূরাশ্চ (সন্তি); (তে) সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ। ৮।৯।

দ্বিজোত্তম! আপনাকে জানাইবার জন্য বলিতেছি, আমাদিগের দলে যাঁহারা বিশিষ্ট ও আমার সৈন্যবাহিনীর নায়ক, তাঁহাদিগকে অবগত হউন।

(আমার দলে) আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, রণজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সৌমদত্তি (ভূরিশ্রবাঃ) এবং আমার জন্য মরণে কৃতসঙ্কল্প বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী আরও অনেক শূর আছেন; তাঁহারা সকলেই রণবিশারদ।

ভবান্—দ্রোণাচার্য্য বা যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের মায়া (পূর্ব্বে বলিয়াছি)।

ভীষ্ম—(ভী+ম, ষ—আগম) ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মার্থে পরিচর্য্যার নাম ব্রহ্মচর্য্য। ইনি উভয় পক্ষেরই পিতামহ। মন, প্রাণ যাহা কিছু, ব্রহ্মচর্য্য হইতেই পুষ্ট হয়—ব্রহ্মচর্য্যের অঙ্কেই পরিবর্দ্ধিত হয়—ব্রহ্মচর্য্য হইতেই শক্তি সঞ্জাত হয়—ব্রহ্মচর্য্য হইতেই জীবের অস্তিত্ব। সাধারণ কথায় ব্রহ্মচর্য্য অর্থে—কামাদি ইন্দ্রিয়দমন, আত্মসংযম ইত্যাদি; কিন্তু এ সকল ব্রহ্মচর্য্যের বহিরঙ্গ মাত্র। জীবাত্মামাত্রেরই ব্রহ্মলাভার্থে স্পৃহা, ব্রহ্মের সহিত সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা অন্তঃপ্রবাহিত আছে; উহাই ব্রহ্মচর্য্যের অন্তরঙ্গ বা উহাই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য। অল্পবিস্তর মাত্রায় ঐ ব্রহ্মচর্য্য প্রত্যেক জীবাত্মারই আছে। তাহারই বলে জীবপ্রবাহ মুক্তির পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। ঐ অন্তঃপ্রবাহই যেন ব্রহ্মচর্য্যের প্রাণ, এবং ইন্দ্রিয়দমন, আত্মসংযম ইত্যাদি ব্রহ্মচর্য্যের দেহ। ব্রহ্মচর্য্যরূপ ভীষ্ম বস্তুতঃ পাণ্ডবরূপ প্রাণ-শক্তিরই মঙ্গল কামনা করে, জীবাত্মার সহিত ভগবন্মিলনের আশা প্রাণে প্রাণে পোষণ করে; কিন্তু বাহ্যতঃ মনোরূপ দুর্য্যোধনের অধীনেই ইহা পরিচালিত হয়। ইন্দ্রিয়দমন, আত্মসংসম, এ সব মনের দ্বারাই চালিত হয়। সাধকের প্রাণ ভগবল্লাভের জন্য যখন ব্যাকুল হয়, তখন এই ইন্দ্রিয়-দমন, আত্মসংযম ইত্যাদির মায়া সাধককে ব্যতিব্যস্ত করে। সাধক ইহার মায়া সহসা ছাড়িতেও পারে না, অথচ শুধু ইহাতে ভগবৎলাভ হয় না বুঝিয়া, তাহার প্রাণ উহার গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করিতে চাহে না। ইহার মায়াই সাধককে সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরে। ভীষ্মদেব পাণ্ডবপক্ষকে যুদ্ধে সমধিক বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন। সাধনার পথে অগ্রসর হইতে জীবের প্রাণ যখন কাঁদে,—অতৃপ্ত প্রাণ যখন মরুমাঝে তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের মত ভগবল্লাভের জন্য চারি ধারে ছুটাছুটি করে, মন তখন তাহাকে—"ইন্দ্রিয় দমন কর—আত্মসংযম কর" ইত্যাদিরূপ উপদেশ দেয়। বস্তুতঃ উহা হইতে শক্তিলাভ হয় বুঝিয়া, এবং হয় ত ঐরূপ করিলেই ভগবল্লাভ হইতে পারে, এইরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, উহার মায়াও ছাড়িতে পারে না, অথচ ভগব-

লাভের প্রবল আশা, উহাতেও তাহাকে স্থির থাকিতে দেয় না। তাহার প্রাণ যাহাকে জিজ্ঞাসা করে,—সাধু, যোগী, মহাত্মা বলিয়া পরিচিত যে কোন লোকের কাছে যুক্তি প্রার্থনা করে, সকলেই প্রায় "ইন্দ্রিয় দমন কর" এইরূপ উপদেশ দিয়াই তাহাকে ক্ষান্ত করিতে প্রয়াস পায়। হায় রে। ভগবৎকৃপা না হইলে যে ইন্দ্রিয়-দমন হয় না, এ কথা আগে তাহাকে কেহ বলে না; ভগবৎকৃপার আস্বাদ প্রাপ্তি ঘটাইয়া, তাহার প্রাণকে কেহই স্থির, সংযত করিয়া দেয় না। জগৎ—ফাঁদ পাতিয়া ভগবান্‌কে ধরিতে চাহে। জগৎ পাখী পাইয়া পিঞ্জরের অন্বেষণ করে না, পিঞ্জর লইয়া পাখীর জন্য অপেক্ষা করে।

এই ভীষ্মচরিত অতি অপূর্ব্ব, দ্রোণাচার্য্য-চরিত অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর। বস্তুতঃ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদিরূপ দ্রোণাচার্য্যের মত ব্রহ্মচর্য্যের বহিরঙ্গরূপ ইন্দ্রিয়দমন, আত্মসংযম ইত্যাদিকে সাধক তত উপেক্ষা করিতে পারে না। ভগবান্ স্বয়ং যতক্ষণ না ভীষ্মের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হন, যতক্ষণ না ব্রহ্মচর্য্যরূপ ভীষ্মের ব্রহ্মস্পৃহারূপ প্রাণ ভগবৎশক্তির আস্বাদন পায়, ততক্ষণ ভীষ্মদেব সমরত্যাগ করেন না। অর্থাৎ সাধক ব্রহ্মচর্য্য-পালনে ঐশী শক্তির অনুভব পাইয়া চরিতার্থতা লাভ করে, অথচ ভগবদন্বেষণের জন্য উহার মায়ায় আর ভুলিয়া থাকিতে পারে না। এইরূপ উভয় সঙ্কটে পড়িয়া সাধক যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, তখন ভগবান্ এক অপূর্ব্ব ভাব তাহার প্রাণের ভিতর ফুটাইয়া দেন। সে ভাব প্রাণের ভিতর ফুটিয়া উঠিলে, কামাদি ইন্দ্রিয় আপনা হইতে দমিত হইয়া যায়। ভীষ্মরূপ ব্রহ্মচর্য্যের মায়া আপনা হইতে অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করে। কামাদি দমনরূপ ব্রহ্মচর্য্যের বহিরঙ্গে আর সাধকের প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মচর্য্য তখন রূপান্তর গ্রহণ করে, ব্রহ্মচর্য্যের বহিরঙ্গ নিশ্চেষ্ট হইয়া যায়, শুধু ব্রহ্মচর্য্যের প্রাণ শান্তিপূর্ণভাবে সাধকের মঙ্গল সম্পাদন করিতে থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রহ্মস্পৃহাই ব্রহ্মচর্য্যের প্রাণ, এবং কামাদি ইন্দ্রিয়-দমনই ব্রহ্মচর্য্যের বহিরঙ্গ বা দেহ।

সে ভাবটী কি? কোন্ ভাব প্রাণের ভিতর উদিত হইলে, কামাদি জয়ের জন্য আর সাধককে ব্যস্ত থাকিতে হয় না—ব্রহ্মচর্য্যের বহিরঙ্গের মায়া আর তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না? সে ভাবটী স্ত্রী-পুরুষ-অভেদ ভাব। কামেন্দ্রিয় জয়ের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম উপায়। ব্রহ্মচর্য্যের বহিরঙ্গকে নিশ্চেষ্ট করিবার বা নিষ্প্রয়োজন ভাবিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। স্ত্রী-পুরুষে অভেদ

জ্ঞান জন্মিলে, কামেন্দ্রিয় দমনরূপ ব্রহ্মচর্য্যের আর আবশ্যকতা থাকে না। ইহাই অর্জ্জুনের রথে স্ত্রী-পুরুষরূপী শিখণ্ডীর আবির্ভাব। স্ত্রী-পুরুষরূপী শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে জয় করিতে গিয়াছিলেন। তাহাকে দর্শন মাত্রেই ভীষ্মদেব নিরস্ত্র হইয়া রণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং অর্জ্জুনের শরজালে নিজ শয্যা রচনা করিয়া, শান্তিপূর্ণ চিত্তে তাহাতে শায়িত থাকিয়া, পাণ্ডবপক্ষের মঙ্গলের জন্য প্রাণে প্রাণে ভগবান্‌কে ডাকিয়াছিলেন। অপূর্ব্ব ধর্ম্মোপদেশ দিয়া, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবদিগের হৃদয়ে বিমল জ্ঞানজ্যোতিঃ ফুটাইয়া দিয়াছিলেন।

শিখণ্ডী (যাহাতে স্ত্রী ও পুরুষ-ভেদ নাই) বা স্ত্রী-পুরুষে অভেদ জ্ঞান, দ্রুপদ রাজারই অন্যতম পুত্র।

সাধক! যদি স্ত্রী-পুরুষে অভেদজ্ঞানের সাধনা করিতে পার, দেখিবে—তোমার ব্রহ্মচর্য্য আপনা হইতেই সংসাধিত হইয়া যাইবে। ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম অতীব কঠোর—আজিকালিকার দিনে পালন করা অতীত দুঃসাধ্য, এইরূপ ভাবিয়া তোমায় হতাশ হইতে হইবে না; এবং ব্রহ্মচর্য্যের বহিরঙ্গ পালন হইল না বলিয়া, বুঝি ভগবৎলাভ হইবে না, এরূপ নিরাশার কুহকে তোমায় ডুবিতে হইবে না। ব্রহ্মচর্য্যের অন্তরঙ্গ পালনে অধিক যত্নবান্ হও। "কামাদি জয়ের মায়া আমার বড় বিঘ্ন সাধন করিতেছে—আমার চিত্ত এই দিকেই প্রধাবিত—তোমার অন্বেষণে তত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে না" এইরূপ ভাবে কাঁদিয়া ভগবানের শরণাগত হও। মাতৃশক্তি তোমার প্রাণে ফুটিয়া উঠিবে—স্ত্রীপুরুষ বলিয়া আকৃতির ধান্ধা, তোমার চক্ষু হইতে জন্মের মত তিরোহিত হইবে, তখন তোমার অন্তরের ব্রহ্মচর্য্য স্বাধীনভাবে তোমার মঙ্গলপথে আলোক দেখাইবে।

ইহাই ভীষ্মের শরশয্যা। বস্তুতঃ ব্রহ্মচর্য্য—সাধনার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, ব্রহ্মচর্য্যই সাধনার শক্তি; কিন্তু তাই বলিয়া কামেন্দ্রিয়দমনরূপ ব্রহ্মচর্য্যের বহিরঙ্গ-সাধন যত দিন না হইবে, তত দিন বুঝি আমার ভগবৎসাধনা হইবে না, এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইও না। মোহে পড়িয়া সময়ের অপব্যবহার করিও না। ভীষ্মচরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখ—অর্জ্জুনের ভীষ্মবিজয় বুঝিতে চেষ্টা কর, তোমার উভয় কামনা পূর্ণ হইবে।

সাধক! "স্ত্রী-পুরুষ" শুধু পোষাকের বিভিন্নতা মাত্র। পোষাকের মোহ

ভুলিতে চেষ্টা কর, ব্রহ্মচর্য্য আপনি সংসাধিত হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের অপূর্ব্ব শক্তিতে তোমার প্রাণ ভরিয়া যাইবে। কিন্তু এ মন্ত্রের সাধনা প্রয়োজন। কিছুদিন যত্নসহকারে তোমার চিন্তাস্রোতকে এই "স্ত্রীপুরুষ অভেদ" জ্ঞানের উপর প্রবাহিত রাখিতে হইবে। তখন তোমার অধ্যবসায় বিফল হইবে না। "স্ত্রী" ও "পুরুষ"—তোমার এ আকৃতিগত ভেদজ্ঞান মিলিয়া এক হইয়া যাইবে ; লিঙ্গ-শরীরের যথার্থ জ্ঞান তোমার প্রাণের ভিতর জ্বলিয়া উঠিবে। লিঙ্গজ্ঞান কি, তখন তুমি বুঝিতে পারিবে।

কর্ণ—পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রাণশক্তিরই একাংশের নাম কর্ণ। উহা মূলাধার চক্রে থাকিয়া আমাদিগের দেহ পোষণ করে এবং সাধারণ কথায় আমরা যাহাকে জীবনের মায়া বলি, উহা ঐ প্রাণশক্তিটুকুরই জন্য। ঐ প্রাণশক্তিটুকুর সাহায্য গ্রহণ করিয়া আমাদিগের মন, ইন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়া দেহ এবং জগৎ উপভোগ করে ; সেই জন্য উহার মায়ায় আমরা এত মুগ্ধ ;—তাই জীব মরণে এত ভীত,—শরীর রক্ষার জন্য এত ব্যস্ত ! ঐ প্রাণশক্তি মৃত্যুর মায়া কল্পনা করিয়া জীবজগৎকে অহর্নিশ শঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে ; মৃত্যুভয়ের করাল মুখব্যাদান হইতে আত্মরক্ষার চিন্তারূপ গভীর অশান্তি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জীবের হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিতেছে।

সাধনা-পথে মৃত্যুভয় একটী প্রবল শত্রু ; আবার সাধনার পথে মৃত্যুভয় একটী প্রবল সহায়। মৃত্যুভয় না থাকিলে সাধারণ জীব উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইত, ধর্ম্মের দিকে জীবের মতি ফিরিত না ; কিন্তু আবার, সাধনার পথ দেহের পক্ষে কষ্টদায়ক এবং "ভোগ হইতে জীবকে বঞ্চিত করে" —এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে বলিয়া ও দেহ নষ্ট হইবার আশঙ্কাতে উহা সাধনা-পথে বিঘ্নকর। অভয়—সাধনার একটী লক্ষণ। আমাদের এই প্রাণশক্তির মায়া, মৃত্যুভয়রূপ কবচ-কুণ্ডল ধারণ করিয়া, আমাদিগকে সাধনাপথে অগ্রসর হইতে দেয় না। মৃত্যুভয়—হৃদয়কে সঙ্কুচিত করে—প্রাণের উদারতা নষ্ট করে—প্রাণকে জগতের বিশাল বিস্তারে মিশিতে না দিয়া, সংকীর্ণ ভোগ-গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে জন্ম-মরণ-ভ্রান্তি-জাল রচনা করিয়া, জীবাত্মাকে জন্ম-মৃত্যুরহিত, নিত্য, নির্ব্বিকার অবস্থার আস্বাদন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে।

মহাভারতে আছে, কর্ণ—সূর্য্যের পুত্র। বস্তুতঃ, কর্ণরূপ এই প্রাণশক্তিটুকুর জন্য এ জগৎ সূর্য্যের নিকট ঋণী। সূর্য্য—জীবনীশক্তির আধার। ঐ যে সূর্য্য

হইতে জ্যোতির্ম্ময় রশ্মিতরঙ্গরাশি অহর্নিশ চারি ধারে প্রবাহিত হইতেছে, জ্যোতির তরঙ্গভঙ্গ অবিরত দিগ্দিগন্ত প্লাবিত করিয়া ছুটিতেছে—উহার নিকট আমরা সর্ব্বাংশে ঋণী। জগতের বস্তুনিচয়ে রক্ত, পীত, নীল আদি বর্ণবিন্যাস—জগতের বিচিত্র রূপমাধুরী সূর্য্যকিরণের মহিমাতেই রচিত হয়। নিবিড় অন্ধকার নাশ করিয়া, পৃথিবী চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহকে কুসুমগুচ্ছের মত ফুটাইয়া তুলেন বলিয়া, এবং আমাদিগকে চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রদান করিয়া, জগদ্ভোগে সাহায্য করেন বলিয়া ইহাঁর নাম জগচ্চক্ষুঃ। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটী মহামূল্যবান্ বস্তুর জন্য আমরা সূর্য্যের মুখাপেক্ষী। সূর্য্যের কনককিরণধারা অবলম্বন করিয়া, প্রাণ-শক্তির অফুরন্ত প্রস্রবণ জীবজগৎকে বাচাইয়া রাখে; তাই সূর্য্য জগতের প্রাণ-স্বরূপ। সূর্য্য আমাদিগের প্রাণ—সূর্য্য জগতের প্রাণ—সূর্য্য ব্রহ্মাণ্ডের জীবনকেন্দ্র।

বস্তুতঃ, সূর্য্য না থাকিলে আমরা বাচিতাম না—সূর্য্য চৈতন্যময়ী মায়ের আমার নয়নমণি; স্নেহময়ী জননীর স্নেহধারার মত জীবনীশক্তির অনন্ত প্রবাহ ঐ সূর্য্য হইতে আমাদের শিরে ঝরিতেছে—আমাদিগকে মগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। সমুদ্রে যেমন জলচর জীব বাস করে, আমরাও তেমনি সূর্য্যপ্রসৃত জীবনীশক্তি-রূপ মাতৃস্নেহের বিরাট্ সমুদ্রে নিমজ্জিত। সূর্য্যের জ্যোতিঃধারা ধরিয়া জীবনী-শক্তি অনবরত আমাদিগের দেহে প্রবেশ করিতেছে; সূর্য্যকিরণের ভিতর দিয়া সন্তানকে স্তনধারা দিবার মত মা আমাদিগকে প্রাণশক্তির ধারা ঢালিয়া দিতেছেন। সেই প্রাণশক্তিপ্রবাহের সাহায্যে আমাদের মন জগৎকে ভোগ করে। ভোগের ব্যয়স্বরূপ সেই প্রাণশক্তি ব্যয়িত হয়। আমরা জগদ্ভোগে যত প্রাণশক্তি ব্যয় করিয়া থাকি, এই বিরাট্ প্রাণশক্তির প্রবাহ ততই আমাদিগের সে অভাব পূরণ করে। যে পরিমাণে প্রাণশক্তি আমাদের দেহে প্রবিষ্ট হয়, তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে যদি আমরা জগদ্ভোগের জন্য ব্যয় করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে আমাদের দেহভাণ্ডারে প্রাণশক্তি অনেক পরিমাণে সঞ্চিত হয়, এবং আমরা দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারি। কিম্বা যদি ব্যয় অপেক্ষা অধিক পরিমাণে এই প্রাণশক্তি বহির্জগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি তাহা হইলেও জীবনকে দীর্ঘকালব্যাপী করা যাইতে পারে। অধিক পরিমাণে প্রাণ-শক্তি বহির্জগৎ হইতে আকর্ষণ করিতে পারিলে, এবং পন্থা জানা থাকিলে, আমরা অন্য কোন ব্যক্তির দেহে উহা প্রয়োগ করিয়া, তাহাকে রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারি; এমন কি, মৃতদেহ অবধিতেও জীবন সঞ্চার করা যায়।

এইরূপ অধিক পরিমাণে প্রাণশক্তি আকর্ষণ করিবার অতি সুন্দর উপায় আছে; কিন্তু সে উপায় প্রকাশ করা যোগনীতিবিরুদ্ধ। কারণ, সাধারণে সে ভাবে প্রাণশক্তি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলে, তাহাতে বিঘ্ন ঘটিতে পারে। প্রাণশক্তিপ্রবাহ এত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সহসা দেহের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে—সূর্য্যের রশ্মিতরঙ্গ ধরিয়া, ঐ প্রাণশক্তির প্রবাহ এত প্রবলবেগে আমাদের দেহে আসিতে পারে যে, অনভ্যস্ত দেহের মূলাধারাদি চক্রসকল সে শক্তির বেগ ধরিয়া কেন্দ্রগত করিয়া রাখিতে পারে না,—প্রাণপ্রবাহ দেহ পরিপ্লাবিত করিয়া দিয়া বন্যাতরঙ্গ বা বিদ্যুচ্ছটার মত আমাদের ব্রহ্মরন্ধ্র বা অন্য কোন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া, বহির্গত হইয়া মুহূর্ত্তে আমাদের মৃত্যু ঘটাইতে পারে; অথবা স্নায়ুপথ বিকৃত করিয়া দিয়া উন্মাদ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত কবিতে পারে। তবে শাস্ত্রসঙ্গত পন্থা অবলম্বন করিয়া ঐরূপে বিরাট্ হইতে প্রাণশক্তি আকর্ষণ করিলে সে ভয় আর থাকে না।

এই জন্য কর্ণকে সূর্য্যপুত্র বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। সকল কথা প্রকাশ করা চলে না, সংক্ষেপে বিরাট্ প্রাণপ্রবাহের কথা বলিলাম। মায়ের এক একটী করুণার কথা বলিতে গেলে, এক একখানি বিরাট্ গ্রন্থ হইয়া পড়ে—বুঝি তাহাতেও বলা চলে না। যাহা হউক, এই শক্তি জীবদেহে প্রবেশকালীন একটি জ্যোতির্ম্ময় সূত্রবৎ ধারা অবলম্বন করিয়া প্রবেশ করে এবং জীবের মৃত্যুকালে ঐরূপ সূত্রধারা অবলম্বন করিয়া বহির্গত হইয়া, পঞ্চ প্রাণশক্তিবিশিষ্ট জীবাত্মার দেহ হইতে বহির্গমনের জন্য পথ ও আধার প্রস্তুত করে; এই জন্যই কর্ণকে সূতপুত্র বা সূত্রধর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

কর্ণরূপ প্রাণশক্তির মৃত্যুভয় ও জগদ্ভোগের মায়ারূপ কবচকুণ্ডল অপহৃত হইলে তবে কর্ণ মরে; অর্থাৎ সাধকের হৃদয় হইতে মৃত্যুভয় ও জগদ্ভোগের মায়া দূরীকৃত হইলে, ঐ প্রাণশক্তি—বিরাট্ প্রাণশক্তিতে মিলিয়া যায়। মন আর উহার সাহায্য লইয়া জগদ্ভোগে জীবকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না; অর্থাৎ যেমন সমুদ্রোত্থিত তরঙ্গ সমুদ্রে মিলাইয়া গিয়া প্রশান্ত ভাব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ উহা বিরাট্ প্রাণসমুদ্রে মিলিত হয়। যাহা হউক, সূর্য্য-সাধনা শিক্ষা করিলে, এই প্রাণশক্তির রহস্য হৃদয়ঙ্গম হয়—কিন্তু সে অন্য কথা।

সাধক! যদি মায়ের আমার ঐ প্রাণশক্তিরূপ স্নেহধারা-পরিপ্লুত সূর্য্যরূপ

নয়নের চিন্তা করিতে পার—যদি হৃদয়ঙ্গম করিতে পার, তুমি মাতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া আছ, এবং তোমার শিরে মাতৃচক্ষু হইতে স্নেহের ধারা ঝরিতেছে, তাহা হইলে তোমার জীবনীশক্তির ভাণ্ডার ফুরাইবে না। মা অনিমেষ লোচনে তোমার দিকে চাহিয়া আছেন, তুমিও যদি অনিমেষ লোচনে সেই মাতৃ-দৃষ্টির দিকে চাহিয়া থাকিতে পার, তোমার মৃত্যুভয় রোধ হইবে। এস। চাহিয়া দেখ। মায়ের অমৃতময়ী স্তনধারা অনবরত তোমাকে নিমগ্ন করিয়া চারি ধারে ঝরিতেছে—তোমাকে পরিপ্লাবিত করিয়া সেই স্তনধারাপ্রবাহ দিগ্দিগন্তে প্রবাহিত হইতেছে; পান করিয়া কৃতার্থ হও। মাতৃ-স্তনের ক্ষীরধারায় পুষ্ট হইয়া শক্তিমান্ হও। মনকে জগৎ উপভোগের জন্য সে শক্তির অপচয় করিতে না দিয়া, পঞ্চপ্রাণযুক্ত আত্মার জন্য আধার পূর্ণ কর। "স্তনধারা দাও মা—স্তনধারা দাও মা" বলিয়া কাঁদ! মাতৃস্তনে দুগ্ধ উছলিয়া উঠিবে—স্বর্গের সুরধুনী, আকাশ-গঙ্গারূপে তোমার শিরোদেশে ঝরিবে, তোমার মস্তকের স্নায়ু-জটাজাল নিষিক্ত করিয়া ভাগীরথীরূপে তোমার সর্ব্বাঙ্গ পরিপ্লাবিত করিবে; তুমি কৃতার্থ হইবে। তোমার শিবমূর্ত্তি তুমি আপনি দেখিয়া আত্মহারা হইবে।

সৌমদত্তি—সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা। ভূরি=ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইত্যাদি, শ্রব =খ্যাতি; যাহা হইতে ব্রহ্মত্ব বিষ্ণুত্ব ইত্যাদির মত খ্যাতিলাভ হইতে পারে, তাহাকে ভূরিশ্রবা বলে; অর্থাৎ হঠযোগকে ভূরিশ্রবা বলে। সত্যান্বেষণের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল রিপু। সাধক সত্যান্বেষণের জন্য যখন সাধনাপথে প্রবেশ লাভ করে—ভগবান্‌কে খুঁজিবার জন্য প্রাণে যখন আকুল পিপাসা জাগিয়া উঠে, সেই সময়ে যোগ অর্থাৎ হঠযোগ শিক্ষার মায়া কোথা হইতে আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করে। ভগবান্‌কে খুঁজিতে গিয়া, ভগবদ্বিভূতি লাভের কৌশল-সকল শিক্ষার জন্য প্রাণ ব্যস্ত হয়। প্রচলিত কথায় যাহাকে যোগী বলে, সাধকের সেইরূপ যোগী হইবার সাধ প্রবল হইয়া উঠে। হঠযোগের অন্তর্গত আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা ইত্যাদিতেই তাহার চিত্ত অধিক অভিনিবিষ্ট হয়, সে ভগবান্ ভুলিয়া ভোজবাজী শিক্ষায় যত্নবান্ হয়। তাহার সত্যান্বেষণের নির্ম্মল উদ্যম কিছু দিনের জন্য বিধ্বস্ত হয়। এই জন্যই মহাভারতে ভূরিশ্রবার হস্তে সাত্যকির লাঞ্ছনা দেখিতে পাই। অনেক সাধক, ভগবান্ খুঁজিতে গিয়া, এইরূপে বাজীকর হইয়া গিয়াছেন।

বস্তুতঃ হঠসমাধিতে ভগবান্ লাভ হয় না—যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠদেব, রামচন্দ্রকে ইহা অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্রের রাজসভামণ্ডপে, তাঁহাকে

শিক্ষা দিবার জন্য তিনি একদিন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করিতে বলিয়াছিলেন। বশিষ্ঠদেবের আদেশানুযায়ী সেই স্থলটী খনিত হইলে, একটী মনুষ্যদেহ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। বশিষ্ঠের আদেশে সেই দেহটী সভামণ্ডপে আনীত হইলে, প্রক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা তিনি তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই দেহে চৈতন্য সম্পাদিত হইবামাত্র, সে উঠিয়া সভাসদ্‌বর্গকে অভিবাদন করিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিল। সভাসদ্‌গণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বশিষ্ঠদেবকে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ঐ লোকটি একজন যাদুকর। রাজসভায় কুম্ভকাদি নানা ভোজবিদ্যা দেখাইতে দেখাইতে সহসা সমাধিস্থ হইয়া গিয়াছিল। উহার সহচরেরা মৃত্যু হইয়াছে এইরূপ কল্পনা করিয়া দেহটি প্রোথিত করিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। 'নৃপতির নিকট হইতে প্রচুর পুরস্কার লইব' এইরূপ প্রত্যাশা উহার প্রাণে সমাধিস্থ হইবার সময় প্রবল থাকায়, সমাধি ভঙ্গমাত্র ও পুরস্কারই প্রার্থনা করিতেছে।

বস্তুতঃ ঐরূপ হঠ-সমাধিতে বাজী দেখান ছাড়া অন্য কোন বিশেষ কাজ হয় না। ইন্দ্রিয়বিশেষের কৌশলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না, তবে চিত্তক্ষেত্রকে স্থির করিবার পক্ষে অনেকটা সহায়তা করে, এই পর্য্যন্ত। যথার্থ সমাধি অন্য প্রকারে হয়, সমাধি আপনা হইতে আইসে। সমাধি হইতে ভগবান্ লাভ হয় না —ভগবৎলাভ হইতে সমাধি আইসে; কিন্তু উহা এখন আমাদের বিচার্য্য নহে। যোগ বুঝিবার সময় এ কথা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিব।

যাহা হউক, অনেক সাধক এই যোগক্রিয়ার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভগবান্‌কে হারাইয়াছে, অনেক সাধকের সত্যান্বেষণ এই ভূরিশ্রবার দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে। হায়! এইরূপ যোগের দুই একটি সাধারণ বিভূতি দেখিয়া, এমন কি, ললাটে সামান্য জ্যোতির্গোলক দর্শন করিয়াও অজ্ঞ জীবপ্রবাহ মুগ্ধ হইয়া যায়। অজ্ঞ জীব উহাকেই তাহাদের জীবনের চরিতার্থতা মনে করে; জানে না, ওরূপ জ্যোতির্গোলক দেহের পদনখর হইতে শিরোদেশ অবধি পুঞ্জে পুঞ্জে বিস্তৃত। আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য, তারকার মত, আমাদিগের শরীরস্থ ব্যোমক্ষেত্র ঐরূপ জ্যোতির্গোলকে পরিব্যাপ্ত। তবে ললাট-গোলকটী সত্বর দর্শনে আইসে। উহারা চক্ষু মুদিত করিয়া ললাটের জ্যোতির্গোলক দেখিবার জন্য যতক্ষণ চেষ্টা করে, ততক্ষণ যদি ঐরূপ চক্ষু মুদিয়া—ঐরূপ আগ্রহে "মা কোথা—মা কোথা" করিতে পারিত—বুঝি তাহা হইলে ওরূপ গোলকপুঞ্জের অনন্ত

বিস্তার দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হইত। উহাদিগের বুঝা উচিত, উহা ভগবৎসাধনা-পথে সহায় মাত্র, যথার্থ চরিতার্থতা নহে।

কিন্তু আসে, ওরূপ যোগবিভূতির মায়া না আসিয়া থাকে না। কেন না, ওরূপ যোগবিভূতি দর্শনে ভগবল্লাভ না হইলেও, অন্য একটী বিশেষ উপকার সংসাধিত হয়। ভগবল্লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রাণে প্রবল থাকিলে উহা জীবকে ভগবল্লাভের জন্য আরও সচেষ্ট করিয়া তুলে। যথার্থ সাধনেচ্ছা প্রাণে প্রবল থাকিলে, ভগবান্ আপনি এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সাধককে সাবধান করিয়া দেন। সাধকের সত্যান্বেষণ বিপর্য্যস্ত হইবামাত্র ভগবান্ জীবশক্তিকে যেন বলিয়া উঠেন, "তুমি সাবধান হও, তোমার সত্যান্বেষণ বিভূতিমায়ার করে নিপীড়িত, তুমি উহাকে রক্ষা কর।" কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে এই কথাই বলিতে শুনিয়াছি। সাত্যকি যখন ভূরিশ্রবার দ্বারা আক্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, সেই সময় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—"অর্জ্জুন! সাবধান! সাত্যকিকে রক্ষা কর—ভূরিশ্রবার কর হইতে সাত্যকিকে পরিত্রাণ কর।" অর্জ্জুন ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদন করিয়া, সাত্যকিকে মুক্তি দিলে, ভূরিশ্রবা সূর্য্যে চক্ষু ও চন্দ্রে মন স্থাপন করিয়া, যোগাবলম্বনে প্রাণত্যাগে প্রয়াসী হইয়াছিল; এবং সেই সময়ে সাত্যকি খড়্গের দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন।

আমরা উভয় পক্ষের এই পর্য্যন্তই সমালোচনা করিলাম। প্রত্যেক চরিত্র বর্ণনা করিতে গেলে, অতিরিক্ত জটিলতা আসিয়া পড়িবে: সাধারণ লোক এ সকল যোগবিজ্ঞান শুধু গ্রন্থপাঠে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিবে না। গ্রন্থপাঠে সাধনেচ্ছা যথার্থ প্রবল হইয়া উঠিলে প্রাণের ভিতর এ সমস্ত তত্ত্ব আপনি ফুটিয়া উঠিবে। সদ্‌গুরু আবির্ভূত হইয়া সমস্ত তত্ত্ব ফুটাইয়া দিবেন। সাধক! তত্ত্ব বুঝিবার জন্য ব্যস্ত হইও না, ভগবল্লাভের জন্য ব্যস্ত হও—তত্ত্ব আপনি ফুটিবে; সদ্‌গুরু খুঁজিও না—সৎশিষ্য হও— গুরু আপনি মিলিবে; ভগবৎশক্তির অন্বেষণ করিও না, ভগবানে আসক্তি ঢালিয়া দাও—শক্তি আপনি আসিবে। মাতৃস্তন অন্বেষণ করিও না—"মা" "মা" করিয়া কাঁদ— মা আপনি মুখে স্তনদান করিবেন।

এইরূপে দুর্য্যোধন উভয় দিক্ বিশ্লেষণ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট যাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সাধন-সংগ্রামের সূচনায় মন শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির মায়াকে লক্ষ্য করিয়া, উভয় দিক্ বিশ্লেষিত করিয়া যেরূপ দেখিতে পায়, তাহা রূপকাকারে বলিলাম।

যাহা হউক, মন এইরূপে উভয় দিক্ দেখিতে দেখিতে বিমর্ষ হইয়া পড়ে; প্রাণের পর্য্যাপ্ত আয়োজন দেখিয়া সে সঙ্কুচিত হয়। "বুঝি প্রাণের গতি সংসারাশ্রমোচিত ধর্ম্ম-সকল লঙ্ঘন করিয়া উন্মার্গগামী হয়" এই ভাবিয়া সাধকের মন বিষণ্ণ হয়। সাধকের প্রাণ ত বিলম্ব সহিতে পারে না। সে চাহে মুহূর্ত্তে ভগবানের আলিঙ্গন;—প্রতি মুহূর্ত্তে তার প্রাণ ভগবান্‌কে পাইবার জন্য ব্যগ্র; প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার প্রাণ ভগবান্‌কে চাক্ষুষ দেখিবার জন্য লালায়িত; প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার প্রাণ ভগবচ্চরণে লুণ্ঠিত হইবার জন্য ব্যাকুল;—তার কি বিলম্ব সহে? শাস্ত্রাধ্যয়ন—ব্রহ্মচর্য্য—যাগযজ্ঞ—এত বিলম্ব সে কি সহ্য করিতে পারে? বৎসহারা গাভীর মত তার প্রাণের গতি—সে কি অপেক্ষা করিতে পারে? তৃণগুচ্ছাদি খাইয়া বল সঞ্চয় করিতে করিতে বৎসের অন্বেষণ কর—এ কথা কি মায়ের প্রাণ শোনে? সমুদ্রের আকর্ষণ পড়িয়াছে—নদীর জল কি স্থির থাকিতে পারে?

কিন্তু মন তাহা চাহে না। মন চাহে জ্ঞান,—মন চাহে যশ, মন চাহে শক্তি, মন চাহে সংসার, মন চাহে স্বর্গ, মন চাহে ভোগ। সুতরাং মন, প্রাণের এই একমুখী স্রোত দেখিয়া চিন্তিত হয়। সে বলে,—

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥১০

ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ অস্মাকং তৎ (তাদৃশবীরসমন্বিতম্) বলং অপর্য্যাপ্তং (প্রতিযোদ্ধুম্ অসমর্থং) তু ভীমাভিরক্ষিতম্ এতেষাং ইদং বলং পর্য্যাপ্তম্।

ব্যবহারিক অর্থ। ভীষ্মাভিরক্ষিত আমাদিগের তাদৃশ বীরযুক্ত বলও পাণ্ডবদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে অসমর্থ; কিন্তু ভীমাভিরক্ষিত পাণ্ডবসৈন্য পর্য্যাপ্ত।

যৌগিক অর্থ।—ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মনের বল রক্ষিত হইলেও এবং নানা প্রকার শক্তি, জ্ঞান ও ভোগৈশ্বর্য্যের আশা থাকিলেও, উহা প্রাণের গতিকে রোধ করিতে বুঝি অসমর্থ। ভীমাভিরক্ষিত অর্থাৎ ভীমের কাতর আহ্বানরূপ জপদ্বারা রক্ষিত প্রাণশক্তি যেরূপ সবল বলিয়া প্রতীয়মান হয়,—প্রাণের কাতর ভগবদাহ্বান যেরূপ উন্মাদনার ভাব প্রকাশ করে, তাহাতে মন যে তাহাকে আশ্রমোচিত ধর্ম্মশৃঙ্খলার ভিতর ধরিয়া রাখিতে পারিবে—এরূপ কল্পনা করিতে পারে না।

ভীষ্মাভিরক্ষিত বলিবার কারণ কি? বস্তুতঃ মনের তেজ ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই সংরক্ষিত হয়। যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্ম ও বেদপাঠাদি জ্ঞানানুশীলন ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা রক্ষিত ও পুষ্ট হয়, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই জীব বীর্য্যবান্ হইয়া উঠে; সেই জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দিন ব্রহ্মচর্য্যের মায়ার সহিত সাধককে যুদ্ধ করিতে হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা আক্রান্ত থাকিতে হয় বা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে বাধ্য হইতে হয়।

পাণ্ডবপক্ষকে ভীমাভিরক্ষিত বলিবার কারণ—সাধককে সর্ব্বপ্রথম কণ্ঠস্থ উদাননামক প্রাণাংশের জপশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় বা সর্ব্বপ্রথম সাধকের প্রাণের ভগবদ্বিরহ উপলব্ধি কণ্ঠেই অভিব্যক্ত হয়। "কোথা তুমি—কোথা তুমি মা; কোথা তুমি মা আমার জীবনের ধ্রুবতারা, কোথা তুমি, আমার তৃষিত প্রাণের শান্তি-বারি, কোথা তুমি, আমার আঁধার হৃদয়ের দীপ্ত মণি?"— সাধকের কাতরতা এই ভাবে কণ্ঠে সর্ব্বপ্রথম জপাকারে স্ফুরিত হয় এবং সেই জন্য সাধনা-পথের প্রথম সহায়—জপ। জপের মত ক্রিয়া আর নাই। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন,—"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি"। কিন্তু জপ-রহস্য বলিবার সময় জপের প্রণালী বিশেষ করিয়া বলিব; পাঠক বুঝিতে পারিবেন, একমাত্র জপ অবলম্বন করিলেই তাহা হইতে সর্ব্বকাম অতি সহজে সিদ্ধ হইতে পারে।

যাহা হউক, মন সকল মায়াকে কেন্দ্রীভূত করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের মায়াকেই প্রবল করিয়া তোলে। পরের শ্লোকে তাই বলিতেছেন,—

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১

সর্ব্বেষু অয়নেষু (ব্যূহমার্গেষু) যথাভাগং অবস্থিতাঃ (সন্তঃ) ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্তু।

ব্যূহমার্গে স্ব স্ব বিভাগানুসারে অবস্থান করিয়া আপনারা সর্ব্বপ্রকারে ভীষ্মদেবকেই রক্ষা করুন।

মোট কথা, সাধকের মন যেন ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মচর্য্য করিয়া পাগল হইয়া উঠে। প্রাণ ভগবান্ ভগবান্ করিয়া ছুটিলে, মন সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মচর্য্যকেই ধরিয়া বসে— ইহাই উক্ত শ্লোকের মর্ম্ম।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২

প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ তস্য হর্ষং সংজনয়ন্ উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য শঙ্খং দধ্মৌ।

ব্যবহারিক অর্থ।—প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, দুর্য্যোধনকে উৎফুল্ল করিয়া, উচ্চ সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন।

যৌগিক অর্থ।—ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি মনের এইরূপ লক্ষ্য পড়িলে, সংযম সজাগ হইয়া উঠে, এবং উহার শঙ্খ বুকের ভিতর বাজিয়া উঠে। শঙ্খ কি? আমাদিগের মন ও প্রাণশক্তির প্রত্যেক বৃত্তির বিশেষ বিশেষ প্রকার ধ্বনি আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মন ও প্রাণ বস্তুতঃ একই শক্তির উভয় প্রকার গতি মাত্র। সেই আদিশক্তি—প্রণব, এ কথাও বলিয়াছি। ঐ আদিশক্তি যত বিভিন্ন প্রকারে আমাদিগের দেহের ভিতর বিশ্লিষ্ট হয়, ঐ প্রণবের নাদও তত প্রকারে বিশ্লেষিত হইয়া, বিভিন্ন বিভিন্নরূপে শ্রুতিগোচর হয়। যোগীরা এ সকল নাদ শুনিতে পান—এ সকল নাদ সাধকমাত্রেরই শ্রুতিগোচর হয়; সাধকমাত্রেই জানেন, আমাদিগের প্রাণ ও মনের বৃত্তিসকল উত্তেজিত হইবামাত্র তাহাদিগের বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রকারের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য ক্রোধাবিষ্ট হইলে এক বিশেষ প্রকারের ধ্বনি উদ্ভূত হইতে থাকে। কামাবিষ্ট হইলে অন্য এক প্রকার, লোভে এক প্রকার, আবার করুণার্ত্ত অবস্থায় এক প্রকার, ভক্তি-ভাবাপন্ন অবস্থায় এক প্রকার, জ্ঞানেচ্ছু হইলে এক প্রকার, এইরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারের ধ্বনি দেহের ভিতর শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আবার বলি, ও সকল ধ্বনি ওঙ্কারের বা প্রণবের রূপান্তরিত তরঙ্গভঙ্গ মাত্র। যখন যেরূপ বৃত্তি চিৎক্ষেত্রকে অধিকার করে, তখন সেই রকমের ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। জপ অবলম্বন করিয়া, সাধক উপবিষ্ট হইলে, এ সকল ধ্বনি অনায়াসে শুনিতে পাইতে পারে। হিন্দু-পল্লীতে সন্ধ্যাসময়ে গৃহে গৃহে শঙ্খ বাজিয়া উঠিলে, সেই সম্মিলিত শঙ্খধ্বনি যেমন একটী নিথর শব্দস্পন্দনে দিগন্তে শ্রুত হয়, ধ্বনির যেমন একটী মধুর তর-তর প্রবাহ দিক্‌প্রান্ত ব্যাপিয়া বহিতে থাকে, সেইরূপ আমাদিগের বৃত্তিসকলের ধ্বনিও দেহের অভ্যন্তরে তর-তর প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া সাধককে মুগ্ধ করে। সে অশ্রুতপূর্ব্ব ধ্বনির আনন্দ-হিল্লোল লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। দূরাগত শঙ্খধ্বনিপ্রবাহের মত, উহা

প্রাণকে আলোড়িত করে বলিয়া, ঐ ধ্বনিগুলিকে শঙ্খনাদ বলিয়া উল্লিখিত করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ আমাদিগের বৃত্তিগুলির বিষয় আলোচনা করিলে, প্রাণ মুগ্ধ হইয়া যায়। আমাদিগের বৃত্তিসকলের বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ বা রূপ আছে—বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারের আকৃতি আছে, এবং বিভিন্ন প্রকারের ধ্বনি আছে। যোগচক্ষুষ্মান্ সাধক দেহের অভ্যন্তরে এই সকল বিভিন্ন আকারের বর্ণবিন্যাস, বিভিন্ন শব্দের ঝঙ্কার দর্শন ও শ্রবণ করিয়া মোহিত হয়। কিন্তু এ সকল বর্ণ-বৈচিত্র্যের কথা পরে আলোচনা করিব।

যাহা হউক, যখন এই প্রকারের কোন বৃত্তি প্রাণে উজ্জীবিত হয়, সেই সময়ে সেই বৃত্তির বিশিষ্ট শব্দতরঙ্গ অন্যান্য শব্দ-তরঙ্গে প্রতিহত হইয়া, প্রথমে নানারূপ মিশ্রিত একটী শব্দকোলাহল রচনা করে। যেমন নদীর স্রোতে কোন বিশেষ প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইলে, অন্যান্য তরঙ্গের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে নানা প্রকারের তরঙ্গরাজি রচিত হয়, তেমনই প্রাণের ভিতর বৃত্তিবিশেষ প্রবলতর হইলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচলিত শব্দ-তরঙ্গ-সকল প্রহত হইয়া, নানা প্রকারের শব্দ-তরঙ্গ সৃজন করে। সেই জন্য পরশ্লোকে পণবানক আদি শব্দ-সকলের কথা বলা হইতেছে।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩

ততঃ শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ পণবানকগোমুখাঃ চ সহসা এব অভ্যহন্যন্ত ; স শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ।

তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ প্রভৃতি সহসা বাজিয়া উঠিল, এবং সে শব্দ-তরঙ্গ তুমুল হইল।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪

ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে (রথে) স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবশ্চ এব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ।

যৌগিক অর্থ।—তখন শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন দিব্য শঙ্খধ্বনি করিলেন অর্থাৎ তখন শ্বেতজ্যোতির্ম্মণ্ডিত হৃদয়-রথে বিরাজিত জীবাত্মা ও ভগবান্ দিব্য শঙ্খধ্বনি করিলেন। এই শ্লোকে শুভ্র জ্যোতিকেই শ্বেতাশ্ব বলিয়া

উল্লিখিত করা হইয়াছে। সূর্য্য হইতে সপ্তপ্রকার বর্ণবিশিষ্ট রশ্মিজাল প্রক্ষিপ্ত হয় বলিয়া, সূর্য্যদেবকেও সপ্তাশ্ব-সম্বলিত-রথশালী বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করেন। হৃদয়ের ভাবসকলের জ্যোতিঃ নির্ম্মল বলিয়া হৃদয়ের সাধারণ জ্যোতিঃ শুভ্র—রজতদ্রববৎ অথবা মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডবৎ। হৃৎকোষ দর্শন হইলে এ জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ-গোচর হয়। হৃদয়ে শুভ্র জ্যোতির একান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা জ্যোতিস্তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা অক্লেশে বুঝিতে পারিবেন, শুভ্র জ্যোতিস্তরঙ্গ কি প্রকারে অন্যান্য জ্যোতিস্তরঙ্গকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দেয়, ভিতরে ঢুকিতে দেয় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের বৃত্তিমাত্রেরই বর্ণ বা জ্যোতিঃ আছে। যদি কৃপাময়ী মা আমার কৃপাবশে হৃদয়কে শুভ্র জ্যোতির্ম্মণ্ডিত না করিতেন, তাহা হইলে মানসিক বৃত্তিরাজির জ্যোতিস্তরঙ্গ হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, হৃদয়কে স্বাধীনভাবে ভাবসকল প্রকাশ করিতে দিত না; প্রাণের ভাবসকলকে মিশ্রিত ও মলামর করিয়া দিত। হৃদয়ের উপর শুভ্র জ্যোতিঃ মণ্ডিত থাকায়, মানসিক বৃত্তিসকলের নানা বর্ণের তরঙ্গ হৃদয়ের ভিতর প্রবেশ করিতে পায় না। শুভ্র জ্যোতিঃ অপর জ্যোতিঃকে প্রত্যাখ্যাত করে।* এই কারণেই আমাদের হৃদয়-রথ শুভ্র জ্যোতিঃ বা শ্বেতাশ্ববিশিষ্ট।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রাণশক্তির প্রাণনামক মুখ্য অংশ-সম্বলিত জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থান করেন, এবং ইনিই অর্জ্জুন বলিয়া উল্লিখিত। সর্ব্বময় ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী হইলেও বিশিষ্টভাবে জীবাত্মাতেই অবস্থিত—জীবহৃদয়েই বিশেষরূপে প্রতিফলিত। সেই জন্য অর্জ্জুনের রথে ভগবান্‌কে সারথিরূপে দেখিতে পাই; "যেখানে জীব, সেইখানে শিব" এই মহাবাক্য সেই জন্যই শাস্ত্রে শুনিতে পাই।

বস্তুতঃ মা আমার হৃদয়েই প্রকাশিতা—সারথিরূপে হৃদয়-রথেই অধিষ্ঠিতা। "হৃদি চৈতন্যে তিষ্ঠতি"—হৃদয়রূপ ক্ষেত্রই মায়ের লীলাভূমি। হৃদয়-রথে সারথিরূপে প্রতিষ্ঠিতা আছেন বলিয়াই, জীবপ্রবাহ মুক্তির পথে অগ্রসর হইতেছে। মূর্ত্তি-মতীরূপে হৃদয়ে বিরাজিতা হন বলিয়াই জড়ভাবাপন্ন জীব নিরাকার চৈতন্যের সন্ধান পায়।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি বা ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ মরুৎ, ব্যোম আদি স্থূল ভাবে জীব মুগ্ধ থাকে বলিয়াই, জননী আমার সগুণা, সাকারা হইয়া—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময়ী হইয়া, ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোমরচিত স্থূল আকার

* 'মা আমার কাল কেন?' পুস্তিকায় এ তত্ত্ব বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

পরিগ্রহণ করিয়া, নিরাকারা জননী আমার সাকারা হইয়া—সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিতা মা আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়বিশিষ্টা হইয়া—ভাবশূন্যা মা আমার ভাবময়ী হইয়া — অরূপা জননী আমার সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী হইয়া —চিদ্‌ঘন ব্রহ্মময়ী আমার আনন্দময়ী হইয়া—এলায়িত কেশজাল পৃষ্ঠে দুলাইয়া—কটিতটে পীত বসনাঞ্চল সংবদ্ধ করিয়া—ভাবরূপ অশ্বের বল্গা করে লইয়া —রক্ত চরণে চরণ দিয়া—জ্যোতিতে চারি দিক্ আলোকিত করিয়া—মধুর হাসিতে প্রাণ মাতাইয়া, তোমার হৃদয়রথে সারথিবেশে ঐ দেখ, মা আমার দাঁড়াইয়া। এমন মোহিনী-বেশে মা যদি না দাঁড়াইতেন, এত রূপে রূপময়ী হইয়া, মা যদি না প্রাণকে আলোকিত করিতেন, প্রাণের ভিতর আলোকমালা জ্বালিয়া না দিতেন, তাহা হইলে কি আমরা সগুণত্ব ছাড়িয়া নিগুর্ণত্বে পৌঁছিতে পারিতাম ? আনন্দের প্রস্রবণ চারি দিকে খুলিয়া দিয়া, আনন্দময়ী মা আমার আনন্দময়ী বেশে, যদি এমনই করিয়া হৃদয়ে না দাঁড়াইতেন, তবে কি দুঃখ-ক্লেশ-সন্তাপ-জর্জ্জরিত আমরা কখনও আনন্দের সন্ধান পাইতাম ? এত ভাবে ভাবময়ী হইয়া, মা যদি না বুকের ভিতর এমনই করিয়া দাঁড়াইতেন, তবে কি জীবভাবমুগ্ধ আমরা কখনও শিবত্ব লাভের আশা করিতে পারিতাম ? এত দয়ায় দয়াময়ী হইয়া মা যদি সারথিবেশে এমনই করিয়া আমার ভাবরূপ অশ্বের বল্গা গ্রহণ না করিতেন, তবে কি আমরা সংসারের এ কর্কশ, অসমতল, দুর্গম পথে রথ চালনা করিয়া, মঙ্গলপুরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতাম ?

তাই মা আমার দাঁড়াইয়া! নিরাকারের সন্ধান জানি না বলিয়াই, মা আমার সাকারা হইয়া বুকের ভিতর দাঁড়ান! নিগুর্ণ অবস্থার সন্ধান জানি না বলিয়াই, মা আমার সর্ব্বগুণে গুণময়ী হইয়া বুকের ভিতর দাঁড়ান। ভাবশূন্য অবস্থার কল্পনা করিতে পারি না বলিয়াই, মা আমার ভাবময়ী—আনন্দময়ী হইয়া দাঁড়ান। ইন্দ্রিয়পরিশূন্য অবস্থার আস্বাদে বঞ্চিত বলিয়াই, মা আমার ইন্দ্রিয়বিশিষ্টা হইয়া বুকের ভিতর দাঁড়ান। অনন্তবিস্তৃত চৈতন্য-সমুদ্রের ধারণা করিতে পারি না বলিয়াই, মা আমার ক্ষুদ্র চৈতন্যময়ী হইয়া বুকের ভিতর দাঁড়ান। হিরন্ময়-মন্দিরের সন্ধান জানি না বলিয়াই, মা আমার সারথিবেশে হৃদয়-রথে আরূঢ়া হইয়া, তাঁহার আনন্দ-মন্দিরের দিকে আমাদিগকে রথ চালাইয়া লইয়া যান। তোমার বলিয়া যাহা আছে—যাহা লইয়া তুমি তোমার তুমিত্ব কল্পনা কর—যাহা লইয়া তুমি তোমার তুমিত্বের গণ্ডী

রচনা কর—যাহা লইয়া তুমি অহর্নিশ ভুলিয়া থাক, সেইগুলিই লইবার জন্য, তাহাতেই পরিতুষ্টা হইবার জন্য - তাহারই ভিতর তোমাকে পথ দেখাইবার জন্য, তোমারই ভাবানুসারে মা আমার এমনই করিয়া তোমারই হৃদয়ে বিরাজিতা। তোমায় কিছুই করিতে হইবে না, কিছুই ভাবিতে হইবে না; হৃদয়-রথের ভাবাশ্ব-সকলের বল্গা করে গ্রহণ করিয়া, ঐ দেখ—মা দাঁড়াইয়া! তুমি শুধু দেখ! দেখিয়া কৃতার্থ হও। আশ্বাসে প্রাণ পূরিয়া যাক্, অভয়ে প্রাণ নাচিয়া উঠুক, আনন্দে দিগন্ত ভরিয়া যাক্। চরণে পড়িয়া লুণ্ঠিত-শিরে, অথবা মাতৃমুখ চাহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে, মুগ্ধনেত্রে, গদগদ কণ্ঠে বল—"কিছু জানি না মা—কিছু জানি না, তুমি আমায় লইয়া চল!" অথবা বল—"দুর্ব্বল, পতিত, পীড়িত, শক্তিহীন আমি মা—তুমি আমায় লইয়া চল।" অথবা বল,—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

সাধক! নিরাকার নিরাকার করিয়া ব্যস্ত হইও না। নিরাকার অতি দূরের কথা, আগে সাকারে মাকে দেখ; তুমি স্থূলে আছ—আগে স্থূলে মাকে প্রত্যক্ষ কর। ইন্দ্রিয়ভাবমগ্ন তুমি, আগে ইন্দ্রিয়বিশিষ্টা মাতৃমূর্ত্তি দর্শনে কৃত-কৃতার্থ হও, তারপর নিরাকারের সন্ধান পাইবে। আগে তোমার ভাবরূপ খড়-মাটি যেমন আছে, তাহাতে মাতৃমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠুক, ইন্দ্রিয় উপচারে পূজা করিয়া প্রসাদ লাভ কর, তারপর ইন্দ্রিয়াতীতা জননীকে বুঝিতে পারিবে। আগে মাকে রক্ত-মাংস-জ্যোতি-ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণময়ী তোমার একার মা বলিয়া প্রত্যক্ষ কর, তারপর তাঁহাকে বিশ্বজননীরূপে রক্ত-মাংস-জ্যোতি-ইন্দ্রিয়-মনঃপ্রাণময়ী বিরাট্ জীব-প্রবাহের জননীরূপে দেখিতে পাইবে; তারপর নিরাকার অবস্থার উপলব্ধি হইবে। আগে তোমার হৃদয়-রথের সারথিরূপে মাকে দেখ। তারপর মায়ের বিশ্বরূপ দেখিয়া চরিতার্থ হইবে; তারপর নিরাকারের আভাস পাইবে।—নিরাকার কথার কথা নহে।

বস্তুতঃ মায়ের এই সারথিরূপ দর্শন না করিলে, মাকে সারথিরূপে দেখিতে না পাইলে, এ দুরন্ত সংগ্রাম জয় করা যায় না। এ তত্ত্ব অতি অপূর্ব্ব! মায়ের সারথ্যরূপ অপূর্ব্ব ব্যাপার বুঝিতে পারিলে আর বুঝিবার কিছু বাকি থাকে না।

আমাদের প্রকৃতি বা আমাদিগের প্রাণের আবেগ যখন যে দিকে ধাবিত হইতে চাহে, করুণাময়ী মা আমায় তখনই সেই দিকে লইয়া যাইতেছেন। সুপথে, কুপথে—প্রাণের আগ্রহ যখন যে দিকে ছুটিতেছে, সেই দিকেই মা আমাদিগকে চালনা করিতেছেন। কাম, ক্রোধ, লোভের দিকেই হউক বা দয়া, ভক্তি, স্নেহের দিকেই হউক—ভোগের দিকেই হউক বা বিরতির দিকেই হউক,—নরকের দিকেই হউক বা স্বর্গের দিকেই হউক,—স্ত্রী পুত্র, সংসারের দিকেই হউক বা জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির দিকেই হউক ;—দস্যুতা, স্বার্থপরতা, লম্পটতার দিকেই হউক বা সাধুতা নিঃস্বার্থতা সচ্চরিত্রতার দিকেই হউক—যখন মায়ের কাছে যে আব্দার করিতেছি, যে দিকে যাইবার জন্য—যাহা পাইবার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে, "কু" "সু" বিচার না করিয়া—বুঝি ভাল মন্দ বিচারের অপেক্ষা না রাখিয়া, স্নেহমুগ্ধা মায়ের মত, আজ্ঞাবহ সারথির মত, আমাদিগের ইচ্ছানুযায়ী আমাদিগকে সেই দিকেই লইয়া যাইতেছেন—তাহাই প্রদান করিতেছেন। প্রবলতর ইচ্ছার সহিত যখন যাহা মায়ের কাছে চাহি, তখনই তিনি তাহাই দিয়া আমার প্রাণে স্বাধীনতার আভাস ফুটাইয়া দিতেছেন। দস্যুতা, সাধুতা, অর্থ, ধন, যখন যাহার সাধনা করিতেছি, তখনই তদ্রূপ সিদ্ধি প্রদান করিয়া, আমার প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইয়া দিতেছেন। জীবভাবাপন্ন আমরা মনে করিতেছি, বুঝি আমরা স্বাধীন—বুঝি আমাদিগের ইচ্ছা স্বাধীন। স্বাধীন ইচ্ছায় যখন যে দিকে যাইতে চাহিতেছি—বুঝি তখন সেই দিকেই যাইতেছি। তাই আমরা বলিয়া থাকি, "যাদৃশী সাধনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

কিন্তু আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সারথিরূপে তিনি একদিকে যেমন আমার স্নেহময়ী জননী, তেমনি আবার বিশাল ভুবন ব্যাপিয়া বিরাট্ রাজরাজেশ্বরী জননীরূপে তিনি অধিষ্ঠিতা। একদিকে যেমন তিনি আমার সকল আব্দার মিটাইতেছেন, অন্য দিকে দেখিলে বুঝা যায়—সেগুলি বস্তুতঃ আমার আব্দার নহে—মায়েরই মঙ্গলেচ্ছা। এক দিকে পূর্ণ জ্ঞানময়ী বিরাট্ রাজরাজেশ্বরীরূপে মঙ্গলাজ্ঞা চালনা করিতেছেন ; অন্য দিকে সেগুলি যেন আমারই ইচ্ছা—এমনই ভাবে প্রতিফলিত করিয়া, স্নেহমুগ্ধা জননীর মত মিটাইয়া দিতেছেন। এইরূপে স্বাধীন সম্ভোগে আমাদিগকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়া, তাঁর পূর্ণ স্বাধীনতার নিত্য সনাতন ক্ষেত্রের দিকে আমাদিগকে লইয়া যাইতেছেন। একদিকে মা শুধু আমার সারথি, অন্য দিকে সেই মা আমার বিরাট্ রাজরাজেশ্বরী। এক দিকে মা

শুধু আমার হৃদয়েশ্বরী, অন্য দিকে সেই মা আমার ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী। এক দিকে মায়ের আমার আমিই কেবল একমাত্র আদরের পুতলী, অন্য দিকে অনন্তকোটি বিশ্ববস্তু সেই মায়ের আমার চরণ-ভিখারী। এক দিকে মা কেবল আমাকে লইয়া ব্যস্ত, অন্য দিকে কোটি কোটি হরিহরব্রহ্মাদি সেই মায়ের পদসেবার জন্য লালায়িত। এক দিকে মা আমার ইচ্ছার ক্রীড়ণক, অন্য দিকে আব্রহ্ম-স্তম্ব সেই মায়েরই আমার ইচ্ছার ইঙ্গিতে চালিত, রচিত, কল্পিত। হায় জীব! ধন্য তুমি! ধন্য আমি! মাকে সারথিরূপে পাইয়া আমরা ধন্য! কে দেখিবে জীব? দেখ! মায়ের আমার সারথিরূপ দেখিয়া কৃতার্থ হও।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫

হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং, ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তং, ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মৌ।

ব্যবহারিক অর্থ।—হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, ধনঞ্জয় দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন।

যৌগিক অর্থ।—ভগবানের শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য। প্রণবই ভগবানের শঙ্খধ্বনি। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চ তত্ত্বের বা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থের ভিতর ওতঃপ্রোতভাবে এই শব্দ প্রবাহিত বলিয়া বা পঞ্চীকরণে উদ্ভূত সমস্ত পদার্থ এই শব্দ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া, ইহার নাম পাঞ্চজন্য। ভগবানের এই শঙ্খধ্বনি প্রত্যেক হৃদয়ে শ্রুত হয়। দেবদত্ত—অর্জ্জুনের বা মুখ্যপ্রাণযুক্ত জীবাত্মার শঙ্খ। দেবতা বা গুরুদত্ত বীজকে দেবদত্ত শঙ্খ বলে। গুরুমুখ হইতে মন্ত্র লইয়া, সেই মন্ত্র হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। সেই মন্ত্র জীবকে নিজের নাদ করিয়া তুলিতে হয়। সেই মন্ত্র হৃদয়ের ভিতর অহর্নিশ যাহাতে ধ্বনিত হয়, তদ্রূপ সাধনা করিতে হয়। রীতিমত মন্ত্র সাধনা করিতে পারিলে, ঐ মন্ত্র হৃদয়ের ভিতর শ্রুত হয়। ভগবানের পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি বা প্রণবের সহিত ঐ দেবদত্ত-শঙ্খ বা গুরুপ্রদত্ত বীজ মিলাইয়া শুনিতে হয়। ঐ উভয় শব্দ মিলিত হইয়া, শব্দ-তরঙ্গ কণ্ঠে আসিয়া প্রতিঘাত করিলে, কণ্ঠদেশে উহা পুণ্ড্র বা শ্বেত-পদ্মাকারে ফুটিয়া উঠে এবং এই জন্য উহাকে ভীমের পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বলে। সাধক যখন জপ করিতে বসে, তখন প্রথমতঃ তাহাকে পাঞ্চজন্য-শঙ্খ বা প্রণব-ধ্বনি শুনিতে হয়। তার পর সেই প্রণব-ধ্বনির তরঙ্গমালা সমগ্র দেহ ব্যাপিয়া

প্রবাহিত হইতেছে, এরূপ শুনিতে পাইলে, তাহার সহিত নিজের বীজরূপ শঙ্খ-ধ্বনি সমতানে মিলাইয়া দিতে হয়। প্রণবের শব্দ-তরঙ্গে ঐরূপ ভাবে বীজ প্রক্ষিপ্ত করিলে, একটী অপূর্ব্ব শুভ্র তরঙ্গ উছলিয়া উঠিয়া, কণ্ঠে আসিয়া, কণ্ঠস্থ প্রাণশক্তির দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া, শ্বেতপদ্মবৎ একটী আবর্ত্তনে উহা আবর্ত্তিত হয়। এবং উহা বাহিরে আসিতে না দিলে, অর্থাৎ কণ্ঠস্থ বায়ুর সহিত মিলিয়া মুখে উচ্চারিত হইয়া না পড়িলে, বহুক্ষণ ঐরূপ প্রস্ফুটিত পদ্মের আকারে স্থির থাকে। তখনই সাধকের প্রকৃত জপ হয় এবং সমস্ত চক্রে চক্রে সেই বীজ নানা প্রসূন আকারে ফুটিয়া উঠে। সেই ফুলদল মায়ের চরণে ঢালিয়া দিতে হয়, সেই ফুলদলে মাতৃপূজা করিয়া মাকে সাজাইতে হয়, সেই ফুলদলে ফুলময়ী করিয়া, প্রফুল্লা জননীকে উৎফুল্লা করিতে হয়। আলোক-বাঁজীতে আমরা যেমন নানা প্রকারের ফুল ফুটিয়া উঠিতে ও মিলাইয়া যাইতে দেখি, প্রকৃত জপ করিতে পারিলে প্রত্যেক বীজ প্রক্ষেপে বা প্রতিবার বীজ জপে আমাদিগের প্রাণময় কোষে বা প্রাণময় দেহটীতে ঐরূপে ফুলদল ফুটিয়া উঠে। মাতৃচরণে বীজ অর্পণমাত্রে ফুলে দেহ ভরিয়া যায় এবং জপের প্রবলতা অনুসারে ইহা স্থায়িত্ব লাভ করে।

পুস্তকে আর অধিক প্রকাশ করা চলে না, তবে জপ-তত্ত্ব বলিবার সময়ে আরও একটু রহস্য বলিবার ইচ্ছা রহিল। যাহা হউক, ইহাই পাণ্ডবপক্ষের শঙ্খসকলের ধ্বনি।

> অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
> নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥১৬
> কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
> ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥১৭
> দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
> সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮

হে পৃথিবীপতে! কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং (দধ্মৌ), নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ (দধ্মতুঃ), পরমেষ্বাসঃ (মহাধনুর্দ্ধরঃ) কাশ্যশ্চ, মহারথঃ শিখণ্ডী চ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, বিরাটশ্চ, অপরাজিতঃ সাত্যকিশ্চ দ্রুপদঃ

দ্রৌপদেয়াশ্চ, মহাবাহুঃ সৌভদ্রশ্চ—সর্ব্বশঃ (সর্ব্বে এব) পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ।

ব্যবহারিক অর্থ।—কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ বাজাইলেন, নকুল ও সহদেব সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খদ্বয় বাজাইলেন; এবং মহাধনুর্দ্ধর কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট্, সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীপুত্রগণ এবং অভিমন্যু, ইঁহারা সকলে পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন।

যৌগিক অর্থ।—এইরূপে শঙ্খ বাজাইতে হয়। মন সাধককে বিপথে চালিত করিতে উদ্যত হইলে, মনের বৃত্তি বাজিয়া উঠিলে, সে শব্দকে প্রতিহত করিতে, মনের সে বৃত্তিকে নির্জীব করিতে, এইরূপে শঙ্খধ্বনি করিতে হয়, এইরূপে ধ্বনির ফুলে সমগ্র দেহ সাজাইয়া তুলিতে হয়। যখনই প্রাণকে বিপথে চালিত করিবার জন্য মন উদ্যত হয়, এইরূপে সাধককে মনের বিপক্ষে সিংহনাদ ছাড়িতে হয়—মনঃপক্ষের হৃদয়ে ব্যথা দিয়া, বিজয়-ভেরী বাজাইতে হয়।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্॥১৯

নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব ব্যনুনাদয়ন্ তুমুলঃ সঃ ঘোষঃ (শঙ্খনাদঃ) ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।

ব্যবহারিক অর্থ।—আকাশ এবং পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিয়া, সেই তুমুল ধ্বনি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল।

যৌগিক অর্থ।—তাহা হইলে আমরা এই বুঝিলাম যে, প্রথমে প্রণবধ্বনি বা ভগবানের পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ দেহাভ্যন্তরে শুনিয়া, সেই শব্দে—সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত-ঝঙ্কারে দেহের চারি দিক্ প্লাবিত হইতেছে, এইরূপ উপলব্ধি করিয়া লইয়া, তার পর সাধকের নিজের নাদ বা গুরুপ্রদত্ত বীজ, সেই শব্দসমুদ্রে প্রক্ষেপ করিতে হয়। ঐ বীজ বা জীবের নিজস্ব শব্দ ঐ বিরাট্ শব্দে মিশ্রিত হইবামাত্র উহা হইতে একটী আবর্ত্তন উঠিয়া, শ্বেতপদ্মাকারে কণ্ঠদেশ আলোকিত করে এবং তখন সঙ্গে সঙ্গে দেহের প্রত্যেক চক্রে চক্রে শব্দ-কুসুমসকল ফুটিয়া উঠিয়া দেহকে ফুলময় করিয়া তুলে। তখন মনের বৃত্তিরাজি ব্যথিত ও সঙ্কুচিত হয়।

কিন্তু জীবের এই নিজস্ব বীজ পাওয়া একটু দুর্ল্লভ। ভগবানের জন্য একান্ত আগ্রহ প্রাণের ভিতর বন্যাতরঙ্গ সৃজন করিলে, সদ্‌গুরু-প্রাপ্তি হয় এবং নিজস্ব

বীজের সন্ধান তখনই পাওয়া যায়। সদ্গুরু অর্থে—ভগবান্। ভগবান্ই সদ্‌-গুরুরূপে হৃদয়াভ্যন্তরে শিবস্বরূপে প্রকটিত হইয়া দীক্ষা প্রদান করেন। বস্তুতঃ দীক্ষা প্রাণের ভিতর হয়। শিবরূপে হৃদয়াভ্যন্তরে বা সহস্রারে প্রকটিত হইয়া জীবকে যখন মা আমার দীক্ষিত করেন, তখনই বুঝিতে হয়—সাধকের প্রকৃত দীক্ষালাভ হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে কাহারও কাহারও ভাগ্যে মনুষ্যরূপে সদ্গুরুকে লাভ হয়; কিন্তু এই মনুষ্যরূপী সদ্গুরু ইচ্ছা করিলে, তাঁহাকে শিষ্যের কর্ণমূলে দীক্ষা দিতে হয় না। মনুষ্যরূপী সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা লাভার্থে সমাহিতচিত্ত হইয়া উপবিষ্ট হইলে, এবং সেই পুরুষ যথার্থ ইচ্ছুক হইলে, তিনি তাহার প্রাণের ভিতর দীক্ষা প্রদান করেন। নিজ শক্তি দ্বারা শিষ্যের প্রাণশক্তিকে মুগ্ধ করিয়া বা সুপ্তবৎ করিয়া, সেই প্রাণশক্তির পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন এবং সেই প্রাণশক্তি তখনই শান্ত, নিদ্রিত এবং নিস্তরঙ্গ ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। তখন বীজ বা সাধকের নিজ শব্দ আপন হইতে তাহার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। সাধক নিজের প্রাণের ভিতর বীজের সন্ধান পাইয়া কৃতকৃতার্থ হয়।

কিন্তু অনেকেরই ভাগ্যে এতটা ঘটিয়া উঠে না। সৎশিষ্য না হইতে পারিলে এতটা প্রত্যাশা করা যায় না। উহা অপেক্ষা নিম্নস্তরের সাধক প্রাণের ভিতর ঐরূপ বীজের স্ফুরণ, দীক্ষিত হইবার সময় দেখিতে পায় না সত্য, কিন্তু তার পর সেই সদ্গুরু তাহার হৃদয়ে যে বীজ দর্শন করিয়াছেন, উহা কর্ণে বলিয়া দিবামাত্র তখন যেন অনেক দিনের পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, শিষ্যের এমনই মনে হয়। ঘরে নিজেরই বাক্সের মধ্যে রত্ন ছিল, সদ্গুরু যেন সেইটী খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিলেন, এইরূপ প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ প্রথম স্তরের শিষ্যদিগের আর কর্ণমূলে কিছু বলিতে হয় না। প্রাণের ভিতরই উহা গুরুকৃপায় দেখিতে পাইয়া শিষ্য কৃতকৃতার্থ হয় এবং দ্বিতীয় স্তরের সাধকদিগের কর্ণমূলে বলিয়া দিবার পর উহা প্রত্যক্ষগোচর হয়। কিন্তু শিষ্য যদি প্রাণের ভিতর ঐ বীজ প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার সদ্গুরু লাভ হইল না।

যাহা হউক, প্রথম স্তরের শিষ্য না পাইলে, তাহাকে প্রকৃত দীক্ষা দেওয়া উচিত নহে। তবে যাহা দ্বারা সৎশিষ্য হওয়া যায়, তদ্রূপ পন্থা তাহাকে দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহা প্রকৃত দীক্ষা নহে। সাধক মনুষ্যরূপী সদ্গুরুর নিকট ঐরূপে দীক্ষিত হইবার পর ভাগ্যক্রমে জগদ্গুরু হৃদয়ে

আবির্ভূত হইয়া, ঐ বীজে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া দিলে, তখন দীক্ষা পরিসমাপ্ত হয়।

বস্তুতঃ সৎশিষ্য হইলে গুরুর অভাব থাকে না। জগদ্ব্যাপী শিবস্বরূপ সদ্‌গুরু ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। সৎশিষ্য হইলে প্রাণের ভিতর তিনিই দীক্ষা প্রদান করেন; অথবা কোন শিবতুল্য সিদ্ধ পুরুষের ভিতর দিয়া, তাহাকে তাহার বীজ দেখাইয়া দেন। যথার্থ দীক্ষা লাভ হইলে আর জীবের পতনের ভয় থাকে না। জীবনের সার্থকতা পদে পদে উপলব্ধ হয়। দীক্ষা লাভ হইলে তখন শুধু সম্ভোগ। পরিশ্রম থাকে না। যত পরিশ্রম, দীক্ষা লাভের পূর্ব্বে। দীক্ষিত হইবার জন্যই খাটিতে হয়। দীক্ষিত হইলে সে পরিশ্রমের চরিতার্থতা বা সম্ভোগ হয়। যেমন পূজার আয়োজন যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ পরিশ্রম। পূজার সময় শুধু চরিতার্থতা, শুধু দেবসান্নিধ্যের অপূর্ব্ব সম্ভোগ—ইহাও তদ্রূপ। বীজরূপ পুষ্প যত দিন আহরণ না হয়, তত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহার সন্ধান করিতে হয়। পুষ্প আহৃত হইলে, তখন আর পরিশ্রম নহে—শুধু মাতৃপূজা—শুধু সম্ভোগ—শুধু আনন্দের পূর্ণ পরিতৃপ্তি।

কিন্তু ঐরূপে দীক্ষিত না হইলে, দুর্ভাগ্যবশতঃ শিবস্বরূপ সদ্‌গুরুলাভ না হইলে, অথবা মনুষ্যরূপী সদ্‌গুরুর কৃপা না পাইলে, তত দিন কি আমাদিগের সাধনা হইবে না? তত দিন সারথিরূপিণী মায়ের আমার পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদের সঙ্গে কোন্ শব্দ মিলাইব? কোন্ শঙ্খধ্বনি করিয়া সংগ্রাম-ক্ষেত্রে মনঃপক্ষের হৃদয় বিদীর্ণ করিব? হৃদয়াভ্যন্তরে প্রণবের অপূর্ব্ব ঝঙ্কার শুনিয়া, আমার প্রাণ পুলকিত হইয়া কোন্ শব্দ অভিব্যক্ত করিবে? কোন্ শব্দ-ঝঙ্কারে সে অনাদি নাদকে তরঙ্গিত করিয়া তুলিবে? মাতৃ-শঙ্খের মধুর নির্ঘোষে কোন্ শব্দ মিলাইয়া, কণ্ঠে শ্বেতপদ্ম ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে?

সাধক এই প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ সদ্‌গুরুর দ্বারা দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে যে কোন শব্দ গ্রহণ করিতে পারেন। তবে প্রণব অথবা মায়ের যে কোন একটি নাম লওয়াই প্রশস্ত। প্রণবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধাকর। এইরূপে প্রণব বা মাতৃনাম প্রথম অবস্থায় নিজের দেবদত্ত শঙ্খরূপে গ্রহণ করিয়া, হৃদয়স্থ অনাদি ঝঙ্কারের সহিত মিলাইয়া দিয়া, কণ্ঠে পৌণ্ড্র নামক শ্বেতপদ্ম স্ফুরিত করা চলে। তাহাতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। কৃপাময়ী মা আমার সারথিরূপে হৃদয়ে থাকিতে আমাদিগের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। কিছু না পার, প্রাণের ভিতর

"মা" "মা" ধ্বনি ফুটাইয়া তুল—প্রাণের ভিতর "মা" "মা" করিয়া ডাকিতে শিখ, তোমার সকল সাধ মিটিবে।

সাধক স্মরণ রাখিও, কণ্ঠস্থ ঐ শ্বেতপদ্ম—বাগ্দেবীর চির-প্রিয় আসন। কণ্ঠে ঐ শ্বেতপদ্ম থাকে বলিয়াই, আমরা শব্দ উচ্চারণ করিতে সক্ষম হই। কণ্ঠের ঐ শ্বেতপদ্মের সাহায্যেই আমাদের প্রাণের ভিতর ভাব শব্দাকারে পরিস্ফুট হয়। আমরা পরস্পর হৃদয়ের ভাবের আদান প্রদান করিতে পারি।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥ ২০

হে মহীপতে! অথ শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে (সতি) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুনঃ) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধনুঃ উদ্যম্য (উত্তোল্য) তদা হৃষীকেশং ইদং বাক্যং আহ।

ব্যবহারিক অর্থ।—রাজন্! শস্ত্র-সম্পাত-প্রারম্ভে কপিধ্বজ অর্জ্জুন কৌরবপক্ষকে যুদ্ধোদ্যোগী দেখিয়া, ধনু উত্তোলনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ কহিলেন।

যৌগিক অর্থ।—সাধককে কিছু দিন এইরূপ নাদ শ্রবণে ও জপে অভ্যস্ত হইবার পর, নিজের কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া লইতে হয়। ঐরূপ অপূর্ব্ব নাদ শ্রবণ করিয়া এবং ঐরূপ জপে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিয়া, তখন সাধক নিজের কি কর্ত্তব্য, কি করিলে ওরূপ জপ ও ঈশ্বর-সাধনা আর প্রতিহত হইবে না, কি করিলে চিরদিন ভগবৎসাধনারূপ অপূর্ব্ব পরিতৃপ্তি অহর্নিশ উপভোগ করিতে পাইব, এইরূপ প্রশ্ন তাহার প্রাণে ফুটিয়া উঠে। ভগবৎসাধনা করিতে বসিলে সন্দেহরাশির আক্রমণ হইতে চিত্তের শান্তি রক্ষার জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে হয়, সাধকের প্রাণ তখন তাহা জানিতে চাহে। কাহার সহিত আগে যুদ্ধ করিব, কাহাকে কাহাকে দমন করিতে হইবে, কিরূপ ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিব, ইত্যাদিরূপ সমালোচনা তাহার প্রাণে স্ফুরিত হইতে থাকে। বার বার সাধনা করিতে বসিলে, নানা চিত্তবৃত্তি সে সাধনায় বিঘ্ন প্রদান করে, সাধনা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে দেয় না, সাধনা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার অবসর দেয় না—এইরূপ বিঘ্নসকলের হাত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইব, কোন্ বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিলে, সাধনায় অহর্নিশ নিযুক্ত থাকিতে পারিব—এই প্রকারের সমালোচনা তাহার প্রাণে আসিতে থাকে।

এই অবস্থায় হৃদয়স্থিত সারথিরূপী ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। উত্তম-ধনু করে তুলিয়া লইয়া, ধীর, স্থির সংযত ভাবে হৃদয়স্থ মাতৃসম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে বলিতে হয়,—

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১

অচ্যুত, উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয়। উভয়োরপি সেনয়োঃ সন্নিহিতয়োর্ম্মধ্যে মদীয়ং রথং স্থাপয়েত্যর্জ্জুনেন সারথ্যে সর্ব্বেশ্বরো নিযুজ্যতে, কিং হি ভক্তানামশক্যং যদ্ভগবানপি তন্নিয়োগ অনুতিষ্ঠতি; যুক্তং হি ভগবতো ভক্তপারবশ্যং, অচ্যুত ইতি সম্বোধনতয়া ভগবতঃ স্বরূপং ন কদাচিদপি প্রচ্যুতিং প্রাপ্নোতি ইত্যুচ্যতে।

হে অচ্যুত! উভয় সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে আমার রথ একবার স্থাপন কর।

এই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে, নিজের জীবনের গতি স্থির করিয়া লইবার সময়ে —কি করিব, জগতে কি ভাবে বিচরণ করিব,—ব্রহ্মচর্য্য, সংসার, সন্ন্যাস, ইত্যাদি বহির্জীবনের অবস্থা-সকলের মধ্যে কোন্‌টি অবলম্বন করিব, ভগবৎসাধনের উন্নতি-কল্পে কোন্ পন্থা ধরিয়া থাকিব, এই সকলের ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া লইতে হইলে, আগে ভগবান্‌কে অচ্যুত নামে সম্বোধন করিতে হয়; অচ্যুত বলিয়া তাঁহাকে চিনিতে হয়, তাঁহার অচ্যুতাবস্থার ধ্যান করিতে হয়। আমি কুপথে যাই বা সুপথে যাই, পাপের দিকে কিম্বা পুণ্যের দিকে যাইতে চাহি, আঁধারের দিকে বা আলোকের দিকে যাইতে কামনা করি,—নরকের ক্রিমি-কীটসঙ্কুল ভীষণ যন্ত্রণাময় গহ্বরে, কিম্বা স্বর্গের পারিজাত-গন্ধামোদিত ভোগক্ষেত্রে, যে দিকে যাইতে আমি কামনা করি—আমার হৃদয়রথকে যে দিকে চালনা করিতে সঙ্কল্প করি, সারথিরূপে তিনি আমায় সেই দিকেই লইয়া যাইতেছেন; —নরকমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি দেখিয়া বা যন্ত্রণার ক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইতেছি বুঝিয়া, তিনি হৃদয়-রথ হইতে মুহূর্ত্তের জন্য নামিয়া ত যান না। স্বর্গে যাই—সেখানেও তিনি আমার সারথিরূপে অবস্থিত, নরকের দুর্গন্ধময় পুরীষ-ক্ষেত্রে—সেখানেও তিনি সেইরূপ ধীর, স্থির, সারথির মত আমার সংকল্পের জন্য অপেক্ষা করিয়া হৃদয়রথে অধিষ্ঠিত; "তুমি নরকের মধ্যে গিয়া পড়িতেছ—তুমি মোহাচ্ছন্ন হইয়া অধোদিকে ধাবিত হইতেছ—তুমি পাপপঙ্কে অনুলিপ্ত হইতেছ, আর আমি তোমার সারথ্য করিতে পারিব না; তুমি অপবিত্র হইয়াছ, আর তোমার এ অপবিত্র রথে অবস্থান করিতে পারিব না; তুমি জঘন্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ

নীচাশয় হইয়াছ,—আর আমি তোমার সারথ্য করিব না, তুমি অন্য সারথি অন্বেষণ কর" এ কথা ত তিনি জানেন না। "রে মদমত্ত জীব! তুই স্বইচ্ছায় শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতেছিস্, তোর রথচক্র প্রকৃতি গ্রাস করিতেছে, তোর হৃদয়-রথ গতিশূন্য অথবা নিম্নগতি প্রাপ্ত হইতেছে—আর আমি থাকিব না, আমি তোর রথ হইতে অবতরণ করিয়া চলিলাম"—এ কথা ত তিনি কখন বলেন না! অথবা "রে সৌভাগ্যবান্ জীব! তোকে তোর ইচ্ছানুযায়ী স্বর্গের সিংহাসনে পৌঁছাইয়া দিয়াছি—তুই এখন আত্মচরিতার্থতা সম্ভোগ করিতে থাক্, আমি এখন তোর রথ ছাড়িয়া চলিলাম"—এ কথা ত তাঁর মুখে কখন ফোটে না! ধীর, স্থির, আজ্ঞাবহ সারথির মত তিনি যে অহর্নিশ অশ্ববল্গা করে গ্রহণ করিয়া, আমার সঙ্কল্পের অপেক্ষা করিতেছেন; রথচ্যুত তিনি ত একবারও হন নাই—আমার হৃদয় রথ হইতে মুহূর্ত্তের জন্য ত অবতরণ করেন নাই! অশ্বচালনা করিয়া ক্লান্তির অনুশোচনা কখনও ত তিনি করেন নাই! রথ-চ্যুত হইতে কখনও ত তাঁহাকে শুনি নাই। সেই হাসিমাখা মুখ—সেই উল্লাসপূর্ণ বঙ্কিম ঠাম—সেই আনন্দাকুল সুন্দর বপু—সেই স্নেহভরা চক্ষু, তাহাতে কখনও ত বিষাদের ছায়া দেখি নাই! সেই ধীর, স্থির, আশ্বাসপূর্ণ আমার জন্য মুখাপেক্ষা, তাহাতে কখনও ত ভাববিচ্যুতি প্রত্যক্ষ করি নাই! হে অচ্যুত! হে অচ্যুত সারথি! তোমার এ ত সারথ্য নহে—এ যে প্রেম, তোমার এ ত আজ্ঞা পালন করা নহে—এ যে সখ্য! হে প্রেমময় সারথি! হে সখা! হে অচ্যুত সখা! আমি যেন তোমার অচ্যুত ভাব অনুভব করিয়া—তোমার এ চ্যুতিহীন সখ্যের উপলব্ধি করিয়া, অচ্যুতভাবে উর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারি। হে অচ্যুত! তোমার সারথ্যের যেমন চ্যুতি নাই, আমিও তেমনই তোমার অন্বেষণ হইতে যেন বিচ্যুত না হই। হে অচ্যুত! তুমি যেন চিরদিন এমনই অচ্যুতভাবে আমার হৃদয়-রথে অবস্থিত থাকিয়া, আমার রথ চালনা কর; হে অচ্যুত! আমার ভাববিচ্যুতি যেন কখনও না ঘটে।

এই ভাবে সারথিকে অচ্যুত বলিয়া চিনিতে হয়। অচ্যুতভাবে তিনি হৃদয়-রথে অবস্থান করিতেছেন, এই ভাব উপলব্ধি করিতে হয়—এই অচ্যুত-মন্ত্রের উপাসনা করিতে হয়, এবং এইরূপ অচ্যুতভাবে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে অচ্যুত বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া, তাঁহাকে বলিতে হয়,—

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।

একবার উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর ত।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিপক্ষের সৈন্যসঙ্ঘের মধ্যস্থলে অর্থাৎ অন্তর্ম্মুখী ও বহির্ম্মুখী শক্তিরূপ উভয় পক্ষ হইতে দূরে, অথচ উভয় দিক্‌ দেখা যায়, এমন স্থলে হৃদয়রথ লইয়া চল। উভয় দিকে রণোল্লাসমত্ত সৈন্যসমুদ্র সংঘর্ষণপ্রয়াসী হইয়া দণ্ডায়মান, পরস্পর রক্তপানে অগ্রসর ; এক দিকে প্রবৃত্তিপক্ষ আমায় রাজ্যচ্যুত, হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া—আমার আত্মপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, অন্য দিকে নিবৃত্তিপক্ষ আমায় আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রগামী করিতে কৃতসঙ্কল্প—এই বিপুল বাহিনীদ্বয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উভয় দিক্‌ পর্য্যবেক্ষণ করিব। একবার রথ মধ্যস্থলে লইয়া চল ত।

সাধককে সর্ব্বপ্রথম এইরূপে বাহিনীদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়া অভ্যাস করিতে হয়। প্রতিদিন প্রাতে একবার বৃত্তি-সকলের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বা রণ-সূচনার প্রারম্ভে স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়া, সমরপ্রয়াসী উভয় পক্ষ হইতে দূরে, অথচ উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে হৃদয়রথে অবস্থিত হইতে অভ্যাস করিতে হয়। আমাদের শাস্ত্রসম্মত প্রাতঃক্রিয়ার ইহাই উদ্দেশ্য। প্রতি প্রভাতে মাকে বলিতে হয়,—"মা! এ সমর-সূচনার পূর্ব্বে একবার আমায় উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে, তোমার সম্মুখে লইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইতে দাও। রণকোলাহল হইতে একটু অপসৃত হইয়া চল মা! একবার মাতাপুত্রে একটু নির্জ্জনে গিয়া দাঁড়াই, উভয় দিক্‌ দেখিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে একবার মধ্যস্থলে অবস্থিত হই।" এইরূপ প্রার্থনা হৃদয়ে লইয়া প্রত্যহ আত্মস্থৈর্য্যের অভ্যাস করিতে হয়। এরূপ স্থিরতার অভ্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া, যতদিন না সাধক বুঝিতে পারে, যাহা কিছু কার্য্য হইতেছে—যাহা কিছু আমি করি, সে সমস্তই মাতৃ-ইচ্ছা—সে সমস্তই মাতৃ-পূজা, তত দিন জীবনের গতির পথে যোগরূপ রণ-সূচনা বিশেষ ফলদায়ক হয় না। যতক্ষণ না ঐরূপ স্থিরভাবে হৃদয়স্থ হইয়া দাঁড়াইয়া বুঝিতে পারি বা বলিতে পারি,—"প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ। যৎ করোমি জগন্মাতস্তদস্তু তব পূজনম্‌॥" ততক্ষণ যোগরূপ সমরে নিযুক্ত হইতে নাই। যতক্ষণ না বুঝিতে পারি—মাগো! প্রভাত হইতে সন্ধ্যা অবধি, সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত যাহা কিছু করি, সে সমস্ত তোমারই ত পূজা মা—সে সমস্ত তোমারই ত সঙ্কল্প পূরণ—সে সমস্ত তোমারই ত মঙ্গল ইচ্ছা, ততক্ষণ ঐরূপ স্থিরভাবে মাকে সম্মুখে লইয়া, কুরুক্ষেত্রের মধ্যস্থলে হৃদয়-রথকে স্থাপিত করিবার জন্য মাকে অনুযোগ করিতে হয়।

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্‌।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্‌ রণসমুদ্যমে ॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

যাবৎ অহং যোদ্ধুকামান্‌ অবস্থিতান্‌ এতান্‌ নিরীক্ষে, অস্মিন্‌ রণসমুদ্যমে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্‌; যুদ্ধে (চ) দুর্ব্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ যে এতে অত্র সমাগতাঃ (তান্‌) যোৎস্যমানান্‌ অহং অবেক্ষে (তাবৎ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয় (ইতি ভাবঃ)।

এতান্‌ প্রতিপক্ষত্বেন প্রতিষ্ঠিতান্‌ ভীষ্মদ্রোণাদীনস্মাভিঃ সার্দ্ধং যোদ্ধুং অপেক্ষাবতো যাবৎ গত্বা নিরীক্ষিতুম্‌ অহং ক্ষমঃ স্যাং, তাবতি প্রদেশে রথস্য স্থাপনং কর্ত্তব্যম্‌ ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ প্রবৃত্তে যুদ্ধ-প্রারম্ভে বহবো রাজানোঽমুষ্যাং যুদ্ধভূমাবুপলভ্যন্তে, তেষাং মধ্যে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যং চ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য দুর্ব্বুদ্ধেঃ স্বরক্ষণোপায়ম্‌ অপ্রতিপদ্যমানস্য যুদ্ধায় সংরম্ভং কুর্ব্বতো যুদ্ধভূমৌ স্থিত্বা প্রিয়ং কুর্ত্তুম্‌ ইচ্ছবো রাজানঃ সমাগতা দৃশ্যন্তে, তেন তেষাম্‌ ঔপাধিকম্‌ অস্মৎ-প্রতিযোগিত্বম্‌ উপপন্নম্‌ ইত্যর্থঃ।

যতক্ষণ আমি যুদ্ধ কামনায় অবস্থিত ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করি এবং এই যুদ্ধে কাহার সহিত আমায় সংগ্রাম করিতে হইবে ও দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়াচরণ বাসনায় যাঁহারা এখানে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অবলোকন করি, (ততক্ষণ সৈন্যমধ্যে রথ স্থাপন কর) অর্থাৎ যত দিন না সাধক কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে পারে, কোন্‌ মার্গে, কোন্‌ ভাবে—কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞানাদি বিভিন্ন ভাবাপন্ন সাধনাপথের কোন্‌ পথটী অবলম্বন করিবে, যত দিন না স্থির হয়,—কোন্‌ কোন্‌ বৃত্তি বিপক্ষে এবং কোন্‌ কোন্‌ বৃত্তি স্বপক্ষে কার্য্য করিতেছে, যত দিন না উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করিতে পারে, তত দিন সাধককে এইরূপে স্থৈর্য্যলাভের অভ্যাস করিতে হয়।

এই স্থৈর্য্যাভ্যাস হইতেই সমস্ত আশা মিটিয়া যায়—এইরূপ স্থৈর্য্যাভ্যাস হইতেই বিশ্বরূপ দর্শন হয়—এইরূপ স্থৈর্য্যাভ্যাসের সূচনা হইতেই এ জগৎকে এক বিরাট্‌ পূজা-মন্দির বলিয়া চিনিতে পারা যায়। এইটি হইল আদিসাধনা বা সাধকের প্রথম অবলম্বনীয় পন্থা।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫

সঞ্জয় উবাচ। হে ভারত! গুড়াকেশেন বিজিতনিদ্রেন অর্জ্জুনেন এবম্ উক্তঃ হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ (সম্মুখে) রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা "হে পার্থ! এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ পশ্য" ইতি উবাচ।

সঞ্জয় কহিলেন,—বিজিতনিদ্র অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হৃষীকেশ এইরূপ অভিহিত হইয়া, ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ সমুদয় রাজন্যবর্গের সম্মুখে রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন,—হে পার্থ! সমবেত কুরুগণকে অবলোকন কর।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই স্থৈর্য্য অভ্যাসই সাধনার প্রথম পন্থা। এই সাধনা অভ্যাস করিতে করিতে জীব বিজিতনিদ্র হয় অর্থাৎ নিদ্রা বা তমঃ ধ্বংসীভূত হয়। যখন জীব গুড়াকেশ অর্থাৎ বিজিতনিদ্র হয়, তখনই হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করেন। গুড়াকেশ কথাটী দিবার ইহাই উদ্দেশ্য। নতুবা সাধারণ সমরক্ষেত্রস্থ বীরকে গুড়াকেশ বলিবার কারণ নাই; বীর, সাহসী ইত্যাদি কোন বিশেষণ দিলেই চলিত। যাহা হউক, যত দিন না সাধক এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে নিদ্রাকে জয় করিতে পারে, তত দিন হৃদয়-রথকে মধ্যস্থলে স্থিরভাবে দাঁড় করাইতে পারে না। সাধকমাত্রেই জানেন, সাধনা-পথে নিদ্রা প্রথম অন্তরায়। চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিতে উদ্যত হইলে বা চিত্তকে কেন্দ্রস্থ করিতে প্রয়াসী হইলে নিদ্রা আইসে। চিত্ত একটু স্থিরভাবাপন্ন হইবামাত্র তমসাচ্ছন্ন সাধারণ জীব ঘুমাইয়া পড়ে। সাধারণ মনুষ্যের তমোগুণ—চিত্ত শান্তভাবাপন্ন হইবামাত্র তাহাকে আক্রমণ করে। এই জন্য যত দিন না এই নিদ্রাকে জয় করা যায়, তত দিন হৃদয়-রথ ঠিক কেন্দ্রগত করা যায় না। বিজিতনিদ্র হইবার পর, তবে ভগবান্ আমাদিগকে কেন্দ্রস্থ হইতে দেন। বিজিতনিদ্র হইয়া রথ কেন্দ্রস্থ করিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে, তবে রথ কেন্দ্রস্থ হয়—তবে কেন্দ্রগত হইয়া জীব উভয় পক্ষ

বিশ্লেষণ করিতে, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে ও সারথি বা হৃষীকেশ দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইতে পারে।

হৃষীকেশ অর্থে ইন্দ্রিয় বা ভাব-ভবনের চালক। হৃষীকাণাং ইন্দ্রিয়াণাং ঈশঃ হৃষীকেশঃ। ইন্দ্রিয় ও ভাবভবন বস্তুতঃ একই কথা। প্রধান প্রধান ভাবের পূর্ণ পরিস্ফুট অবস্থার নাম ইন্দ্রিয়। ভাবসমষ্টি প্রধান প্রধান গুচ্ছে বিভক্ত হইয়া ও স্থূলতা লাভ করিয়া ইন্দ্রিয় নামে পরিচিত হইয়াছে। যোগীরা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় ছাড়া, ভাবকে ঘনীভূত করিয়া আরও ইন্দ্রিয় ফুটাইতে পারেন এবং তদ্দ্বারা অলৌকিক কার্য্যসকল সম্পন্ন করিতে পারেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বা বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এ সকল ভাবেরই কার্য্যকারী ক্ষেত্র বলিয়া ইন্দ্রিয় নামে পরিচিত। এই স্থলে ইন্দ্রিয়-কার্য্য সম্বন্ধে একটু বলি—প্রত্যেক কার্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, তাহার ভিতর তিনটী স্তর দেখিতে পাওয়া যায় ; এ তিনটী স্তরের নাম জ্ঞান, ইচ্ছা ও কর্ম্ম বা ভাব, ভক্তি ও কর্ম্ম। প্রথমে বস্তুসংক্রান্ত জ্ঞান বা ভাব প্রাণের ভিতর ফুটে ; সেই ভাব স্ফুটতর হইলে, সেই বস্তুর দিকে প্রাণ ছুটিতে থাকে বা তাহাতে আসক্তি বা ভক্তি জন্মে এবং আসক্তি বা ভক্তি আরও প্রবল হইলে, উহা কার্য্যে পরিণত হয়। বস্তুতঃ এ তিনটী একই শক্তির বিভিন্ন স্তর মাত্র। আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে দর্শনাদি ভাবসকল কার্য্যে পরিণত হয় বলিয়া, উহারা ইন্দ্রিয় নামে পরিচিত। "বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বঞ্ছ্রোত্রং"—তিনি কথা কহিয়া বাগিন্দ্রিয় হইলেন, দর্শন করিয়া চক্ষু হইলেন, শ্রবণ করিয়া শ্রোত্র হইলেন—শ্রুতিতে এইরূপে ভাব হইতে ইন্দ্রিয় উৎপত্তির কথা আছে। কর্ম্মযোগ বলিবার সময় এ কথা ভাল করিয়া বুঝাইব। এই ভাবরূপ অশ্ব-সকলকে ভগবান্ সারথিরূপে চালনা করেন বলিয়া তাঁহার নাম হৃষীকেশ। আর একটী কথা বলি—আমি পূর্ব্বে মায়ের সারথিরূপ বর্ণনার সময়ে এলায়িতকেশী বলিয়া তাঁহাকে বর্ণনা করিয়াছি। বস্তুতঃ তিনি এলায়িতকেশীরূপে হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং তাঁহার হৃষীকেশ নাম প্রাপ্তির ইহা অন্যতম কারণ। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ শশ্বৎ অংশুভিঃ কেশসংজ্ঞিতৈঃ।
বোধয়ৎ স্বাপয়ৈচ্চেব জগদুদ্ভিদ্যতে পৃথক্।
বোধনাৎ স্বাপনাচ্চৈব জগতো হর্ষণং ভবেৎ॥
অগ্নীসোমকৃতৈরেব কর্ম্মভিঃ পাণ্ডুনন্দন।
হৃষীকেশোঽহমীশানো বরদো লোকভাবনঃ॥"

চন্দ্র-সূর্য্য-কিরণসমূহ কেশ নামে অভিহিত। এই কিরণসমূহ দ্বারা জাগরণ ও নিদ্রা হইয়া থাকে। এইরূপ জাগরণ ও নিদ্রার দ্বারা জগতের হর্ষণ ও সমস্ত ক্রিয়া সংসাধিত হয় বলিয়া, আমি হৃষীকেশ নামে অভিহিত।

মা হৃদয়-রথে চন্দ্র-সূর্য্য-কিরণরূপ কেশজাল এলাইয়া দিয়া অবস্থিতা থাকেন বলিয়া, আমাদিগের প্রাণশক্তি গতি প্রাপ্ত হয় এবং সমস্ত কার্য্য সম্পাদন হয়। মায়ের চরণচুম্বী কেশরাশি চারি ধারে ছড়াইয়া পড়িয়া, আমাদিগকে কখনও জাগ্রত, কখনও সুপ্ত, কখনও কর্ম্মনিযুক্ত, এইরূপ ভাবে হৃষ্ট করেন বলিয়া, মায়ের অন্যতম নাম হৃষীকেশ।

যাহা হউক, স্থিরতার অভ্যাস করিয়া ক্রমশঃ বিজিতনিদ্র হইয়া, এবং ভগবান্ অচ্যুত ও হৃষীকেশ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলে পর, তখন ভগবান্ রথকে কেন্দ্রস্থ করেন এবং সমরোন্মুখী পক্ষদ্বয়কে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার অবসর দেন। অচ্যুত, হৃষীকেশ, গুড়াকেশ—এই তিনটী শব্দই এখানকার সাধনা-রহস্য। এই তিনটী বাক্য,—প্রথম স্তরের সাধক কিরূপে হইতে হয়, তাহাই শিক্ষা দিতেছে। প্রথমে ভগবান্‌কে অচ্যুতরূপে চিনিতে হয়, তিনি হৃদয়-রথ হইতে কখনও বিচ্যুত হন না, এই ভাবটী উপলব্ধি করিতে হয়; তার পর ভাব-সকলের বল্গা তাঁহার করে দিতে হয় বা তিনি ভাবরূপ অশ্ববল্গা করে গ্রহণ করিয়া আছেন—এই তত্ত্ব বুঝিতে হয়; এবং এইরূপ উপলব্ধি করিতে করিতে বিজিতনিদ্র হইয়া কেন্দ্রস্থ হইবার জন্য সঙ্কল্প করিলে, তিনি হৃদয়রথকে কেন্দ্রস্থ করিয়া দেন। প্রথম অধিকারীদিগের ইহাই সাধনা।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬

অথ পার্থঃ তত্র সেনয়োরুভয়োরপি স্থিতান্ পিতৄন্ পিতামহান্, আচার্য্যান্, মাতুলান্, ভ্রাতৄন্, পুত্রান্, পৌত্রান্, তথা সখীন্, শ্বশুরান্, সুহৃদশ্চৈব অপশ্যৎ।

তখন পার্থ সেইখানে উভয় সেনাদলে অবস্থিত পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর ও সুহৃদাদি সকলকে অবলোকন করিলেন।

চিত্ত ঐরূপ স্থির হইলে বা হৃদয়-রথকে কেন্দ্রস্থ করিতে পারিলে, তখন উভয় দিক্ সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন দেখিতে পাওয়া

যায়—এক দিকে ইন্দ্রিয় ও সংসারের মায়ারাশি, জীবন, জ্ঞান, যশঃ, ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদির মায়া সঙ্গে লইয়া, আমাদিগের প্রাণশক্তিকে গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য প্রয়াসী হইয়া দণ্ডায়মান; অন্য দিকে বিরাট্ চিন্তা, সত্যান্বেষণ, ঊর্দ্ধগতি ও তজ্জনিত দৃঢ়সঙ্কল্প প্রভৃতি প্রাণশক্তির সাহায্যকারী বৃত্তিসকল আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে সাহায্য করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া রণসাজে সজ্জিত। এক দিকে বহির্ম্মুখী শক্তি জগদ্ভোগে ভুলাইয়া রাখিতে প্রয়াসী, অন্য দিকে প্রাণ বা অন্তর্ম্মুখী শক্তি ভগবৎসম্ভোগের জন্য জগদ্‌ভোগকে পদদলিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

কিন্তু ইহারা কাহারা? কে আমার সাধনা-পথের সহায় এবং কেই বা সাধনার অন্তরায়? সাধক স্থির হইয়া দেখিলে বুঝিতে পারে—ইহারা সকলেই তাহার স্বজন। সকলের সহিত সাধক আত্মীয়তাসূত্রে সম্বদ্ধ। যাহাদিগকে শত্রু বলিয়া জানে—যাহাদিগের বধের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া সমরক্ষেত্রে সাধক অগ্রসর হয়, তাহারাও বস্তুতঃ আত্মীয়। কেন—তাহা বলিতেছি।

বস্তুতঃ জীব, ইন্দ্রিয়াদি ও তৎপক্ষীয় জ্ঞান, কর্ম্ম ইত্যাদির দ্বারা চিরদিন পালিত—একত্রে পুষ্ট হয়। ব্রহ্মচর্য্যের অঙ্কে জীব বর্দ্ধিত ও জ্ঞানসম্পন্ন হয়। নানা জন্ম ধরিয়া উহাদের ভিতর দিয়া বহুদর্শিতা লাভ করিয়া, তবে ত একদিন আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। যেমন জীব মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, যত দিন না বহির্জগতে বাসোপযোগী শক্তি লাভ করে, তত দিন মাতৃগর্ভেই বাস করে এবং পরে যত শক্তিমান্ হইতে থাকে, ততই ক্রমশঃ গর্ভ হইতে বহির্গমনের জন্য সচেষ্ট হয় এবং অবশেষে বহির্গত হয়; তদ্রূপ জীব এই সকল ইন্দ্রিয়াদির ভিতর থাকিয়া, তাহা হইতে আত্মশক্তি সংগ্রহ করিয়া, তারপর তাহাদিগের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। প্রথমাবস্থায় জীবের উন্নতি ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যেই হইয়া থাকে। শুধু সাহায্য নহে - ইন্দ্রিয়সকল লইয়াই প্রথমাবস্থায় আমাদের চৈতন্য উন্মেষিত হয়; অথবা ইন্দ্রিয়সকলই আমাদের চৈতন্য অভি-ব্যক্তির প্রথম বিকাশ। প্রথমাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়া, তবে জীব তাহার "আমিত্বে"র উপলব্ধি করে, ইন্দ্রিয়বিচ্ছিন্ন হইলে তমে আচ্ছন্ন, বিকাশহীন, অজ্ঞান অবস্থার মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ জীব প্রকৃতি-ক্ষেত্রে যখন প্রথম আত্মোপ-লব্ধির জন্য সচেষ্ট হয়, জীবের চৈতন্যের প্রথম স্ফুরণ প্রকৃতি-ক্ষেত্রকে যখন আলোকিত করে, প্রকৃতিক্ষেত্রে যখন চৈতন্য ফুটিয়া উঠে, তখন সে চৈতন্য প্রকৃতির

প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করে; এবং সেই ধারাবাহিক চেষ্টার ফলস্বরূপ যে যে দিকে সে চেষ্টার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই সেই দিকে এক একটী পথ প্রস্তুত করিয়া ফেলে; সেই পথগুলিকে আমরা ইন্দ্রিয় বলি। প্রকৃতি-ক্ষেত্রের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচ প্রকার গুণ, চৈতন্যকে পাঁচ প্রকারে স্ব স্ব ক্ষেত্রের উপর প্রতিফলিত করিবার জন্য যেন ভুলাইতে থাকে এবং চৈতন্যও তাহাদের উপর প্রতিফলিত হইবার জন্য প্রতিনিয়ত যত্নবান্ হয়। শ্রীমতী দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের আকুলতার মত চৈতন্যের এই আকুলতা উভয়মুখী। শ্রীমতীকে দেখিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আকুলতা কিম্বা শ্রীমতীকে দেখা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের আকুলতা—সে কথা বুঝি ঠিক বলা যায় না। প্রেমের সে গভীর তল অন্বেষণ করিবার এখন আমাদের সময় নহে, তবে ফলে এই দেখাদেখির জন্য—এই মিলনের মধুর আস্বাদনের জন্য—এই প্রকৃতিপুরুষের একত্বসাধনের মঙ্গলসূচনার জন্য—এই রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনের জন্য—গুপ্তভাবে যাতায়াতের ফলস্বরূপ রাধাকৃষ্ণের পদচিহ্নাঙ্কিত ইন্দ্রিয়নামীয় এই পথগুলি তৈয়ারি হইয়া যায়। তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের উপর পথিকের পদচিহ্নে যেমন একটী শীর্ণ পদরেখা অঙ্কিত হয়, তদ্রূপ এই প্রণয়িদ্বয়ের যাতায়াতে ইন্দ্রিয়রূপী এই পথগুলি তৈয়ারী হইয়া যায়। হায়! আমরা যদি ইন্দ্রিয়গুলিকে সাধারণের গমনাগমনের পথ নহে—প্রেমিকযুগলের গুপ্ত মিলনের গুপ্ত পথ বলিয়া চিনিতাম ও পথের ধারে অপেক্ষা করিয়া, নিশীথে বসিয়া থাকিয়া তাহাদের যাতায়াত লক্ষ্য করিতে পারিতাম।

যাহা হউক, এইরূপে ইন্দ্রিয়সকল ফুটিয়া উঠে, এবং তাহাদের সাহায্যে জীব নিজের অস্তিত্ব বলিয়া একটা জিনিষ উপলব্ধি করে। এইরূপে প্রকৃতি-ক্ষেত্রে জীবের আমিত্ব সঞ্জাত হয়। যত দিন না জীবের এই "আমিত্ব" পূর্ণভাবে স্ফুটিত হয়—যত দিন না যথার্থ "আমিত্ব", বস্তুতঃ "আমি কে" এ তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়, তত দিন শুধু ওই ইন্দ্রিয়াদির উপরেই "আমিত্ব" উপলব্ধি চলিতে থাকে। প্রথমাবস্থায় এই যথার্থ "আমিত্ব" অতি ক্ষীণ, কোমল, বায়ুবৎ তরল আকারে সঞ্জাত হয়; এবং উহা সমগ্র জগৎময় বা প্রকৃতি-ক্ষেত্রে ছড়াইয়া থাকে। দিন দিন যত আমাদের এই "আমিত্ব" পূর্ণত্ব লাভ করিতে থাকে, ততই আমরা বহির্বস্তু ছাড়িয়া আমার নিজের ভিতর আমিত্বের অনুভব করিতে থাকি। পশুর "আমিত্ব" মনুষ্যাপেক্ষা অনেক কম বলিয়া, পশুরা সমগ্র জগৎটাই তাদের নিজস্ব বলিয়া মনে

করে। এটা অন্যের, এটা অপরের জন্য, এটা আমার নহে, এরূপ জ্ঞান পশুর নাই। মনুষ্যজীবনে জীবের এই "আমিত্ব" স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া, এই আমিত্ব দৃঢ়, কেন্দ্রমুখী ও ঘনীভূত হইয়াছে বলিয়া, মনুষ্য এটা আমার, এটা আমার নহে, এরূপ বিচার করিতে সমর্থ হয়। মানুষ সমগ্র জগৎটাকে সাধারণতঃ নিজের বলিয়া দেখে না; যত উন্নত অবস্থায় আরোহণ করে, মনুষ্য বহিঃক্ষেত্রকে তত সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর করিয়া আনে; এমন কি, তখন নিজের দেহকেও আর আমার বলিয়া জ্ঞান করে না। জীব নিজেকে চারি ধারে খুঁজিয়া খুঁজিয়া এবং তাহা হইতে বহুদর্শিতা লাভ করিয়া করিয়া, শেষ যেন ক্রমশঃ নিজের ভিতর আমিত্বের সন্ধান পায় ও সেইখানে ক্রমশঃ গুটাইয়া আসিতে থাকে। কুম্ভকার যেমন প্রতিমা নির্ম্মাণের জন্য মৃত্তিকারাশি সংগ্রহ করে, এবং প্রতিমা নির্ম্মাণোপযোগী পরিষ্কার মৃত্তিকাটুকু লইয়া, তাহাতে প্রতিমা গড়িতে থাকে ও নিষ্প্রয়োজনীয় অংশ-সকল পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ জীবের আমিত্ব যত দিন না ঘনীভূত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তত দিন "আমিত্ব" ও "আমার" জ্ঞানটা চারি ধারে ছড়াইয়া থাকে; জগৎসঙ্গ হইতে সংস্কাররাশি সঞ্চয় করিয়া যত তার ইন্দ্রিয়-সকল ফুটিয়া উঠিতে থাকে এবং যত পূর্ণভাবে সে জগতের বস্তুনিচয়কে ভোগ করিতে ক্রমশঃ সক্ষম হয়, তত তার "আমিত্ব" জগৎ ছাড়িয়া ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়। তারপর তার আত্মিক আমিত্ব আরও স্ফুটতর হইলে, তখন আর সংসার বা স্ত্রীপুত্র ইত্যাদিতেও আমিত্ব বা আমার জ্ঞান ছড়াইয়া থাকিতে চাহে না; এবং তত সে নিজের ভিতর প্রবেশ করে ও ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়াদিতে "আমিত্ব" উপলব্ধি করে না—ইন্দ্রিয়াদি ছাড়া আমির সন্ধান করে।

ভাল করিয়া বলি—একটী পশুর আত্মপর জ্ঞান নাই এবং একজন মুক্ত পুরুষেরও আত্মপর জ্ঞান নাই; তবে বস্তুতঃ উহারা উভয়েই কি সমতুল্য? তাহা নহে। পশুর আমিত্ব এখনও সুচারুরূপে গঠিত হয় নাই; আর মুক্ত পুরুষের মায়াদেহ সুন্দররূপে রচিত হইয়া, তারপর আবার পরিত্যক্ত হইয়াছে। মুক্ত পুরুষের সংস্কার-নির্ম্মিত আমিত্ব রচিত হইয়া, তাহা হইতে যথার্থ আমিত্ব উপলব্ধি হইয়া গিয়া, তারপর সে সংস্কার-নির্ম্মিত আমিত্ব পরিত্যক্ত হইয়াছে। পশুর এখনও প্রতিমা নির্ম্মাণ হয় নাই। মুক্ত পুরুষের প্রতিমা নির্ম্মাণ হইয়া গিয়া, তাহাতে দেবতার আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে। দেবতাপূজায় সিদ্ধিলাভ করিয়া মুক্ত পুরুষ সে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়াছে।

যাহা হউক, ইন্দ্রিয়াদি এই আমিত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্ফুট হয় এবং আবার ওই ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা আমিত্ব আরও বিকশিত হইতে থাকে। পরস্পর এইরূপে পরস্পরকে পুষ্ট ও সাহায্য করিতে থাকে। ইন্দ্রিয়সকল অহর্নিশ বহির্বস্তু হইতে সংস্কাররাশি লইয়া জীবের আমিত্ব উপলব্ধিকে জাগাইয়া রাখে। অহর্নিশ এইরূপে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উদ্দীপিত না হইলে, আমরা অবীচি অবস্থা কিম্বা তমসাচ্ছন্ন অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতাম। জগতের অনন্ত ঐশ্বর্য্য-ভোগও হইত না এবং আত্মোপলব্ধিও ঘটিত না। আমাদের মন অহর্নিশ চঞ্চল বলিয়া, আমরা সময়ে সময়ে আপনাকে ধিক্কার দিই। আমরা বলিয়া থাকি, মন বড় চঞ্চল, মুহূর্ত্তের জন্য আমাদিগকে স্থির হইতে দেয় না, ভগবচ্চিন্তা করিতে গেলে অন্য দিকে মন ছুটিয়া পালায়। কিন্তু বস্তুতঃ আমাদের বুঝা উচিত, সাধারণ মনুষ্যের মন এইরূপ চঞ্চল না হইলে—এরূপ দ্রুতভাবে চারি ধারে কার্য্য না করিলে, আমরা অজ্ঞান অবস্থা প্রাপ্ত হইতাম। যত দিন না আত্মিক আমিত্ব ঘনীভূত ও স্থূলতর হয়, তত দিন মন সেই জন্য চঞ্চল থাকে। যে মাত্রায় আমিত্ব দৃঢ়ীভূত হয়, সেই মাত্রায় মনের চঞ্চলতা কমিয়া আসে। মনের চঞ্চলতা, ভগবানের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ, পরীক্ষাময় অভিশাপ নহে।

পশুজীবনে পাপ নাই বলিয়া একটা প্রবাদ আছে। আমরা সে বিচারে এখন প্রবৃত্ত হইব না। তবে এইটুকু বলি, মৃত্যুর পর মনুষ্যের মত সকল পশুর প্রেতলোক ও স্বর্গাদি জ্ঞানতঃ ভোগ ঘটে না। তাহারা তাহাদের যথাসম্ভব ইন্দ্রিয়যুক্ত স্থূলদেহে যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা পায়, ততক্ষণ আমিত্বের উপলব্ধি করিতে পারে। স্থূল শরীর ও স্থূল ইন্দ্রিয় পরিত্যাগের পরে, তাহাদের মনোময় দেহে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সুনির্ম্মিত হয় নাই বলিয়া, আমিত্ব হারাইয়া তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; সে অবস্থায় তাহাদের ভোগ ঘটিয়া উঠে না। মনুষ্যের আমিত্ব ঘনীভূত হইয়া গিয়াছে বলিয়া, স্থূল দেহ ও স্থূল ইন্দ্রিয় পরিত্যাগের পর মনোময় বা সূক্ষ্ম-দেহে, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ে জ্ঞানতঃ প্রেত ও স্বর্গলোক ভোগ হয়। কিন্তু সাধারণ মনুষ্য স্বর্গের ঊর্দ্ধতম লোকসকল আর ভোগ করিতে পায় না। যোগী পুরুষেরা—যাঁহাদের আত্মিক আমিত্ব আরও পরিস্ফুট এবং আরও চৈতন্যস্ফুটসম্পন্ন, তাঁহারা স্বর্গাপেক্ষা সূক্ষ্ম তপঃ, সত্য আদি অন্যান্য লোকসকল সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন। মৃত্যুর পর আত্মা মাত্রেই বিজ্ঞানময় কোষ বা সত্যলোক অবধি যায়, তবে স্ব স্ব আমিত্বের দৃঢ়তার তারতম্য অনুসারে সজ্ঞানভাবে বা অজ্ঞানভাবে লোকসকল অতিক্রম করিতে হয়।

যাহা হউক, ইহা হইতে আমরা এইটুকু বুঝিলাম যে, ইন্দ্রিয়-সকল প্রথম আমাদের মিত্রস্থানীয় ; যত দিন আমাদের সূক্ষ্ম দেহ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়যুক্ত না হয়, যত দিন আমাদের সূক্ষ্ম দেহ স্থূল দেহের মত কার্য্যকরী শক্তি লাভ করিতে না পারে, তত দিন ইন্দ্রিয়াদির প্রয়োজন ; তারপর ধান্যার্থী যেমন পলাল পরিত্যাগ করে, তদ্রূপভাবে সমস্ত পরিত্যাজ্য।

আমরা সাধারণ জীব প্রধানতঃ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় জানি। কিন্তু বস্তুতঃ আরও দুইটী ইন্দ্রিয় আছে, যাহার সন্ধান আমরা এখনও মনুষ্যজীবনে পাই নাই। সাধকেরা তাহার সন্ধান পান, এবং সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অলৌকিক কার্য্যসকল সম্পাদন করিতে পারেন। আমরা যোগীদিগেরঅ লৌকিক কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হই, এবং কেমন করিয়া ওরূপ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা ভাবিয়া পাই না। কিন্তু দর্শনাদি ব্যাপারের মত যোগীদিগের পক্ষে উহা একান্ত সহজসাধ্য।

যাহা হউক, প্রথম অবস্থায় সাধক যখন সমস্ত ত্যাগের জন্য বা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবান্ হয়, তখন এই সকল তত্ত্ব তাহার প্রাণের ভিতর ফুটিয়া উঠে। সে দেখে, বস্তুতঃ এখন ইন্দ্রিয়সকল পরিত্যাগ করিতে গেলে নিজের অস্তিত্ব অবধি হারাইয়া যায় এবং শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম, জ্ঞান, ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি না থাকিলে ইন্দ্রিয়-সকল দুর্ব্বল ও কার্য্যাক্ষম হইয়া পড়ে। তবে কেমন করিয়া উহাদিগকে পরি-ত্যাগ করিব ? ইহারা যে আত্মীয়, ইহারা যে উপকারী ! ইন্দ্রিয়সকল না থাকিলে নিজের অস্তিত্ব কি প্রকারে থাকিবে ? ইন্দ্রিয় ছাড়া নিজের অস্তিত্ব প্রথম অবস্থায় উপলব্ধি হয় না, তাই সাধক নিজের ইন্দ্রিয়শূন্য অবস্থার কল্পনা করিতে পারে না। সাধনার সূচনায় যাহাদিগের ধ্বংসের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল, সাধনা-প্রারম্ভে তাহাদিগের স্বরূপ ও কার্য্যসকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, তাহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া সাধক বুঝে।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ॥ ২৭

তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ অবস্থিতান্ সমীক্ষ্য পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ বিষীদন্ (সন্) স কৌন্তেয়ঃ ইদং অব্রবীৎ।

সেই সকল বন্ধুগণকে অবস্থিত দেখিয়া, অতিশয় কৃপাবিষ্ট ও বিষাদান্বিত হইয়া অর্জ্জুন এই কথা বলিলেন।

অর্থাৎ সাধক তাহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া চিনিয়া বিষাদযুক্ত হইয়া পড়ে। সাধক ভাবে, বস্তুতঃ ইহারাও আমার আত্মীয়, অথচ আমার সাধনাপথে আমার অন্তরায় কেন? ইহারা চিরদিন আমার আপনার বলিয়া পরিচিত, অথচ এখন আমরা পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন; দুই বিরুদ্ধ ভাব এক সঙ্গে উদিত হইয়া সাধককে চঞ্চল করে। এক দিকে ইহাদের দ্বারা যেমন আমি আত্মপ্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী হইয়াছি, অন্য দিকে উহারাই আবার এখন আত্মপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। সাধক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, তাহার হৃদয় বিষাদভারাক্রান্ত হয়। উহাদের উপর কৃপা আসিয়া উপস্থিত হয়। কৃপায় ও বিষাদে সাধক চঞ্চল হইয়া উঠে।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮

অর্জ্জুন এতক্ষণ অচ্যুত, হৃষীকেশ বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন, এখন কৃষ্ণ বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

হে কৃষ্ণ! যুদ্ধেচ্ছু হইয়া সম্মুখে সমবেত এই সমস্ত স্বজনগণকে দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইতেছে—মুখ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। কৃষ্ণ বলিয়া সম্বোধন করিবার কারণ—বিষাদে হৃদয় অভিভূত হইলে, হৃদয় ঘোর ঘনকৃষ্ণ বিষাদ-মেঘে আপ্লুত হইলে, জীব সেই সময়ে যেন চারি ধারে অন্ধকার দেখে - দিশাহারা হইয়া যায়। তার গতি স্থির করিতে পারে না—পথ খুঁজিয়া পায় না। সেই দারুণ সময়ে যখন অন্ধকারে জ্ঞান, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, সমস্ত আচ্ছন্ন, জ্যোতিহীন হইয়া যায়—জীবনের সেই দুরন্ত সঙ্কট-মুহূর্ত্তে তুমি যদি ভগবৎশক্তির সাহায্য অন্বেষণ কর—তবে তুমি কি করিবে? ভগবান্‌কে কিরূপে তখন ভাবিবে? কোনও রূপ তোমার তাৎকালীন গাঢ় কালিমামগ্ন প্রাণে প্রতিফলিত হইবে না; কালিমায় যে চারি ধার প্লাবিত। কাল ছাড়া তখন আর কিছু ত তুমি দেখিতে পাইবে না। তখন যাহা ভাবিবে—যাহা প্রাণে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে—কালিমাতে সবই যে ডুবিয়া যাইবে। তাই সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে

তোমার জীবনের একমাত্র সুহৃৎ—তোমার হৃদয়-রথের একমাত্র সারথি—তোমার জীবন-মরণের একমাত্র চিরসহচর—আর্ত্তের আশা—বিপন্নের ভরসা—ভগবান্‌কে কাল দেখিও—কৃষ্ণ বলিয়া সম্বোধন করিও। তোমার হৃদয়ের নিবিড় কালিমায় তুমি তখন কাল হইয়া গিয়াছ, তোমার সে সারথিও তখন যে কাল, তোমার বিষাদই যে তাঁর বিষাদ—তোমার সন্তাপই যে তাঁর সন্তাপ—তোমার ব্যাকুলতা যে তাঁরই ব্যাকুলতা। তুমিই যে তাঁর সব। তাঁর নিজের হাসি-কান্না নাই। তোমার হাসিতেই তিনি হাসেন, তোমার কান্নাতেই তিনি কাঁদেন। তোমার কালিমায় তিনি কৃষ্ণ কাচে আবৃত দীপ-শিখার মত প্রতিফলিত হয়েন। তাই সেই সময়ে আর্ত্তের পক্ষে, বিপন্নের পক্ষে, বিষাদাপন্নের পক্ষে—তিনি কৃষ্ণ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আগে ভগবান্‌কে অচ্যুত বলিয়া ধারণা করিতে হয়, তারপর সারথ্যের কথা ভাবিতে হয়। তারপর তিনি যখন মানস নয়নে সর্ব্বপ্রথম প্রতিভাত হয়েন, তখন কৃষ্ণ-জ্যোতিবিমণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। আকাশের গভীর নীলিমার স্নিগ্ধ কান্তির মত সে কৃষ্ণ-জ্যোতিঃ প্রাণের সকল অবসাদ মুছিয়া দেয়। তাই অর্জ্জুন এই দারুণ বিষাদের সময়ে প্রথম 'কৃষ্ণ' বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥ ২৯

মে শরীরে বেপথুঃ (কম্পঃ) চ রোমহর্ষঃ জায়তে, হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে ত্বক্ চ এব পরিদহ্যতে।

আমার দেহে কম্প ও রোমহর্ষ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে, সর্ব্বাঙ্গ যেন বিদগ্ধ হইতেছে।

নচ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥ ৩০

কেশব (অহং) অবস্থাতুং চ ন শক্নোমি, মে মনঃ চ ভ্রমতি ইব, বিপরীতানি নিমিত্তানি চ পশ্যামি।

কেশব! আমি আর অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমার মন ঘুরিতেছে, আমি বিপরীত লক্ষণ-সকল দেখিতেছি।

বস্তুতঃ, সাধকের তখন ঠিক এই অবস্থাই হইয়া থাকে; তাহার উত্তম অধ্যবসায় তিরোহিত হয়—তাহার প্রাণ কাঁপিতে থাকে—তাহার শরীরে দাহ উপস্থিত হয়। কি করি! কি করি! পঞ্চ তত্ত্ব ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব, এই চিন্তায় প্রাণের ভিতর অহরহঃ জ্বলিতে থাকে। আবার যোগস্থ হইতে গেলে, অর্থাৎ সাধক যখন হৃদয়ের ভিতর ভগবানের সারথ্যের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাতে যুক্ত হইবার প্রয়াস পায়, তখন সর্ব্বপ্রথম প্রাণের ভিতর যেন শূন্য হইয়া যায়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি যেন আর কিছু থাকে না; বিজিতনিদ্র সাধকের হৃদয় সেই সময়ে কাঁপিয়া উঠে, আর তুরীয় মুখে অগ্রসর হইতে সাধকের সাহস হয় না, সাধক যেন নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিতেছে, এইরূপ অনুভব করে। আর একটু অগ্রসর, আর একটু কেন্দ্রস্থ হইতে পারিলেই সমাধি আসিয়া যায়, কিন্তু প্রথমাধিকারী সাধক আর পারে না। চিরদিন শব্দাদি তন্মাত্রার সহিত থাকিয়া, এবং তদবস্থায় অভ্যস্ত হইয়া, জীব নিজেকে শব্দাদি-গঠিত বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে, সুতরাং সর্ব্বপ্রথম সেই অমূলক ভাব নষ্ট হইবার সময়ে, সেই শূন্য অথচ অস্তিত্ব ভাবের আস্বাদনের পূর্ব্বে, সাধক শব্দাদির মায়া এড়াইতে পারে না। তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। সে তখন আবার সব বিপরীতভাবে দর্শন করিয়া, আর সমাধিপথে না অগ্রসর হইয়া, তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়।

সেই অবস্থায় বিপরীত লক্ষণ-সকল প্রতিভাত হইতে থাকে। যেগুলি সাধনার অন্তরায়, আত্মপ্রতিষ্ঠায় যাহা বিরোধী,—সেইগুলি তখন প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। যেগুলি নিমিত্তস্বরূপ হইয়া সাধককে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট করিয়াছিল, এখন সেইগুলি বিপরীত ভাবে প্রতীয়মান হয়। কিরূপে হয়,—তাহা পরে বর্ণিত হইতেছে।

নচ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১

আহবে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ চ (অহং) ন অনুপশ্যামি; কৃষ্ণ! (অহং) বিজয়ং রাজ্যং সুখানি চ ন কাঙ্ক্ষে।

যুদ্ধে আত্মীয় বধ করিয়া মঙ্গল দেখিতে পাইতেছি না। হে কৃষ্ণ! জয়, রাজ্য, সুখ, এ সকল আমি চাহি না।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫

গোবিন্দ! আচার্য্যাঃ, পিতরঃ, পুত্রাঃ, তথা পিতামহাঃ এবচ, মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শ্যালাঃ, তথা সম্বন্ধিনঃ যেষাম্ অর্থে নঃ রাজ্যং ভোগাঃ সুখানিচ কাঙ্ক্ষিতং, তে ইমে প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা যুদ্ধে অবস্থিতাঃ; নঃ রাজ্যেন কিং ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্? মধুসূদন! মহীকৃতে কিংনু, ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ অপি ঘ্নতঃ অপি এতান্ ন হন্তুম্ ইচ্ছামি; জনার্দ্দন, ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ।

হে গোবিন্দ! আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালা ও অন্যান্য আত্মীয়গণ—যাহাদের জন্য রাজ্যভোগ, সুখ ইত্যাদি অভীপ্সিত, তাহারাই ধন ও প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে অবস্থিত; সুতরাং আমাদের ভোগেই কি, রাজ্যেই কি এবং জীবনেই বা কি? হে মধুসূদন! পৃথিবী ত তুচ্ছ, ত্রৈলোক্যরাজ্যের জন্য হইলেও এবং ইহারা আমায় বধ করিলেও, আমি ইহাদিগকে মারিতে পারিব না! ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে মারিয়া আমাদের কি সুখ হইবে?

ইন্দ্রিয়াদি যদি উচ্ছেদিত হইয়া গেল, তবে ভোগ কি প্রকারে সম্ভব হইবে? ইন্দ্রিয়াদির উদ্দেশ্যেই জীব ভোগ কামনা করে। কিন্তু সেইগুলিই যদি ধ্বংস হইয়া যায়, যদি সেইগুলিই ছাড়িয়া দিয়া, তবে যুক্ত হইতে হয়, তবে ত সে অবস্থায় ভোগ বলিয়া কিছু থাকে না। সে আবার কি শূন্যবৎ অবস্থা! সাধক ভীত হয়। বস্তুতঃ সাধক তখন জানে না যে, সে অবস্থা "সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্। অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥" সে

অপূর্ব্ব অবস্থার আস্বাদ সাধক তখনও ত পায় নাই, সেই জন্য এইরূপ মায়িক আশঙ্কায় উদ্বেলিত হয়। সে "কিছু নাই, অথচ সব আছে" অবস্থার উপলব্ধি যত দিন না হয়, তত দিন সাধক অনুমান বা কল্পনার দ্বারা তাহার আস্বাদন পাইতে পারে না। সুতরাং ইন্দ্রিয়ভোগযুক্ত অভ্যস্ত অবস্থা হইতে শূন্যবৎ নূতন অবস্থায় যাইতে হইলে তাহার প্রাণ কাঁপে। মেঘমুক্ত সূর্য্যের মত সে অবস্থা যে অপূর্ব্ব বিকাশমণ্ডিত সর্ব্বান্ধকারভেদী, সে ত তখন তাহা জানে না। সে তখনও জীব, তাহার চক্ষে তখনও দুই দিক্ আছে, আলো ও অন্ধকার আছে, সুখ ও দুঃখ আছে, পাপ ও পুণ্য আছে, জ্ঞান ও অজ্ঞানতা আছে, হিত ও অহিত আছে, মিলন ও বিচ্ছেদ আছে। সুতরাং সে অবস্থাতীত অবস্থার আভাস জীব তখন পায় না। তাই সে কাতর হয়। সে ভাবে, জগতে সাধারণ কথায় যাহাকে আমরা সুখ বলি, যাহাকে তৃপ্তি বলি, যুক্ত অবস্থায় বুঝি সে সুখ, সে তৃপ্তিটুকুও থাকিবে না। সে ত জানে না, যথার্থ পূর্ণমাত্রায় সুখ, পূর্ণমাত্রায় তৃপ্তি, একমাত্র সেই অবস্থাতেই সম্ভবপর; এবং সেই পূর্ণতার জন্যই তাহা সুখদুঃখের অতীত অবস্থা। জলাশয় যতক্ষণ অপূর্ণ থাকে, ততক্ষণ চারি ধার হইতে জলস্রোত তাহাতে প্রবেশ করিতে থাকে; পূর্ণ হইয়া গেলে আর যেমন সেখানে স্রোতঃ কিছু থাকে না, তদ্রূপ সে যুক্ত অবস্থায় সুখদুঃখরূপ স্রোত থাকে না সত্য; কিন্তু তা বলিয়া সেখানে ভোগরূপ শান্তিবারির অভাব নাই। ভোগের পূর্ণতাই সুখদুঃখ-রূপ স্রোত নিরাকরণের কারণ, ভোগের অভাব তাহার কারণ নহে। পূর্ণতাই শূন্যানুভূতি—শূন্য বলিয়া কিছু নাই। শূন্যবাদ পূর্ণবাদেরই নামান্তর; শূন্যকে যাঁহারা পূর্ণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না—তাঁহারা শূন্যের প্রকৃত রহস্য পান না। কিন্তু এ স্থলে উহা আমাদের আলোচ্য নহে। যাহা হউক, সাধক প্রথম অবস্থায় এই পূর্ণতাকে শূন্যতা বলিয়াই কল্পনা করে, এবং সেই জন্যই ব্যাকুল হয়। বস্তুতঃ ব্যাকুল হইবারই কথা। লক্ষ লক্ষ জন্মের অনন্ত অধ্যবসায়, অনন্ত উদ্যম, যে সকল ইন্দ্রিয়াদির ও জ্ঞানকর্ম্মাদির শক্তির সঞ্চয়ে ব্যয়িত হইয়াছে, যেগুলিকে পাইতে লক্ষ লক্ষ জন্ম আমাদিগকে অহর্নিশ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরিয়া যে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছে, আজ সহসা যদি কেহ বলে, উহা দ্বারা কোন কাজ হইবে না, উহা ভাঙ্গিয়া ফেল, তবে প্রাণ কি ব্যাকুল হয় না? কিন্তু বস্তুতঃ যে ওই যন্ত্র-সাহায্যেই যথার্থ সফলতা আসিবে, সে কথা সাধক তখন বুঝিতে পারে না।

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥ ৩৬

এতান্ আততায়িনঃ হত্বা পাপম্ এব অস্মান্ আশ্রয়েৎ, তস্মাৎ বয়ং স্ববান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং ন অর্হাঃ; মাধব, হি স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম।

এই আততায়ীদিগকে হত্যা করিলে, পাপই আমাদিগকে আশ্রয় করিবে; সেই জন্য আমরা স্ববান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে বিনাশ করিতে পারি না; পরন্তু স্বজন বধ করিয়া আমরা কিরূপে সুখী হইব।

সাধক প্রথমাবস্থায় পাপপুণ্যাদি গণ্ডীর মধ্যে থাকে, সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির উচ্ছেদ সাধনকে সে পাপ বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ আত্মোন্নতি যাহাতে ক্ষণকালের জন্যও রোধ প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই পাপ বলে। সাধক কিরূপে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা উপকৃত হয়, এই অবস্থায় যখন তাহা বুঝিতে পারে, তখন ইন্দ্রিয়াদির ত্যাগ পাপ বলিয়া মনে করে। তন্তুকীট যখন প্রথম অবস্থায় নিজ লালার দ্বারা গুটিকা নির্ম্মাণ করিতে থাকে, এবং ধীরে ধীরে তাহার ভিতর আপনাকে আবদ্ধ করে, সেই প্রথম অবস্থায় এইরূপে নিজেকে আবদ্ধ না করাই তাহার পক্ষে পাপ; কেন না, ক্ষুদ্র কীট যদিও ভাবে নিজ লালায় আবদ্ধ না হইত, যদি এইরূপে নিবিড় অন্ধকারময় সংকীর্ণ গহ্বরমধ্যে অবরুদ্ধ না হইত, তাহা হইলে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাহার প্রাণে ত প্রবল আগ্রহ উন্মেষিত হইত না; তাহার প্রাণ ত বন্ধনের দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতে পাইত না ও তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সচেষ্ট হইত না; দুর্গমে যে পরিত্রাণ করে, সঙ্কটে যে উদ্ধার করে, হতাশকে যে আশ্বাস দেয়, তাহার কৃপার পরিচয় ত পাইত না; দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত কাঁদিতে শিখিত না। সেই নিজ দেহের আয়তনের মত ক্ষুদ্র, অন্ধকার, জীবশূন্য গহ্বরটুকুর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া, তন্তুকীট মুক্তির জন্য কাঁদে; নিজের সমস্ত চেষ্টা হইতে বিচ্যুত হইয়া, আর তার অঙ্গ সঞ্চালনেরও উপায় নাই দেখিয়া, সে আত্মসমর্পণ করে। অন্ধকূপাবদ্ধ ক্ষুদ্র কীটকে উদ্ধার করিতে ত্রিভুবনে তবে কি কেহ নাই? অবোধ ক্ষুদ্র জীবের কাতর ক্রন্দন শুনিয়া তাহাকে রক্ষা করে, এমন কি কেহ নাই? এই গহ্বরে আমার প্রাণের দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতে, আমার যন্ত্রণায় দয়ার্দ্র হইতে, আমার

অশ্রুজলে দ্রবীভূত হইতে, অগতির গতি, অনাথের নাথ, পীড়িতের পরিত্রাতা কেহ কি নাই? তন্তুকীটের সে ক্রন্দন ত্রিভুবনের অন্য কেহ শুনিতে পায় না—তাহার সে আত্মসমর্পণ আর কেহ লক্ষ্য করিতে পারে না—তাহার সে সঙ্কটাপন্ন অবস্থা আর কেহ দেখিতে পায় না;—শুধু একজন—যার নয়ন সর্ব্বত্র চাহিয়া আছে, সেই দেখে; শুধু একজন—যার শ্রবণ সর্ব্বত্র প্রসৃত, সেই শুনে; সেই সে যন্ত্রণা অনুভব করে; শুধু একজন, যে সেই অন্ধকূপে, সেই তন্তুকীটের সহিত আবদ্ধবৎ হইয়া আছে,— সেই প্রত্যক্ষ করে; সে গুপ্ত সখাকে ফাঁকি দিয়া জীব ত কোথাও যাইতে পারে না—সে গুপ্ত মুখাপেক্ষীকে ফাঁকি দিয়া, জীব ত কোন কাজ করিতে পারে না; জীব আপনাকে বদ্ধ করিবার প্রারম্ভ হইতে, সে যে তার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে,' সে যে ক্রোড় বিস্তার করিয়া অপেক্ষা করিতেছে; —সেই অন্ধকূপের ভিতর, অন্ধকূপ অপেক্ষা অন্ধকার তার প্রাণের ভিতর,—সেই গুপ্ত সখা, সেই গুপ্ত মুখাপেক্ষী, সেই স্নেহময়ী মা আমার অমনি দুলিয়া উঠেন, আকুল হইয়া উঠেন, তন্তুকীটের আত্মসমর্পণ অনুভব করিবামাত্র, অমনি দুর্গা-মূর্ত্তিতে সে দুর্গমে আবির্ভূতা হয়েন; কীটের ক্ষুদ্র অঙ্গে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত দুইখানি পক্ষ কোথা হইতে আনিয়া সংলগ্ন করিয়া দেন। সহসা কীট দেখে, সে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে সক্ষম; স্বাধীনতার অপূর্ব্ব আভাস তাহার প্রাণকে মাতাইয়া তোলে। তাহার শরীর নববলে বলীয়ান্ হইয়া উঠে, মুহূর্ত্তে সে গহ্বর বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইয়া স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করিতে থাকে।

ওই তন্তুকীটবৎ আমরাও আবদ্ধ হইতেছি; আমরাও অবিদ্যা-কূপ রচনা করিয়া, তাহার দ্বারা আমাদের চেষ্টাশক্তিকে সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতেছি, আমরাও ক্রমশঃ আমিত্বের গণ্ডী গুটাইয়া গুটাইয়া একটী সুদৃঢ় অন্ধকূপ নির্ম্মাণ করিতেছি। যখন কূপ নির্ম্মাণ শেষ হইবে,—যখন নিজের আর অঙ্গ সঞ্চালনের উপায় নাই বলিয়া নিজেকে প্রত্যক্ষ করিব—নিজের চেষ্টাশক্তি বস্তুতঃ কিছুই নহে বুঝিয়া, মায়ের উপর নির্ভর করিতে শিখিব—আত্মসমর্পণ ছাড়া আর গতি নাই বুঝিয়া, যখন ভগবানের উপর আত্মসমর্পণ করিব—যখন প্রাণ-বন্ধনের সুতীব্র যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মুক্তির জন্য লালায়িত হইব, তখন দেখিব, বস্তুতঃ আমি স্বাধীন, স্বাধীনতারূপ পক্ষ আমার অঙ্গে সংলগ্ন। জ্ঞানরূপ দন্তের দ্বারা অবিদ্যা-কূপ ভেদ করিয়া, আমি মহাশূন্যে ভ্রমণশীল হইব। কিন্তু আগে অবিদ্যা-কূপ চাই, আগে অবিদ্যা-কূপ সংরক্ষণ না করাই পাপ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদিগের আত্মোন্নতির পথে যাহা অবরোধ করে, তাহাই পাপ; বস্তুতঃ পাপ-পুণ্য বলিয়া কিছুই নাই। একই জিনিষ অবস্থাভেদে পাপ বা পুণ্য বলিয়া গণ্য হয়। এক অবস্থায় যাহা আত্মোন্নতির জন্য গ্রহণীয়, অবস্থান্তরে তাহা পরিত্যাজ্য—এক অবস্থায় যে কার্য্য আমাদিগকে মাতৃসন্নিধানে অগ্রসর করে, অবস্থান্তরে তাহাই আবার আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। কার্য্যে কোন গুণ নাই, গুণ আমাদের স্ব স্ব অভ্যন্তরে। যতক্ষণ নিজের কর্ত্তৃত্ব ছাড়া অন্য কোন কর্ত্তৃত্ব দেখিতে না পাইব, যতক্ষণ না নিজের চেষ্টা থামিয়া গিয়া, ভগবৎশক্তির উপর নির্ভর করিতে শিখিব, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়াদির মায়া আমাদিগের উপকারী। ঈশ্বর-নির্ভরতা আসিয়া গেলে, স্বাধীনতার বিমল সুখের জন্য প্রাণ যথার্থ কাঁদিয়া উঠিলে, অগতির গতি বলিয়া যথার্থ তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, তখন আর ও মায়ার আবশ্যকতা নাই। তুমি যদি আপনাকে যথার্থ মায়াবদ্ধ বলিয়া অনুভব করিয়া থাক, যদি তুমি বুঝিয়া থাক, তোমার কর্ত্তৃত্ব কিছু নাই, তবে বুঝিবে, তোমার মুক্তির দিন সন্নিকট। কিন্তু এই নিজের কর্ত্তৃত্বহীনতা বা মাতৃক্রোড়ে আত্মসমর্পণ পূর্ণভাবে হওয়া চাই, সম্পূর্ণ হতাশ ভাবে মাতৃ-চরণে লুটাইয়া পড়া চাই।

যাহা হউক, আততায়ী হত্যায় ব্যবহারিক জ্ঞানে পাপস্পর্শের সম্ভাবনা নাই, অথচ অর্জ্জুনের পাপের ভয় হইবার কারণ কি? কারণ, তাহারা স্ববান্ধব। শুধু আততায়ী হইলে পাপের তত আশঙ্কা অর্জ্জুনের প্রাণে উঠিত না; আততায়ী অথচ আত্মীয়, শত্রু অথচ মিত্র, এরূপ উভয় সম্বন্ধ-সম্পন্ন বলিয়াই ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন অর্জ্জুনের পাপের আশঙ্কা এবং সেই জন্যই বিশিষ্টভাবে "এতান্ আততায়িনঃ" বলা হইয়াছে।

আত্মোন্নতির বিরোধী কার্য্যকেই পাপ বলে, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কোন কার্য্য সূচনা করিলে, তাহা পাপজনক, কি পুণ্যজনক, ইহা কার্য্যবিচারে নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। সুতরাং সাধারণ জীবকে পাপ-পুণ্য বিচারের জন্য শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। শাস্ত্রে যে কার্য্য পাপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই পরিত্যাজ্য এবং যাহা পুণ্যপ্রসূ বলিয়া কথিত, তাহাই গ্রহণীয়। কিন্তু যোগ-চক্ষুষ্মান্দিগের পক্ষে আর শাস্ত্রের সাহায্য তত প্রয়োজন হয় না। কার্য্য পাপ-যুক্ত, কি পুণ্যযুক্ত হইল, সূক্ষ্মদেহ বা প্রাণময় কোষের কার্য্যকালীন অবস্থা দেখিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে কার্য্য সম্পাদন করিলে, আমাদিগের

প্রাণময় কোষ সঙ্কুচিত ও মলিন বর্ণসম্পন্ন হয়, সেইগুলি পাপ বলিয়া পরিত্যাজ্য এবং যেগুলি করিলে প্রাণময় কোষ স্ফুরিত, পুষ্ট ও সমধিক বিস্তৃত হয়, তাহাই গ্রহণীয় বা কর্ত্তব্য। যোগীরা প্রাণময় কোষ দেখিয়া অনায়াসে বলিয়া দিতে পারেন, কার্য্য কিরূপ ফল প্রসব করিল। বস্তুতঃ সাধারণের পক্ষে পাপ-পুণ্য বা কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিচার অতীব দুরূহ। সেই জন্যই সাধারণকে পদে পদে শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এবং যত দিন না যোগচক্ষু উন্মেষিত হয়, তত দিন শাস্ত্রানুমোদিত পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। আজকাল অনেকেই ব্রহ্মজ্ঞানের ঈষৎ বাচনিক আভাস পাইয়াই, পাপ-পুণ্য কিছু নাই বলিয়া বসিয়া থাকেন এবং উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে কুণ্ঠিত হন না ; বরং শাস্ত্রানুরত নিরীহ সাধারণ সমাজকে অজ্ঞ বলিয়া উপেক্ষা করেন। তাঁহাদিগের জন্যই আমি এইগুলি বলিলাম। পাপ-পুণ্যের বিচার বস্তুতঃ কত সূক্ষ্ম—জীবের আত্মিক স্তরের কত অভ্যন্তরে প্রতিফলিত হয়—কত সূক্ষ্মভাবে পাপ-পুণ্যের বিচার করিতে হয়, নিম্নলিখিত উপাখ্যানটীতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

এক সময়ে কোন এক পুণ্যবান্ গৃহস্থের পরমা সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার মত সতী ও স্বামিপরায়ণা স্ত্রী দুর্ল্লভ বলিয়া তাঁহার সতীত্ব-গরিমা চারি ধারে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। স্বামিসেবা ও ঈশ্বরারাধনা ব্যতীত সে সতীর আর অন্য কোন কর্ম্ম ছিল না। স্বামিসেবা করিয়া যে অবসরটুকু পাইতেন, ঈশ্বরারাধনায় তাহা যাপন করিতেন। নিত্য নারায়ণ পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেন,—"হে গোলোকবিহারি! দেহত্যাগের পর আমি যেন তোমায় স্বামিরূপে পাই। হে প্রভো! হে প্রাণেশ! তুমি আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিও।" এইরূপে বহুদিন পুণ্যচরিত্রা রমণী জীবন যাপন করিবার পর একদিন কালনিয়োগে তাঁহার মৃত্যু হইল। স্বামী, পত্নীবিয়োগে কাতর হইয়া, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, কোন তীর্থক্ষেত্রে গিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সে সাধ্বীর বিষ্ণুলোকে গতি হইল ; বিষ্ণুলোকের অনন্ত মহিমময় অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্মণ্ডিত প্রাসাদাবলীর মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়া, তাঁর নরজীবনের স্বামিসেবা সার্থক হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিলেন, এবং নারায়ণ স্বামিরূপে তাঁহার প্রাসাদে আসিয়া তাঁহাকে চরিতার্থ করিবেন বলিয়া আশায় উৎফুল্লা হইয়া রহিলেন। বহু দিন তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইল না। নারায়ণ সেই সতীর বৈকুণ্ঠস্থ গৃহে আসিয়া একদিন দেখা দিলেন এবং আসন গ্রহণ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা

করিলেন। আনন্দে বিভোরা হইয়া সতী কৃতাঞ্জলিপুটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন, এবং তাঁহার কৃপা হইতে আর যেন বঞ্চিত না হন, এরূপ প্রার্থনা করিলেন। তার পর সুবর্ণ-ভৃঙ্গার ভরিয়া স্নিগ্ধ সুগন্ধি বারি আনিয়া নারায়ণের পদধৌত করিয়া দিলেন এবং নানাবিধ আহার্য্য ও পানীয় আনিয়া নারায়ণকে গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। গোপীবল্লভ নানারূপ মিষ্ট সম্ভাষণে তাঁহাকে পরিতুষ্টা করিয়া, গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"ব্রাহ্মণি। তুমি স্ত্রীরূপে আমার সহবাস প্রার্থনা করিয়াছিলে, আমি তোমার সেই আশা পূরণ করিতে আসিয়াছি; কিন্তু আমি তোমার জলগ্রহণ করিতে পারিব না—তুমি অসতী।"

রমণীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। নারায়ণের চরণে বিলুণ্ঠিতা হইয়া, সাশ্রুলোচনে দীনা পাগলিনীর মত বলিলেন, "কেন নাথ। এরূপ কঠোর বাক্য কেন প্রয়োগ করিতেছেন? চিরদিন কায়মনোবাক্যে স্বামিসেবা করিয়া আসিয়াছি, মুহূর্ত্তের জন্য অন্য কোন চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিই নাই, অসতী কেমন করিয়া হইলাম, জগন্নাথ।" ভগবান্ জলদ-গম্ভীর স্বরে রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কামিনি। তুমি স্বামিসেবা করিয়াছ সত্য, কিন্তু অনন্যচিত্তে কর নাই। তুমি চিরদিন স্বামিসত্ত্বেও আমাকে স্বামিরূপে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছ। তোমার স্বামীকে অবহেলা করা হইয়াছে—তোমার পরপুরুষ ভজনা করা হইয়াছে। তুমি যদি তোমার সেই ব্রাহ্মণ স্বামীকে নারায়ণ ভাবিয়া বা আমার মূর্ত্তিমান্ অবতার ভাবিয়া, তাঁহারই কাছে তোমার প্রাণের বাসনা জানাইতে, তাহা হইলে আজ তোমাকে সহধর্ম্মিণী বলিয়া আমি তোমার জল গ্রহণ করিতে পারিতাম। তুমি তাহা না করায়, স্বামী ও নারায়ণ, দুই বিভিন্ন পুরুষ বিবেচনা করায়, তোমার সতীত্ব-ধর্ম্ম কালিমাঙ্কিত হইয়াছে। আমার আরাধনার ফল-স্বরূপ তুমি বৈকুণ্ঠে স্থান পাইয়াছ, এবং তুমি ইচ্ছা করিলে বৈকুণ্ঠের বেশ্যাস্বরূপ এখানে বসবাস করিতে পার। কিন্তু যদি সতীত্বের অনুপম ফল ভোগ করিবার তোমার বাসনা হয়, তাহা হইলে পুনরায় মর্ত্তে গিয়া স্বামিসেবা করিতে হইবে, এবং অনন্যচিত্তে স্বামিভক্তি-রূপ মহাব্রত পালন করিতে হইবে। তোমার ভক্তিতে আমি প্রীত হইয়াছি সত্য, কিন্তু তোমার সেই ব্রাহ্মণ স্বামীর ধর্ম্মে বিঘ্ন ঘটিয়াছে। ঐ দেখ। তোমার সে স্বামী তপস্যায় নিযুক্ত; কিন্তু তাঁহার সূক্ষ্ম দেহের বামার্দ্ধ কিরূপ জ্যোতিঃহীন—কালিমামগ্ন।"

নারায়ণের কৃপায় রমণী সেই বৈকুণ্ঠ হইতে মর্ত্তলোকস্থ স্বীয় স্বামীকে দেখিতে পাইলেন। স্বামীর সূক্ষ্মদেহ জ্যোতিঃহীন দেখিয়া, তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিল; রমণী নারায়ণের পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং পরজন্মে যেন তিনি সতীত্বরূপ মহাধর্ম্ম সুচারুভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন, এইরূপ প্রার্থনা করিলেন।

ধর্ম্মের গতি বস্তুতঃ এতই অন্তস্তলবাহিনী;—এতই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া, তবে কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে হয়। অর্জ্জুনও সেই জন্য খুব সূক্ষ্মভাবে পাপের বিশ্লেষণ করিতেছেন। সাধকমাত্রকে এইরূপ কর্ম্ম বিশ্লেষণের জন্য সচেষ্ট হইতে হয়। কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বুঝাইবার সময়ে এ কথা বিশেষ করিয়া বলিব।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন॥ ৩৮

লোভোপহতচেতসঃ এতে কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে পাতকং চ যদ্যপি ন পশ্যন্তি, হে জনার্দ্দন! কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্।

লোভে হতবুদ্ধি হইয়া ইহারা কুলক্ষয়কৃত দোষ এবং মিত্রদ্রোহের পাপ যদিও লক্ষ্য করিতেছে না, হে জনার্দ্দন। কুলক্ষয়কৃত দোষ দেখিয়াও আমাদের এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য জ্ঞান কেন না হইবে?

ইন্দ্রিয়াদির উচ্ছেদে কুলক্ষয়ের আশঙ্কা সাধকের প্রাণে জাগিয়া উঠাই যুক্তিসঙ্গত। ব্যবহারিক অর্থে জ্ঞাতিবধে যেমন মিত্রবধ ও কুলক্ষয়ের সম্ভাবনা আছে, তদ্রূপ যৌগিক অর্থে ইন্দ্রিয়াদিরূপ আত্মীয়বধে কুলক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। কুল অর্থে—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বা প্রকৃতি। আত্মা প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন বলিয়া, প্রকৃতিকে কুল বলে। ইন্দ্রিয়াদির উচ্ছেদ ও কুলক্ষয় একই কথা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রথম অবস্থায় আমাদের আত্মিক আমিত্বের পূর্ণ পরিস্ফুটনের জন্য প্রকৃতির বা ইন্দ্রিয়াদির প্রয়োজন। সুতরাং সে অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদির উচ্ছেদ পাপযুক্ত বলিয়া সাধকের ধারণা হয়।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯

কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ কুলধর্ম্মাঃ প্রণশ্যন্তি ; ধর্ম্মে নষ্টে অধর্ম্মঃ কৃৎস্নম্ উত কুলম্ অভিভবতি।

কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়, এবং ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম সমুদয় কুলকে অভিভূত করে।

কুল-ধর্ম্ম অর্থে—জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যে শক্তি বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম নামে অভিহিত, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং ঐ শক্তি জীবের দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডকে যে ভাবে ধারণ করিয়া রাখে, তাহাকে কুল-ধর্ম্ম বলিয়া বিশিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। উহা আকর্ষণীশক্তি বা প্রণব, এ কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। যেমন সূর্য্য স্বীয় শক্তি-প্রভাবে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে এবং পৃথিবী তদুপরিস্থ বস্তুনিচয়কে আকৃষ্ট করিয়া রাখে, তদ্রূপ বিরাট্ প্রণব-শক্তি জীবাত্মাকে এবং জীবাত্মা দেহকে ধারণ করিয়া থাকেন। কুলক্ষয় হইলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি উচ্ছেদিত হইলে, ঐ কুল-ধর্ম্ম হইতে আমরা বিচ্যুত হই। ইন্দ্রিয়াদিই আত্মাকে বহিঃপ্রকৃতির সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখে। ইন্দ্রিয়াদির উচ্ছেদে সে সংযোগ বিনষ্ট হয় ; সুতরাং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আদি আকারে সে বহিঃপ্রকৃতি আমাদিগের কুলে বা জীবভাবাপন্ন অবস্থায় আর প্রতিফলিত হইতে পারে না—সে কুল-ধর্ম্ম উচ্ছেদিত হয়। আমরা কি প্রকারে জীব-ভাবাপন্ন বা প্রকৃতিকোষে অবস্থান করিতেছি, একটু খুলিয়া বলি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক বিরাট্ আকর্ষণীশক্তির দ্বারা এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ধৃত হইয়া রহিয়াছে। জীব-সংস্কার ইন্দ্রিয়াদি প্রস্তুত করিয়া, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধরূপে সেই বহিঃপ্রকৃতি বা ব্রহ্মাণ্ডকে উপভোগ করে, অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতি ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জীবসংস্কারে প্রতিফলিত হইয়া, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আকার ফুটাইয়া তোলে। ঐ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধও ঐ প্রণবের বা আকর্ষণীশক্তির রূপান্তর। উহাই কুল-ধর্ম্মরূপে জীবকে অহর্নিশ ধারণ করিয়া রাখে। ঐগুলির সত্তাতেই আমরা আমাদের আমিত্ব উপলব্ধি করি। জীব-দেহরূপ মাতৃ-মন্দির, ঐগুলির দ্বারাই রচিত এবং ঐগুলিই মাতৃ-পূজার

উপাদান। উহা হইতে বিচ্যুত হইলে সাধারণ জীব, নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। সেই জন্য প্রণবের ঐরূপ রূপান্তরগুলি জীবের পক্ষে কুল-ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন কাচের কলম রৌদ্রের দিকে ধরিয়া দেখিলে, সে রৌদ্র বা সূর্য্যালোকে সপ্তবর্ণবিশিষ্ট দেখায়, তেমনই জীবের সংস্কারে ঐ বিরাট্ আকর্ষণীশক্তি প্রতিফলিত হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি-রূপে রঞ্জিত হয়। আমাদিগের সংস্কার যেন ঐ কাচের কলম, বহিঃপ্রকৃতি যেন সূর্য্যরশ্মি, এবং ঐ সূর্য্যালোকের বর্ণরাশি যেন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি। যদি আমরা ইন্দ্রিয়াদি উচ্ছেদিত করি, তাহা হইলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদিরূপে প্রবল শক্তিস্রোত আসিয়া আর আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না; এবং বিরাট্ সৃষ্টির সহিত আমাদিগকে সংযুক্ত করিয়া বা ধরিয়া রাখিতে পারে না,—সুতরাং ধর্ম্ম নষ্ট হয়। কেন না, এইরূপ ধারণ করিয়া রাখে বলিয়াই আকর্ষণী শক্তির নাম ধর্ম্ম।

আরও খুলিয়া বলি। প্রণব বা আকর্ষণী শক্তি সমগ্র ভুবন ওতপ্রোতভাবে পরিপ্লাবিত করিয়া, আকাশগঙ্গারূপে প্রবাহিতা। আকর্ষণী শক্তির আকুল প্রবাহ, সংস্কাররূপ উপকূলে সঙ্ঘাত করিতে করিতে, কালরূপ মহেশ্বরের জটাজাল ভেদ করিয়া, অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে। সংস্কার-উপকূলে সে আকুল প্রবাহ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আদি তরঙ্গভঙ্গে উল্লাসিত। জীবমণ্ডলী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আকারে সে প্রবাহ ভাঙ্গিয়া দিয়া মাতৃপূজা সমাপন করিতেছে। যেন সমুদ্রতীরে সাধকমণ্ডলী উপবিষ্ট হইয়া, করাঞ্জলি ভরিয়া সাগরবারি তুলিয়া, ভগবদুদ্দেশে আবার সাগরে ঢালিয়া দিতেছে। এ আকাশ-গঙ্গা তিন লোক ব্যাপিয়া প্রবাহিতা বলিয়া, ইহাকে ত্রিধারা বা ত্রিপথগা বলে। সুরধুনী, ভাগীরথী ও ভোগবতী, এই ত্রিলোকবাহিনীর তিনটী কল্পিত নাম। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, এই তিনরূপ স্রোত ইহাতে প্রবাহিত; তাই ইহার অন্য নাম ত্রিস্রোতা। এই আকাশ-গঙ্গায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া, ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া, অনন্ত জীবমণ্ডলী করাঞ্জলি ভরিয়া, তিন প্রকারে এ আকুল প্রবাহ পরিদর্শন করিতেছে। যাহারা তমোগুণরূপ স্রোতে নিমজ্জিত, পাতালস্থ সেই জীবমণ্ডলীর করাঞ্জলিতে তাহারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আদি ভোগরূপে তুলিয়া লইতেছে। তাই পাতালস্থ সে প্রবাহের নাম ভোগবতী। রজোগুণরূপ স্রোতে নিমগ্ন জীবমণ্ডলী সে

প্রবাহ হইতে করাঞ্জলি ভরিয়া, ঐ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধরূপ তরঙ্গকে অদৃষ্ট বা ভাগ্যফল বলিয়া গ্রহণ করিতেছে ; তাই মরলোকে ইহার নাম ভাগীরথী। সত্ত্বস্রোতস্থ জীবমণ্ডলী এ স্রোতকে অমৃতপ্রবাহরূপে জ্ঞাত হয় বলিয়া, সে সুরলোকে ইহার নাম সুরধুনী বা অমৃতপ্রদায়িনী। জীব! একই গঙ্গার একই প্রবাহ ত্রিলোকে এই তিনরূপে পরিগৃহীত হইতেছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধরূপ তরঙ্গভঙ্গগুলিকে কেহ উপভোগ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে এবং নিজে ভোক্তা সাজিতেছে ; কেহ কর্ম্মফল বা অদৃষ্টলিপি বলিয়া, তাহাতে ভোগসুখ না দেখিয়া, বিরাট্ শক্তির বিরাট্ তরঙ্গ-তাড়না বলিয়া অনুভব করিতেছে এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ঊর্দ্ধে নয়ন ফিরাইতে শিখিতেছে ;—কেহ বা সেই শব্দ-স্পর্শাদি তরঙ্গকে অমরপুরের অমৃতপ্রবাহ বলিয়া চিনিয়া, অমরনাথ মহেশ্বরের মৃত্যুঞ্জয়-রূপ উপলব্ধি করিয়া, অমরত্বের আস্বাদন পাইতেছে বা মৃত্যুঞ্জয় হইতেছে। জীব! তুমি শেযোক্তরূপে আকাশ-গঙ্গার এ তরঙ্গ-প্রবাহকে দেখ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধরূপে সে আকাশগঙ্গার প্রবাহ তোমার সংস্কাররূপ কূলে লাগিয়া যে তরঙ্গভঙ্গ সৃজন করিতেছে, তাহাতে ভোগ হইলেও, ভোগ বলিয়া গ্রহণ করিও না, কর্ম্মফল হইলেও, তাহাতে নিরাশ হইও না। উহাকে অমৃত-প্রবাহ বলিয়া পরিজ্ঞাত হও ; অমৃত-প্রবাহের অমৃতবারি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধগুলিকে অমৃতাঞ্জলি বলিয়া গ্রহণ করিয়া, মৃত্যুঞ্জয়ের চরণ উদ্দেশ্যে ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া, সে অমৃত-প্রবাহে ঢালিয়া দাও। স্রোত ঊর্দ্ধমুখী হইবে—গা ভাসাইয়া চলিয়া যাও, মৃত্যুঞ্জয়ের চরণে গিয়া ঠেকিবে। তুমি উপকূল ছাড়িয়া কূল পাইবে।

ইহাই কুল-ধর্ম্ম। এইরূপে জগদ্ভোগকে পরিদর্শন করাই আমাদের সনাতন ধর্ম্ম। কেন না, এ অকুল পাথারে কূল পাইতে হইলে, এইরূপে যতক্ষণ না জগদ্ভোগকে উপলব্ধি করা যায়, ততক্ষণ বালুকাময় ইতস্ততঃসঞ্চারি সংস্কাররূপ উপকূলে থাকিতে হয়। ততক্ষণ স্রোত ফেরে না বা ততক্ষণ ঊর্দ্ধমুখী স্রোতের সন্ধান পাওয়া যায় না।

ইন্দ্রিয় না হইলে, এ অমৃতাস্বাদের সম্ভাবনা নাই বলিয়া, তাই যতক্ষণ না ঊর্দ্ধস্রোতের সন্ধান পাওয়া যায়, ততক্ষণ উপকূলে থাকিতে হয়, ততক্ষণ সে কূলের ক্ষয় করিতে নাই —ততক্ষণ সে কূল ক্ষয় করিলে, সনাতন কুল-ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়।

ঐরূপ ধর্ম্ম নষ্ট হইলে বা সংস্কারজনিত ইন্দ্রিয়রূপ উপকূল ভঙ্গ করিলে, যদ্যপি শুধু ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া ক্ষান্ত হইত, তাহা হইলেও জীবের অনেকটা আশ্বাসের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা হয় না—ধর্ম্ম নষ্ট হইলেই অধর্ম্ম আসিয়া পড়ে। ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলেই অধর্ম্মের কবলে জীবকে পড়িতে হয়। স্রোতস্বিনীর জলে জীবের স্থির হইয়া দাঁড়াইবার উপায় নাই। হয় উর্দ্ধে, নতুবা নিম্নে—গতি এক দিকে হইবেই হইবে। আলোক অথবা অন্ধকার—সুখ অথবা দুঃখ—হর্ষ অথবা বিষাদ—পাপ অথবা পুণ্য—ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম,স্রোতে যতক্ষণ থাকিবে, গতি ততক্ষণ হইবেই। পাপও নাই, পুণ্যও নাই—ধর্ম্মও নাই, অধর্ম্মও নাই—হর্ষও নাই, বিষাদও নাই, সে অবস্থা কুল না পাইলে হয় না। সেই জন্যই ইন্দ্রিয়াদি বা সংস্কার-রূপ উপকূল ধরিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। উর্দ্ধমুখী স্রোতের সন্ধান যত দিন পাওয়া না যায়, তত দিন স্রোতে গা ভাসাইতে নাই। মাতৃ-আকর্ষণের উর্দ্ধমুখী বন্যাতরঙ্গ আসিয়া, যত দিন না উর্দ্ধ দিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়া যায়, তত দিন উপকূলকে অবহেলা করিও না। তত দিন মায়া-বালুকারচিত উপকূলে বসিয়া, বন্যার অপেক্ষা কর। নতুবা শুধু ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না—অধর্ম্মও আসিয়া জুটিবে। আবার পাতাল-পুরে ভোগবতীর জলে গিয়া প্রক্ষিপ্ত হইবে। অনেক দিন ভাসিয়া ভাসিয়া—অনেক স্রোতে হাবুডুবু খাইয়া—অনেক বালুকাময় চরে ঠেকিয়া, মনুষ্যরূপ ইন্দ্রিয়স্ফুটসম্পন্ন উপকূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছ। ভোগবতীর জল ছাড়িয়া ভাগীরথীর জলে আসিয়া পৌঁছিয়াছ। ভোগ ছাড়িতে ও কর্ম্মফল, অদৃষ্ট, ভাগ্য বলিয়া চিনিতে শিখিয়াছ। ভাল করিয়া শিক্ষা কর। কর্ম্মময় ভাগীরথী-কুলকে কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া দেখ, ভোগবতীর ভোগময় কুল বলিয়া দর্শন করিও না। এবং সুরধুনীর কুলে পৌঁছাইবার জন্য অপেক্ষা কর। এখন আমরা উর্দ্ধস্রোতের সন্ধান পাই নাই—এখন নিম্নমুখী স্রোতের খরতর প্রবাহ হইতে উঠিয়া আক্রান্তচরণে এই চরে ঠেকিয়াছি মাত্র। এখন সহসা চর ছাড়িয়া জলে পা দিলে, পাছে আবার নিম্নস্রোতে গিয়া পড়ি, এই ভয়ে অহরহঃ সতর্ক থাকিতে হয়।

ইহাই কুল-ধর্ম্ম। তন্ত্রে ইহারই আচার পদ্ধতি কুলাচার বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না—ইহারই তান্ত্রিক নাম। আজ্ঞাচক্রই উপকুলরূপে বর্ণিত। সহস্রার—কুলরূপে লিখিত। নিম্নাধিকারী সাধক যখন এই আজ্ঞাচক্রের সন্ধান পায়—এই আজ্ঞাচক্রে গিয়া যখন উপবেশন করিতে পারে, তখন সেইখানে তাহাকে উর্দ্ধস্রোতের অপেক্ষা করিতে হয়। নিম্নাধিকারীরা আজ্ঞাচক্রে উঠিতে

পারে সত্য, কিন্তু অধিকক্ষণ অবস্থান করিতে পারে না। ক্ষণপরে ভোগবতীর টানে পড়িয়া আবার নিম্নস্থ হয়—আবার ভোগক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে এবং জগদ্ভোগে পূর্ব্ববৎ মাতে। এইরূপে বার বার অভ্যস্ত হইবার পর, বার বার আজ্ঞাচক্রে গিয়া ও তাহা হইতে পুনঃ প্রক্ষিপ্ত হইয়া, শেষ এক সময়ে সে চক্রে অবস্থান করিবার শক্তি পায় ও সেখানে উর্দ্ধ স্রোতের জন্য অপেক্ষা করিতে সক্ষম হয়। শুধু সাধক নহে, প্রত্যেক মনুষ্যই আজ্ঞাচক্র বার বার স্পর্শ করিয়া ফিরিয়া আসে। যখন মনুষ্য কোন কাজ সম্পন্ন করে, আজ্ঞাচক্রের স্পর্শ বিনা সে কাজ সম্পন্ন হইতে পারে না। যে কোন কাজ করিতে হইলে মনোময় ক্ষেত্রে বা ঐ আজ্ঞাচক্রে তৎসম্বন্ধে ঈষৎ সমাধির প্রয়োজন। ঈষৎ সমাধি হইয়া, সেই কার্য্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ঈষৎ আভাস গ্রহণ করিয়া, তবে মনুষ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। কার্য্যমাত্রেই যোগ—কার্য্যমাত্রেই ষড়ঙ্গ যোগ সম্পাদিত হয়—কার্য্যমাত্রেই আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি আছে। প্রত্যেক কার্য্যের ভিতর এ ছয়টী স্তর স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এ ছয়টী স্তরের সাহায্য বিনা কোন কাজ সম্পাদিত হইতে পারে না।

যে কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলেই, সেই সেই কার্য্যোপযোগী আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও শেষ সমাধিলাভ হইয়া তবে কার্য্য সম্পাদিত হয়। মনে কর, তুমি একখানি পত্র লিখিবে। লিখিতে হইলে যেরূপ-ভাবে উপবেশনে অভ্যস্ত, প্রথম সেইরূপে তোমায় উপবেশন করিতে হইবে। দৌড়াইবার মত বা কলহ করিবার সময়ের মত বা নিদ্রা যাইবার মত অঙ্গাদির অবস্থা হইলে লেখা সুদুষ্কর; সুতরাং লিখিবার উপযোগী ভাবে অঙ্গভঙ্গ না করিলে লেখা হয় না। তোমার লেখারূপ কার্য্য সম্পাদনের পক্ষে উহাই আসন। আসন অর্থে কার্য্যকে সুগম করিবার পক্ষে উপযুক্তরূপে অঙ্গ সকলকে সম্বদ্ধ করা। যেরূপে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থাপন করিলে কার্য্য সুখে বা অনায়াসে সম্পাদনের পক্ষে সহায়তা করে—তাহাই সুখাসন। যোগশাস্ত্রে আসন শব্দের ইহাই উদ্দেশ্য।

যাহা হউক, তার পর প্রাণায়াম। বিশেষ বিশেষ কার্য্যোপযোগী ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংযমনকে প্রাণায়াম বলে। আমাদের শ্বাসপ্রবাহ একভাবে সকল সময়ে চলে না। আহারের সময়ে এক রকমে, চলিবার সময়ে এক রকমে, নিদ্রার সময়ে এক রকমে, বাক্যালাপের সময়ে এক রকমে, ক্রোধোদ্রেকের সময় এক রকমে,

ভক্তিভাবের উচ্ছ্বাসের সময় এক রকমে, প্রতি কার্য্যের সময়ে বিশেষ বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত ও তৎকার্য্যোপযোগিরূপে প্রবাহিত হয়। নিদ্রার সময়ে যে ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস বহে, লিখিবার সময়ে সে ভাবে শ্বাস বহে না। লিখিবার সময়ে শ্বাসের গতি অন্যরূপ। অর্থাৎ মানসিক অবস্থা যে ভাবে যখন পরিবর্ত্তিত হয়, শ্বাসবায়ুও সে মানসিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে এবং তদ্রূপ ভাবে শ্বাস প্রবাহিত হওয়াই সেই সময়ের উপযোগী প্রাণায়াম। ঈশ্বরচিন্তার সময়ে যে ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসকে অনুশাসিত করিবার ব্যবস্থা আছে, সাধারণতঃ তাহাকেই প্রাণায়াম বলে ; এবং পাতঞ্জলদর্শনে সেই অবস্থার কথাই উল্লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু যোগদর্শনের চক্ষে প্রত্যেক কার্য্যপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎকার্য্যোপযোগী ভাবে শ্বাস-প্রবাহের পরিবর্ত্তনের ও অনুশাসনের নামই প্রাণায়াম। যাহা হউক, লিখিবার কালে যেমন লিখনোপযোগী ভাবে অঙ্গাবস্থিতি বা আসন রচিত হয়, শ্বাসপ্রবাহও তদ্রূপ লিখনোপযোগী ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় ও উহাই লিখিবার প্রাণায়াম।

এইরূপ প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান প্রভৃতি প্রত্যেক যোগাঙ্গ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক কার্য্যের স্ব স্ব স্বভাবানুযায়ী চিত্তকে চারি ধার হইতে প্রত্যাহরণ করিতে হয় ; ঈশ্বরচিন্তা করিবার সময়ে মন নিমন্ত্রণের চিন্তায় ব্যস্ত থাকিলে, জিহ্বার সুখকল্পনা ছাড়া আর কিছু হয় না। ইষ্টদেবতার চরণকমল ধারণা করিতে গিয়া, রসগোল্লার মুখকমল ফুটিয়া উঠে। লিখিবার সময়ে মানসিক ভাব লিখন সম্বন্ধে প্রত্যাহৃত না হইলে কলম হাতেই থাকে, কালি খরচ আর বড় একটা করিতে হয় না। যখন লেখা সম্পন্ন হইতেছে দেখিবে, তখন বুঝিতে হইবে, প্রত্যাহার ঠিক হইয়াছে।

এই ভাবে প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও শেষ লিখনভাবের উপর একটু মানসিক সমাধি আসিয়া, তারপর কি লিখিবে—কিরূপে লিখিবে, সেটা স্থির হইয়া যায় ও তারপর অক্ষরসকল অঙ্কিত হইয়া থাকে।

এইরূপে প্রত্যেক কার্য্য সম্পাদনেই আমাদিগকে আজ্ঞাচক্র স্পর্শ করিতে হয়। যোগ বুঝাইবার সময় ইহা সবিস্তারে আলোচনা করিব।

যাহা হউক, ইন্দ্রিয় উচ্ছেদ করিলে, কি প্রকারে আমরা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত থাকারূপ কুলধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হই, তাহা বুঝা গেল। এবং কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে কেন, তাহাও আলোচিত

হইয়াছে। যাহা আমাদিগকে ক্ষেত্রে ধারণ করিয়া রাখিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ করিয়া দেয়, যাহা আমাদিগকে মাতার মত ক্রোড়ে করিয়া লালন পালন করিয়া, তারপর পত্নীর মত আমাদের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হয়, যাহা শক্তিরূপে আগে সঞ্চিত হইয়া, তারপর মুক্তিরূপে আমাদিগের কল্পিত বন্ধনরাশি উন্মুক্ত করিয়া দেয়, তাহাই ধর্ম্ম এবং তদ্‌বিপরীত যাহা, তাহাই অধর্ম্ম। যেখানে - যে কার্য্যে ধর্ম্ম ঐরূপে ক্রিয়াশীল নহে, তাহাই অধর্ম্ম অথবা যেখানে বা যে কার্য্যে ঐরূপ ধর্ম্মের অভাব পরিদৃষ্ট হয়, তাহাই অধর্ম্ম। ধর্ম্মহীনতাই অধর্ম্ম। অনেকে মনে করেন, ধর্ম্মজনক কার্য্য না করিলে অধর্ম্ম হয় না। অধর্ম্মজনক কার্য্য করিলেই তবে অধর্ম্ম হয়; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা সত্য নহে। ধর্ম্মজনক কার্য্য না করাই অধর্ম্ম। অধর্ম্মজনক বা ধর্ম্মধ্বংসী কার্য্য করিলে অধর্ম্ম ত হইবেই, কিন্তু ধর্ম্মজনক কার্য্য না করিলেও অধর্ম্ম হইবে, এটি অনেকে ধারণা করেন না। আমাদিগের ভিতর যে সমস্ত সূক্ষ্ম সাত্ত্বিক গুণ প্রচ্ছন্নভাবে আছে, ধর্ম্মজনক কার্য্য করিলে সেগুলি স্ফুরিত হইয়া উঠে; অধর্ম্মজনক কার্য্য করিলে বা ধর্ম্মজনক কার্য্য না করিলে, এই উভয়েতেই সে শক্তি স্ফুরিত হইতে পায় না; সুতরাং সে শক্তিগুলি অবরুদ্ধ থাকিয়া থাকিয়া জড়ে পরিণত হয়। সেই আশঙ্কায় অর্জ্জুন বলিতেছেন,—

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪০

কৃষ্ণ! অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি; বার্ষ্ণেয়! স্ত্রীষু দুষ্টাসু বর্ণসঙ্করঃ জায়তে।

অধর্ম্মে অভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ দূষিত হয়; হে বার্ষ্ণেয়! কুলস্ত্রী দূষিতা হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে।

কুলস্ত্রী অর্থে—কুলশক্তি বা জগৎসম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিয়া যে সকল শক্তি আমাদের অভ্যন্তরে আপনা হইতে সঞ্চিতা হয়, তাহাদিগকে কুলস্ত্রী বলে। আমরা ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে থাকিয়া এবং ইন্দ্রিয়-সকলের সদ্ব্যবহার দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিতে থাকি। ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে থাকিয়াই আমরা দয়া, প্রেম, স্নেহ, ভক্তি, জ্ঞান, বিবেক ইত্যাদি বিবিধ শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকি। কিন্তু এগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদিগের ভিতর ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে। সেগুলির কার্য্য আরও উচ্চ অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। ইন্দ্রিয় উচ্ছেদিত

হইলে এ শক্তিগুলি আর স্ফুরিত হইতে পায় না ; ক্রমশঃ দূষিত হইয়া যায়। যেমন তরবারি ব্যবহার করিলে এবং তাহাকে তীক্ষ্ণ করিবার জন্য প্রকৃষ্ট উপায়ে ঘর্ষণ করিলে, তাহার তীক্ষ্ণতা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, কিন্তু অন্যায়রূপে ব্যবহার করিলে বা অন্যায়রূপে ঘর্ষণ করিলে, কিম্বা ব্যবহার একেবারে বন্ধ করিয়া দিলে তাহার তীক্ষ্ণতা নষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহাকে কার্য্যাক্ষম করিয়া ফেলে, তদ্রূপ ধর্ম্মকার্য্য করিলে বা ইন্দ্রিয়-সকলের সদ্ব্যবহার করিলে, আমাদিগের উক্ত আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি ফুটিয়া উঠে ; এবং অধর্ম্মজনক কার্য্য করিলে বা ইন্দ্রিয় উচ্ছেদিত করিয়া কার্য্য একেবারে বন্ধ করিয়া দিলে, সে শক্তিগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ আমাদিগের ঐ কুলস্ত্রী বা কুলশক্তি-সকল দূষিত হয়। যত দিন না আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তির তীক্ষ্ণতা উত্তমরূপে সম্পাদিত হয়, তত দিন আমাদিগকে প্রাকৃতিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। যত দিন না আমরা পূর্ণ ঐশ্বর্য্যময় হইয়া উঠি, তত দিন আমাদিগকে ইন্দ্রিয় ধর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া কার্য্যক্ষেত্রে বা ধর্ম্মক্ষেত্রে অবস্থান করিতে হইবে।

আর কুলশক্তি দূষিতা হইলে বর্ণসঙ্কর হয়। প্রত্যেক জীবের বর্ণ বা জ্যোতিঃ আছে। যে যেমন গুণান্বিত, তাহার জ্যোতিঃ সেইপ্রকার বর্ণের ; যোগচক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি জীবের সে জ্যোতিঃ দেখিতে পান। সাধারণতঃ সাত্বিকভাবাপন্ন জীবের বর্ণ শুভ্র। রাজসিক ভাবাপন্ন জীবের জ্যোতিঃ রক্তবর্ণ। রজঃ ও তমোগুণান্বিত জীবের জ্যোতিঃ পীত এবং তমে আচ্ছন্ন জীবের জ্যোতিঃ ধূম্রবর্ণ। আমাদিগের আধ্যাত্মিক দেহের এই প্রকার বর্ণ-বিভিন্নতাই হিন্দুর জাতিভেদের মূল কারণ। সেই জন্য জাতিবিচারের প্রশস্ত নাম—বর্ণ-বিচার। আবার এই সমস্ত বিভিন্ন বর্ণীয় জীব যখন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মগ্ন হয়, অর্থাৎ যখন তাহাদের প্রাণে যেরূপ ভাবের উদয় হয়, তাহাদিগের এই ছটার উপর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রতিফলিত হইতে থাকে। ক্রোধের সময় এক প্রকার, দয়ার সময় এক প্রকার, ভক্তির সময় এক প্রকার, এইরূপ ভাবান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণান্তর আমাদিগের সূক্ষ্ম দেহকে রঞ্জিত করে। আবার সে ভাব বিদূরিত হইলে, সে অস্থায়ী জ্যোতিঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপ অহর্নিশ নানাপ্রকারের জ্যোতির তরঙ্গে ক্ষুব্ধ হইয়া, আমাদিগকে এক-প্রকার সাধারণ স্থায়ী জ্যোতির্ম্মণ্ডিত বলিয়া অনুমিত হয়। সাত্বিক জীবের প্রাণে অহর্নিশ পবিত্র ভাব সকল উন্মেষিত হয় বলিয়া, তাহার দেহের বর্ণ-বিন্যাসকে সাধারণতঃ শুভ্র, মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডবৎ দেখায়। রাজসিক ব্যক্তির আধ্যা-

ত্মিক দেহ অহর্নিশ ক্রোধ, চঞ্চলতা আদি রাজসিক বৃত্তির রক্তবর্ণীয় তরঙ্গে আপ্লুত হয় বলিয়া, রাজসিক ব্যক্তিদিগকে সাধারণতঃ রক্তবর্ণীয় দেখায়। রজঃ ও তমোগুণ-মিশ্রিত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ বৈষয়িক বুদ্ধিবৃত্তিতে নিবিষ্ট থাকে বলিয়া, তাহাদিগকে পীতবর্ণের দেখায়। এবং তামসিক ভাবাপন্ন জীব-সকলকে ধূম্রবর্ণের বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

যাহা হউক, আমাদিগের পূর্ব্বোল্লিখিত কুলশক্তিসকল যদি স্ফুরিত হইবার অবসর না পায়, তাহা হইলে তাহারা বৃত্তি-সকলকে পরিচালিত করিতে এবং স্ব স্ব বর্ণে আমাদিগের আধ্যাত্মিক দেহকে রঞ্জিত করিতে পারে না। সুতরাং আমাদিগের স্থায়ী বর্ণরঞ্জনা সম্যক্ স্ফুরিত হইতে পায় না ও অন্য বর্ণে দূষিত হয়। মনে কর, তুমি সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তি, তুমি সাধারণতঃ দেখিতে শুভ্রবর্ণের; তোমার প্রাণে সর্ব্বদা সাত্ত্বিক ভাবসকল উদ্দীপিত থাকে বলিয়া, সাত্ত্বিক-ভাবের শুভ্র জ্যোতিতে তুমি নিমজ্জিত থাক। কিন্তু যদি কোন কারণে তোমার প্রাণে সাত্ত্বিক ভাব আর উদ্দীপিত না হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে রাজসিক ভাব সমধিক প্রবল হয়, তাহা হইলে তোমার সে স্থায়ী শুভ্র বর্ণের সহিত রক্তবর্ণ মিশ্রিত হইয়া, বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে।

এই বর্ণ-সঙ্কর অতীব দূষণীয়, এবং নরকের দ্বার-স্বরূপ। কিন্তু আগে বর্ণসকল কি প্রকারে স্ফুরিত হয়, বুঝাইয়া বলি; নতুবা সঙ্কর-দোষ বুঝিতে পারা যাইবে না।

তড়িদ্‌বিজ্ঞানবিদেরা জানেন, এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সাধারণতঃ তড়িৎশক্তির আধার। সেই তড়িৎসমুদ্র কোন প্রকারে সংঘর্ষিত বা প্রতিহত হইলে, উহা দুই প্রকারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং দুই প্রকারের তড়িৎ-শক্তি ক্রিয়াশীল হয়। একটীর নাম ধন-তড়িৎ বা পিতৃশক্তি, অন্যটীর নাম ঋণ-তড়িৎ বা মাতৃশক্তি। এই দুই প্রকারের তড়িৎশক্তি দুই দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া, আবার পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে ও মিলিত হইবার জন্য যত্নশীল হয়। উভয় তড়িৎ-শক্তির এই মিলনেচ্ছাই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূল। ইহাদিগের মিলনের তারতম্যেই সৃষ্ট পদার্থের এত তারতম্য।

যাহা হউক, আমাদিগের প্রাণশক্তিও তদ্রূপ তড়িদাধার মাত্র। সেই প্রাণ-শক্তিরূপ তড়িৎসমুদ্র শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ স্বাভাবিক সংস্কারজাত ক্রিয়ার দ্বারা অহর্নিশ প্রতিহত ও সংঘৃষ্ট হইতেছে। এবং সেই প্রতিঘাতের ফলস্বরূপ

পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে ও পুনরায় মিলিবার জন্য সচেষ্ট হইতেছে। এইরূপ ঐ পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তির বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনের ফল-স্বরূপ আমাদিগের প্রাণে ভাবরাশিরূপ সৃষ্টি-বৈচিত্র্য অহর্নিশ সূচিত হইতেছে ও সেই ভাবসকল ঐ তড়িৎ-স্ফুরণের জ্যোতিতে বা বর্ণে রঞ্জিত হইতেছে। মেঘ-রাশির সঞ্চালনে যেমন শূন্যস্থ বা ঐ মেঘস্থ লুকান তড়িৎ বিদ্যুদাকারে ঝলসিয়া উঠে ও মনুষ্য-চক্ষে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ আমাদিগেরও তড়িৎ সক্রিয় হইয়া, ভালরূপে জ্যোতিঃ বা বর্ণ-বিশিষ্ট হইয়া, আমাদিগের আধ্যাত্মিক দেহে বর্ণবিন্যাস রচনা করে। ভাবরূপ বিদ্যুন্মেখলা অহর্নিশ চমকিত থাকিয়া, আমাদিগের প্রাণময় কোষটীকে জ্যোতির্ম্মণ্ডিত করিয়া রাখে। বিরাট্ জগতে অনন্ত কোটি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী মাতৃপ্রাণের ভাবস্বরূপে ফুটিয়া রহিয়াছে। মহাশক্তির ভাবসকল অসীম শক্তিসংযুক্ত বলিয়া, তাহা ঘনীভূত হইয়া জড়াকারে ফুটিতে সক্ষম; আমরা দুর্ব্বল বলিয়া আমাদের ভাবসকল ভাবরূপেই থাকে ও মিলাইয়া যায়, ঘনীভূত হইয়া জড়াকারে বা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া ফুটিয়া উঠিতে সক্ষম হয় না। আমরা শক্তিমান্ হইলে, আমাদের ভাবসকলও মায়ের প্রাণের ভাবগুলির মত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারিত বা আমরা জড়বস্তু-সকল নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইতাম। ভাব—শক্তির চৈতন্যময় বিকাশ, স্থূল জগৎ সেই ভাবের পূর্ণ ঘনীভূত বিকাশ। ভাবে ও স্থূল-জগতে পরিমাণের তারতম্য ছাড়া অন্য কিছু প্রভেদ নাই। আমাদিগের প্রাণে যখন যে প্রকারের ইচ্ছাশক্তি স্ফুরিত হয়, আমরা শক্তিমান্ হইলে, ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল বস্তু সৃজিত হইতে পারিত। স্থূলজগৎ ভাবেরই ঘনীভূত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থা মাত্র।

যাহা হউক, আমাদিগের ভাব-সঞ্জাত প্রাণময় কোষের ঐ বর্ণ-রঞ্জনা আমাদিগের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। আমাদিগের দেহ ঐরূপ বর্ণ-ছটায় রঞ্জিত না থাকিলে বা আমাদিগের দেহ হইতে ঐরূপ বর্ণালোক অহর্নিশ স্ফুরিত না হইলে, অপরের ভাবসকল অনায়াসে নির্ব্বিঘ্নে আমাদিগের প্রাণে প্রবিষ্ট হইত এবং সেই সকল মিশ্রিত ভাবের দ্বারা আমরা পরিচালিত হইতাম; আমাদিগের স্ব স্ব ভাবসকল ফুটিয়া উঠিবার অবসর পাইত না। বহির্জ্জগতের জীবসমষ্টির ভাবস্রোত আমাদিগের প্রাণকে অহর্নিশ প্লাবিত করিত। স্থূল কথায়, আমাদিগের ভাবের স্বাতন্ত্র্য কোন ক্রমেই রক্ষা হইত না। কোন গৃহে যদি প্রদীপ বা কোন আবরণ-হীন আলোক জ্বলে, সেই গৃহে অন্য একটী আবরণ-

হীন আলোক জ্বালিয়া লইয়া গেলে, উভয় আলোক-তরঙ্গ সহজে মিশিয়া যায়; কিন্তু লাল, পীত, হরিৎ ইত্যাদি কোন আবরণের ভিতর দিয়া যদি ঐ গৃহস্থ আলোকটির জ্যোতিঃ বাহির হইত বা ঐ গৃহের আলোকটী যদি কোন বর্ণাবরণে আবৃত থাকিত, তাহা হইলে গৃহটি সেইরূপ লাল অথবা পীত বর্ণের আলোকে আলোকিত হইত; এবং সেই গৃহে অন্য কোনরূপ বর্ণের আবরণে আবৃত আলোক লইয়া আসিলে, সে উভয় আলোক সহজে মিশ্রিত হইত না।

মনে কর, একটী লাল ফানস-সংযুক্ত আলোক কোন গৃহে জ্বলিতেছে, এবং গৃহটী রক্তবর্ণের দেখাইতেছে। যদি ঐ ঘরে একটী নীল আবরণে আবৃত ক্ষীণ আলোক লইয়া আসা যায়, তাহা হইলে ঐ গৃহটীর লাল বর্ণ-রঞ্জনা সহজে তিরোহিত হয় না, ঐ লাল ও নীল বর্ণ-তরঙ্গ পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন বলিয়া, পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিবার প্রয়াস পায় এবং স্ব স্ব শক্তি অনুযায়ী স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সক্ষম হয়।

এইরূপ স্বাতন্ত্র্য রক্ষণের জন্যই আমাদিগের প্রাণময় কোষের উপর বর্ণবিন্যাস রচিত; এবং সেই জন্যই হিন্দুরা বর্ণ বিচারের জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করেন। নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া যাইতে না পারিলে, উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। উন্নতির পথ সাধারণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত; সেই চারি প্রকার অবস্থায় চারি প্রকার বর্ণ জীব প্রাপ্ত হয়। শূদ্রত্ব বা ধূম্র-বর্ণীয় অবস্থা হইতে ব্রাহ্মণত্ব বা শুক্লবর্ণ লাভ করিতে হইলে, পীতত্ব ও লোহিতত্ব বা বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব, এ দুইটী অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। কিন্তু আগে শুক্লত্ব লাভের আবশ্যকতা কি, তাহা বলি।

যেমন স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য প্রত্যেকের দেহে বর্ণ-রঞ্জনা প্রয়োজন, তেমনই আবার শুক্লবর্ণ স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। শুক্লবর্ণ অন্য কোন বর্ণ-তরঙ্গকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না—সকল প্রকার বর্ণ-রঞ্জনাকে শুক্লবর্ণ প্রত্যাখ্যান করে। এবং অপরের সহিত মিশ্রিত হইবার ভয় হইতে শুক্লবর্ণ আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করে। একবার শুক্লত্ব লাভ করিলে, তাহা হইতে পতন সহসা হয় না। শুধু তাহাই নহে, শুক্লবর্ণীয় ভাব-সকল যত দিন না প্রাণের ভিতর অহর্নিশ ফুটিতে থাকে বা যত দিন না আমরা শুক্লত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করি, তত দিন ভগবত্তত্ত্ব বা বর্ণ-শূন্যত্বরূপ মহাতত্ত্ব প্রাণে ফুটে না। এবং তত দিন মুক্তি সুদূর-পরাহত। মুক্তির পূর্ব্বে

শুক্লত্ব লাভ করিতে হইবেই। জাতি-বিচার আলোচনার সময় এ তত্ত্ব আরও বিশদরূপে বিবৃত করিব।

মোটের উপর আমরা এই বুঝিলাম, শুক্লত্ব লাভ আমাদিগের একান্ত প্রয়োজন, শুক্লত্ব আমাদিগের স্বাতন্ত্র্য সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করে ও মুক্তির জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া দেয়।

তাই বর্ণহীনা মা আমার রজত-শুভ্র মহেশ্বরের বুকে দাঁড়াইয়া, দেখিতে পাই। তাই* মহেশ্বর যোগীর চক্ষে রজত-কল্প-গিরিসদৃশ প্রতীয়মান হন। তাই শ্রীকৃষ্ণের পাশে বলরামের শুভ্র বপু পরিশোভিত।

আমরা আমাদিগের এই ইন্দ্রিয়-সকলের ও আধ্যাত্মিক শক্তি-সকলের দ্বারা অনুশাসিত হইয়া, আমাদিগের অবস্থানুযায়ী ক্রমশঃ ধূম্রবর্ণ হইতে পীত, লোহিত, এই দুই স্তর ভেদ করিয়া, ধীরে ধীরে শুক্লত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছি। এবং আমাদিগের শাস্ত্র স্তর হইতে স্তরান্তরে যাইবার সুগম পন্থাসকল জাতিধর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে এক স্তর হইতে অন্য স্তরে বর্ণসঙ্কর-দোষে সবিশেষ দূষিত না হইয়াও ধনুর্ম্মুক্ত তীরের মত যাওয়া যায়, তাহাই তাঁহারা যোগশক্তির সাহায্যে পরিদর্শন করিয়া, তদুপযোগী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা মানব-প্রকৃতির ক্রমোন্মেষ-সূচক গতি লক্ষ্য করিয়া এবং সেই গতির পশ্চাদনুসরণ করিয়া, তাহারই সাহায্যার্থে বিধিনিষেধ-সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আজ আমরা সকলেই ভৌম পণ্ডিত হইয়া বসিয়াছি, এবং কথায় কথায় শাস্ত্রের সমালোচনা ও তাহার দোষ-গুণ বিশ্লেষণ করিতেও কুণ্ঠিত নহি। কিন্তু যোগচক্ষু না পাইলে শাস্ত্রের সমালোচনা করা চলে না, এ কথা আমরা একেবারে বিস্মৃত।

যাহা হউক, ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়-সকল হইতে উচ্ছেদিত হইলে, আমাদিগের আধ্যাত্মিক শক্তিসকল নষ্ট হইয়া যায় এবং আমাদিগের পিণ্ডদেহের বর্ণ পূর্ব্বোক্ত স্তর অবলম্বন করিয়া থাকিতে না পারিয়া, ঐ শক্তি-নাশের তারতম্য অনুসারে মিশ্রিত বর্ণে প্রতিফলিত হইয়া উঠে ; আমরা স্বাভাবিক শৃঙ্খলাবন্ধনময় স্তর-পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া, সঙ্করদোষে দূষিত হইয়া, পথভ্রষ্টরূপে বিচরণ করিতে থাকি।

---

* "শিবের বুকে শ্যামা কেন?" পাঠ কর।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১

কুলঘ্নানাং কুলস্য চ সঙ্করঃ নরকায় এব (ভবতি), এষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ পিতরঃ পতন্তি হি।

কুলঘ্নদিগের কুলের বর্ণসঙ্কর নরকবাসের জন্য হইয়া থাকে। ইহাদের পিতৃগণ লুপ্তপিণ্ডোদক হইয়া পতিত হয়।

বর্ণ-সঙ্কর নিম্নগতির কারণ। একবার মিশ্র বর্ণ প্রাপ্ত হইলে, উন্নতির পথ হইতে কিছু দিনের জন্য বিচ্যুত হইতে হয়; এবং পিতৃলোক তাহার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয়। আমাদিগের সহিত পিতৃলোকের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এবং আমাদিগের সাহায্যে আমাদিগের পিতৃগণের উৰ্দ্ধগতি-প্রাপ্তি অসম্ভব নহে। যদি আমাদিগের সূক্ষ্মদেহ বা পিণ্ডদেহ সঙ্কর-দোষে দূষিত হয়, তাহা হইলে আমরা পিতৃতর্পণাদি-ক্রিয়া দ্বারা পিতৃলোকে আমাদিগের সূক্ষ্ম শক্তি চালনা করিয়া, তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পারি না। আমাদের বর্ণসঙ্করবশতঃ সে শক্তি-স্রোত পিতৃগণের সহিত সমবর্ণীয় না হওয়ায় প্রত্যাহত হয়। পিতা অপেক্ষা পুত্রের পিণ্ডদেহের বর্ণ উৰ্দ্ধস্তরীয় হইলে, পিতৃলোকের পক্ষে অত্যন্ত সুখকর ও সাহায্যকারী হয়; কিন্তু বর্ণ যদি নিম্ন স্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে পুত্রের দ্বারা পিতার কোন সাহায্য হইতে পারে না। মনে কর, তুমি ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও কর্ম্মানুসারে তোমার পিণ্ডদেহের বর্ণ শুভ্রত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছে। তুমি বাহিরে জন্ম হিসাবে ক্ষত্রিয় হইলেও, তুমি বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ হইয়াছ এবং পরজন্মে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে। এরূপ অবস্থায় তোমার তর্পণাদি তোমার ক্ষাত্র পিতৃগণকে তাঁহাদিগের উৰ্দ্ধগতি লাভের পক্ষে বিশেষভাবে সহায়তা করিতে সমর্থ। কিন্তু যদি স্বীয় কর্ম্মদোষে তুমি ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও শূদ্রত্ব বা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাক, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ হইতে চ্যুত হইয়া, যদি পীতত্ব বা কৃষ্ণত্ব লাভ করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও বৈশ্যত্ব বা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ বুঝিতে হইবে এবং পরজন্মে বৈশ্য-কুলে কিম্বা শূদ্র-কুলে তোমার জন্ম অবশ্যম্ভাবী। এবং তোমার পিতৃগণ তোমার বর্ণ-নিম্নতাবশতঃ তোমার দ্বারা বিশেষরূপে উপকৃত হইতে পারেন না, সুতরাং পিণ্ডোদক বিলুপ্ত-প্রায় হয়,

তাঁহারা পতিত হইতে পারেন। দেবযান ও পিতৃযান বুঝাইবার সময়ে এ তত্ত্ব বিশদরূপে আলোচিত হইবে।

এইখানে আর একটু বলিয়া রাখি, আমাদিগের ভাষার অক্ষর-সকলও এই কারণে বর্ণ বলিয়া পরিচিত। শব্দ—ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র; ভাবশূন্য শব্দ হইতে পারে না; অক্ষর বা বর্ণ সমষ্টীভূত হইয়া শব্দ হয়; এক, দুই বা ততোধিক অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব পুঞ্জীভূত হইয়া, একটি পূর্ণ ভাব—পূর্ণ শব্দ-তরঙ্গ সৃজন করে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভাব-সকল উদ্দীপিত হইলে বর্ণালোক ঝলসিয়া উঠে। "অ," "আ," "ক" প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব অভিব্যক্তির সময়েও বর্ণ-তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়; সেই জন্য ভাষা বর্ণতত্ত্বের অন্তর্গত ও অক্ষর-সকল বর্ণ বলিয়া পরিচিত। একই ভাব বিভিন্ন মনুষ্য-সমাজের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন শব্দে যে অভিব্যক্ত হয়, তাহার কারণ—আমাদিগের সূক্ষ্ম দেহের বর্ণ-বিভিন্নতা। যেমন তরঙ্গসকল জলের বর্ণের অনুরূপ বর্ণ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যেমন রক্তবর্ণের তরল দ্রব্য তরঙ্গিত হইলে, রক্তবর্ণের তরঙ্গ উৎপন্ন হয় বা পীতবর্ণীয় কোন তরল দ্রব্য আন্দোলিত হইলে, পীতবর্ণেরই তরঙ্গ রচিত হয় অর্থাৎ যেমন একই বায়ুহিল্লোলে পীতবর্ণীয় ও লোহিতবর্ণীয় তরল দ্রব্যদ্বয় দুই প্রকার বিভিন্ন বর্ণের তরঙ্গ উৎপাদন করে, তেমনই একই ভাব ভিন্ন ভিন্ন বর্ণীয় মনুষ্যের কণ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উচ্চারিত হয়।

ভাবই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূল। অরূপ ভাব উদ্দীপ্ত হইয়া, রূপময় বা বর্ণময় হইয়া উঠে ও রূপ-জগৎ রচনা করে। আমাদের স্থূলদেহও ভাবসকল ঘনীভূত হইয়া রচিত হয়, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ জন্যই আমাদের শাস্ত্রে ভাব-সংযমের নানাপ্রকার ব্যবস্থা আছে। আচার, খাদ্যবিচার, নিষ্ঠা, উপাসনা, ব্রহ্মচর্য্য—এ সমস্ত ঐ ভাব-সংযমের জন্যই বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ভাব-সংযমের জন্যই কর্ম্মবিচার—ভাব-সংযমের জন্যই জাতিবিচার—ভাব-সংযমের জন্যই সমাজ সংগঠিত। ভাব হইতে বর্ণ, বর্ণ হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে শরীর। আবার শরীর হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে বর্ণ, বর্ণ হইতে ভাব। শক্তির এই উভয়মুখী গতি যে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ, তাহাকেই যথার্থ বিদ্বান্ বলা যায়। এ সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান বলি।

এক সময়ে কোন দেশে এক পশুভাষাভিজ্ঞ নৃপতি ছিলেন। তিনি এক দিন প্রভাতে নিজ প্রাসাদের দ্বার-সমীপে একটী কুকুর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে

দেখিতে পাইলেন। রাজাকে দেখিতে পাইয়াই কুকুরটী চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। রাজা বুঝিলেন—কুকুরটী বলিতেছে, সেই নগরের কোন এক ব্রাহ্মণ তাহাকে অযথা ভাবে ও অন্যায়রূপে প্রহার করিয়াছে। কুকুর সেই জন্য রাজ-সমীপে বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছে। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, রাজা সেই ব্রাহ্মণের অন্বেষণের জন্য চারি দিকে লোক প্রেরণ করিলেন।

ক্ষণকাল পরে, সে ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আহ্বানের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন, "আপনি অন্যায় ভাবে, বিনা দোষে এই কুকুরটীকে প্রহার করিয়াছেন বলিয়া বিচারপ্রার্থী হইয়া কুকুর আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। আপনি উহাকে কি কারণে প্রহার করিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা করি।" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন "আমি আমার গুরুদেবের পূজার জন্য পুষ্পাদি আহরণ করিয়া আসিতে আসিতে কুকুরটীকে পথ অবরোধ করিয়া শায়িত থাকিতে দেখিয়া, স্পৃষ্ট হইবার ভয়ে পথ হইতে সরিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু কি কারণে জানি না, আমার আজ্ঞামত আমাকে সে পথ ছাড়িয়া দেয় নাই। আমি অঙ্গসঞ্চালনা করিয়া, উহাকে সরাইয়া দিতে উদ্যত হইলে, কুকুরটী আমাকে স্পর্শ করিয়াছিল এবং তজ্জন্য আমার পূজার দ্রব্য-সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। উহার সেই অবিমৃষ্য-কারিতার জন্য আমার হৃদয়ে ক্রোধোদ্রেক হইয়াছিল এবং সেই জন্য আমি উহাকে প্রহার করিয়াছিলাম।" কুকুরটি বলিল, "আমি পথ পর্য্যটনে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং সেই জন্য আমার সরিতে বিলম্ব হইয়াছিল ও চলিতে গিয়া অসাবধানতাবশতঃ ব্রাহ্মণের অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিলাম। অজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমার মনোভাব না বুঝিয়াই আমাকে প্রহার করিয়াছেন, সুতরাং উনি দোষী।" রাজা উভয়ের বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ! আপনার দোষ হইয়াছে এবং আপনি রাজানুশাসনে শাস্তি লইতে বাধ্য।" কুকুর বলিল, "আপনার বিচারে ব্রাহ্মণ যথার্থ দোষী বলিয়া যদি বিবেচিত হন, তাহা হইলে আমার অভিলাষ অনুসারে শাস্তি দিন। উঁহাকে কুলপতিপদে বরণ করুন।" ব্রাহ্মণ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, রাজাও হাসিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্রাহ্মণ! আপনার বোধ হয়, শাপে বর হইল; আপনি ইচ্ছা করিলে, আমি আপনাকে কুলপতিপদে বরণ করি।" ব্রাহ্মণ নিজের মঙ্গল হইবে বুঝিয়া বলিলেন, "আমি ঐ পদ গ্রহণে সম্মত আছি, কিন্তু আমার গুরুর বিনা অনুমতিতে

পারিব না।" এই বলিয়া রাজার অনুমতি লইয়া, ব্রাহ্মণ সানন্দে গুরুগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, কুকুরটীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। গুরুসমীপে উপস্থিত হইয়া, সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিবার পর, তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে বলিলেন,—"বৎস! তুমি যে পদ-প্রাপ্তির আশায় আনন্দিত হইয়াছ, উহা বস্তুতঃ আনন্দসূচক নহে। এই কুকুরটীও এক সময়ে কুলপতি ছিল এবং ঐ কুলপতিপদই উহার কুকুরত্ব লাভের কারণ। প্রভুর তোষামোদ, মনস্তুষ্টি, হিতাহিতজ্ঞানশূন্যভাবে প্রভুর কুকার্য্য সমর্থন প্রভৃতি দোষে সাধারণতঃ ভৃত্য-সকল দূষিত হয়, বিশেষতঃ কুলপতিপদ। এবং ঐরূপ অবিমৃষ্যকারিতার ফলস্বরূপ তাহাদিগের সূক্ষ্মদেহ ঐরূপ সংস্কারাপন্ন হইয়া গিয়া, শেষ তাহাকে কুকুররূপে পরিণত করে। দাসত্ব, বিশেষতঃ কুলপতিত্ব কুকুরবৃত্তি বলিয়া জানিও। ঐ কুকুর সেই হিসাবেই তোমাকে কুলপতি করিবার জন্য রাজার নিকট প্রার্থনা করিয়াছে। যদি কুকুরত্ব চাও, তবে ঐ পদ লইতে স্বীকৃত হইও।" ব্রাহ্মণ শুনিয়া, কুকুরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিলেন।

বস্তুতঃ কর্ম্ম হইতে ভাব, ভাব হইতে পুনরায় বর্ণ ও বর্ণ হইতে কিরূপে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, এই উপাখ্যানটীতে তাহা সুন্দর হৃদয়ঙ্গম হয়।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২

কুলঘ্নানাং এতৈঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈঃ শাশ্বতাঃ জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ উৎসাদ্যন্তে।

কুলঘ্নদিগের এই বর্ণসঙ্কর-দোষ সনাতন জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম উচ্ছেদিত করে।

কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্মের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মাতৃশক্তি সাধারণতঃ সমষ্টিভাবে জগৎকে যে ক্রমোন্নতির পথে লইয়া যাইতেছেন, সেই প্রাকৃতিক ধর্ম্মকেই কুল-ধর্ম্ম বলে এবং সেই কুল-ধর্ম্মকে সাহায্য করিবার জন্য আমাদিগের আধ্যাত্মিক দেহের বর্ণরঞ্জনার বিজ্ঞানসম্মত অনুশাসনকে জাতিধর্ম্ম বলে। জাতি-ধর্ম্ম ও কুল-ধর্ম্মের ইহাই স্থূল মর্ম্ম।

কুলঘ্ন হইলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম উচ্ছেদিত করিলে, বর্ণসঙ্কর প্রাপ্ত হইয়া কুল-ধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম উচ্ছেদিত হইতে পারে এবং সেই আশঙ্কায় সাধকের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে। যাহারা মায়ার প্রলোভনে পড়িয়া ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মের আপাতভোগ-

মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, শুধু নিজের ইন্দ্রিয়-বৃত্তির চরিতার্থতার জন্য মৌখিক যুক্তি অবলম্বনে ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মে থাকিতে চাহে, সে সকল নগণ্য জীবের কথা বলিতেছি না। যাঁহারা যথার্থ ভগবদন্বেষী—মাতৃ অন্বেষণে বস্তুতঃ যাঁহারা কৃতসঙ্কল্প - যাঁহাদিগের প্রাণ "মা" "মা" করিয়া অনবরত কাঁদিতে শিখিয়াছে, এবং শুধু মাকে পাইবার জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বনীয়, সেই পন্থা বিচার করিয়া, যাঁহারা ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মে থাকিতে চাহেন, তাঁহাদিগের কথাই বলিতেছি। প্রথমতঃ সেই সমস্ত যথার্থ মাতৃঅন্বেষীর প্রাণে এই সমস্ত ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মের গুণ ফুটিয়া উঠিতে থাকে। সমাজে বৈজ্ঞানিক যুক্তি-সম্বলিত শাস্ত্রানুশাসন যদি পরিত্যাজ্য, তবে এত করিয়া সমাজ-শৃঙ্খলা করিবার উদ্দেশ্য কি এবং গৃহ-ধর্ম্ম পালনের উদ্দেশ্য কি ? তবে কি শুধু সমাজের শৃঙ্খলা-স্থাপনের জন্য শাস্ত্র, সমাজ-ধর্ম্ম লিখিয়া গিয়াছেন ? কেন, ইহার ভিতর এই সমস্ত অপূর্ব্ব যুক্তি—অপূর্ব্ব ধর্ম্মোন্মেষের পন্থা—অপূর্ব্ব ভগবৎসান্নিধ্যের উপায়-সকল ত রহিয়াছে, তবে আমি কেন এ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব—কেন এ কুল হারাইয়া অন্য কুল অন্বেষণ করিব ? তাহাতে জাতিধর্ম্ম ও কুল-ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া অধোগতি প্রাপ্তির আশঙ্কা ত রহিয়াছে। যাহাতে পতনের আশঙ্কা, তাহা হইতে কিরূপে আত্মমঙ্গল হইবে ? এইরূপ যুক্তি-তর্ক সাধককে প্রথমাবস্থায় বড়ই চঞ্চল করিয়া তোলে।

সাধনার প্রথম অবস্থায় সাধকের কোমল প্রাণ বড়ই বিপর্য্যস্ত হয়। যতক্ষণ না সাংখ্যজ্ঞানে সাধক-হৃদয় আলোকিত হয়, ততক্ষণ সাধকের মনঃপীড়ার বুঝি অবধি নাই। তারপর শক্তিজ্ঞানের বিমল আভাস প্রাণে ফুটিয়া উঠিলে, তখন সে কালিমা দূরীভূত হইয়া যায়—তখন সে জগন্ময় ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করে। সে মুহূর্ত্তের জন্য আর ভগবানের সঙ্গছাড়া হয় না। এক সময়ে জনৈক সাধককে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"আপনি ভগবান্‌কে দেখিয়াছেন ?" সাধক উত্তর করিয়াছিলেন,—"ভগবান্‌কে কে না দেখিয়াছে ? তুমিও ভগবান্‌কে দেখিয়াছ ও দেখিতেছ, আমিও ভগবান্‌কে দেখিয়াছি ও অহর্নিশ দেখিতেছি। তবে তুমি দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছ না, আমি চিনিতে পারিয়াছি, প্রভেদ এইটুকু।"

বস্তুতই প্রভেদ এইটুকু। সকলেই তাঁহাকে দেখে, তবে উপলব্ধি করিতে পারে না ; সাধক তাঁহাকে দেখে ও উপলব্ধি করে। ইহা ছাড়া অন্য পার্থক্য আমি বুঝি না।

যাহা হউক, সাংখ্য-জ্ঞানের বিমল আলোক-প্রাপ্তির পূর্ব্বে চিত্তের সঙ্কীর্ণতা ও মলিনতাবশতঃ সাধক, জাতিধর্ম্ম ও কুল-ধর্ম্ম প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া, তাহা নষ্ট হইবার আশঙ্কায় বড়ই বিব্রত হইয়া পড়ে ও পাছে ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম পদদলিত করিয়া উন্মার্গগামী হইলে—ভাবের আবেশে সমস্ত ভাসাইয়া দিলে, ভ্রমবশতঃ অধোগতি প্রাপ্তি হয়, এই আশঙ্কায় সাধক অধীর হয় ও সাধনার পন্থা নির্দ্ধারণ করিতে পারে না।

তাহা হইলে, স্থূলতঃ আমরা সাধকের প্রাণের আশঙ্কাগুলি এইরূপে দেখিতে পাইলাম।—

১। ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম উচ্ছেদ করিলে ভোগ বলিয়া আর কিছু থাকে না। ভোগ যদি না রহিল, তবে সে শূন্যবৎ অবস্থার প্রয়োজন কি ?

২। ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম উচ্ছেদিত করিলে কুলক্ষয় ও মিত্রদ্রোহরূপ মহাপাতকের দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়।

৩। কুলক্ষয় করিলে, জীবের স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির পথরোধ হইয়া যায় বা প্রকৃতির ধর্ম্ম নষ্ট হয়।

৪। প্রাকৃতিক ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম সঞ্চারিত হয়।

৫। অধর্ম্ম হইলে, আমাদিগের আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি দূষিত হয়।

৬। আধ্যাত্মিক শক্তি বা কুলস্ত্রী দূষিতা হইলে, আমরা বর্ণসঙ্কর প্রাপ্ত হই।

৭। বর্ণসঙ্কর হইলে, আমরা আর পিতৃলোকের সন্তোষ-সাধনে সমর্থ হইতে পারি না ও তাঁহাদিগের মনঃপীড়ার কারণ হইয়া, তাঁহাদিগের অভিশাপ প্রাপ্ত হই এবং তাঁহাদিগের ঊর্দ্ধগতির পথে সাহায্য করিতে পারি না।

৮। ঐরূপ সঙ্কর অবস্থায় বর্ণসঙ্করবশতঃ জাতিধর্ম্ম বা বর্ণ-ধর্ম্ম উপেক্ষিত হয় ও তাহা হইতে আমরা ভ্রষ্ট হইয়া পড়ি ও প্রাকৃতিক ক্রমোন্নতির পথ আরও অবরুদ্ধ হয় বা আমরা কুল-ধর্ম্ম হারাইয়া বসি।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩

জনার্দ্দন। উৎসন্নকুল-ধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ ভবতি; ইতি অনুশুশ্রুম।

জনার্দ্দন। এইরূপ শ্রুতি আছে—কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে, মনুষ্য-সকলের নিয়ত নরকে বাস হয়।

নিম্নগতিকে নরক বলে। যেখানে লোকসকল ঊর্দ্ধগতি হারাইবামাত্র নীত হয়, তাহাকে নরক বলে। নৃ = লওয়া + অক, এইরূপে নরক শব্দের উৎপত্তি। ঊর্দ্ধগতি হারাইবামাত্র লোক-সকলের গতিচ্যুতি হয়; এবং সেই জন্যই উহা নরক বলিয়া অভিহিত। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ধর্ম্মকার্য্যের অভাব হইলেই অধর্ম্ম সঞ্চারিত হয়; এবং অধর্ম্ম হইতে নরক-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী; ধর্ম্মকার্য্য করিব না, অধর্ম্মও করিব না, এরূপ হইতে পারে না, এ কথা পূর্ব্বে সবিস্তারে বুঝাইয়াছি। সুতরাং কুল-ধর্ম্ম উচ্ছেদিত হইলে বা প্রাকৃতিক ক্রমোন্নতির পথ হইতে বঞ্চিত হইলে, গতিচ্যুতি বা নরক-লাভ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

জনার্দ্দন বলিয়া সম্বোধন করিবার কারণ—জনার্দ্দন শব্দের অর্থ—স্রষ্টা ও প্রলয়কর্ত্তা। জন অর্থে—জন্মান বা সৃজন করা এবং অর্দ্দন অর্থে—সংহার বা নাশ। যিনি সৃজন ও প্রলয়ের কর্ত্তা, তাঁহাকে জনার্দ্দন বলে। আমাদিগের এই ঊর্দ্ধগতি ও নিম্নগতি— আমাদিগের সৃষ্টি ও ধ্বংসের কারণ বলিয়া, সেই সৃষ্টি ও ধ্বংস যাঁহার ইচ্ছায় সংসাধিত হয়, ভগবান্ যে রূপে সৃজন ও ধ্বংস করেন, অর্জ্জুন সেই রূপ স্মরণ করিয়া নরকবাসের কথা বলিলেন।

প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা মরিতেছি—প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা নূতন হইয়া জন্মাইতেছি। আমাদিগের প্রাণশক্তি প্রতি শ্বাসগ্রহণে সংঘৃষ্ট ও উদ্দীপিত নূতন বর্ণরঞ্জনায় অভিব্যক্ত হইয়া আমাদিগের দেহকে তদনুযায়ী ভাবে গঠিত করিতেছে; এবং পুরাতন ভাবটুকু প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসীভূত হইয়া, বহির্গত হইয়া যাইতেছে— সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের পরমাণুগুলি বিনষ্ট হইতেছে। এইরূপে মৃত্যু ও জন্ম আমাদিগের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের উপর অনবরত আধিপত্য করিতেছে। যখন আমরা সাত্ত্বিক গুণের দ্বারা পরিচালিত হই, তখন এই সৃজন বা পোষণ অধিক মাত্রায় হইতে থাকে; এবং সেই পোষণ-শক্তি-প্রভাবে আমরা ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে থাকি। রজঃ ও তমঃশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইলে, আমাদিগের মৃত্যুরূপ ধ্বংসকার্য্য সম্পন্ন হয় ও ঐ ধ্বংসশক্তিপ্রভাবে আমাদিগের নিম্নগতি হয়। অহর্নিশ এইরূপ ঊর্দ্ধ নিম্নগতির প্রভাবে ও অনুপাতে আমরা একটা স্থায়ী ভাবের ঊর্দ্ধ বা নিম্নগতি প্রাপ্ত হই। এইরূপে আমরা ভগবানের যে শক্তির দ্বারা গতি লাভ করিতে থাকি, তাহাকে জনার্দ্দন বলে।

যাহা হউক, আমাদিগের এই গতিকে কুল-ধর্ম্ম বহু পরিমাণে সাহায্য করে। আমাদিগের কুল ঐরূপ গতির একটা স্থায়ী অবস্থা বা স্তর মাত্র। যেমন কোন

ত্রিতল প্রাসাদে আরোহণ করিতে হইলে, সোপানে সোপানে ভ্রমণ করিয়া এক একটা তল পাওয়া যায় এবং সেই তলে কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া, আবার সোপান বহিয়া ঊর্দ্ধতন তলে আরোহণ করিতে হয়, তদ্রূপ আমাদিগের প্রাকৃতিক ক্রমোন্নতি যেন ঐরূপ সোপান এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী বা শূদ্র, বৈশ্য, ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি যেন এক একটি তল। এই তলগুলির শাস্ত্রীয় নাম—কুল।

কুলের দ্বারা আমাদিগের এই গতি বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হয়। যেমন বেগবান্ পশু লম্ফ প্রদানের সময় ধরণীর উপর ভর দিয়া, ধরণীর প্রতিরোধ-শক্তির সাহায্যে লম্ফরূপ ক্রিয়াটী বেগে সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, মাটির উপর বেগে দমক না দিলে, যেমন লম্ফ প্রদান অসম্ভব হইয়া উঠে, তদ্রূপ আমাদিগের গতিও এক একটা স্থায়ী কুলে ভর দিয়া নব বেগ প্রাপ্ত হয় এবং ধর্ম্ম বা ঊর্দ্ধগতিজনক কার্য্য সকল সময় করিতে না পারিলেও সহসা নিম্নগতি-প্রভাবে সে কুল ছাড়িয়া নিম্নতর কুলে গতি হয় না। অবশ্য বহুল পরিমাণে নিম্নগতি প্রাপ্ত হইলে কুল ছাড়িয়া অন্য কুলে গতি হয়, কিন্তু সহসা স্বল্পমাত্র নিম্নগতির দ্বারা আমাদিগকে কুল ছাড়িয়া যাইতে হয় না; কুলের গতিরোধশক্তি কিছুক্ষণ আমাদিগকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ। এই প্রকারে কুল বা আমাদিগের গতির স্তর ঊর্দ্ধগতিকে সাহায্য ও নিম্নগতিকে প্রতিরোধ করে। কিন্তু কুল-ধর্ম্ম পালন না করিলে কুল উৎসন্ন হয় ও তাহার ঐরূপ উপকারিতা হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়া নিম্নমুখে অথবা নরকে নীত হই।

তবে সাধকের প্রাণে ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম পরিত্যাগের জন্য এত আগ্রহ আসে কেন? ভগবৎলাভের তৃষা আসিলে, ইন্দ্রিয়ের উপর বৈরাগ্য হয় কেন? বেদে আছে,—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ
তস্মাৎ পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।"

ইন্দ্রিয়গণ পরের অনুগত হইল দেখিয়া, স্বয়ম্ভূ তাহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন। অথবা স্বয়ম্ভূ ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া অন্তরাত্মাকে তাহারা দেখিতে পায় না।

বস্তুতঃ তখন সাধকের প্রাণ যাহা খুঁজিতেছে, তাহা ত ওতপ্রোতভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিত। ভগবানের অভাব কোথায়? ইন্দ্রিয় যাহা বহন করিয়া আনে, তাহাও ভগবান্; তবে ইন্দ্রিয় সেগুলিকে ভোগ্য বিষয় বলিয়া গ্রহণ করে ও তাহার অনুগত হইয়া পড়ে বলিয়া, তাহারা ভগবান্‌কে

ভগবান্ বলিয়া চিনিতে পারে না ও প্রাণকে চিনিতে দেয় না। তাই প্রাণ ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম পরিত্যাগের জন্য লালায়িত হয়। তাই সাধকের প্রাণ ইন্দ্রিয়-সকলকে বিশ্বাসঘাতক ভাবিয়া, তাহাদিগের উচ্ছেদসাধনে যত্নবান্ হয়। কিন্তু তারপর বিচার ও তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দ্বারা ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মের উচ্ছেদে পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা দেখিয়া, সে সাধক উভয়-সঙ্কটে পড়ে; কি করিবে, স্থির করিতে পারে না। ভাবে—ইন্দ্রিয় ছাড়িলে মহাপাপ হইবে।

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥ ৪৪

অহো বত বয়ং যৎ রাজ্যসুখলোভেন স্বজনং হন্তুম্ উদ্যতাঃ (তস্মাৎ) মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ।

হায়! আমরা যখন রাজ্যসুখলোভে স্বজন-বধে উদ্যত হইয়াছি, তখন মহা-পাপ করিতে যত্নবান্ হইয়াছি (বুঝিতে হইবে)।

স্বার্থান্ধ হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত ভাসাইয়া দিয়া, আশ্রম-ধর্ম্মকে অবহেলা করিতে উদ্যত হইয়া, নিশ্চয় মহাপাপের দিকে অগ্রসর হইতেছি।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ ৪৫

যদি রণে অপ্রতীকারম্ অশস্ত্রং মাং শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রা হন্যুঃ, তৎ মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।

যদি যুদ্ধে প্রতিরোধ-বিমুখ অশস্ত্র আমাকে সশস্ত্র কৌরবগণ বধ করে, তাহা আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর।

প্রকৃতি আমাকে কূলে কূলে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে, আমিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মবৎ বিনা রোধে, বিনা প্রতীকারে তেমনই ভাসিয়া ভাসিয়া যাইব। শাস্ত্রের অবমাননা করিয়া ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। এত জন্ম ধরিয়া যে সমস্ত ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ফুটাইয়া তুলিলাম, আজ সহসা তাহার উচ্ছেদ-সাধনে যত্নবান্ হইব না। তাহাতে আমার অমঙ্গল সাধিত হয় হউক।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥ ৪৬

এবম্ উক্ত্বা শোকসংবিগ্নমানসঃ (সন্) সংখ্যে সশরং চাপং বিসৃজ্য অর্জ্জুনঃ রথোপস্থে উপাবিশৎ।

সঞ্জয় বলিলেন,—এইরূপ কহিয়া শোকাকুল-চিত্তে রণস্থলে ধনুঃশর পরিত্যাগ করিয়া, অর্জ্জুন রথোপরি উপবেশন করিলেন।

বহু দিন ধরিয়া বৈরাগ্যে কৃতনিশ্চয় হইয়া, নানা প্রকারে সমরায়োজন করিয়া, তার পর রণপ্রান্তরে অরি-পক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, এইরূপে অরি হনন করিব না বলিয়া অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করা অতি বিচিত্র। এমন অপূর্ব্ব ভাব বুঝি আর নাই। সব ছাড়িয়া, শুধু কবিত্ব হিসাবে দেখিতে গেলেও ইহার তুলনা নাই। কত দিনের আশাকে—কত দিনের আকাঙ্ক্ষাকে মুহূর্ত্তের মোহ এইরূপে হৃদয় হইতে বিতাড়িত করিতে প্রয়াস পায়।

শুধু ইহা নহে। মায়ার রহস্য ভেদ করা অসম্ভব। পলকে পলকে যাহার নির্য্যাতনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি—পলকে পলকে যে মায়াকে লৌহ-কারা ভাবিয়া, বাহির হইবার জন্য অবিরাম পরিশ্রম করিয়াছি,—অক্লান্ত অধ্যবসায়ে যে মায়ার বাঁধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে অহর্নিশ যত্ন করিয়াছি—যে মায়াকে রাক্ষসী ভাবিয়া, পলকে পলকে আমার রক্তশোষণ করিতেছে ভাবিয়াছি—যে মায়ার বক্ষে পদাঘাত করিয়া, মেঘমুক্ত সূর্য্যের মত স্বাধীন স্বপ্রকাশ ভাবে দাঁড়াইব বলিয়া বহু দিন হইতে হৃদয়ে আশা পোষণ করিয়া আসিয়াছি, আজ সহসা সমস্ত আয়োজন পূর্ণ করিয়া—সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া, সে রাক্ষসী বধের জন্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—এ কি? এ ত রাক্ষসী নহে, এ যে স্নেহের মোহিনী মূর্ত্তি—এ যে মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহকরুণার মূর্ত্তিময় বিকাশ—এ ত বিমাতা নহে, এ যে "মা"—এ ত বিষকুম্ভ নহে, এ যে অমৃত-কলস—এ ত অগ্নির জ্বলন্ত দাহ নহে, এ যে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ পরশ।

এ কি! আমি কি করিতেছিলাম! বিশ্বাসী প্রভুভক্ত ভৃত্যকে কৃতঘ্ন ভাবিতেছিলাম—গুরুকে বধ্য ভাবিতেছিলাম—ভ্রাতাকে শত্রু ভাবিতেছিলাম! সব ভাসাইয়া দিয়া, সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, এরূপ ভাবহীন আত্ম-প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন কি?

কেন আমি ইন্দ্রিয় ছাড়িব? ইন্দ্রিয় সাহায্যে জগৎকে যেমন প্রত্যক্ষ ভাবে উপভোগ করি, তেমনি প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয় সাহায্যে কেন তোমায় ভোগ করিতে পাইব না? ভগবন্! আমার এই চর্ম্মচক্ষু কেন তোমায় দেখিতে পাইবে না?

আমার শ্রবণদ্বয় কেন তোমার মধুময় স্নেহের আহ্বান শুনিয়া কৃতার্থ হইবে না? আমার করদ্বয় কেন তোমার রক্তচরণ স্পর্শ করিয়া অভূতপূর্ব্ব স্পর্শসুখ অনুভব করিবে না? আমার ইন্দ্রিয়সকল স্ব স্ব শক্তি অনুযায়ী তোমার আলিঙ্গনাস্বাদ কেন পাইবে না? আমায় যেমন ইন্দ্রিয়ময় করিয়া তুলিয়াছ, তুমিও তেমনি ইন্দ্রিয়ময় হইয়া কেন আমার সম্মুখে আসিবে না? তা যদি না আসিবে, কেন আমায় ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মে অভ্যস্ত করিয়া তুলিলে? তা যদি না আসিবে, তবে কেন আমায় ইন্দ্রিয়সকল ফুটাইয়া তুলিতে জন্ম জন্ম ধরিয়া নানা যোনিতে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এত যন্ত্রণা দিলে? তা যদি না আসিবে, তবে এত করিয়া সমাজ-ধর্ম্ম-সকল বিধিবদ্ধ করাইয়াছ কেন? আজ সহসা আবেগে পড়িয়া সমস্ত কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিব? আজ সহসা স্বপ্ন ভাবিয়া, কেমন করিয়া সব মুছিয়া ফেলিব? সত্য যদি সব স্বপ্নবৎ, তবে স্বপ্নেই আমি তোমায় ভোগ করিতে চাহি। সব যদি মিথ্যা, তবে এই মিথ্যারই মাঝে তোমায় আমি প্রত্যক্ষ করিতে চাহি।

যে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় তোমায় মা বলিয়া সম্বোধন করিতে বাক্য থাকিবে না, যে আত্মপ্রতিষ্ঠায় তোমার অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, তোমার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিবার জন্য বাহুদ্বয় থাকিবে না, যে আত্মপ্রতিষ্ঠায় তোমার স্নেহভারনম্র কোমল মনো-মুগ্ধকারী বঙ্কিম নয়ন দেখিবার জন্য চক্ষু থাকিবে না, যে আত্মপ্রতিষ্ঠায় চক্ষের ভিতর দিয়া আকর্ষণের প্রবল তড়িৎ ছুটিবে না, যে আত্মপ্রতিষ্ঠায় মিলনের সুখসম্ভোগের জন্য হৃদয় থাকিবে না, সে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন কি?

যথার্থ ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলে, প্রাণে এইরূপ আশঙ্কা আসে, এইরূপ মোহ হৃদয়কে অভিভূত করে। ইন্দ্রিয়তত্ত্ব উত্তমরূপে জ্ঞাত না থাকায় অজ্ঞ, নিম্নাধিকারী সাধকের প্রাণ এইরূপে কাঁপিয়া উঠে—এইরূপে বিষাদ-বিমণ্ডিত হয়।

বস্তুতঃ আত্মপ্রতিষ্ঠা যে ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ নহে, ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ অভিব্যক্তি, তাহা তখন সে জানে না। আত্মপ্রতিষ্ঠায় ইন্দ্রিয় উচ্ছেদিত হয় না, ইন্দ্রিয়-সকলের অবয়ব মাত্র উচ্ছেদিত হয়, অথচ তাহাদিগের কার্য্যকারিতা অটুট থাকে; বরং স্ফুটতর হয়। আমরা দিন দিন যত শক্তিমান্ হইতেছি, আমাদিগের ইন্দ্রিয়-সকলও তত স্থূল ও জড় ভাব হারাইয়া, সূক্ষ্ম ও ব্যাপকরূপে কার্য্যকারী হইতেছে। স্থূল কোষে সংযুক্ত থাকিয়া ও তাহাতে কার্য্য করিয়া শক্তি যত বলবতী হইতে থাকে, স্থূলের সাহায্য ততই আমরা ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করি। ক্রমশঃ এমন

সময় আইসে, যখন স্থূল অংশ না থাকিলেও আপনি স্থূলের বিনা সাহায্যে কার্য্য করিতে সক্ষম হই। এবং ঐ অবস্থাই নিরবয়ব অথচ সম্পূর্ণ বিকাশময়—নিরাকার অথচ সুপ্রকাশ—কার্য্যহীন অথচ শক্তিময়—সর্ব্বেন্দ্রিয়-বর্জ্জিত অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের গুণাভাসযুক্ত অপূর্ব্ব অবস্থায় পৌঁছাইয়া দেয়।

আমাদিগের ঊর্দ্ধগতি অর্থে—স্থূলের সাহায্য ব্যতীত কার্য্যকারিতার অভিব্যক্তি। যে যত দেহের সাহায্য ব্যতীত ইন্দ্রিয়-কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ, তাহার তত ঊর্দ্ধগতি হইতেছে বুঝিতে হইবে। ঐরূপ কার্য্যকারিতার অনুসারে লোক হইতে লোকান্তরে জন্মপরিগ্রহণ ও বসবাস হয়। আমার যে পরিমাণে ঐরূপ শক্তির সঞ্চয় হইয়াছে, সেই পরিমাণে সেই শক্তি যে লোকে ক্রিয়াশীল, সেই লোকে আমার জন্ম হইবে, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। একটী স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাই।

মনে কর, তুমি যোগ অভ্যাস করিতেছ। যোগ অভ্যাস করিলে, দেহ বায়ুবৎ লঘু হয়। এমন কি, খুব দুর্ব্বল মনুষ্যও তোমার দেহকে তুলিতে সক্ষম হয়; অবশ্য কোন যৌগিক শক্তির সাহায্যে তুমি দেহকে পর্ব্বতবৎ গুরু করিয়া তুলিতে পার; এবং সেই শক্তির সাহায্যে তুমি খুব শক্তিমান্ পুরুষকেও তোমার দেহ চালনে অসমর্থ করিতে পার; কিন্তু সাধারণতঃ কোন শক্তি প্রয়োগ না করিলে, যোগীর দেহ লঘিমা প্রাপ্ত হয়। তোমার চক্ষুও জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠে। আমরা যে সূর্য্যের দিকে এক মুহূর্ত্ত চাহিতে পারি না, তুমি অনায়াসে সেই সূর্য্যের দিকে বহুক্ষণ স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে সমর্থ হও। তোমার শ্রবণশক্তিও তীক্ষ্ণতর হয়। তুমি অহর্নিশ জগদ্‌ব্যাপী প্রণব-নাদ শুনিতে পাও। এ পৃথিবী বায়ু-মণ্ডলের মধ্যে থাকিয়া নিয়ত ঘুরিতেছে বলিয়া, সেই গতি হইতে একটী গভীর সুমধুর রব অহর্নিশ বায়ুমণ্ডলে সঞ্চারিত আছে। সে শব্দ যোগাভ্যাস করিলে শুনিতে পাওয়া যায়। তোমার প্রাণও তীক্ষ্ণতর হয়, সাধারণ মনুষ্য যে পরিমাণ বায়ু না পাইলে শ্বাস অবরোধের কষ্ট পায়, তুমি তাহা অপেক্ষা বহু পরিমাণে অল্প বায়ুতে জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হও। তোমার নাসিকা জগতের সুগন্ধের আঘ্রাণ পায়। পৃথিবীর একটী সুগন্ধ আছে, সাধারণ মনুষ্য তাহা পায় না, জন্মকাল হইতে তাহাতে অভ্যস্ত না থাকায় সাধারণ মনুষ্যের ঘ্রাণেন্দ্রিয় আর সে গন্ধানুভূতি মনে জন্মাইতে পারে না; কিন্তু যোগাভ্যাসনিরত ব্যক্তি অনায়াসে থাকিয়া থাকিয়া সে গন্ধের আঘ্রাণে বিমুগ্ধ হয়। যোগশক্তির পরিচালনে তোমার এমন অভ্যাস হইয়াছে যে, বহু দূরে কেহ তোমাকে কোন খাদ্যদ্রব্য

উৎসর্গ করিয়া দিলে, কিম্বা কোন খাদ্যদ্রব্য দেখিবামাত্র তুমি তোমার জিহ্বায় তাহার আস্বাদ পাইয়া থাক; এবং তোমার স্পর্শশক্তি তীক্ষ্ণতা লাভ করে; তোমার অনতিদূরে কাহারও অঙ্গে কোনরূপ আঘাত করিলে, তোমার অঙ্গে সে আঘাত অনুভব করিতে পার। এ সব শক্তির দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

যাহা হউক, এখন যদি তুমি এই অবস্থায় দেহত্যাগ কর, তাহা হইলে স্থূলভাবে দেখিতে গেলে ও তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম অনুকূলে থাকিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, তোমার সূর্য্যলোকে জন্ম হইবে। তোমার লঘিমাবশতঃ সূর্য্যলোকে আর লঘুতা অনুভব থাকিবে না। সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণী শক্তি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তি অপেক্ষা বহু পরিমাণে অধিক। যদি পৃথিবীর একটী সাধারণ বলশালী ব্যক্তি কোনক্রমে এই দেহ লইয়া সূর্য্যলোকে যাইতে পারে, তাহা হইলে সেখানে তাহার চলচ্ছক্তি এককালে রোধ হইবে। সূর্য্যের প্রবল মাধ্যাকর্ষণী প্রভাবকে পরাস্ত করিয়া, পদচালনা করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। সেখানে তাহাকে স্থাণুভাবে থাকিতে হইবে; অথবা এখানে দৌড়াইতে হইলে যেরূপ বেগ প্রদান করে, সেখানে সেইরূপ বেগ প্রদান করিয়া হয় ত দু এক পাদ সংক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে। আবার সূর্য্যলোকের জীব যদি পৃথিবীতে আসে, তাহা হইলে সেখানে পদচালনা করিতে যেরূপ শক্তি প্রয়োগ করে, এখানে সেইরূপ শক্তি প্রয়োগমাত্র হয় ত সে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে নীত হইবে। সূর্য্যের প্রবল মাধ্যাকর্ষণী শক্তিতে বিচরণে অভ্যস্ত বলিয়া, পৃথিবীর স্বল্প মাধ্যাকর্ষণী শক্তি, তাহার দেহের পক্ষে দুর্ব্বল বলিয়া বিবেচিত হইবে। সুতরাং পৃথিবীতে তুমি লঘিমাসিদ্ধি লাভ করিলে, সেই শক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সূর্য্যলোকই উপযুক্ত স্থান। অর্থাৎ সঞ্চারিণী শক্তি সূর্য্যলোকে বসবাসোপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

তোমার চক্ষুর জ্যোতির্ধারণশক্তির তীক্ষ্ণতাবশতঃ উহাও সূর্য্যলোকের উপযোগী হইয়াছে। যদি পৃথিবীর সাধারণ কোন মনুষ্য সূর্য্যলোকে যায়, তাহা হইলে সূর্য্যের প্রচণ্ড জ্যোতিতে তাহার দৃষ্টিশক্তি তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু সূর্য্যলোকস্থ কোন জীব এখানে আসিলে, হয় ত দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী পদার্থ তাহার নয়নে স্পষ্ট প্রতিফলিত হইবে; তীক্ষ্ণ জ্যোতির সন্নিধানবশতঃ তাহার দর্শনেন্দ্রিয় এত তীক্ষ্ণ হইয়াছে; সুতরাং তোমার যোগশক্তির দ্বারা যদি দর্শনেন্দ্রিয় প্রবল হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা সূর্য্যলোকে কার্য্যকারী হইবার উপযোগী হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং তোমার সূর্য্যলোক-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত।

তোমার প্রাণধারণের জন্য পৃথিবীর ঘন বায়ুমণ্ডল আর তত প্রয়োজন হয় না, তুমি যোগ চর্চ্চায় রত থাকায় তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস নাসাভ্যন্তরচারী হইয়াছে। সুতরাং সূর্য্যমণ্ডলের মত বায়ুহীন বা অল্পমাত্র বায়ুচাপযুক্ত স্থানেও প্রাণকার্য্য সম্পাদনে তুমি উপযুক্ত হইয়াছ বুঝিতে হইবে। সুতরাং ঐরূপ সংস্কার প্রাপ্তি-বশতঃ পরজন্মে তোমার ঐরূপ সূর্য্যাদি লোকে গতি সম্ভব।

তোমার প্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতাবশতঃ তুমি বায়ুর সাহায্য ব্যতীতও শুনিতে পাও বলিয়া, তোমার ইন্দ্রিয়-সংস্কার ঐরূপভাবে রচিত হইয়াছে; সুতরাং বায়ুশূন্য বা স্বল্পমাত্র বায়ুবেষ্টিত সূর্য্যমণ্ডলেও তুমি অনায়াসে শব্দাদি শুনিতে সক্ষম হইবে। এবং এই জন্য তোমার ঐ সংস্কার নিজশক্তির উপযুক্ত কার্য্যকারী ক্ষেত্র সূর্য্যবৎ লোকে তোমায় লইয়া যাইবে, ইহা সুনিশ্চিত। এইরূপ সকল ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। সংস্কার হইতে ইন্দ্রিয় জন্মে। পরজন্মে এ দেহ থাকিবে না; তবে এ দেহের শক্তি পরজন্মে কিরূপে কার্য্যকরী হইবে, এ আশঙ্কা কেহ করিবেন না। কার্য্য—দেহ করে না, কার্য্য—সংস্কার করে। সংস্কার কার্য্যোপ-যুক্ত দেহ নির্ম্মাণ করিয়া লয়।

যাহা হউক, ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল, ইন্দ্রিয়কার্য্য সুকৌশলে সম্পাদিত হইলে, কি প্রকারে উহা সূক্ষ্মতা অথবা প্রবল কার্য্যকরী শক্তি লাভ করে ও আমাদিগকে ঊর্দ্ধগতি প্রদান করে। কালে ইন্দ্রিয় নিরবয়বত্ব লাভ করিলেও, তাহার কার্য্যকরী শক্তির আভাস চিরবর্ত্তমান থাকে।

কিন্তু নিম্নাধিকারী সাধক এ তত্ত্ব বুঝিতে পারে না বলিয়া, ইন্দ্রিয় হারাইবার ভয়ে ভীত হয়। বৈরাগ্যকে ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ বলিয়া মনে করে ও ইন্দ্রিয়শক্তি হারাইবে বুঝিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ বিষাদে তাহার মর্ম্ম পীড়িত হইতে থাকে। ইহাই সাধকের প্রথম অবস্থা বা প্রথম যোগ।

বিষাদযোগ সমাপ্ত।

ওঁ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাংখ্যযোগ।

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১

তথা কৃপয়া আবিষ্টম্ অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং বিষীদন্তং তং মধুসূদন ইদং বাক্যম্ উবাচ।

ব্যবহারিক অর্থ।—সেইরূপ কৃপাবিষ্ট, অশ্রুপূর্ণ আঁখি, বিষাদযুক্ত অর্জ্জুনকে মধুসূদন এই কথা বলিলেন।

যৌগিক অর্থ।—বিষাদের গভীর অন্ধকারে সাধকের হৃদয় পরিপূরিত হইয়া উঠিলে, মায়ার মায়ায় প্রাণশক্তি আচ্ছন্ন হইলে, এক দিকে ভগবদ্‌বিরহের কাতরতা, অন্য দিকে ইন্দ্রিয়াদির মায়া, এই উভয়-সঙ্কটে সাধকের প্রাণ বিজড়িত হইলে, সেই সময়ে ভগবদুপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। ভগবচ্চিন্তা করিতে উপবিষ্ট হইয়া, ক্রমশঃ মন চারি দিক্ হইতে প্রত্যাহৃত হইলে—প্রাণশক্তি কেন্দ্রীভূত হইলে, সেই মহামুহূর্ত্তে সাধকের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হয়। সেই সময়ে ইন্দ্রিয়গ্রাম ছাড়িয়া, ভাবগ্রামে বা চিৎরাজ্যে প্রবেশ করিতে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। অন্ধকারময় সংকীর্ণ ইন্দ্রিয়-পথে বিচরণ করিয়া, প্রাণ সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং সহসা চিৎরাজ্যের আলোকময় বিশাল বিস্তারে প্রবেশ করিতে সে ভীত, সঙ্কুচিত, বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

যোগের পথে আর অগ্রসর হইতে পারে না। সেই সময়ে সেই সঙ্কটাপন্ন সাধকের প্রাণে সর্ব্বপ্রথম ভগবান্ যে ভাবগুলি ফুটাইয়া দেন—যে ভাবের ও জ্ঞানের আশ্বাসবাণী প্রাণকে উৎসাহিত ও তুরীয়ের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়—প্রথম যে ভাবের দ্বারা প্রাণশক্তি সাহায্য প্রাপ্ত হয়, উহাকে সাংখ্যযোগ বলে। কিন্তু বিষাদের গভীর অন্ধকারে প্রাণ পূর্ণ না হইলে, এ সাংখ্য অবস্থার আস্বাদ পাওয়া যায় না। আজকাল অনেকেই যোগতত্ত্ব শিখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, এবং সদ্‌গুরুর অভাবে কিছু হইল না ভাবিয়া, বিমূঢ় হইয়া আপনাকে ও কালকে ধিক্কার দেন। কিন্তু যে জিনিষ হইলে সদ্‌গুরু লাভ হয়—যে পাথ্য প্রদান করিলে ভগবৎকৃপার সন্ধান পাওয়া যায়—যোগের যাহা মূল উপাদান—মাতৃলাভের যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, তাহা তাঁহাদিগের ভিতর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রাণে বিচ্ছেদের উপলব্ধি, আকুল পিপাসা ও মায়ের সন্ধান পাইতেছি না বলিয়া হতাশের দীর্ঘশ্বাস যতক্ষণ না আসিবে, ততক্ষণ সাধনার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। চলচ্ছক্তি যাহার নাই, পথের সন্ধান লইয়া তাহার লাভ কি? জলস্রোত আপনি আপনার পথ বাহির করিয়া লয় ও প্রণালী কাটিয়া দিলে সুগমে সাগর লাভ করে; কিন্তু স্রোত না থাকিলে শুষ্ক প্রণালী পড়িয়া থাকে।

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২

অর্জ্জুন। কুতঃ ইদম্ অনার্য্যজুষ্টম্ অস্বর্গ্যম্ অকীর্ত্তিকরং কশ্মলং বিষমে ত্বা সমুপস্থিতম্।

ব্যবহারিক অর্থ।—হে অর্জ্জুন। কোথা হইতে এইরূপ অনার্য্যজুষ্ট নিম্নমুখী অকীর্ত্তিকর মোহ, এই সঙ্কট সময়ে তোমার হৃদয়ে উপস্থিত হইল।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বোক্তরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কিছু দিন অবস্থিতির পর, সহসা নিশান্তে উষার আলোকের মত শক্তির নবরাগ প্রাণে জাগিয়া উঠে। প্রাণের ভিতর কে যেন বলিতে থাকে,—কেন তুমি এরূপ মোহাক্রান্ত হইতেছ? ইন্দ্রিয় ছাড়িতে কেন এত সন্ত্রাসিত হইতেছ? এইটাই মহাসঙ্কটাপন্ন অবস্থা। এই বিষম অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইলে, তোমার প্রাণ স্বাধীনতার আস্বাদন পাইবে। এ সময়ে কেন তুমি এত মুহ্যমান?'

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

পার্থ! ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ, এতৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে; পরন্তপ! ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ।

ব্যবহারিক অর্থ।—পার্থ। কাতর হইও না; কাতরতা তোমার উপযুক্ত নহে; হে পবন্তপ। তুচ্ছ হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হও।

যৌগিক অর্থ।—ভগবান্ সাধককে এ স্থলে পরন্তপ বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। পরন্তপ কথাটীতে যেন তিনি এই বলিতেছেন, জীব। তুমি পরমতেজঃশালী, দৌর্ব্বল্য তোমার ধর্ম্ম নহে। তুমি তোমার গুপ্ত শক্তিসকলেব ব্যবহার কর, তোমার শক্তি স্ফুরিত হইলে, তোমার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। তুমি যাহা এখন সঙ্কট বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, উহা বস্তুতঃ সঙ্কট নহে, উহা দৌর্ব্বল্য-মাত্র। এইরূপ দৌর্ব্বল্যে অভিভূত হইলে, তুমি ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইবে।

বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্তরূপ বিষাদ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ছাড়া আর কিছুই নহে। মায়া, জ্ঞানের ছদ্মবেশ পবিগ্রহণ করিয়া, ঐরূপে জীবকে জড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করে। ঐ অবস্থায় একমাত্র নিজেকে তেজঃশালী, শক্তিমান্ পুরুষ বলিয়া চিন্তা করিয়া, আরও অন্তর্মুখে অগ্রসর হইতে হয়, কিন্তু নিম্নাধিকারী সাধক তাহা পারে না।

পূর্ব্বে যে পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তির কথা বলিয়াছি, সেই শক্তিদ্বয়ের কোনটী যখন কার্য্যকরী না হয়, তখন ক্লীব অবস্থা। ঐরূপ অবস্থাকেই ক্লৈব্য বলে। চিত্তের দুর্ব্বলতাবশতঃ কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া ক্লীবত্বের লক্ষণ।

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

অরিসূদন মধুসূদন। অহং সংখ্যে পূজার্হৌ ভীষ্মং দ্রোণঞ্চ প্রতি কথং ইষুভিঃ যোৎস্যামি।

ব্যবহারিক অর্থ।—হে মধুসূদন। আমি কেমন করিয়া পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত রণস্থলে বাণসমূহ দ্বারা যুদ্ধ করিব; অর্থাৎ যাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিব বলা অনুচিত, তাঁহাদিগকে বাণের দ্বারা কিরূপে বিদ্ধ করিব?

যৌগিক অর্থ।—ব্রহ্মচর্য্যা বা ব্রহ্মান্বেষণ এবং শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদি দ্বারা আমরা জীবিত আছি। সাধকের প্রাণ যত দিন না মায়ের সন্ধান পায়, তত দিন মাতৃ-অন্বেষণে ফিরিবার জন্য শক্তিসংগ্রহ ও মাতৃ-উদ্দেশ্যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদি করিতে থাকে। তার প্রাণের প্রবল উৎকণ্ঠা মাতৃ-উদ্দেশ্যে কর্ম্মাদি করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করে। সে কর্ম্মের উচ্ছেদসাধনে তার প্রাণ কি সন্তুষ্ট হয়? কর্ম্মই তাহার গুরু, ব্রহ্মান্বেষণই তাহার প্রাণ, সে কি উহা পরিত্যাগ করিতে পারে? সে কি আজ সহসা কর্ম্মসকল জলাঞ্জলি দিতে পারে? শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম আমাদের গুরু। কেন না, কর্ম্ম হইতেই আমরা জ্ঞান লাভ করি। কর্ম্মের সেবা না করিলে জ্ঞান উদ্রিক্ত হয় না; ব্রহ্মান্বেষণরূপ মহাব্রতের সেবায় নিযুক্ত না থাকিলে, সে জ্ঞান প্রাণময় হয় না; সুতরাং ব্রহ্মান্বেষণ ও কর্ম্ম সাধকের গুরুস্থানীয়; তাঁহাদের বিপক্ষে সাধকের প্রাণ কি দাঁড়াইতে চাহে? তাই পরশ্লোকে বলিতেছেন,—

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির-প্রদিগ্ধান্॥ ৫

মহানুভাবান্ গুরূন্ অহত্বা হি ইহ লোকে ভৈক্ষ্যম্ অপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ, গুরূন্ হত্বা তু ইহ রুধির-প্রদিগ্ধান্ এব অর্থকামান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয়।

ব্যবহারিক অর্থ।—মহানুভব গুরুজনের হত্যা না করিয়া ভিক্ষান্ন ভোজন করাও ভাল; কিন্তু গুরুবধ করিলে, আমাদিগকে তাঁহাদিগের রুধিরলিপ্ত অর্থ-কামরূপ ভোগ্যসকল উপভোগ করিতে হইবে।

যৌগিক অর্থ।—চিন্তাই আমাদিগের মনোময় দেহের আহার, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অন্নরসাদির দ্বারা যেমন আমাদের দেহ পুষ্ট ও কার্য্যকারী হয়, চিন্তা দ্বারা তেমনই আমাদিগের মনোময়কোষ পুষ্ট ও কার্য্যক্ষম হয়। কর্ম্ম ও ব্রহ্মান্বেষণরূপ গুরুবর্গ হইতে আমরা সংচিন্তারূপ আহার মনোময়কোষের জন্য সংগ্রহ করিতে পারি। কর্ম্ম আমাদিগকে ক্রমশঃ চিন্তাশক্তিপরায়ণ করিয়া তুলে এবং সেই চিন্তাশক্তি-প্রভাবে আমাদের মনোময়কোষ অলৌকিক কার্য্য-সকল করিতে সমর্থ হয়। সেই জন্য সাধক ব্রহ্মান্বেষণ ও শাস্ত্রাদিবিহিত যজ্ঞাদি হইতে বিরত হইতে চাহে না। তাহার প্রাণ উহাদিগকে মনোময়কোষের

অন্নদাতা বুঝিয়া, উহাদিগের প্রতি অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করে; এবং কৃতজ্ঞতা-পরবশ হইয়া ভাবে, যদি ভিক্ষান্নের দ্বারাও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি গুরুহত্যা করিতে পারিব না; অর্থাৎ আশ্রমবিহিত কর্ম্মের দ্বারা যদি জ্ঞান সম্যক্ পরিপুষ্ট নাও হয়—অন্য প্রকারে সৎচিন্তা সংগ্রহ করিয়া যদি মনোময়কোষকে পুষ্ট করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি কর্ম্মবধ করিতে পারিব না। কর্ম্মবধ করিলে আমাদিগের মনোময় দেহ ক্ষীণ ও রুধির-প্রদিগ্ধ হইয়া যায়; অর্থাৎ যদি কর্ম্ম ছাড়িয়া অন্য কোন উপায়েও আমাদিগের বাসনা পূর্ণ হইত, তাহা হইলে উহাও কর্ম্মের অভাববশতঃ স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিত না, ক্ষরিত হইয়া নির্গত হইয়া যাইত।

রুধির-প্রদিগ্ধ বলিবার অর্থ কি? আমাদিগের মনোময়দেহে ভোগসকল রুধিরপ্রদিগ্ধ কি প্রকারে হইতে পারে? আমাদিগের স্থূলদেহ যেমন সাপ্তকৌষিক* অর্থাৎ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, স্নায়ু, এই সাত প্রকার উপাদানে গঠিত, তদ্রূপ আমাদের মনোময়দেহও ঐরূপ সপ্ত উপাদানে রচিত হয়। নিষ্ঠা ইহার অস্থি, কর্ম্ম ইহার মাংস, ভাব ইহার রক্ত, চিন্তা ইহার রস, জ্ঞান ইহার মেদ, বুদ্ধি ইহার মজ্জা ও ব্রহ্মান্বেষণ ইহার প্রাণ। স্থূলদেহে যেমন অন্নরস হইতে রক্ত নির্ম্মিত হয়, তেমনই মনোময়দেহে স্থূল কর্ম্ম হইতে ভাবরূপ রক্ত নির্ম্মিত হইয়া আমাদিগের মনোময়দেহকে সজীব করিয়া রাখে। যেমন আমাদিগের স্থূলদেহের কোন স্থান বিচ্ছিন্ন হইলে, সে স্থানে রুধির প্রবাহিত হইতে থাকে, তদ্রূপ আমরা স্থূল কর্ম্ম ত্যাগ করিলে, আমাদিগের মনোময়দেহ বিচ্ছিন্ন হয় ও ভাবসকল স্রাবিত হইয়া যায়। সুতরাং কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য কোনরূপে মনোময়দেহে আহার অর্পণ করিলেও উহা সঞ্চিত না হইয়া, স্রাবিত হইয়া যাইতে থাকে ও মনের পুষ্টিসাধনে কৃতকার্য্য হয় না। শুধু এই কারণে আমাদিগের শাস্ত্র মন্ত্রগুপ্তির কথা বার বার বলিয়াছেন। মন্ত্র প্রকট হইলেই ধ্বংস হইয়া যায়। ভাব প্রকটিত হওয়া ও স্থূলদেহ হইতে রুধির স্রাবিত হওয়া একই জিনিষ। সাধনার কথা যে যত গুপ্ত রাখিতে পারে, তাহার মনোময়দেহের বল তত অধিক সঞ্চিত হয়; এবং যে যত প্রকাশ করিয়া ফেলে, তাহার সাধনা তত অকৃতকার্য্য হয়। মন্ত্রগুপ্তি সিদ্ধির উপায়, প্রকটে সাধনার বিনাশ, এ কথা যেন সাধকমাত্রেরই মনে থাকে।

* মতান্তরে দেহকে ষাট্‌কৌষিক বলে।

যাহা হউক, কর্ম্ম বিচ্ছিন্ন হইলে, যেমন মনোময়কোষের ভাবরূপ রুধির স্রাবিত হইয়া যায়, তদ্রূপ আবার বহির্দ্দেহে রক্তের সহিত প্রাণশক্তি ক্ষয়িত হইবার মত, মনোময়দেহের ব্রহ্মান্বেষণরূপ প্রাণ, ভাবরূপ রুধিরের সঙ্গে নির্গত হইয়া যায়; অর্থাৎ যেমন আমাদিগের স্থূলদেহ হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হইলে, দেহ প্রাণহীন হইতে পারে, তদ্রূপ মনোময়কোষ হইতে ভাব-সকল প্রকাশ বা বিনির্গত হইয়া গেলে, ব্রহ্মান্বেষণরূপ তাহার প্রাণও ক্ষরিত হইয়া যায়। ব্রহ্মান্বেষণই মনোময়কোষের প্রাণ, এ কথা যেন স্মরণ থাকে। আমাদিগের ব্রহ্মান্বেষণই সমস্ত কর্ম্মের ও দেহধারণের মূল। ব্রহ্মান্বেষণের জন্যই জগতে এত ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। অপরিচ্ছিন্না মহাশক্তি জীবে জীবে অবস্থিতা থাকিয়া, ব্রহ্মান্বেষণরূপ স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া, চারি ধারে স্ফুরিত হইতেছে ও আপনি ঘনীভূত হইয়া, দেহ ইন্দ্রিয়াদি আকারে পরিণত হইয়া, ব্রহ্ম সন্দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। জীবের যত কিছু চেষ্টাশক্তি—যত কিছু ক্রিয়া, ব্রহ্মান্বেষণই ইহার মূল কারণ—ব্রহ্মান্বেষণের জন্যই জীবের জীবভাব—ব্রহ্মান্বেষণের জন্যই জীব, জীবরূপে পরিণত। সুতরাং ভাব বাক্যে প্রকাশ হইয়া গেলে, ব্রহ্মান্বেষণরূপ শক্তি ক্ষয়িত হইয়া যায়। এমন কি, সে শক্তির অভাবে জীবের স্থূলদেহ পর্য্যন্ত অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। আমরা অনেক মহাপুরুষকে অকালে দেহত্যাগ করিতে শুনিয়াছি। তাহার ভৌতিক কারণ আর কিছুই নহে, অধিক পরিমাণে ব্রহ্মক্ষরণ। জগতের হিতার্থে ইচ্ছা করিয়া হউক, অথবা ভাবের আবেগে অলক্ষ্য ভাবেতেই হউক, কিম্বা অজ্ঞাতবশতেই হউক, স্থান, কাল, পাত্রাদি বিচার না করিয়া, ব্রহ্মসত্তার ভাবসকল অধিক পরিমাণে বাক্যাকারে স্ফুরিত করিবার জন্য, তাঁহাদিগের মনোময়কোষ অপরিমিত ভাবে ক্ষয়ীভূত ও এমন কি, স্থূলদেহ পর্য্যন্ত তজ্জন্য অকালে নিপাতিত হইয়াছে। আমাদিগের শাস্ত্র এই সকল কারণে স্থান, কাল, পাত্র ও নানাপ্রকার কর্ম্মের আবরণের ভিতর দিয়া, ব্রহ্মসত্তা আলোচনার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এ সকল কথা কর্ম্মযোগ আলোচনার সময়ে বিস্তৃতভাবে বলিব।

আমরা স্থূলতঃ এই বুঝিলাম যে, কর্ম্ম হনন করিলে ও ব্রহ্মান্বেষণরূপ শক্তি হত হইলে, আমাদিগের চিন্তাসকল রুধির-রঞ্জিত বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।

যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-

স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

যৎ বা জয়েম যদি বা নঃ জয়েয়ুঃ, (এতয়োর্ম্মধ্যে) কতরৎ নঃ গরীয়ঃ এতৎ চ ন বিদ্মঃ ; যান্ হত্বা নৈব জিজীবিষামঃ, তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে অবস্থিতাঃ।

ব্যবহারিক অর্থ।—আর আমরা জয়ী হই কিম্বা বিজিত হই, ইহার মধ্যে কোন্‌টী গরীয়ান্, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা জীবিত থাকিতে চাহি না, সেই কৌরবগণই আমাদিগের বধ্যরূপে অবস্থিত রহিয়াছে।

যৌগিক অর্থ।—ইন্দ্রিয়দিগকে বধ করে বা ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক বিজিত হয়, এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী গুরুতর, কোন্‌টী অভীপ্সিত, সাধক এই উভয়সঙ্কট অবস্থায় তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

তাহার প্রাণ যেন বলিতে থাকে, ইন্দ্রিয়গণকে বধ করিয়া আমি বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, এবং সেই ইন্দ্রিয়গণই বধ্যরূপে আমার সম্মুখে অবস্থিত।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে

শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ (অহং) ত্বাং পৃচ্ছামি ; যৎ মে শ্রেয়ঃ স্যাৎ, তৎ নিশ্চিতং ব্রূহি। অহং তে শিষ্যঃ, ত্বাং প্রপন্নং মাং শাধি।

ব্যবহারিক অর্থ।—মনের সংকীর্ণতা ও কুলক্ষয়াদি দোষ আশঙ্কায় আমার চিত্ত অভিভূত হইয়াছে ; ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বিমূঢ়, তাই আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বল। আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমায় শিক্ষা দাও। এমন অপূর্ব্ব চরিত্র-প্রতিফলন আর কেহ কোথাও দেখে নাই। রণস্থলে শত্রুসম্মুখে দাঁড়াইয়া, ধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া ভগবচ্চরণে এমন করিয়া কাতরভাবে লুটাইয়া পড়িতে আর কাহাকেও দেখি নাই। উভয় দিকে নর-সমুদ্র রণোল্লাসে উন্মত্ত, অস্ত্র-শস্ত্র-ঝঞ্ঝনের শব্দে দিগন্ত মুখরিত, সমর-প্রাঙ্গণ প্রলয়ের পূর্ব্বমুহূর্ত্তের মত ঘোর

গম্ভীর করাল বিভীষিকাময়—সাম্রাজ্য আশা উদ্দীপ্ত ভ্রাতৃবৃন্দ আত্মীয়তা বিস্মৃত হইয়া শত্রুভাবে পরস্পর পরস্পরকে হননের জন্য দণ্ডায়মান—মোহান্ধতার বিকট অন্ধকার-মূর্ত্তি যেন তত্রস্থ জীবসকলকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে, আর সেই অন্ধকারের মধ্যে, সেই আসুরিক ভাবোল্লাসের মধ্যস্থলে, সেই প্রলয়কল্লোলের ঘাতপ্রতিঘাতকে মূহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ করিয়া, যেন হিংসা-রাক্ষসীর দশনপঙ্‌ক্তিদ্বয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া, সাধকপ্রবর ভগবচ্চরণে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতেছে,—

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

আপনাকে এমনই করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়া, এমনই উত্তেজনার অবস্থায়, এমনই উত্তেজনাপূর্ণ স্থানে, এমনই উত্তেজনাপূর্ণ সময়ে, এমনই করিয়া অধর্ম্মাশঙ্কায় ভগবচ্চরণে লুটাইয়া পড়িতে জগতে কেহ কখন কাহাকেও দেখে নাই। গীতার সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া শুধু এই স্থানের কাব্যাংশটুকু দেখিলেও গীতা জগতে অতুলনীয়।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বোক্তরূপে উভয় দিক্ চিন্তা করিতে করিতে সাধক অন্য কিছু বুঝিতে না পারিলেও সে বোঝে—তাহার চিত্ত ধর্ম্মসংমূঢ় হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম কি, অধর্ম্ম কি, বিচার করিতে বসিয়া, সে তাহার ক্ষুদ্র শক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার শক্তি কার্পণ্য বা সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন সাধক আর নিজের উপর নির্ভর না করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া পড়ে। নিজের ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা দুরন্ত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই বুঝিয়া, বিরাট্ শক্তির নিকটে সাহায্যপ্রার্থী হইতে হয়। এই নির্ভরতাটুকু আনাইবার জন্যই এত বিষাদ। বিষাদ না হইলে নির্ভরতা আসে না। ঐ মহামুহূর্ত্তেই সাধক সম্পূর্ণভাবে মাতৃশক্তির উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করে একান্তরূপে মায়ের চরণে লুটাইয়া পড়িতে প্রয়াসী হয়। বিষে যেমন অমৃত প্রচ্ছন্ন থাকে, সমুদ্রে যেমন বাড়বানল থাকে, বিপদের ভিতর তেমনই মহাসম্পদ্ লুক্কায়িত; সাধনার ঐ সঙ্কটের ভিতর তেমনই নির্ভরতা লুকান। কাহাকে লইয়া ধর্ম্ম অধর্ম্ম ? মায়ের জন্য ত। কিসের জন্য প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ? মায়ের জন্য ত। কিসের জন্য বিচার আকাঙ্ক্ষা ? মায়ের জন্য ত! সে সব ঘাতপ্রতিঘাত মাকে পাইবার জন্য ত! তবে সাধক! তোমার ঐ বিচার ও সন্দেহের মধ্যস্থলে মা ত নিশ্চয়ই রহিয়াছেন, নতুবা এত আকর্ষণ কোথা হইতে আইসে? মহাকেন্দ্রের আকর্ষণ না হইলে এমন করিয়া প্রাণকে টানে কে রে! তুমি বিলম্ব

করিও না; যখন বিষাদ আসিয়াছে—যখন মহাস্রোতের আকর্ষণ অনুভব করিয়াছ, তখন আর তোমার কিসের ভাবনা! তুমি তোমার ঐ আলো ও অন্ধকারের মধ্যস্থলে মাকে দর্শন কর—তোমার ঐ বিচার ও আশঙ্কার মধ্যস্থলে মাকে দর্শন কর—তোমার ঐ আগ্রহ ও অসুবিধার মধ্যস্থলে মাকে দর্শন কর—জ্ঞান ও বুদ্ধির মধ্যস্থলে মাকে দর্শন কর;—বিচার বিতর্কের মধ্যস্থলে—সংশয় সিদ্ধান্তের মধ্যস্থলে মাকে পরিদর্শন কর;—চক্ষুর পার্শ্বদৃষ্টি ফিরাইয়া মধ্যস্থলে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। যে সারথিরূপে তোমার আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত আজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহার মুখের দিকে একবার সতৃষ্ণ নয়নে চাহ, তাহার চরণে লুটাইয়া পড়। দিবা ও রাত্রির সঙ্গমস্থলে উষা যেমন সূর্য্যচরণে নতশির হয়, তেমনই ভাবে তোমার ঐ আলোক ও অন্ধকারের সঙ্গমস্থলে হৃদয়স্থ দীপ্ত-মার্ত্তণ্ডের চরণে শরণাগত হও। "মা" "মা" করিয়া প্রাণের ভিতর তোমার প্রাণের প্রাণের চরণ জড়াইয়া ধর—আর বল—"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" আমি তোমার শিষ্য, শরণাগত, আমি অন্য কাহাকেও জানি না, তুমি আমায় শিক্ষা দাও। হৃদয়স্থ মহাকাশে তোমার সে কাতর সম্ভাষণ যেন তরঙ্গিত হয়; হর্ম্ম্য মাঝে শব্দ যেমন প্রতিধ্বনিত হয়, তেমনি ভাবে তোমার বুকের ভিতর চারি ধারে যেন প্রতিধ্বনি শুনিতে পাও—"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

এই মহামন্ত্রের সাধনা যত দিন না সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তত দিন সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া দুরূহ। এমনই ভাবে নিজ ব্রহ্মসত্তায় গুরুবোধ যত দিন না আসে, তত দিন সাধনার দ্বিতীয় বা সাংখ্যস্তরে আরোহণ করা যায় না। এমনই করিয়া যত দিন না নিজের জীবভাবকে নিজের ব্রহ্মভাবের শিষ্যত্বে নমিত করা যায়, তত দিন সাধনার পথ রুদ্ধ থাকে। মাকে বুকের ভিতর দাঁড় করাইয়া যত দিন না তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করা যায়, তত দিন সাধনার আশা বৃথা।

ভগবান্‌কে গুরুরূপে দেখিয়া, তাঁহার চরণে আত্মনির্ভর করাই সাধনার দ্বিতীয় স্তর। এইরূপে গুরুপ্রতিষ্ঠা না করিলে সংশয়, বিচার, সন্দেহের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। নির্ভরতা না আসিলে শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। পৃথিবী যেমন স্রোত আকারে তাহার জলরাশি সমুদ্রে ঢালিয়া দিয়া, তৎপরিবর্ত্তে বর্ষণ প্রাপ্ত হয়—পৃথিবীর জল, নদ নদী আকারে পৃথিবীস্থ সমুদ্রে গড়াইয়া পড়ে, এবং সেই সমুদ্র হইতে জলরাশি বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া যেমন শতগুণে

পৃথিবীর সে বারি-উপহারের পুরস্কার দেয়, তেমনই করিয়া তোমার শক্তি-স্রোত তোমারই হৃদয়স্থ শক্তি-সমুদ্রে ঢালিয়া দাও; সে সাগর তোমার সে উপহার বিশ্বভুবনব্যাপী অন্তরীক্ষে প্রেরণ করিবে। সে অন্তরীক্ষ, সে আকাশের আকাশ, সে শূন্যের পূর্ণ, তোমার সে উপহার শতগুণে গুণিত করিয়া তোমায় প্রত্যর্পণ করিবে।

গুরু-প্রতিষ্ঠা ও কেন্দ্রস্থ হওয়া একই কথা। যদি সাধক হইতে চাহ, তবে পরমুখাপেক্ষী হইও না— পরের আশায় থাকিও না। প্রাণে যখন যাহা সংশয় আসিবে, অমনই হৃদয়স্থ গুরুকে সে সংশয়ের মীমাংসার জন্য প্রার্থনা করিবে। দেখিবে—অপৌরুষেয়, অভ্রান্ত বেদে সে সন্দেহের যেরূপ মীমাংসা আছে, তোমার মত ক্ষুদ্র প্রাণীর হৃদয় হইতেও সেই মীমাংসা স্বতঃ উদ্ভূত হইবে। প্রাণের ভিতর যখন যে সৎচিন্তা উদিত হইবে, অমনি তাহা গুরু-চরণে অর্পণ করিবে, দেখিবে—তাহা অমৃতময় হইয়া গিয়াছে। প্রাণের ভিতর যখন যে অসৎ ভাবের আবির্ভাব হইবে, অমনই উহা গুরু-সকাশে লইয়া যাইবে, দেখিবে—উহা মাতৃ-খড়্গে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে।

আবার বলি, তোমার ক্ষুদ্র মুখের ক্ষুদ্র ফুৎকার যেমন শঙ্খমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহুদূরবিস্তৃত এক উচ্চ শব্দ-রোল সৃজন করে, তেমনই তোমার ক্ষুদ্র শক্তি যদি হৃদয়স্থ গুরুকে অর্পণ করিতে পার, তাহা হইলে উহা শতগুণে শক্তিসম্পন্ন হইয়া, তোমাকে শক্তিময় করিয়া তুলিবে। আবার বলি, যেমন তরুতলে সাধারণ জলসেচন করিলে, সে তরু ফল ও কুসুমসম্ভারে পরিশোভিত হইয়া তোমায় চরিতার্থ করে, তেমনই তোমার সাধারণ শক্তি হৃদয়স্থ গুরু-উদ্দেশ্যে অর্পণ কর; দেখিবে,—সে কল্পতরু ফলফুলময় হইয়া তোমার হৃদয়-কানন সুশোভিত করিয়াছে। আবার বলি,—সূর্য্য-কিরণ অয়স্কান্তমণির উপর পড়িলে বা ভর দিলে যেমন উহা কেন্দ্রস্থ হইয়া অগ্নি উৎপাদন করে, তেমনই তোমার শক্তি যদি তোমার হৃদয়স্থ সে অয়স্কান্তমণির উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, অর্থাৎ যদি তুমি নির্ভর করিতে শিক্ষা কর, তাহা হইলে উহা জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা সদৃশ ঝলসিয়া উঠিবে। নির্ভরতা না হইলে কিছু আসিবে না, নির্ভরতা না আসিলে শক্তির সন্ধান পাইবে না। সেই জন্যই এত করিয়া বলিলাম।

এই স্থলে গুরু সম্বন্ধে একটু বলিব। গুরু কি? গুরু ভগবৎশক্তির বিকাশ-ক্ষেত্র। ভগবৎশক্তির স্রোত অনন্ত দিকে প্রবাহিত—দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত, পদার্থে

পদার্থে অনুস্যূত। আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের ভিতর ও বাহিরে ভগবৎ-শক্তি প্রবাহিত। কিন্তু যেমন নদীতে জাল নিক্ষেপ করিলে, জলরাশি জালখানিকে ভিজাইয়া, অনায়াসে বিনা প্রতিরোধে তাহার ভিতর দিয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ প্রত্যেক জীব ও প্রত্যেক পদার্থের ভিতর দিয়া সে মাতৃশক্তি শুধু আমাদিগকে সঞ্জীবিত রাখিয়া, প্রায় বিনা প্রতিরোধে চলিয়া যাইতেছে। কেবল মায়ের শক্তিশালী সন্তান সিদ্ধর্ষিরা সে শক্তিস্রোত প্রতিরোধ করিতে বা ধরিয়া রাখিতে সমর্থ। সাধারণ জীবের ভিতর দিয়া সে শক্তিস্রোত যেমন করিয়া বহিয়া চলিয়া যায়, তাঁহাদের ভিতর দিয়া তেমনই করিয়া বহিয়া চলিয়া যাইতে পারে না। সূর্য্যালোক যেমন দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া জ্যোতিরাশি প্রক্ষিপ্ত করে, এবং নিজেও সূর্য্যবৎ জ্যোতিষ্মান্ দেখায়, তেমনই ঐ সমস্ত সিদ্ধর্ষি আদি গুরুশ্রেণী, সেই ভগবৎ-শক্তিতে নিমজ্জিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় হইয়া রহিয়াছেন ও চারি দিকে জ্যোতিঃ প্রক্ষিপ্ত করিতেছেন। গৃহের ভিতর সূর্য্যালোক প্রবেশ করিবার পথ না পাইলেও যেমন দর্পণের দ্বারা সে আলোককে সে গৃহমধ্যে প্রক্ষিপ্ত করা যায়, তদ্রূপ সাধারণ জীবশ্রেণী ঐরূপ গুরুসন্নিধানে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের অঙ্গ হইতে প্রতিফলিত জ্যোতিঃ হৃদয়মধ্যে প্রতিফলিত হইতে পারে। ঐ সমস্ত গুরুবৃন্দ,—চুম্বক যেমন লৌহখণ্ড আকর্ষণ করে তেমনই ভাবে ভগবৎশক্তি আকর্ষণ করিয়া লয়েন, এবং সেই আকৃষ্ট শক্তি জগতের হিতার্থে নিয়ত প্রক্ষেপ করেন। যেমন সূর্য্যের দিকে আমাদিগের চক্ষু চাহিতে পারে না, কিন্তু সূর্য্যালোকে অনায়াসে কার্য্যকারী হয়, তদ্রূপ নিম্নস্তরীয় সাধকবৃন্দ অনন্তপ্রসৃত ভগবৎশক্তি আকর্ষণ করিতে বা তাহার দিকে চাহিতে সক্ষম হয় না; কিন্তু সেই ভগবদালোকে উজ্জ্বলিত ঐ সমস্ত মহাপুরুষদিগের আলোকে আপনাদিগকে আলোকিত করিতে পারে। এই জন্যই সাধারণ জগৎ ও ভগবৎসত্তার মধ্যস্থলে গুরুরূপে মহাপুরুষেরা অবস্থিত।

জীব, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য কাতর হইলে, তাহার কাতরতা ও শক্তির অনুপাতে ভগবান্ তাহাকে গুরু দেখাইয়া দেন। যাহার যেরূপ আগ্রহ, যাহার যেরূপ আকুলতা, সে তদনুসারে গুরু লাভ করে। আগ্রহের অনুসারে ভগবান্ তাহার নিকট সাধারণ কুল-গুরুরূপে বা সাধকাকারে সদ্‌গুরুরূপে বা জীবন্মুক্ত সিদ্ধপুরুষ-রূপে আবির্ভূত হন। প্রাণে অল্প তৃষ্ণা জাগিলে সাধারণ গুরু, তৃষ্ণা প্রবলতর হইলে কোন উচ্চশ্রেণীর সাধক ও প্রবলতম হইলে জীবন্মুক্ত সিদ্ধপুরুষ গুরুরূপে

তাহার নিকট উপস্থিত হয়েন এবং তৃষ্ণা অনুযায়ী তাহাদিগকে শক্তি ও জ্ঞান দান করেন। উচ্চ স্তরের সাধক হইলে, জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের সাক্ষাৎ লাভ হইতে পারে। আমাদিগের পুরাণ-কথিত নারদ, সনক, সনাতনাদি ঋষিবৃন্দ গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাদিগের জ্যোতিতে হৃদয় আলোকিত করিয়া দেন। ঐ সকল জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ কখন ব্যক্তিবিশেষের গুরুরূপে এবং কখনও বা জগদ্‌-গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। মনুষ্য-জগতের যখন যে অংশ যেরূপ ভাবে মলিনতা প্রাপ্ত হয় ও তজ্জনিত অন্ধকারে আলোকের জন্য আকুল হয়, মনুষ্য-জগতের সেই অংশে সেইরূপ ভাবে অন্ধকার দূর করিবার জন্য, ঐ সিদ্ধ পুরুষেরা মনুষ্যাকারে অবতীর্ণ হইয়া, জগতে অবতার বলিয়া পরিচিত হয়েন। জগৎ তাঁহাদিগের চরণে "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌" বলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে। মাতৃশক্তির অলৌকিক লীলা কিছু দিন জগতে প্রকাশ করিয়া, জগতে এক আনন্দোচ্ছ্বাসের সৃজন করেন এবং জগতের মলিনতা কিছু দিনের জন্য ধৌত করিয়া দিয়া যান।

এইরূপে যখন যেখানে অভাব অনুভূত হয়, সেই স্থলেই গুরু আসিয়া আবির্ভূত হয়েন। কি ব্যক্তিগত ভাবে, কি সমষ্টিভাবে, অভাব অনুসারে তৃষ্ণা অনুসারে, আসক্তি অনুসারে—গুরুলাভ হইয়া থাকে। ভগবৎশক্তি প্রাপ্তির জন্য প্রাণ কাঁদিলেই অগ্রে গুরুলাভ অবশ্যম্ভাবী। তখন তৃষ্ণা অনুসারে যে গুরু তোমার নিকট উপস্থিত হউন না কেন, তুমি তাঁহাকে ভগবৎপ্রেরিত বলিয়া বুঝিয়া লইবে। গুরুরূপে সাধারণ মনুষ্যই হউন, শক্তিমান্ কোন সাধকই হউন, অথবা সৌভাগ্যবশতঃ কোন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষই হউন, যিনিই আসুন—তুমি বুঝিবে, তিনিই তোমার ভগবান্. মূর্ত্তিমান্ ভগবৎশক্তি তোমার সম্মুখে উপস্থিত। তোমার তৃষ্ণা অনুযায়ী ক্ষুদ্র আধারে অথবা বৃহৎ আধারে করিয়া সেই একই পানীয় প্রেরিত হইয়াছে। শিশুর তৃষ্ণায় কেহ কুম্ভ ভরিয়া জল দেয় না, অথবা বয়স্থ ব্যক্তি পিপাসিত হইলে, কেহ তাহাকে গণ্ডূষমাত্র জল দিয়া সন্তুষ্ট করিতে চাহে না। কিন্তু উভয়েই জল পায়, এ কথা যেন স্মরণ থাকে।

তাই বলিতেছি, গুরুর বিচার করিও না—নিজের তৃষ্ণার বিচার কর, গুরু-প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত হও; গুরুশ্রেণী স্তরে স্তরে সজ্জিত, তুমি তৃষ্ণা বাড়াইয়া গ্রহণ কর। ভগবানের চরণে লুটাইতে শিখ, ভগবৎদূত আপনি আসিবে; আসিলে বঞ্চিত হইও না, সে জন্য প্রস্তুত হও। "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"বলিয়া

ভগবচ্চরণে অশ্রুজল ঢাল। "হে গুরো! হে জগদ্‌গুরো! আমি তোমার শিষ্য —দীন, শরণাগত তুমি আমায় শিক্ষা দাও" বলিয়া কাঁদ—গুরু আসিবেন ও আসিলে তুমি বঞ্চিত হইবে না। তোমার তৃষ্ণা তিলমাত্র উদ্রিক্ত হইলেই গুরু আসিয়া উপস্থিত হয়েন। কিন্তু হায়! সন্দেহ, সংশয় তোমার সে তৃষ্ণাকে হৃদয়ে অধিকক্ষণস্থায়ী হইতে দেয় না; সুতরাং গুরু পাইয়াও তোমার গুরুলাভ হয় না। চরণে লুটাইতে না শিখিলে গুরু-শক্তি অনুভূত হয় না, গুরু পাইয়া তোমার লাভ কি?

তাই আবার বলি, চরণে লুটাইতে শিখ। তোমার প্রাণ অহর্নিশ কাঁদুক,— "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"; তোমার মর্ম্মে মর্ম্মে ক্রন্দনের রোল উঠিতে থাকুক,—"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"; তোমার হৃদয়ে অহর্নিশ প্রতিধ্বনিত হউক,—"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" তবে তুমি গুরু আসিলে চিনিতে পারিবে।

বহিশ্চক্ষে গুরু চিনিবার উপায় নাই। হয় ত তোমার তৃষ্ণা প্রবল হইয়াছে ও তদনুসারে কোন মহাপুরুষ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন; কিন্তু তোমার মলিন চিত্ত বহির্লক্ষণ বিচারে অভ্যস্ত বলিয়া, তুমি সেই পুরুষে কোন সিদ্ধি বা মহত্ত্বের লক্ষণ আছে কি না, জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলে, এবং তোমার মলিন জ্ঞান সেরূপ কোন বহির্লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইল,— ইনি সাধারণ মনুষ্য। সুতরাং তন্মুখনিঃসৃত উপদেশ তোমার হৃদয়ে আস্থা পাইল না, তুমি বঞ্চিত হইলে।

সামান্য কথায় বলি, একজন তস্করকে বা অপরাধীকে যদি প্রহার কর, তবে সে নিঃশব্দে হয় ত সে প্রহার সহ্য করিবে। নিরপরাধী সাধারণ মনুষ্য হইলে তজ্জন্য ক্রোধ প্রকাশ ও তাহার প্রতীকারের জন্য ব্যস্ত হয়; কিন্তু অপরাধী স্বীয় অপরাধ বুঝিয়া নিঃশব্দে সে অত্যাচার সহ্য করে। আবার কোন মহাপুরুষকে বিনা কারণে যদি তুমি প্রহার কর, তিনিও হয় ত নিঃশব্দে সে অত্যাচার সহ্য করিবেন। তোমার মলিন জ্ঞান হয় ত ঐরূপ নিঃশব্দে প্রহার সহ্য করিবার নিমিত্ত সেই মহাপুরুষকে অপরাধী ভাবিয়া লইবে—নিঃশব্দে অপরাধ সহ্য করা তস্করের লক্ষণ বলিয়া তাঁহাকেও তস্কর মনে করিবে; সুতরাং মহাপুরুষ পাইয়াও তুমি চিনিতে পারিবে না।

তাই বলিতেছি, বহির্লক্ষণ দেখিয়া গুরুবিচার করিও না। কাতরতারূপ

বারিতে হৃদয় পূর্ণ না হইলে গুরুর গুরুত্ব অনুভূত হয় না। "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" বলিতে না পারিলে, গুরু-শক্তির বিকাশ অসম্ভব।

কত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, স্বার্থান্ধ মনুষ্য-জগতে কত নির্যাতন সহ্য করিয়া স্বলোকে প্রস্থান করিয়াছেন; জগতে অবস্থিতিকালে তাঁহাদের কেহ চিনিতে পারে নাই, তিরোধানের পর জগৎ তাঁহাদের জন্য কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে, এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। তাই বলি, তুমি সেই স্বার্থান্ধ জগতের জীব—তুমিও জগতের মত গুরু পাইয়াও যেন গুরু হারাইও না, সাবধান! *

এই শিষ্যত্বের লক্ষণ কি? চিত্তের কি প্রকার অবস্থা হইলে বুঝিব, তুমি শিষ্যত্বের জন্য প্রস্তুত হইতেছ? তোমার মানসিক গঠন কিরূপে গঠিত হইলে বুঝিব, তুমি গুরুলাভে অধিকারী হইয়াছ?

যখন দেখিবে, তোমার কার্য্য-সকল জগতের ঊর্দ্ধ-লোকস্থ জীব-সকলের সন্তোষ বিধানে যত্নবান্, তখন বুঝিবে, তুমি ক্রমশঃ শিষ্যত্বের অধিকারী হইতেছ। সাধারণ জীব! তোমার কার্য্যসকল আত্মীয়, স্বজন, সমাজ অথবা এই ক্ষুদ্র বিশ্বের মঙ্গল লইয়াই অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু বিশাল সূক্ষ্ম-জগৎ তোমার সে কার্য্য কিরূপ চক্ষে দেখে, তুমি কার্য্য করিবার সময় সে দিকে একবারে লক্ষ্য রাখ না। তুমি অন্যায় কার্য্য করিবার সময় মনুষ্য-জগতের চক্ষে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাক, কর্ত্তব্য কাজ করিবার সময় শুধু মনুষ্য-জগতেরই হিতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর; কিন্তু তোমার প্রত্যেক কার্য্য এ ক্ষুদ্র মনুষ্য-জগৎ অপেক্ষা বিশাল সূক্ষ্ম-জগতে কিরূপে প্রতিফলিত হয়, সে দিকে একবারও দৃষ্টি রাখ না। তুমি স্থূল-জগতের সন্তোষ-বিধানেই অহরহ যত্নবান্, সূক্ষ্মজগতের অস্তিত্ব তুমি কার্য্যতঃ একেবারে বিস্মৃত—তুমি অন্ধ।

যদি যথার্থ শিষ্য হইতে চাহ, তবে সূক্ষ্ম-জগতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবে। এই স্থূল-জগতের গোটাকয়েক চক্ষুর দিকে চাহিয়া ভুলিয়া থাকিও না। সূক্ষ্ম-জগতের অসংখ্য মহাপুরুষের দীপ্তিমান্ চক্ষে তোমার প্রতি কার্য্য প্রতিফলিত হইতেছে। শশক যেমন তৃণগুচ্ছমধ্যে মুখ লুকাইয়া, সে লোকচক্ষুর অন্তরালে আসিয়াছে ভাবে, তুমিও তদ্রূপ এই স্থূল জগৎরূপ তৃণগুচ্ছে লুক্কায়িত বলিয়া

* জগতে কোন মহাপুরুষ শীঘ্রই অবতীর্ণ হইবেন। পাছে অন্যান্য মহাপুরুষের মত তিনিও জগতে আসিয়া অনাদৃত হয়েন, এই ভয়ে অনেক সাধকবৃন্দ তাঁহাকে সমাদর ও সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

আপনাকে অনুমান করিতেছ। তোমার এই শশকসদৃশ ব্যবহারে তুমি আধ্যাত্মিক জগতে হাস্যাস্পদ হইতেছ মাত্র।

যদি শিষ্য হইতে চাহ, তবে আধ্যাত্মিক জগতের দিকে চক্ষু ফিরাও। তোমার প্রত্যেক কার্য্য সূক্ষ্ম-জগতের দিকে কিরূপে প্রতিফলিত হইতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ কর। মহাপুরুষদিগের কার্য্যসকল পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবে, সাধারণতঃ উহা সমাজের পক্ষে বিপরীত ভাবাপন্ন বলিয়া পরিগণিত হয়; এবং সেই জন্য অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। কিন্তু তবু তাঁহারা সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কার্য্য করিয়া চলিয়া যান। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল আধ্যাত্মিক জগতের দিকে দৃষ্টি থাকে বলিয়া. বহির্জগতে সে কার্য্য কিরূপে রঞ্জিত হইতেছে, সে দিকে তাঁহারা লক্ষ্য করেন না।

কত সিদ্ধ পুরুষ আমাদিগের নিকট দিয়া চলিয়া যান, চক্ষুর অভাবে আমরা দেখিতে পাই না, তাঁহাদিগের শরণাগত হইতে পারি না। "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" মন্ত্রের সাধনা না থাকায় তাঁহাদিগের চরণ স্পর্শ করিতে পারি না। কত সিদ্ধ পুরুষ যুগযুগান্তর ধরিয়া জগতের হিতার্থে অনবরত বেদ রক্ষা করিতেছেন ও জীবজগতের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতেছেন; তাঁহাদিগের অঙ্গের জ্যোতির দুই এক পরমাণু ম্লান জীব-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, মূর্খকে বিজ্ঞ, ক্রূরকর্ম্মাকে দয়ালু, অভক্তকে ভক্ত করিয়া তুলিতেছে। আমাদিগের অজ্ঞাতে আমরা সেই সকল মহাপুরুষদিগের নিকট হইতে কত সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছি, আমরা তাহা বুঝি না।

তাহার কারণ আর কিছুই নহে, শুধু ঐ "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" মন্ত্রের সাধনা নাই বলিয়া।

> ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
> যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
> অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
> রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮

ভূমৌ অসপত্নং ঋদ্ধং রাজ্যং সুরাণাম্ অপি আধিপত্যং চ অবাপ্য যৎ মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণং শোকম্ অপনুদ্যাৎ (তৎ) নহি প্রপশ্যামি।

ব্যবহারিক অর্থ।—ধরণীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য কিম্বা সুরগণের উপর আধিপত্য পাইলেও আমি এমন কিছু দেখিতেছি না, যাহা আমার ইন্দ্রিয়গণের পরিশোষণকারী এই শোক অপনোদন করিতে পারিবে।

যৌগিক অর্থ।—হে গুরো! আমি আত্মরাজ্য স্থাপনে ইন্দ্রিয়ের শোষণ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। এবং আমি সেই হননের আশঙ্কায় শোকাভিভূত হইতেছি। এমন কিছুই আছে বলিয়া আমার বিবেচনা হয় না, যাহা ইন্দ্রিয় অপেক্ষা আমার প্রিয় হইতে পারে।

বস্তুতঃ, ইন্দ্রিয়সকলই জীবের চৈতন্য-শক্তির প্রকাশক। প্রকাশধর্ম্মী আত্মা ইন্দ্রিয়রূপে স্ফুরিত হইয়া জগতের সহিত সম্বন্ধবদ্ধ হয়; এবং সেই প্রকাশ-শক্তিকে অন্তর্ম্মুখী করিতে গেলে, নিজের জীবভাব সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; সুতরাং সাধক ভীত হয়। ইন্দ্রিয়ের মায়া সাধারণতঃ মুখে আমরা যে ভাবে উপেক্ষা করিতে সমর্থ হই, কার্য্যতঃ সে ভাবে পারি না। যদি যথার্থ কেহ সাধক হয়, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারে, অর্জ্জুনতুল্য তেজঃশালী হইলেও তাহাকে ইন্দ্রিয়ের মায়ায় অভিভূত হইতে হয়। পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ ইন্দ্রিয় নিরোধে সচেষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, যখন প্রত্যাহরণ করিতে করিতে চিত্তাকাশ শূন্যবৎ হইয়া যায়, তখন কিরূপ ত্রাস প্রাণের ভিতর উদিত হয় ও দ্রুত আবার বহির্ম্মুখে মন প্রসৃত হইয়া স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে। ইন্দ্রিয়-সকল জগতের সঙ্গে এত সুদৃঢ়ভাবে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে বলিয়াই, এবং সংস্কার সে সম্বন্ধ সহসা ভুলিতে চাহে না বলিয়াই মৃত্যুরূপ বিস্মৃতি পরিকল্পিত হইয়াছে। মৃত্যু বস্তুতঃ কিছুই নহে; বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থার মত একটী অবস্থামাত্র। সে বিষয়ে পরে বলিব। শুধু পার্থক্য ঐ বিস্মৃতিটুকু। ঐরূপভাবে বালকদিগের ধূলার ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলার মত বিস্মৃতিরূপ মৃত্যু আসিয়া যদি আমাদিগের খেলার ঘর ভাঙ্গিয়া না দিত, তাহা হইলে আমরা একই অবস্থায় একই খেলা লইয়া চিরদিন মত্ত থাকিতাম; এবং ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিতাম। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর আশঙ্কা সত্ত্বেও সাধারণ লোক যে ভাবে মায়ায় জড়াইয়া পড়ে, মৃত্যু না থাকিলে বন্ধন-কল্পনা যে আরও সুদৃঢ় হইত, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, অর্জ্জুনের মত সাধক হইলেও ইন্দ্রিয় উচ্ছেদের বিপক্ষে তাহার হৃদয়ের সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক যুক্তিসকল যে একবারে মায়াস্পৃষ্ট নহে, এ কথা বলা যায় না।

তাই সাধক বলিতেছেন,—"ভূমৌ (পৃথিব্যাম্) অসপত্নং রাজ্যং সুরাণাম্ অপি আধিপত্যম্ (ইন্দ্রত্বং) অবাপ্য যৎ মম ইন্দ্রিয়াণাং (উচ্ছোষণজনিতং) শোকম্ অপনুদ্যাৎ, তৎ নহি প্রপশ্যামি।"

ইন্দ্রিয়গণ উচ্ছেদিত হইলে তজ্জনিত শোক ইন্দ্রত্ব পাইলেও অপনীত হইবে না, সাধক মায়ায় অভিভূত হইয়া এইরূপ আশঙ্কা করে। অর্থাৎ ভগবৎসাধনা করিতে গেলে ইন্দ্রিয়সকল উচ্ছেদিত হয়, এবং ভগবান্ তজ্জন্য ইন্দ্রত্ব আদি পদ সাধককে প্রদান করিতে পারেন ; কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা ঐ সকল পদ অধিক ঈপ্সিত নহে, সাধক এইরূপ ধারণা করে।

অর্থাৎ মোটের উপর দুই রকমের আশঙ্কা সাধকের প্রাণে উদিত হয়।

১। ব্রহ্মচর্য্য, কর্ম্ম ইত্যাদির দ্বারা ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা আমার অস্তিত্ব অনুভব করি, সুতরাং উহারা উচ্ছেদিত হইলে, নিজের অস্তিত্ব কি প্রকারে থাকিতে পারে। (এই আশঙ্কা প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।)

২। যদি আমি এইরূপে আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইন্দ্রিয়াদি হনন করি, তাহা হইলে ঐরূপ উদ্যোগও যখন কর্ম্ম, তখন নিশ্চয়ই তাহার ফল আছে। সেইরূপ যোগ বা আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগরূপ কর্ম্মের ফলস্বরূপ ভগবান্ ইন্দ্রত্ব আদি পদ আমাকে অবশ্য প্রদান করিতে পারেন এবং তাহা হইলেও ত আমি কর্ম্মফলে বদ্ধ হইলাম—এক বন্ধন হইতে অন্য বন্ধনে আবদ্ধ হইলাম। কেন না, কর্ম্মমাত্রেরই ফল অবশ্যম্ভাবী। (এই আশঙ্কাই এই শ্লোকে সুস্পষ্ট); নতুবা এ ভাবের শ্লোকের পুনরুল্লেখের প্রয়োজন ছিল না।

ভাল করিয়া বলি, কর্ম্মমাত্রেরই ফল আছে ; সেই জন্য সাধকের প্রাণে এইরূপ আশঙ্কা হয় যে,যেমন কর্ম্ম-বন্ধনের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কর্ম্ম-সকলকে ও ইন্দ্রিয়সকলকে রোধ করা উচিত, তেমনই সে কর্ম্মবন্ধন মোচন করিতে যোগাদি যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাও ত কর্ম্ম ; সুতরাং তাহার ফল আছে এবং কর্ম্মফলস্বরূপ যদি ইন্দ্রত্বও লাভ হয়, তাহাও বন্ধন ; সুতরাং তাহাও সাধকের অভীপ্সিত নহে।

এই উভয় প্রকারের আশঙ্কায় সাধক ভীত হয়, এবং এই জন্য কিছুই করিব না, সাধকের প্রাণের অবস্থা এইরূপ হয়। তাই পরশ্লোকে বলিতেছেন,—

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূবহ ॥ ৯

পরন্তপঃ গুড়াকেশঃ হৃষীকেশং এবম্ উক্ত্বা ন যোৎস্যে ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ।

ব্যবহারিক অর্থ।—তপঃপ্রভাবশালী বিজিতনিদ্র অর্জ্জুন হৃষীকেশকে এইরূপ বলিয়া, তার পর আমি যুদ্ধ করিব না. এই কথা গোবিন্দকে বলিয়া তূষ্ণীম্ভূত হইলেন।

যৌগিক অর্থ।—এই শ্লোকটীতে "হৃষীকেশং উক্ত্বা" এবং "গোবিন্দমুক্ত্বা" এইরূপে 'উক্ত্বা' কথাটী দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তরূপে হৃষীকেশকে আশঙ্কার কথা বলিয়া,তারপর সাধক ভগবানের গোবিন্দ-মূর্ত্তিকে স্মরণ করিয়া "আর যুদ্ধ করিব না" এইরূপ বলিয়া কিছুক্ষণের জন্য কর্ম্মবিরত হয়। জীব-হৃদয়ে সূর্য্য ও চন্দ্ররশ্মি আকারে বা দিবা ও রাত্রিরূপে রশ্মিরূপ কেশজাল বিস্তৃত করিয়া যিনি আমাদিগের সু ও কু বা উর্দ্ধ ও অধঃ গতিসকল নিয়মবদ্ধ করেন, আমাদিগের হৃদয়স্থ থাকিয়া যিনি আমাদিগের সারথিরূপে আমাদের ইন্দ্রিয়রূপ কেশজাল বিস্তৃত করিয়া বাসনাসকল পূরণ করেন,—যিনি আমার একার মা—যিনি আমার একার সারথি—যিনি আমার একার প্রিয় সহচর, তিনিই হৃষীকেশ নামে অভিহিত, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এবং যিনি বিশ্বসকলকে জানেন—যিনি বিশ্ব-সমূহকে পালন করেন—যিনি বিশ্বসমূহকে চালনা করেন—যিনি বিশ্বের জননী—যিনি বিশ্বের সারথি—যিনি বিশ্বসমূহকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেন, তিনিই গোবিন্দ নামে অভিহিত। গো অর্থে বিশ্বসমূহ বা বেদ, বিন্দ—যিনি জানেন।

সাধক বিষাদ-পীড়িত হইবার পর যখন উভয় দিক্ বিচারে প্রবৃত্ত হয় এবং বিচারের ভার নিজের উপর গ্রহণ করিয়া যখন চারি দিক্ অন্ধকার দেখে, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া যখন শেষ হৃদয়স্থ ভগবৎ-শক্তিকে গুরু বলিয়া সম্ভাষণ করে, ঠিক সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তাহার প্রাণ হৃদয়স্থ শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া, নিজের জ্ঞানানুযায়ী বিচার বিশ্লেষণ করিয়া, তারপর বিরাট্ বিশ্বব্যাপী শক্তির দিকে চাহিয়া কর্ম্মে একবারে পূর্ণরূপে নিরস্ত হইতে চাহে। নিজ হৃদয়স্থ ভগবানের দিকে যতক্ষণ লক্ষ্য থাকে, অর্থাৎ মাকে যতক্ষণ সে তার একার মা বলিয়া দেখে

বা হৃষীকেশ বলিয়া দেখে, ততক্ষণ তাঁহার নিকট মঙ্গল অমঙ্গল বিচার করিতে সাধক যত্নবান্ থাকে। তার পর যখন আর নিজের বিচার করিতে সমর্থ না হইয়া, সেই তার একার মায়ের চরণে "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" বলিয়া জড়াইয়া ধরে—যখন নিজের জীবভাবের দ্বারা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের উপায় নাই বুঝিয়া হৃদয়স্থ মাকে জাগাইতে, গুরু বলিয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ে, তখন দেখে, বস্তুতঃ যাহাকে একার মা বলিয়া চিনিতেছিল, সে ত একার মা নহে, সে যে বিশ্বের মা! যাহাকে হৃদয়স্থ বলিয়া ভাবিতেছিল, সে ত তার একার হৃদয়স্থ নহে, বিশ্ব ভুবনের প্রত্যেক ভূতে ভূতে প্রতিষ্ঠিত—যাহাকে ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্র হৃদয়স্থ গুরু বলিয়া বসাইয়াছে, সে ত তার একার গুরু নহে, সে যে বিশ্বগুরু—বিশ্ব চরাচরের মন্ত্রদাতা। ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া একই মন্ত্রে প্রত্যেককে দীক্ষিত করিতেছেন—একই ভুবনবিনোদন মন্ত্রে বিশ্বভুবন নিনাদিত করিয়া ধূলিকণা হইতে মহেশ্বর অবধিকে শিক্ষা দিতেছেন—একই অনাদি মন্ত্র-তরঙ্গ তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে বিনির্গত হইয়া হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সেই হৃষীকেশ তার একার হৃষীকেশ নহে, তিনি গোবিন্দ—তার একার গুরু নহেন—জগদ্গুরু। তবে সে বিশাল শক্তির ইচ্ছায় যাহা হয় হউক, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান সে শক্তির গতি কিরূপে বিচার করিতে সমর্থ হইবে। আর ভাবিব না,—অমঙ্গল হয় হউক, আর ভাবিতে পারি না, আর কিছু করিব না; "ন যোৎস্যে"—যে দিকে চাহিতেছি—যেমন করিয়া বিচার করিতেছি, কোন দিকেই মঙ্গল দেখিতেছি না। বন্ধনের শৃঙ্খল উন্মোচিত হইবার কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইতেছি না—কর্ম্মের বা যুদ্ধের পক্ষে কোন সদ্‌যুক্তিই প্রাণে উদিত হইতেছে না, তার উপর আবার দেখিতেছি, অনন্ত ভুবনমণ্ডলমধ্যে একই গুরুশক্তি অহর্নিশ ক্রিয়াশীল; অহর্নিশ একই অনন্তশক্তি ভুবনসকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে; সূর্য্য, চন্দ্র, তারকামণ্ডল একই গুরুশক্তির মহামন্ত্রে উজ্জীবিত হইয়া স্পন্দিত হইতেছে, ফুটিতেছে, মিলাইয়া যাইতেছে; একই গুরুশক্তির মহাঝঙ্কারে দিগন্ত ব্যাপিয়া একই তালে বিশ্ব-ভুবন নাচিতেছে—একই মহাগুরুকে বেষ্টন করিয়া হরি, হর, ব্রহ্মা হইতে কৃমি, কীট, পতঙ্গ অবধি একই মন্ত্র গাহিতে গাহিতে প্রদক্ষিণ করিতেছে। তবে আর কেন? সে আবর্ত্তনের মহাতালের বিপক্ষে আমি কি তাল জাগাইব! দীন ক্ষুদ্র শক্তি-বিশিষ্ট জীব আমি, আমি সে বিরাট্ শক্তি-তরঙ্গে মিলিয়া যাওয়া ব্যতীত আর কি করিতে সমর্থ হইব! যাক্, সব যাক্— অমঙ্গল হয় হউক,—মঙ্গল হয় হউক, আমি

কর্ম্ম করিব না; আমার চেষ্টা-শক্তি চালিত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াস করিব না। ইন্দ্রিয়াদি, শাস্ত্রজ্ঞান, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম থাকে থাক্, তাহারা আমায় নির্ব্বাসিত করিয়া রাখে রাখুক, যাহা হয় হউক, আমি নিরাশ হইয়াছি—আমার উদ্যমরূপ ক্ষুদ্র তরণী মহাসমুদ্রে ভাসিয়া আসিয়া পড়িয়াছে; ডুবিতে হয় ডুবুক। আমি কর্ণ ছাড়িয়া সে বিরাট্ শক্তির তরঙ্গ-নর্ত্তন শুধু দেখিতে থাকি।

এইরূপে ভগবান্‌কে গুরু বলিয়া চিনিবার পর সাধকের প্রাণ ভগবৎশক্তির বিশালত্ব অনুভব করিয়া স্বীয় চেষ্টাশক্তিকে তাহাতে ভাসাইয়া দিবার সঙ্কল্প করে। সে গুরু বলিয়া যাঁহার শরণাগত হইয়াছে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই অনুশাসিত বুঝিয়া সে স্তব্ধ হইয়া পড়ে। মহতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ক্ষুদ্র যেমন আপনা হইতে নমিত হইয়া পড়ে, তেমনি ভাবে সে নিজ চেষ্টা-শক্তিকে হারাইয়া ফেলে। তবে ইহাকে নির্ভরতা বলিয়া বুঝিও না—ইহাকে আসক্তি বা ভক্তির আত্মত্যাগ বলিয়া মনে করিও না; সে অবস্থা আসিতে এখনও বিলম্ব আছে। ইহা অসমর্থের আত্মসমর্পণ—ইহা অশক্তের নির্ভরতা—ইহা দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকের ধ্রুবতারার জন্য আকাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ।

ইহাই সাধনার দ্বিতীয় অবস্থার উন্মেষণ। সাধনার সূচনায় সাধক যখন সর্ব্বপ্রথম উদ্যোগী হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়, তখন ইন্দ্রিয়াদি ও কর্ম্মাদির মায়া তাহার প্রাণে একবার বলবতী হইয়া উঠে ও সাধককে বিষাদ-ভাবাপন্ন করিয়া ফেলে; সাধক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। তার পর নিজের ক্ষুদ্র জ্ঞানে ইন্দ্রিয়াদির উচ্ছেদ করিলে আত্ম-প্রতিষ্ঠা হয় না—এইরূপ ভাবিয়া ও সে সকল পরিত্যাগে নিম্নগতি হইতে পারে বুঝিয়া, শেষ হৃদয়স্থ ভগবৎশক্তির শরণাপন্ন হয়; এবং একই ভগবৎ-শক্তি সমস্ত ভুবনের অনুশাসক বুঝিয়া নিজেকে শক্তিহীন অনুভব করে; কিন্তু বুঝিতে হইবে, তখনও তার অন্তরে আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা বলবতী আছে।

আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা রহিয়াছে, অথচ যুক্তি ও সহজ জ্ঞান মায়াবিজড়িত হইয়া তাহার হৃদয়কে তদ্বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে, এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়াই সে সাধক তখন ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে সঙ্কল্প করিতেছে—কূল পাইতেছে না বলিয়াই সে স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতেছে, ইহাকে যথার্থ নির্ভরতা বলে না। ভগবানে আত্মসমর্পণ, প্রাণে অন্য কোন ইচ্ছা বলবতী থাকিতে, অন্য বস্তুর উপর পূর্ণ আসক্তি থাকিতে আসে না। আমি আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, এইরূপ উদ্দেশ্য অভ্যন্তরে নিহিত থাকায় আত্ম-কর্তৃত্ব আসিয়া পড়ে। প্রাণ উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া যখন ভগবানে

নির্ভর করে, তখনই যথার্থ ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করা হয়। সে অবস্থা সাধকের হইতে বিলম্ব লাগে। বিষাদের পর দ্বিতীয় অবস্থায় আমিত্ব-শক্তির দুর্ব্বলতা বুঝিয়া, ভগবৎশক্তির প্রবল স্রোতের মুখে দাঁড়াইতে অক্ষম জানিয়া, সাধক যেন ক্ষুণ্ণভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ করে। ইহা অক্ষম বুঝিয়া আত্মত্যাগ।

যাহা হউক,এরূপ আত্মত্যাগেরও মহাফল আছে। এই ভয়ে ভক্তি হইতে যথার্থ ভক্তি ক্রমশঃ আসিতে পারে। এবং এই দ্বিতীয় অবস্থায় তাহাই সঙ্গত বলিয়া বুঝিতে হইবে। পূর্ণ নির্ভরতা শক্তিস্রোতের অনুভব না করিলে আসে না। ভগবৎ-শক্তির অনুভব ধীরে ধীরে যত গাঢ় হইতে গাঢ়তর হয়, নির্ভরতাও সেই অনুপাতে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে থাকে। স্রোতস্থ পদার্থ সমুদ্রের যত নিকটস্থ হয়, ততই যেমন সমুদ্রের প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে, তদ্রূপ জীব যত ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করে, ততই তাঁর বিরাট্ আকর্ষণী-শক্তিতে আকৃষ্ট হইতে থাকে ; এবং সেই পরি-মাণে তার নির্ভরতাও প্রবল হইতে প্রবলতর হয়।

নির্ভরতা ভগবৎশক্তি অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে আপনি আইসে, নির্ভরতা শিখিতে হয় না। এবং ঐ নির্ভরতার আরম্ভ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে সূচিত হয়। যেমন পৃথিবীর অন্তর্গত মহাশক্তি-তরঙ্গ ভূমিকম্পের সময় অনুভূত হয়, জীব-জীবনের সঙ্কট-সকলকেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। সঙ্কট ভগবৎশক্তি অনুভূতির জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। জীবন-সঙ্কটে না পড়িলে ভগবদনুভূতি হয় না।

এই জন্যই যখনই কোন মঙ্গলশক্তি জগতে কার্য্যের সূচনা করে, সঙ্গে সঙ্গে তদ্‌বিরুদ্ধ শক্তিও উজ্জীবিত হইয়া তাহার প্রতিবন্ধকতা সম্পাদন করিতে প্রয়াস পায়। বিপরীত শক্তি জাগিয়া উঠে বলিয়াই শক্তি কার্য্যকরী হয় ; অবরোধ না পাইলে শক্তি উদ্রিক্ত হয় না। জগতে দৈবী শক্তির অবতারণা হইলেই আসুরিক শক্তি চারি দিক্ হইতে সম্মিলিত হইয়া তদ্বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। কি ব্যষ্টিভাবে, কি সমষ্টিভাবে এই শক্তিরহস্য সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

এই জন্যই জ্ঞানের পার্শ্বে সন্দেহ, দয়ার পার্শ্বে কৃপণতা, ভক্তির পার্শ্বে দ্বেষ, সহানুভূতির পার্শ্বে হিংসা, সাধকের পার্শ্বে ভণ্ড দেখিতে পাই।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০

হে ভারত! হৃষীকেশঃ প্রহসন্ ইব উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং তম্ ইদং বচঃ উবাচ।

ব্যবহারিক অর্থ।—হে ভারত! তখন হৃষীকেশ হাস্য করিতে করিতে সেই উভয় সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিলেন।

যৌগিক অর্থ।—জীব এই সময়ে চেষ্টাশক্তির পরাধীনতা ও বিরাট্ শক্তির সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ আধিপত্য বুঝিতে আরম্ভ করে। তখন তাহার প্রাণ উদাস হইয়া পড়ে। উদাসীন ভাব, সর্ব্ব বিষয়ে অনাস্থা, চিত্তের নির্জীবতা, বিষণ্ণতা, এই সকল এই অবস্থার লক্ষণ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা বৈরাগ্যের আভাস মাত্র—বৈরাগ্য নহে। পুরুষকার শ্লথ হইয়া পড়ে, অদৃষ্টবাদ প্রবল হয়। তাহার কর্ত্তব্য আছে বলিয়া কিছু খুঁজিয়া পায় না; খুঁজিয়া পাইলেও করিতে প্রবৃত্তি হয় না। অদৃষ্টবাদের ফলে হিন্দুগণের অধোগতি হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা মত প্রকাশ করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ এইরূপ অবস্থার লোক বা বহিঃক্ষেত্রে বিষয়-ব্যবসায় সম্বন্ধে এইরূপ ভাবাপন্ন লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়া থাকেন। কিন্তু অদৃষ্টবাদ বা পুরুষকার যে একই জিনিষের অগ্রপশ্চাৎ ভাবমাত্র, এ কথা তাঁহারা বুঝেন না। এবং এইরূপ অবস্থায় অদৃষ্টে নির্ভরশীল মনুষ্যসকলও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। যে যথার্থ অদৃষ্টবাদ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, তাহার চিত্ত উদাস ও বিষণ্ণ ভাব পাইতে পারে না। পুরুষকারবাদী অপেক্ষা সমধিক সত্ত্বভাবাপন্ন, হর্ষোৎফুল্ল, কর্ম্মে আগ্রহ-যুক্ত; এবং কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী কৃতকার্য্যতা বুঝিয়া সে ক্লান্তি অনুভব করে না। অদৃষ্টবাদ কি? পুরুষকারের পুঞ্জীভূত সঞ্চিত শক্তিই অদৃষ্ট। যখন আমাদের কৃত কর্ম্মসকল মহাশক্তি উজ্জীবিত করিয়া আমাকে বহিয়া লইয়া যাইতেছে, তখন আমি যে কর্ম্মই করি, আমার দ্বারা যে কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হউক, উহা যে আমারই সেই পুঞ্জীভূত শক্তিকে আরও বর্দ্ধিত করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? অদৃষ্টবাদ অর্থে—কোন মহাশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ নহে—সে মহাশক্তি আমারই শক্তি বুঝিয়া তাহাকে আরও উদ্দীপিত করা। পুরুষকারবাদ অর্থে—খণ্ড শক্তিবাদ। অদৃষ্টবাদ অর্থে—পূর্ণ শক্তিবাদ। সাধারণতঃ মানব-প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টার মধ্যে বিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়,—আমরা কোন সৎকার্য্য করিতে গেলে হয় ত প্রবৃত্তি সে দিকে আমাদিগকে সাহায্য না করিয়া, অন্য দিকে ফিরাইয়া দেয়। তাহা আর কিছুই নহে, ঐ একই শক্তির আবর্ত্তন মাত্র—দুই বিভিন্ন শক্তির সংঘর্ষণ নহে। যেমন জলস্রোত চক্রাকারে আবর্ত্তিত হইয়া, আবার ঋজুভাবে প্রবাহিত হয়, উহাও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

যাহা হউক, সাধারণ কর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার—শক্তির

পূর্ণত্বের ও খণ্ডত্বের নামান্তর মাত্র ও যথার্থ অদৃষ্টবাদ যেমন পূর্ণশক্তির করে আত্মসমর্পণ নহে, সে পূর্ণশক্তিকে আত্মশক্তি বলিয়া পরিচিত হওয়া, সাধনক্ষেত্রেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। কিন্তু সাধনার যে স্তরের কথা বলিতেছি, ঐ স্তরের সাধক এ তত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তার আত্মসমর্পণ যেন কোন প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির নিকট বাধ্যতামূলক আত্মসমর্পণ বলিয়া সে অনুভব করে। ঐ বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি ও সে নিজে যেন দুইটী ভিন্ন ভিন্ন শক্তি, এইরূপে তাৎকালিক অবস্থা তাহার মনে প্রতিফলিত হয় হৃদয়স্থ হৃষীকেশকে বিশ্বগুরু বুঝিয়া ও তাঁহার বিশালত্ব অনুভব করিয়া, মাতা যেমন কন্যাকে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিতে হর্ষ ও বিষাদপীড়িত হয়, তদ্রূপভাবে হর্ষ-বিষাদযুক্ত হইয়া সে তার নিজের আমিত্বকে সেই বিশালের কর্তৃত্বাধীনে প্রেরণ করে।

এই স্থলে বুঝিতে হইবে,সে সাধক তখনও উভয় শক্তির একত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। ভৌতিক জগতে অদৃষ্ট ও পুরুষকার দুইটী বিভিন্ন শক্তি বলিয়া সাধারণ লোকে ভাবে,আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও ঠিক তদ্রূপ—আমিত্ব ও বিরাট্ দুইটি বিভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। এবং সেই কারণে সাধারণ অদৃষ্টবাদী যেমন পুরুষকারকে তুচ্ছ ভাবিয়া উপেক্ষা করে, সেইরূপ ভাবে সে সাধক আমিত্বকে তুচ্ছ বোধ করে ও অবশেষে হর্ষ-বিষাদযুক্ত হইয়া আত্ম-বিসর্জ্জনে অগ্রসর হয়।

কিন্তু এরূপ আত্মত্যাগ যে সরল আত্মত্যাগ নহে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে সাধক নিজ বিচারশক্তি দ্বারা, ইন্দ্রিয়নিরোধে পাপ হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া, তার পর আপনাকে উভয়সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া, তবে ভগবানের শরণাপন্ন হয়। যদি তার বুদ্ধিশক্তির দ্বারা সে বুঝিতে পারিত যে, ইন্দ্রিয়-নিরোধ কর্ত্তব্য, তাহা হইলে হয় ত সে আর ভগবানের উপর আত্মনির্ভর কার্য্যতঃ করিয়া উঠিতে পারিত না; আমিত্বের বশীভূত হইয়াই কার্য্য করিতে থাকিত।

যেরূপে হউক,ভগবানে নির্ভরতা সূচিত হইলে সে বিরাট্ শক্তি প্রসন্না হন এবং হৃদয়ে জ্ঞানালোক উজ্জীবিত করিয়া দেন। শুধু প্রসন্না নহেন—মা হাসেন, তাঁহার দিগন্ত-মুখরিত হাস্য হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়, তাই এই শ্লোকে "প্রহসন্" কথাটী উল্লিখিত হইয়াছে। তোমরা মায়ের হাসি কখনও শুনিয়াছ? দিগন্তব্যাপিনী মহাশক্তির আনন্দোল্লাস কখনও দেখিয়াছ? আনন্দময়ীর আনন্দ-নিকেতন কিরূপ হাস্যকল্লোলে পূর্ণ, কখনও কি তাহার সন্ধান পাইয়াছ? তোমাদের মুখে যেমন হাস্যরূপে আনন্দ ফুটিয়া উঠে, আনন্দময়ীর সর্ব্বাঙ্গ হইতে সেইরূপ আনন্দোচ্ছ্বাস

ঝরিতে কখনও প্রত্যক্ষ করিয়াছ? তাঁহার উচ্চ হাস্যরোল গগনে গগনে কেমন করিয়া নাচিয়া বেড়ায়—সে হাস্যের তালে তালে রুদ্রসকল কেমন করিয়া নাচে—সে হাস্যের সুরে সুরে সিদ্ধর্ষিরা কেমন করিয়া সুর মিলায়—সে হাস্যের মধুর রস পান করিয়া দেবতারা কেমন করিয়া অমর হন —কখনও দেখিয়াছ? যদি না দেখিয়া থাক—না শুনিয়া থাক, বুঝিবে, তোমার জীবন বৃথা যাইতেছে।

বিরাট্‌ভাবে সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবার সুযোগ হওয়া সুদুর্লভ সত্য,কিন্তু আংশিক ভাবে ইহা দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ণ শক্তির পূর্ণ লীলা পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারে,এমন শক্তিমান্ নাই সত্য; তবে অধিকারী হিসাবে আংশিক ভাবে ইহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। মহাগুরুবৃন্দ কিম্বা মহামানববৃন্দ—তাঁহারা যে ভাবে দেখিতে পারেন, সাধারণ মনুষ্য অবশ্য সে ভাবে এখন দেখিবার আশা করিতে পারে না,তবে সাধারণ সাধকের পক্ষে যতটুকু সম্ভব,তাহা বলিতেছি।

চারি পাঁচ জন সাধক একত্রে প্রত্যহ চক্র করিয়া বসিতে হয়। সংহারমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, সংহারিণীশক্তির উপাসনা করিবার জন্য সাধকেরা এইরূপ চক্রে অভ্যস্ত হইলে, রজনীর ঘোর অন্ধকারে দীপশূন্য কোন গৃহমধ্যে অথবা কোন নির্জ্জন স্থানে বা শ্মশানে চক্র প্রতিষ্ঠা করিয়া, মন্ত্র সহকারে প্রত্যহ অগ্নিতে আহুতি দিতে হয় ও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক সংহারিণী শক্তির দ্বারা অহর্নিশ তাড়িত হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিতে হয়। আত্মার বিনির্ম্মুক্তির জন্য—মা যেমন সন্তানের গায়ের আবর্জ্জনা মুছাইয়া দেন, তেমনই ভাবে সেই সংহারিণী শক্তি আমাদের প্রবৃত্তিসকল বা এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সংহার করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিতে হয়। গুরূপদিষ্ট ভাবে এইরূপ চিন্তা ক্রমশঃ গাঢ়তর হইলে সংহারের স্বরূপ হৃদয়ে সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইতে থাকে ও সাধকেরা সংহারের সারূপ্য লাভ করে। তখন সাধকদিগের বহির্ম্মূর্ত্তি এক অপূর্ব্ব নির্ম্মুক্ত ভাবাপন্ন হয় ও সাধকসকল উচ্চ হাস্য করিতে থাকে। তাহাদিগের হাস্যরোল ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর হয় ও তখন তাহারা শুনিতে পায়—এক বিকট অট্ট অট্ট হাস্য গগন ব্যাপিয়া মুখরিত। বিশাল অন্ধকারের মধ্যে তাহাদিগের সে হোমশিখা নির্ব্বাপিত হইয়া যায় —তাহাদিগের অঙ্গ হইতে বস্ত্রসকল স্খলিত হয়, উলঙ্গ হইয়া সে সাধক-সকল উন্মত্তের মত শুধু হাসিতে থাকে ও মায়ের অট্ট অট্ট হাসির সঙ্গে সে বিকট হাসি মিশাইয়া যাইতে থাকে। সে হাসির স্রোত সহসা থামে না। নির্ম্মুক্ত ভাবের অপূর্ব্ব আনন্দে বিভোর হইয়া, সমর-বিজয়ী বীরের মত তাহাদিগের সে হাসি বিজয়সূচক।

তাহাদিগের চক্ষু হইতে তেজোব্যঞ্জক দৃষ্টি নির্গত হইতে থাকে। আপনাদিগকে বিশাল শক্তিমান্ ও কায়িক সংকীর্ণতাশূন্য বা বিদেহী বলিয়া তাহারা বিবেচনা করে। বাহিরের কোন মনুষ্য সে সময়ে তাহাদিগের দৃশ্য দেখিলে, কতকগুলি রণবিজয়ী সৈন্য বিজয়োল্লাস করিতেছে, এইরূপ মনে করে।

এ চক্রের ব্যাপার অতি অপূর্ব্ব। এ চক্রে একবার সুদৃঢ় অভ্যস্ত হইলে সাধকের প্রাণে অন্য ভাব জাগরিত হয় না। জগৎ তাহাদিগের চক্ষে অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। মৃত্যু বলিয়া কোন জিনিষ তাহারা কল্পনা করিতে পারে না। একটী তুচ্ছ তৃণ উৎপাটনে ও একটী মনুষ্য হননে তাহারা পার্থক্য দেখিতে পায় না। তাহারা বিশ্বময় শুধু এক সংহারের লীলা অহর্নিশ দেখিতে থাকে।

এক সময়ে এরূপ একটী চক্র কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাতে পাঁচ জন সাধক উপবিষ্ট ছিলেন। অমাবস্যা-রজনীর গভীর অন্ধকারে এক জনশূন্য প্রান্তর মাঝে চক্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারা সাধনা করিতেছিলেন। অন্ধকারে তাঁহাদিগের হোমাগ্নি-শিখা থাকিয়া থাকিয়া লক্ লক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল ও তাঁহাদিগের মন্ত্রধ্বনি মাঝে মাঝে সে স্থলের নির্জীবতা ভাঙ্গিয়া দিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদিগের যিনি নায়ক,তিনি সহসা দণ্ডায়মান হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অঙ্গ হইতে বস্ত্র স্খলিত হইল। তিনি অন্য সাধকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বৎসগণ! আমাদিগের সাধনায় ভাবান্তর ঘটিয়াছে। গুরুশক্তির সাহায্য বিনা আজিকার সাধনা বিফল হইবে। এত দিন ধরিয়া যে চক্র প্রতিষ্ঠা করিতেছিলাম,গুরুর উপদেশ সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে না পারায় আমাদিগের অজ্ঞাতে তার সঙ্গে সঙ্গে একটী ভ্রম সংসাধিত হইয়া আসিতেছে। এত দিন বুঝিতে পারি নাই,এখন সহসা আমার মনে উদিত হইল। গুরুদেব ব্যতীত সে ভ্রম এ সময়ে আর কেহ সংশোধন করিতে পারিবে না। এত দিনের উদ্যম শেষ মুহূর্ত্তে বোধ হয় ব্যর্থ হইয়া গেল।" তখন সকলে যুক্তি করিলেন, ভ্রম হইয়া থাকে হউক, সাধনা ছাড়িব না। আমাদিগের সাধনা যেরূপ চলিতেছিল, চলুক। তখন সেই উলঙ্গ পুরুষ—সেই চক্রের নায়ক—উপবেশন করিয়া, আহুতি গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"অন্তর্য্যামিন্! আমরা যদি অকপটভাবে সাধনা করিয়া থাকি, তবে আমাদিগের ভ্রম সংশোধনের জন্য—আমাদিগের পরিশ্রমের চরিতার্থতার জন্য আপনি উপায় বিধান করুন।" এইরূপ বলিতে বলিতে অগ্নিশিখায় সে আহুতি অর্পিত হইল। লিখিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, দেহ কাঁপিয়া উঠে, সহসা অগ্নিবৎ

জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গবিশিষ্ট এক বিশাল পুরুষ তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষীভূত হইল। সে মূর্ত্তি দর্শনে একমাত্র সেই নায়ক ব্যতীত অন্যান্য সকলে বজ্রাহতের মত স্তব্ধ রহিলেন। শুধু সেই নায়ক "জয় গুরু,জয় গুরু" বলিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া পড়িলেন। তার পর আর কিছু দেখা গেল না; হোমশিখা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, মন্ত্র-শব্দ রোধ হইয়া গেল। সেই পাঁচ জন সাধকের উচ্চ হাস্যে সে নির্জ্জন প্রান্তর মুখরিত হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের গুরু-কৃপায় ভ্রম সংশোধন হইয়া যাওয়ায়, তাঁহারা বিরাট্‌ হাসির সন্ধান পাইলেন।

এইরূপে হাস্যযোগ অনুষ্ঠিত হয়। আমি প্রকাশের ভয়ে হাস্যযোগ নাম দিয়া এ সাধনা সম্বন্ধে যতটুকু উল্লেখযোগ্য, বলিলাম। ইহা অপেক্ষা অধিক পুস্তকে প্রকাশ করা চলে না।

বিরাট্‌ জননীর বিরাট্‌ হাসি, সংহারিণী শক্তির উপাসনায় যেমন অট্ট অট্ট ভাবে শুনিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ সৃজন ও পালন-শক্তির আরাধনায় সুমধুর মৃদু হাস্য সাধক অনুভব করিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে বিরাট্‌ জননীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে না পারিলে সাধক হওয়া যায় না ও সাধক হইতে না পারিলে তাঁহার লীলা-তরঙ্গ উপলব্ধি করা যায় না।

হাসিই বিশ্বের প্রাণ—হাসিই বিশ্বের জীবন—হাসির জন্যই বিশ্বসৃজন কল্পিত। এ হাসি যে না শুনিল,—জগৎপালিনীর মধুময় হাসি যে না শুনিল—সংহারিণীর অট্ট অট্ট হাসি যে না শুনিল, তাহার মনুষ্যত্ব এখনও সুদূরে।

কথায় কথায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। যাহা হউক, আমরা এই পর্য্যন্ত পাইলাম, হৃদয়স্থ শক্তিকে বা হৃষীকেশকে বিশ্বব্যাপিনী শক্তি বা গোবিন্দ বলিয়া অনুভব করিলে, সে শক্তি প্রসন্না হয়েন; এবং সেইরূপ দায়ে পড়িয়া নির্ভরতার অবস্থা হইতে পূর্ণ, সরল নির্ভরতায় তিনি পৌঁছাইয়া দেন। এই স্থল হইতেই জীবের জীবন-গতির বিকাশ; এই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহাকে ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত ও সাধক বলিয়া সম্বোধন করিতে পারা যায়। জীবমাত্রেই সাধক ও তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত, সে হিসাবে আমি বলিতেছি না; তবে এত দিন অজ্ঞাতভাবে সাধক ও সম্বন্ধযুক্ত ছিল, এইবার জ্ঞাতভাবে সাধক ও সম্বন্ধযুক্ত হইল। বিষাদের পালা ঘুচিয়া গিয়া এইবার আনন্দের পালা পড়িল। ক্রন্দনের রোল থামিল—হাস্যের তরঙ্গ-হিল্লোলে সাধকের হৃদয় পূর্ণ হইতে চলিল।

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১

ত্বম্ অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ প্রজ্ঞাবাদান্ চ ভাষসে; পণ্ডিতাঃ গতাসূন্ অগতাসূন্ চ ন অনুশোচন্তি।

ব্যবহারিক অর্থ।—অশোচ্যদিগের জন্য তুমি শোক করিতেছ ও বিজ্ঞের মত কথা কহিতেছ। মৃত বা জীবিত, ইহার জন্য পণ্ডিতেরা কখনও শোক করেন না।

যৌগিক অর্থ।—মৃত বা জীবিত, হত বা আহত, পণ্ডিতদিগের শোকের কারণ এ সকল নহে। পণ্ডিতদিগের লক্ষ্য এ দিকে নিবদ্ধ নহে। পণ্ডিতদিগের বা সাধকদিগের নিম্নাবস্থায় যদি কিছু শোকের কারণ থাকে, তবে তাহা ঈশ্বরবিচ্ছেদ উপলব্ধি। এ অবস্থায় যখন জ্ঞান হৃদয়স্থ হয় নাই, শুধু কণ্ঠস্থ হইয়াছে মাত্র, অর্থাৎ জ্ঞানের যখন ঈষৎ আভাসমাত্র স্ফুরিত হইয়াছে,—যখন জ্ঞান কেবলমাত্র বাক্যকে অনুশাসিত করিতে সক্ষম—কার্য্যকে পারে না, সেই সময়ে জীবের শোকের কারণ ঐ একমাত্র ভগবদ্‌বিরহ। মৌখিক বা আভাসিক জ্ঞানে সে বুঝিয়াছে, ঈশ্বর এবং সে একই পদার্থ; কিন্তু কার্য্যতঃ নিজের হীনতা, অক্ষমতা, সর্ব্ববিষয়ে ঈশ্বরের সহিত পার্থক্য অনুভব করিয়া সে শোক করে। অনুশোচনায় তাহার হৃদয় পুড়িয়া যায়। ভাবে—আমি যদি ঈশ্বর বা তদংশ বা স্বরূপ, তবে আমি তদ্রূপ শক্তি উপলব্ধি করিতে পারি না কেন? এ অবস্থায় সাধকের এইটুকুমাত্রই শোকের বিষয়। নতুবা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি যাক্ বা থাক্, এ সকল সাধকের শোকের বিষয় নহে।

সাধকের এই বিশিষ্ট অবস্থাটুকুই এই শ্লোকে স্ফুটিত। এ অবস্থায় মানুষ প্রাজ্ঞের মত কথা কহে, কিন্তু প্রাজ্ঞের মত কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারে না। বুঝিতে হইবে, জ্ঞান এখনও কার্য্যকে অনুশাসিত করিবার উপযুক্তভাবে ঘনীভূত হয় নাই; ঈষৎ আভাসমাত্র চিত্তক্ষেত্রকে ক্ষীণ আলোকযুক্ত করিতেছে, তাহার ভাবসকল সেই আলোকে ঈষৎ আলোকিত হইয়া বাক্যাকারে প্রকাশ পাইতেছে।

তাই ভগবান্ এই সময়ে এই ভাববৈষম্যময় অবস্থার প্রতি সাধকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কার্য্য ও বাক্যে যাহাতে সমতা আইসে, এই অবস্থায় সাধকের সেই দিকে লক্ষ্য করা উচিত। অবশ্য বাক্য চিরদিনই কার্য্যের অগ্রসর, মনুষ্যের কার্য্য

কোন দিনই বাক্যের সহিত সমবেগে যাইতে পারে না। ভাব চিরদিনই বাক্যাকারে কার্য্যের আগে আগে যায়, কার্য্য ক্রমশঃ তার পশ্চাদ্ধাবন করে মাত্র। তবে যাহাতে বাক্য হইতে কার্য্য অধিক পিছাইয়া না পড়ে—যাহাতে বাক্যের সহিত কার্য্য সম অনুপাতে অগ্রসর হইতে পারে, এই অবস্থায় সাধকের সেইটী প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাই ভগবান্ ঐ বিশিষ্ট অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য করেন। যাহার কার্য্যে ও বাক্যে বিরোধ নাই, জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও বাক্যসকল যেমন উন্নত হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যকে তদনুপাতে যে উন্নত করিতে পারে, সেই যথার্থ এই শ্রেণীর সাধক। নতুবা ছায়াবাজীর মত জ্ঞান একবার বাক্যাকারে চারি ধারে স্ফুরিত হইয়া, লোকচক্ষু চমৎকৃত করিয়া চিরদিনের মত নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। কিন্তু কার্য্যকে সে ভাবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঊর্দ্ধমুখী করিতে পারিলে, কার্য্য সেই ভাবরূপ শক্তিকে নিজ পোষণের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখে, বাক্যাকারে ফুটিয়া উঠিয়া ছায়াবাজীর মত মিলাইয়া যাইতে দেয় না। ঐ পন্থাতেই সাধকের শক্তি বাড়িতে থাকে, তাই ভগবান্ সাধকের এই ভাববৈষম্যময় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—জীব। তুমি বিজ্ঞের মত কথা কহিতেছ, কিন্তু অজ্ঞের মত কার্য্য করিতেছ।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥ ১২

অহং জাতু ন আসম্ ইতি তু নৈব, ত্বং ন (আসীঃ ইতি ন), ইমে জনাধিপাঃ ন, অতঃপরং সর্ব্বে বয়ং ন ভবিষ্যামঃ (ইতি) চ ন এব।

ব্যবহারিক অর্থ।—আমি যে কখনও ছিলাম না, এমন নয়, তদ্রূপ তুমিও যে ছিলে না, তাহাও নহে,এই জনাধিপসকল, ইহারাও যে ছিল না, এমনও নহে, ইহার পর আমরাও যে থাকিব না, তাহাও নহে।

যৌগিক অর্থ।—জীবের পক্ষে এমন আশ্বাসের বাণী বুঝি আর নাই। প্রাণে অভয় জাগাইয়া দিতে, এমনই করিয়া অমৃত-স্রোত ঢালিয়া দিতে, প্রাণকে চির অস্তিত্বের আভাসে আলোকিত করিতে, মৃত্যুশব্দ চিরদিনের জন্য বুকের ভিতর হইতে মুছিয়া দিতে ভগবান্ এই ভাবের আশ্বাসবাণী হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত করেন। জীব যাহা কিছু দেখিতেছে—যাহা কিছুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছে,আছে বলিয়া

যাহা কিছু বুঝিতেছে—এ সমস্তই চির সত্য—জন্ম-মৃত্যুহীন। কিছু কখনও ছিল না, নূতন হইয়াছে, অথবা নূতন করিয়া হইবে, এমন নহে। ভাবিও না—তুমি নূতন হইয়াছ, ভাবিও না—তুমি কখনও ছিলে না, ভাবিও না—তুমি কখনও থাকিবে না। তোমার অস্তিত্বের কখন লোপ হয় নাই, কখন লোপ হইবে না, কখনও হইতে পারে না। আমি চিরবর্ত্তমান, তুমিও চিরবর্ত্তমান। এই ইন্দ্রিয়ভাবাদি যাহাদিগের হননে তুমি কাতর হইতেছিলে, যাহারা বিনষ্ট হইবে বুঝিয়া তুমি শোকাচ্ছন্ন হইতেছিলে—এ সকলও চিরবর্ত্তমান; এবং ঐ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত যে সকল পদার্থের জন্য তুমি মায়াক্রান্ত, সে সকলও চিরবর্ত্তমান।

তুমি ইন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া যোগস্থ হইতে গেলে প্রাণ যে ইন্দ্রিয়গ্রামে বার বার প্রত্যাবর্ত্তন করে, নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিবার ভয়ে ভীত হইয়া আবার মায়ার ক্ষেত্রের দিকে লক্ষ্য ফিরায় অথবা তোমার জীবন-প্রবাহ ক্রমশঃ মায়ার দিক্ হইতে ফিরাইয়া ভগবানের দিকে লইয়া যাইতে গেলে বার বার উহা যে মায়ার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়ায়, কুলধর্ম্ম আদি বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা করে, এই উভয় পক্ষেই তোমার বুঝা উচিত, তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নাই। কেন না, কোন পদার্থ কখন অস্তিত্ব হারাইতে পারে না। বস্তু বল, ভাব বল, শক্তি বল, ইন্দ্রিয় বল—সমস্তই চির অস্তিত্বময়—চির বর্ত্তমান—চির সত্য। যাহা কিছু দেখি, যাহা কিছু শ্রবণ করি, ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা যাহা কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করি, বুঝিও—বিরাট্ অস্তিত্বে সমস্তেরই সত্তা বর্ত্তমান—সমস্তই সত্য। চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, বৃক্ষ, তৃণ, পর্ব্বত, সমুদ্র,—সমস্ত সত্য—সমস্ত অস্তিত্বরূপ সত্যে গঠিত। কাহারও অস্তিত্বের কখনও বিচ্ছেদ হয় না, অস্তিত্ব কাহারও কখনও হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, অস্তিত্ব কাহারও কখনও বিলুপ্ত হয় না। তুমি আজ ঐ যে একটী অঙ্কুরকে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিতে দেখিতেছ, এবং কিছু কাল পরে যে উহাকে এক বৃহৎ বৃক্ষাকারে পরিণত হইতে দেখিবে, ভাবিও না—ঐ বৃক্ষটি ছিল না, আজ নূতন হইয়া জন্মাইতেছে; অথবা ঐ যে বৃক্ষটিকে নির্জ্জীব শুষ্ক হইয়া ক্রমশঃ ধ্বংস হইয়া যাইতে দেখিতেছ, ভাবিও না—উহা আর থাকিবে না—বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। ঐ যে মাতৃগর্ভে রেতোবিন্দু পুষ্ট হইয়া শিশুরূপে জগতে অবতীর্ণ হইল এবং কিছু কাল পরে বর্দ্ধিত হইয়া যুবক আকারে পরিণত হইবে, ভাবিও না—উহার অস্তিত্ব কখনও ছিল না, আজ নূতন করিয়া হইল। অথবা ঐ যে মৃত্যুশয্যায় জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মনুষ্যটী শায়িত রহিয়াছে, ভাবিও না—উহা আর রহিল না—বিনষ্ট

হইয়া গেল। তোমার প্রাণে যে পিতা, মাতা, মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ, ক্রোধ, ভক্তি ইত্যাদি ভাবসকল বিকাশ পাইতেছে, ভাবিও না—উহারা ছিল না, আজ নূতন জন্ম পরিগ্রহণ করিতেছে,অথবা বিস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে উহারা চিরদিনের জন্য অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিতেছে।

তবে হইতেছে কি? এই মুহূর্ত্তে যাহা দেখিতেছি, পর মুহূর্ত্তে তাহা দেখিতে পাই না কেন? আজ যে ভাব আমার প্রাণের ভিতর ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল, ইহ জীবনে আর সে ভাবের সন্ধান পাই না কেন? প্রাণ দিয়া যাহাকে ভালবাসিলাম, হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তি যাহার সেবায় অর্পণ করিলাম, যাহার সঙ্গ মনুষ্য-জীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা ভাবিয়া মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়িতে চাহিতাম না, কিছুকাল পরে আর সেই মনুষ্যরূপী গুরুকে সমগ্র জগৎ অনুসন্ধান করিয়াও খুঁজিয়া পাই না কেন? প্রাণপণে কঠোর পরিশ্রম করিয়া মাতৃরূপ ধ্যান করিতে বসিলাম, বহু কষ্টে বহু আরাধনায় মূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিলাম, মুহূর্ত্তের জন্য মাতৃনয়নের স্নেহ-ভরা চাহনি হৃদয়ে স্নেহের ধারা ঢালিয়া দিল, তার পর চরণে লুটাইতে গিয়া আর ত তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া "মা" "মা" করিয়া কাঁদিলাম; কই, আর ত তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না? ঐ যে ব্রততীর শিরে বিমল হাসি হাসিয়া ক্ষুদ্র কুসুমটি উঠিল, কত সৌরভ বিতরণ করিল, কত নয়নে সৌন্দর্য্যের মোহ বিকীর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়িল, আর ত তাহাকে রাখিতে পারিলাম না!

কেন এমন হয়? যদি সবই চিরস্থায়ী, তবে আমাদের চক্ষে সকলি অস্থায়ী কেন? যদি সকলই অপরিণামী, তবে আমরা জগৎকে এত পরিণামী দেখিতেছি কেন? বস্তু বল, ভাব বল, এই মুহূর্ত্তে যদ্রূপ দেখি, পর মুহূর্ত্তে ঠিক তদ্রূপ দেখিতে পাই না কেন? তাহার উত্তরে ভগবান্ বলেন,—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ১৩

দেহিনঃ যথা অস্মিন্ দেহে কৌমারং যৌবনং জরা, দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ তথা, ধীরঃ তত্র ন মুহ্যতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—দেহীদিগের দেহে যেমন কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য, দেহান্তর-প্রাপ্তিও তদ্রূপ; ধীরত্ব প্রাপ্ত হইলে আর এ সকলে তাহাকে মুগ্ধ হইতে হয় না।

যৌগিক অর্থ।—এই শ্লোকটীতে এবং পর শ্লোকে সমগ্র সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। এই দুইটী শ্লোক ভেদ করিতে পারিলে সৃষ্টিতত্ত্ব সুন্দররূপে উপলব্ধি হয়। এত সংক্ষেপে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব আর কোথাও ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এবং ঐ দুই শ্লোকের মর্ম্ম সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে সাংখ্যযোগে অধিকারী হওয়া যায়।

দেহ কাহাকে বলে? আধারের নাম দেহ। অনন্ত শক্তির সমুদ্র বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন স্তরে উপলব্ধি হয় ও বিভিন্নরূপে ক্রিয়া করে। সেই ভিন্ন ভিন্ন স্তরে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে যে শক্তি পরিদৃষ্ট ও উপলব্ধি হয়, সেইগুলিকে দেহ বলা যায়। বিরাট্ শক্তি সাধারণতঃ সপ্ত প্রকারে প্রতিফলিত। সেই সপ্ত স্তর বিরাট্ শক্তির সপ্ত দেহ বলিয়া পরিচিত। সাধারণতঃ এই সপ্ত দেহ সপ্ত লোক নামে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু এই স্থলে বিশেষ করিয়া বুঝা উচিত, একই জিনিষ সাত স্থলে সাত রকমে পরিদৃষ্ট হয় মাত্র। জিনিষের প্রত্যবায় হয় না, দর্শনের রূপান্তর হয় মাত্র। যেমন একই নক্ষত্র চক্ষে এক আকারে এবং যন্ত্র সাহায্যে অন্য প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ একই শক্তি-সমুদ্র ঐ সপ্ত স্থলে সপ্ত প্রকারে পরিদৃষ্ট। স্থূল কথা, বিশাল ব্রহ্মাণ্ড জিনিষের তারতম্য নহে, শুধু চক্ষের তারতম্য।

যাহা হউক, ইহা হইল প্রথম স্তরের কথা অর্থাৎ প্রথম স্তরে ব্রহ্ম এইরূপে পরিদৃষ্ট হন। দ্বিতীয় স্তর বা সাংখ্যস্তরে যে প্রকারে উপলব্ধি হয়, তাহা এইবার বলিব। বিশাল চৈতন্যশক্তি পূর্ণ ঘনীভূত অবস্থা পাইয়া প্রকাশিত হইলে যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম দেহ। চৈতন্য-শক্তির প্রত্যেক কল্পিত অণু এইরূপ সাত সাতটী দেহে পরিব্যাপ্ত। বিরাট্ হইতে অণু পরমাণু অবধি এই হিসাবে সকলেই দেহী।

বস্তুতঃ দেহে ও দেহীতে যেন কিছু পার্থক্য নাই। যেমন অগ্নিশিখা তাপের দেহ, অগ্নি-শিখার প্রত্যেক অণুটী উত্তাপ ছাড়া আর কিছুই নহে এবং সেই প্রত্যেক উত্তাপ-কণা রূপ বা জ্যোতিবিশিষ্ট, কিন্তু বহু উত্তাপ-কণা একত্র সম্বদ্ধ হইয়া তবে মানবচক্ষে রূপবিশিষ্ট সাবয়ব বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক পদার্থ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। চৈতন্যশক্তিই সর্ব্বত্র এইরূপ অণু আকারে এইরূপে সাবয়বত্ব পরিগ্রহণ করে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুই এইরূপে চৈতন্য-বিশিষ্ট—চৈতন্যে গঠিত ও চৈতন্যের ঘনীভূত বিকাশ বা দেহী। সাধক হইতে হইলে দেহকে যাহাতে দেহী নহে বলিয়া চিনিতে পারা যায়, তদ্রূপ জ্ঞান

সাধনা করিতে হয়। এবং ঐরূপ সাধনার নামই সাংখ্যযোগ। আধারকে আধেয় নহে বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়াই প্রকৃতি-পুরুষ জ্ঞান। সাধারণতঃ লোকে ভাবে, প্রকৃতি ও পুরুষ যেন দুইটী বিভিন্ন জিনিষ, এই প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পরমার্থতঃ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাই যেন বিবেক এবং এইরূপে মায়াবিজৃম্ভিত হইয়া তাহাদের দ্বৈতবাদের পোষকতা করে। কিন্তু শাস্ত্রে প্রকৃতি হইতে পুরুষকে মুক্ত করার যে উল্লেখ তোমরা দেখিতে পাও, উহার অর্থ ঐরূপ নহে। উহার প্রকৃত অর্থ—প্রকৃতি ও পুরুষ বা দেহ ও দেহী ভিন্ন করিয়া দেখিয়া, পরে ব্রহ্মজ্ঞানে একীকরণ। এই একীকরণের উদ্দেশ্যেই প্রথম বিবেক।

এই একীকরণের জন্য প্রকৃতিকে বা দেহকে বা আধারকে বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন করিয়া প্রথমে দেখিতে হয় ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার ভিতরকার মূল অপরিণামী সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া নিজ শক্তির প্রেরণা করিতে হয়। তাহা হইলে স্পষ্টতঃ পরে দেখিতে পাওয়া যায়, বস্তুতঃ একই চিতিশক্তি বিশেষ বিশেষ স্থলে তত্তৎ-স্থলীয় সঙ্কীর্ণতাবশতঃ বিশেষ বিশেষ গুণাক্রান্ত বা ভাবাক্রান্ত বা আধার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে ও তন্মধ্যে আধেয়রূপে এক চিৎস্বরূপ আত্মাই রহিয়াছেন। এই চিতিশক্তি ও চিৎ, পরে এক বলিয়া জানা যায় ও উহাই ব্রহ্মবাদ।

পরমাত্মা অর্থে—সর্ব্বপ্রকার অস্তিত্ব অননুভবনীয় এক কিম্ভূত কিমাকার কল্পনার জিনিষ নহে; পরমাত্মা অর্থে—সর্ব্ব অণুর, সর্ব্ব মহতের, সমস্তের অবিচ্ছিন্ন কেন্দ্র বা পূর্ব্বোক্তরূপ ভাব বা গুণ বা আধাররূপ সংকীর্ণতামুক্ত নিত্য সর্ব্বব্যাপী অস্তিত্ব।

মনে কর, একটী বিন্দু। বিন্দু বলিলে কি বুঝায়? ব্যাপ্তিশূন্য অস্তিত্ব; যাহা বিভাজ্য নহে, তাহাকে বিন্দু বলে। ব্যাপ্তিশূন্য অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভবপর? যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহারই ব্যাপকতা অবশ্যম্ভাবী; এবং ব্যাপকতা থাকিলেই তাহা বিভাজ্য, সুতরাং ব্যাপ্তিশূন্য ও অবিভাজ্য অস্তিত্ব কি প্রকারে সুসিদ্ধ হইতে পারে? অথচ যেমন বিন্দুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে বস্তুমাত্রেরই অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয়, বিন্দুর অস্তিত্ব যেমন স্বতঃসিদ্ধ ও বিন্দুর অস্তিত্বেই যেমন পদার্থমাত্রের অস্তিত্ব, অবিভাজ্য ব্যাপ্তিশূন্য বিন্দুই যেমন বিভাজ্য ও ব্যাপ্তিময় দ্রব্যাকারে পরিণত, এ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের মূল উপাদানও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

তার পর মনে কর, সেই বিন্দু যে কোন দ্রব্যের যে কোন স্থলে যে কোন অবস্থায় যেমন উপলব্ধি হয়;—এমন কোন স্থল থাকা সম্ভব নহে, যেখানে বিন্দুর

অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারা যায়; সুতরাং বিন্দুকে যেমন সর্ব্বব্যাপী অথচ অপরিণামী বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, চৈতন্যশক্তিকে সেইরূপ বিন্দু অথচ মহান্ —ব্যাপকতাশূন্য অথচ সর্ব্বব্যাপী—গুণশূন্য অথচ গুণময় বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এই যে ব্যাপ্তি ও গুণবিশিষ্ট ভাব, ইহাই চন্দ্র বা দেহ বা আধার বা বিরাট্ ব্রহ্ম। আর ঐ ব্যাপ্তিশূন্য অস্তিত্বই বিন্দু—দেহী বা আধার বা নির্গুণ ব্রহ্ম।

যাহা হউক, মোট কথা এই—চন্দ্র ও বিন্দুর মধ্যে অর্থাৎ জড় ও হিরণ্ময় পুরুষের মধ্যে পাঁচটী স্তর বর্ত্তমান। ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর দিয়া এই পাঁচটী স্তর অনুস্যূত। জড় ও হিরণ্ময়কোষ লইয়া সর্ব্বসমেত সাত প্রকার ক্ষেত্র প্রস্তুত। সাত প্রকার অর্থে সাতটী বিভিন্ন জিনিষ নহে। একই জিনিষের সূক্ষ্ম ও ঘনীভূত অবস্থাভেদ মাত্র। আর প্রত্যেক পরমাণু বা জীব এই সপ্তকোষসম্বলিত ও এই প্রকারে অস্তিত্ব উপভোগ করিতে ক্রমশঃ সমর্থ হয়।

জীব বহির্ম্মুখী গতিপ্রভাবে যত শক্তিমান্ হইতে থাকে, তত তাহার স্থূল দেহ ক্রমশঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিশিষ্ট মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে ও তার পর অন্তর্ম্মুখী গতি সূচিত হইলে ভিতরের ঐ সপ্ত কোষ ক্রমশঃ দেহে পরিণত ও তাহাতে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। সাধারণ মনুষ্য তাহাদের এই বাহিরের স্থূল দেহে কার্য্যপটু; কিন্তু দ্বিতীয় অন্তস্তরে বা মনোময় কোষে শিশুসদৃশ—সেখানে এখনও তাহাদের ইন্দ্রিয়সকল ফোটে নাই। উন্নত পুরুষেরা মনোময় কোষে পূর্ণ কার্য্যক্ষম এবং স্থূলদেহের মত মনোময় দেহেও সুচারুরূপে সর্ব্ব কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ।

মনোময় কোষে জীব কার্য্যকারী হইলে ভুবর্লোক পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে পরিদৃষ্ট হইতে পারে। এইরূপে জীব যত সূক্ষ্ম কোষ-সকলকে সূক্ষ্ম দেহে পরিণত করিতে পারে, ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রের সহিত সে সম্বন্ধবদ্ধ হয় ও অবশেষে হিরণ্ময় কোষ বা মায়ের আমার আনন্দমন্দিরের সন্ধান পায়।

এইরূপে স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর কোষে কার্য্যক্ষম হইতে যে সময় লাগে, সাধারণতঃ তাহা চারি ভাগে কল্পিত—কলি, দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্য। মনুষ্যকুলে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বাবধি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই প্রকার ক্রমাবলম্বনে শক্তি উন্মেষিত হয় ও তার পর গতি অন্তর্ম্মুখী হইলে বিপরীত ক্রম অর্থাৎ কলি, দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্য,এই ভাবে গতিপ্রবাহ চলিতে থাকে। শক্তি যখন শায়িত বা প্রচ্ছন্ন, তখন তাহাকে কলি বলে, শক্তির উপবিষ্ট অবস্থার নাম দ্বাপর, উত্থান অবস্থার নাম ত্রেতা ও পূর্ণ কার্য্যকরী অবস্থার নাম সত্য।

সাধারণ জীবদেহে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এইরূপ ভাবে কালপ্রবাহ চলে, অর্থাৎ স্থূলদেহে অন্তর্ম্মুখী গতি উন্মেষণ হওয়া বশতঃ জীব ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ-স্তরীয় কোষে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু সেই কোষে প্রবিষ্ট হইয়া বহির্ম্মুখী গতিপ্রভাবে তার অন্তর্ম্মুখী গতি রুদ্ধপ্রায় হইয়া পড়ে ও ক্রমশঃ সেই কোষানুযায়ী ইন্দ্রিয়-সকল পরিপুষ্ট হইয়া জীব-কোষের ভোগে মগ্ন হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়সকল যত স্ফুটতর হইতে থাকে, বহির্ম্মুখী ভোগেচ্ছার তত চরিতার্থতা ঘটিতে থাকে ও তাহার অন্তর্ম্মুখী গতি ততই ধীরে ধীরে সঞ্চালনশীল অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া শায়িত হইয়া পড়ে বা কলি আক্রান্ত হয়। তখন বিরাট্ স্নেহময়ী মাতৃশক্তির স্নেহ-দৃষ্টি তাহাকে—তাহার অন্তর্ম্মুখী গতিকে পুনরায় উন্মেষিত করিতে দেহান্তর আশ্রয় করিতে বাধ্য করে। ইহারই সাধারণ নাম মৃত্যু। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি অবস্থা, পরমাণু হইতে সাধারণ মনুষ্য অবধি এই সমস্ত জীব-ক্ষেত্রে কৌমার, যৌবন, জরা ও দেহান্তরপ্রাপ্তি, এই চারিরূপে প্রকটিত হয়। কিন্তু সাধক হইতে হইলে এই চারিটিকে ঘুরাইয়া বা বিপরীত ক্রম করিয়া লইতে হয়; অর্থাৎ যে ভাবে সাধারণ মনুষ্য বাঁচিয়া থাকে, সেইটিকে মৃত্যু অবস্থা বা অন্তর্ম্মুখী শক্তির শায়িত অবস্থা বলিয়া ধারণা করিয়া লইতে হয়। এবং যাহাতে সেই শায়িত অবস্থা হইতে অন্তর্ম্মুখী গতি ক্রমশঃ উপবেশন, উত্থান ও সঞ্চারণশীল অবস্থায় পরিণত হয়, তদনুযায়ী ভাবে জীবনের গতি ফিরাইয়া লইতে হয়।

সে ফিরাইবার উপায় বিরাট্ চৈতন্যশক্তিকে উপলব্ধি করা বা প্রকৃতিকে চেনা। সগুণা জননীর গুণসকলের বিশ্লেষণ করিতে করিতে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই ক্রমশঃ নিজের গুণ বা শক্তি সেই মহাশক্তিতে বিলীন হইতে থাকে। স্রোত যেমন সমুদ্রে মিলায়,বাষ্প যেমন আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তেমনি ভাবে আত্মশক্তি মাতৃক্রোড়ে মিশাইয়া যাইতে থাকে ও তখন মাতা ও পুত্র, প্রকৃতি ও পুরুষ, চন্দ্র ও বিন্দু, আধার ও আধেয়, নির্গুণ ও সগুণ এক হইয়া যায়।

আগে হইতে নির্গুণ নির্গুণ করিও না,নির্গুণ কথার অর্থ বুঝিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। আজ ব্রহ্মবাদের ঘনঘটায় পৃথিবী ছাইয়া ফেলিতেছে—আপামর সাধারণ "ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম" শব্দে দিগন্ত মুখরিত করিতেছে—আজ মা আমার বাঙ্ময়ী-রূপে দেশে অবতীর্ণা—অভাগিনী হৃদয়ে আশ্রয় না পাইয়া কণ্ঠে আশ্রয় লইয়াছে। যদি দেখিতে চাও, তবে কণ্ঠ হইতে মাকে হৃদয়ের মধ্যে লইয়া যাও—দেখিতে পাইবে।

আগে আধার বুঝিতে চেষ্টা কর—আগে বৃক্ষ লতা, তৃণ বুঝ—আগে রক্ত মাংস মেদ বুঝ—আগে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম বুঝ,তার পর প্রাণ বুঝিবে—তার পর আত্মা বুঝিবে।

জানি, বুঝিবার শক্তি তোমার নাই; তাই ব্রহ্মশক্তির আশ্রয় লও; অনুমান ছাড়িয়া প্রত্যক্ষের দিকে চাহ,—মাথা ঘামাইতে হইবে না, যাহা দেখিতে শুনিতে পাইতেছ, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা স্পর্শ করিতে অধিকারী হইয়াছ, তাহাই ভাল করিয়া স্পর্শ কর, তাহাই ভাল করিয়া দেখ, শুন—বুঝিতে পারিবে।

যাহা হউক, পূর্ব্বে বলিয়াছি, আধারের চারি প্রকার অবস্থা—কৌমার, যৌবন, জরা ও দেহান্তরপ্রাপ্তি। শক্তির উন্মেষের ক্রম হিসাবে এই চারিটী অবস্থা দেহী বা জীবমাত্রেরই দেহে ফুটিয়া উঠে। দেহান্তর-প্রাপ্তি কৌমার, যৌবন, জরার মত একটী অবস্থা মাত্র; উহা আর নূতন কিছু নহে। অন্তর্ম্মুখী শক্তির শায়িত অবস্থার নাম দেহান্তরপ্রাপ্তি; শক্তির বিনাশ নহে। মনে কর, একটি আধারে এক দিক্ দিয়া জলপ্রবাহ প্রবিষ্ট হইতেছে ও অন্য দিক্ দিয়া অন্য একটি প্রণালী বহিয়া সে জল নির্গত হইয়া যাইতেছে। আর সে আধারটী এমন ভাবে গঠিত যে, ইচ্ছানুযায়ী তাহার দ্বারা জল অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করিতে ও অল্প পরিমাণে প্রক্ষেপ করিতে কিম্বা অল্প পরিমাণে টানিয়া লইতে ও অধিক পরিমাণে বাহির করিয়া দিতে সমর্থ হওয়া যায়। তুমি সেই যন্ত্রে যত অধিক পরিমাণে জল টানিয়া লইতে সমর্থ হইবে বা সংগ্রহ অপেক্ষা যত অল্প পরিমাণে ব্যয় করিবে, তত সে জলের বহির্গমন-বেগ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে এবং ইহার বিপরীত ক্রমে বহির্ম্মুখী বেগও মাত্রানুযায়ী হ্রাস পাইতে থাকিবে। জীব-শক্তি যৌবনের প্রারম্ভ অবধি অধিক পরিমাণে অন্তর্ম্মুখী ও অল্প পরিমাণে বহির্ম্মুখী থাকে বলিয়া, বহির্ম্মুখী চঞ্চলতা বৃদ্ধি ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির পুষ্টি অধিক মাত্রায় হইতে থাকে। যখন শক্তি অন্তর্ম্মুখে ও বহির্ম্মুখে সমান পরিমাণে ক্রিয়া করে, জীব তখন তাহাকে যৌবন বলে এবং যখন শক্তি অন্তর্ম্মুখ অপেক্ষা বহির্ম্মুখে অধিক কার্য্য করে, তখন প্রৌঢ়, জরা ও অবশেষে দেহান্তরপ্রাপ্তি আদি পরিবর্ত্তন ঘটে।

যেমন পূর্ব্বোক্ত আধারটীতে সংগ্রহ অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইলে, জল সঞ্চাপের ন্যূনতাবশতঃ বহির্ম্মুখী নল দিয়া জল-বহিষ্কার হ্রাস হইয়া পড়ে ও সে নল স্থিতিস্থাপকতা গুণবিশিষ্ট হইলে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে, তদ্রূপ যৌবনের পর শক্তির অন্তর্ম্মুখী ক্রিয়ার হ্রাস প্রাপ্তির জন্য সঞ্চাপ হ্রাস প্রাপ্ত হয় ও ইন্দ্রিয়াদি

বিশুষ্ক, শীর্ণ হইয়া পড়িতে থাকে। ইহাই প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য ইত্যাদি শারীরিক বিকলতার কারণ।

এই যে অন্তর্ম্মুখে বা বহির্ম্মুখে ক্রিয়াশীলতা, ইহা জীব নিজ সংস্কারানুযায়ী সম্পাদন করে। সাধারণতঃ বহির্ম্মুখে বিষয়াদি ভোগের জন্য যত ব্যস্ততা প্রদর্শন করে এবং অন্তর্ম্মুখের দিক্ হইতে লক্ষ্য ফিরাইয়া বহির্ম্মুখের দিকে লক্ষ্য স্থাপিত করে, তত সঞ্চয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ অধিক হইয়া পড়ে।

এইরূপ অন্তর্ম্মুখ হইতে বহির্ম্মুখে অধিক ক্রিয়া হইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আভ্যন্তরিক ঘটনা ঘটিতে থাকে। এই অন্তর্ম্মুখী ও বহির্ম্মুখী গতির ক্রিয়ার অধিক পরিমাণে মাত্রা-বৈষম্য হইলে, উভয় দিকেরই সাধারণ কার্য্যকরী শক্তি হ্রাস হইয়া পড়ে। শক্তি প্রতিরোধ না পাইলে ক্রিয়াশীল হয় না, ইহা শক্তির একটী ধর্ম্ম। শক্তির অন্তর্ম্মুখী গতি বহির্ম্মুখী গতিতে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয় ও বহির্ম্মুখী গতি অন্তর্ম্মুখী গতিতে প্রতিঘাত পাইতে থাকে এবং এই জন্যই সংগ্রহ ও ব্যয় বা অন্তর্ম্মুখে ও বহির্ম্মুখে শক্তি কার্য্যকারিতা প্রকাশ করে। সুতরাং যখন শক্তির এক দিকের গতি অন্য দিকের গতি অপেক্ষা বহুল পরিমাণে অধিক হইয়া পড়ে, তখন ঐ দুর্ব্বল শক্তি প্রবলতর শক্তিটিকে প্রয়োজনানুযায়ী প্রতিরোধ দিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং উহারও কার্য্য রুদ্ধ হইয়া আসিতে থাকে। এই অবস্থাকেই দেহান্তরপ্রাপ্তি বলে।

দেহান্তরপ্রাপ্তি বা যাহাকে সাধারণতঃ মৃত্যু বলে, উহা কার্য্যতঃ অন্তর্ম্মুখী শক্তির অতিরিক্ত হ্রাসপ্রাপ্তি ও তজ্জনিত বহির্ম্মুখী গতির প্রায় রুদ্ধাবস্থা। মৃত্যু এইরূপ জীবের ক্রিয়াশীলতার তারতম্য ছাড়া আর কিছুই নহে। যেমন একটি বৃক্ষের ত্বক্ ক্রমশঃ উপরিভাগ হইতে জীর্ণ হইয়া আসিয়া আসিয়া নীরস হইয়া পড়িতে থাকে ও শেষে সে ত্বক্‌রূপ বৃক্ষের আবরণখানি খসিয়া পড়ে, মৃত্যুও তদ্রূপ একটি স্থূল আবরণের পরিত্যাগ ছাড়া আর কিছুই নহে। যেমন স্বয়ম্ভু পুষ্পোদ্ভিদ (ভুঁইচাঁপা গাছ) মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বিকশিত হইয়া, পুষ্পাদি প্রদান করিয়া, তার পর ক্রমশঃ জীর্ণ হইতে থাকে, পত্রসকল ও দণ্ড রসহীন হইয়া ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায় ও অবশেষে একবারে আমাদিগের নয়নের অদৃশ্য হইয়া পড়ে, অথচ আমরা জানি যে, সেই স্থলে ঐ স্বয়ম্ভু উদ্ভিদ আছে. আবার কালে প্রকাশ হইবে, তদ্রূপ আমাদিগের দেহান্তরপ্রাপ্তিও বুঝিতে হইবে। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

ধীরত্ব লাভ হইলে আর এই দেহান্তরপ্রাপ্তি বিভীষিকা আকারে প্রাণকে ভীত করিতে পারে না। এই স্থলে শক্তির আর একটি রহস্য আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। শক্তি প্রতিরোধ না পাইলে ক্রিয়াশীল হইতে পারে না—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শক্তি-বিজ্ঞান যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এ তত্ত্ব সহজেই বুঝিতে পারিবেন এবং এই রহস্যটী বুঝিতে পারিলেই একই জিনিষ বহুরূপে—বহু আকারে কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে, কেমন করিয়া এই সৃষ্টিবৈচিত্র্য হয়, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

কোন বস্তুর উপর শক্তি প্রয়োগ করিলে, সেই বস্তুর নিজ শক্তি সে শক্তিকে প্রতিরোধ করে বলিয়াই বস্তু সঞ্চালিত বা গতি প্রাপ্ত হয়। প্রতিরোধ করা কার্য্যতঃ শক্তিকে সংগ্রহ করা মাত্র; সেই সংগ্রহ যখন পূর্ণমাত্রায় হয়, অর্থাৎ প্রতিরোধশক্তি ছাপাইয়া যখন কোন শক্তিপ্রবাহ অধিক মাত্রায় আইসে, তখনই সে জিনিষ গতিশীল হয়। যেখানে প্রতিরোধ, সেইখানেই ক্রিয়া, জড়-বিজ্ঞান ইহা আমাদিগকে শিখায়। এই বিজ্ঞানটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে শক্তির তিনটি অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। প্রথম অস্তিত্ব বা সত্তা উদ্দীপনা দ্বিতীয় আভ্যন্তরিক আণবিক গতি, তৃতীয় সে গতির বাহ্য প্রকাশ বা সমষ্টি গতি। ইহারই শাস্ত্রীয় নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই তিনটি অবস্থা প্রতি শক্তি-অণুর যেন অঙ্গ বা দেহ। যেখানে শক্তির অস্তিত্ব, সেইখানেই এই তিনটি গুণ প্রকটিত। এই তিনটি গুণ অবলম্বন করিয়াই যত কিছু কার্য্য বা পরিণাম সংঘটিত হয়। এই তিনটি গুণ সংক্ষুব্ধ না হইলে কার্য্য বা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারে না। কিন্তু ইহা ছাড়া আর একটি অলৌকিক গুণ আমরা শক্তি-অণুতে দেখিতে পাই। যদি কতকগুলি অণু একত্রে পর পর সংলগ্নভাবে রক্ষিত হয়, আর যদি সই শ্রেণীবদ্ধ অণুর এক প্রান্তে নূতন কোন শক্তি আঘাত করে, তাহা হইলে মধ্যস্থ সমস্ত অণুশ্রেণীর ভিতর দিয়া সে শক্তি প্রবাহিত হইয়া গিয়া, সর্ব্বশেষস্থ অণুটীকে সঞ্চালিত করে, আর সমুদায় অণু স্ব স্ব স্থানচ্যুত হয় না। বালকদিগকে সময়ে সময়ে এইরূপ ক্রীড়া করিতে দেখা যায়। কতকগুলি পয়সা শ্রেণীবদ্ধরূপে পার্শ্বে পার্শ্বে পরস্পর সংলগ্ন করিয়া সাজাইয়া, তাহারা অপর একটি পয়সা দিয়া সেই শ্রেণীটীর এক প্রান্তে তাড়না করে; সেই তাড়না বা আঘাতজনিত শক্তি সমগ্র শ্রেণীর ভিতর দিয়া তাহাদিগকে অবিচল রাখিয়া বহিয়া চলিয়া যায়, অপর প্রান্তস্থ বা শেষের পয়সাটী শ্রেণী হইতে দূরে গিয়া পড়ে। এই শ্রেণী হইতে দূরে

গিয়া পড়া, ঐ পূর্ব্বোক্ত তিনটি অবস্থার পরিণাম। শক্তির ঐ পূর্ব্বোক্ত যে তিনটি অবস্থার কথা বলিয়াছি, উহার শেষটি সম্যক্‌রূপে অন্য কোথাও প্রকাশিত না হইয়া, ঐ শেষস্থ পয়সাটি—যেটির একটি মুখ শ্রেণীতে লুকান নাই, যেটি স্বাধীনভাবে একটী মুখ শ্রেণী হইতে বাড়াইয়া বসিয়া আছে, তাহার উপরই প্রকাশ পায়। সেই পয়সাটির উপরই প্রথমে অস্তিত্ব বা সত্ত্বগুণ,তার পর প্রতিরোধ বা আভ্যন্তরীণ গতি বা রজোগুণ, তার পর সঞ্চালন বা তমোগুণ সম্যক্‌রূপে প্রকাশ পাইয়া তাহাকে চতুর্থ বা অবস্থান্তরে প্রেরণ করে। এই যে চারিটি অবস্থা পাইলাম, ইহারই নামান্তর কৌমার, যৌবন, জরা ও দেহান্তরপ্রাপ্তি।

পয়সার দৃষ্টান্তে যেটী বুঝাইলাম, বিরাট্ শক্তিতে এই ক্রিয়াটী অনবরত ঘটিতেছে। জীবসকল বা শক্তির অণুসকল জীবাকারে স্বাধীন বহির্ম্মুখী অবস্থা কল্পনা করিয়া লইয়া, বিরাট্ হইতে একটি মুখ কল্পিত স্বাধীনতার দিকে বাড়াইয়া আছে;—ভোগেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া, বিরাট্ অস্তিত্ব ভুলিয়া, ব্যষ্টি স্বাধীনতার মোহে মুগ্ধ হইয়া, সমষ্টি হইতে বাহিরে যেন মুখ বাড়াইয়া আছে। সেই জন্য বিরাটের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া তাহাদিগের উপর ঐ চারিটি গুণ প্রকটিত করিতেছে। তাই জীব সত্ত্ব, রজ, তম অবস্থায় চালিত হইয়া কৌমার, যৌবন, জরা সম্ভোগ করিয়া, শ্রেণী হইতে শ্রেণ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। হায় জীব! যদি এ অবস্থার হাত এড়াইতে চাহ—যদি সত্ত্ব, রজ, তমোগুণের বিকাশ হইতে মুক্তি চাহ—যদি কৌমার, যৌবন, জরা, দেহান্তরপ্রাপ্তির কবল হইতে নিষ্কৃতি চাহ—যদি জন্মমৃত্যুর স্রোত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাহ, তবে মায়ের বুকে মুখ লুকাও। অমন করিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া থাকিও না—জননীর ক্রোড়ে থাকিয়া জননীকে ভুলিও না—বিরাটে সংযুক্ত থাকিয়া বিরাট্‌কে বিস্মৃত হইও না—বহির্ম্মুখী হইও না—বাহিরে মুখ বাড়াইও না, স্নেহময়ী মায়ের স্নেহধারাপূর্ণ স্তনে মুখ সংলগ্ন করিয়া রাখ, বিরাটের তরঙ্গ তোমার উপর দিয়া অপ্রতিহত-ভাবে চলিয়া যাইবে—বিরাটের উদ্বেলিত শক্তি তোমায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না—ক্রোড় হইতে তুমি বিচ্যুত হইবে না—তুমি ধীরত্ব লাভ করিবে, স্রোতে পর্ব্বতের মত তুমি অটল থাকিবে; অবস্থার চক্র তোমায় স্পর্শ করিবে না।

শুন, ধীর হও, "**মুখ লুকাও**"। অন্তর ও বহিঃ নামক তোমার কল্পিত দুই বাহু দিয়া মাকে জড়াইয়া ধর। জড় বলিয়া কিছু নাই, চৈতন্যময়ীর বিরাট্

চৈতন্য-সমুদ্র আমরা জড় ও চৈতন্য বলিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলাম। যখন মনুষ্যকুলে প্রবেশ করিয়াছ—যখন মানবোচিত ইন্দ্রিয়াদি লাভ করিয়াছ—যখন মাকে খুঁজিতে চলিয়াছ, তখন আর ও কল্পিত দিক্‌রচনায় তোমার প্রয়োজন নাই। মায়ের বিরাট্ সত্তা জড় ও চৈতন্যের ভিতর সমানভাবে অনুস্যূত দেখ। লবণকণা যেমন জলে মিলাইয়া যায়—বরফখণ্ড যেমন দ্রবীভূত হইয়া জল হইয়া যায়, তেমনি ভাবে মিলাইয়া যাও—দ্রবীভূত হইয়া যাও; তোমার সর্ব্বাঙ্গ মাতৃঅঙ্কে মিশাইয়া যাইবে—প্রতিঘাতের ভয় থাকিবে না, অন্তর্বাহ্য এক হইয়া যাইবে।

শুন। মুখ লুকাও—মরীচিকা দূরে যাইবে। এখন তোমাদের গতি বলিয়া একটা কল্পনা আছে—উদ্যম বলিয়া জিনিষ তোমরা না বুঝিয়া থাকিতে পার না, তাই দ্রুতগমনশীল যানে আরোহণ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিলে যেমন দিগন্তে বর্ণশ্রেণী ঘূর্ণিত দেখায়, যানের বা নিজের গতি উপলব্ধি হয় না,—তদ্রূপ তোমরা পূর্ণ বিরাটত্বের দিকে যাইতে যাইতে বাহিরের দিকে চাহিয়া আছ ও বাহ্যকে তোমরা জন্ম, মৃত্যু, কৌমার, যৌবন, জরা, জন্মান্তরাদিরূপে ঘুরিতে দেখিতেছ। মুখ লুকাও—দৃষ্টি ভিতরে টানিয়া লও, নিজের বিকাশ প্রত্যক্ষ হইবে—ঘোর ছুটিয়া যাইবে।

মুখ লুকাও। স্নেহময়ীর বিরাট্ চক্ষে, যেখানে অনন্ত শক্তি প্রবাহিত—যেখানে অনন্ত জ্যোতিঃ উদ্বেলিত—যেখানে অনন্ত আনন্দ নিত্য প্রকটিত—বিকাশ যেখানে লয়হীন—স্ফুরণ যেখানে বিরামহীন—অস্তিত্ব যেখানে শঙ্কাহীন, সেইখানে তোমার মুখ ফিরাও—সেই দিকে—তোমার শক্তির যে প্রান্ত বাহিরের দিকে বাড়াইয়া রাখিয়াছ, সেই প্রান্ত ঘুরাইয়া ধর—ভয়, মোহ দূরীভূত হইবে।

মুখ লুকাও—মায়ের গুণ বুঝিবে; মুখ লুকাও—মায়ের নির্গুণত্ব বুঝিতে পারিবে; মুখ লুকাও—তুমি ধীর হইবে।

ধীরত্ব প্রাপ্তি হইলে আর কৌমার, যৌবন, জরা, দেহান্তরপ্রাপ্তি ইত্যাদিতে মুগ্ধ হইবে না।

আর সেইরূপ ধীরত্ব লাভ হইলে, তার পর তোমার ঐ উদ্যম বা গতিকল্পনা দূরীভূত হইবে। তখন বুঝিবে—তাহার পূর্ব্বে কোন প্রকারেই নহে—শুধু তখন উপলব্ধি হইবে, তোমার গতিও নাই—বিরাটের দিকে তোমার যাইতে হয় না—বিরাট্ মাতৃঅঙ্গীভূত হইয়াও তুমি স্থির। বাষ্পযান পূর্ণগতিতে যাইবার

সময়ে পথপার্শ্বে কেহ দাঁড়াইয়া সেই দিকে চাহিলে সে যেমন দেখে, যানশ্রেণী যাইতেছে না, পৃথিবীখানা তাহাকে লইয়া বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, তদ্রূপ এত দিন মায়া-শক্তির যানকে তোমার পাশ দিয়া ছুটিতে দেখিয়া অবিদ্যাবশে তাহাতে নিজ গতি কল্পনা করিতেছিলে; চাহনি ঘুরাইয়া লইয়া দেখিবে, অবিদ্যা দূর হইয়াছে; দেখিবে মায়াশক্তির চিত্রাবলী বেগে ঘুরিয়া যাইতেছে, মা তোমায় বক্ষে লইয়া ছুটিতেছেন অথচ তুমি অপরিণামী—স্থির—নিত্য।

তার পর তৃতীয় বা ব্রহ্মস্তর। সেখানে দেখিবে, সব সগুণ হইয়াও নির্গুণ, তোমার স্বতন্ত্র শক্তি আর থাকিবে না, সুতরাং শক্তি তোমার উপর দিয়া বহিবে না,স্বপ্রকাশ তুমিই স্বয়ংশক্তি। অবিদ্যা ও গতি কিছুই লক্ষ্য হইবে না। কিন্তু এখন—যখন গতি, উদ্যম, দেহী ও দেহ ইত্যাদি জ্ঞান আছে, ততক্ষণ অবিদ্যাকে বা জীবত্বকে উড়াইতে যাইও না। আগে মায়া কি বুঝ, আগে কেমন করিয়া আমাদের চিৎক্ষেত্র নানারূপে রঞ্জিত হয়, তাহা উপলব্ধি কর—কেমন করিয়া সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, জল স্থল, জড় চৈতন্য, শীত উষ্ণ, পীত হরিৎ ইত্যাদি অনুভূতি আইসে, সেই প্রণালী হৃদয়ঙ্গম কর, অবিদ্যা বুঝ, তার পর মহামায়ার সন্ধান পাইবে। তার পর ব্রহ্মত্ব।

এই মহামায়ার মায়া—এই জগৎ উপলব্ধির প্রণালী কিরূপ, সাংখ্যস্তরে তাহাই জ্ঞাতব্য এবং ভগবান্ পরশ্লোকে তাহাই বলিয়াছেন। কেন এক নিত্য অপরিণামী আত্মায় এত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, তাহার উত্তর—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ ১৪

কৌন্তেয়। মাত্রাস্পর্শাঃ তু শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ, আগমাপায়িনঃ অনিত্যাঃ, ভারত। তান্ তিতিক্ষস্ব।

ব্যবহারিক অর্থ।—মাত্রাস্পর্শই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখানুভূতির কারণ। সে স্পর্শসকল যাতায়াতধর্ম্মী অনিত্য। ভারত! (এইরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া) সে সকলে অবিচলিত থাক।

যৌগিক অর্থ।—মাত্রাস্পর্শ কি? মাত্রা কাহাকে বলে? মাত্রাশব্দ পরিমাণ বা ছেদ অর্থবোধক। এই মাত্রাশব্দটীতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের স্পন্দনতত্ত্ব বা দেবতাতত্ত্ব

বর্ণিত হইয়াছে। বেদ বলেন, স্পন্দনই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ—স্পন্দনই দেবতা—স্পন্দনই প্রকাশ, চৈতন্যের ঈক্ষণ বা অভিব্যক্তি। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুই স্পন্দনধর্ম্মী। স্পন্দনের জন্যই চৈতন্য উপলব্ধি ও পরমাণুরূপে সংগঠিত বা অনুভূত হয়। আমাদের দেহের যেমন নিদ্রা ও জাগরণ দুইটী অবস্থা, প্রত্যেক পরমাণুতে বা চৈতন্যশক্তির আণবিক দেহে তদ্রূপ আকুঞ্চন ও প্রসারণ, এই দুইটী ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হয়। এই আকুঞ্চন প্রসারণ ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে সর্ব্বত্র ক্রিয়াশীল। আমাদের হৃৎপিণ্ড যেমন একবার আকুঞ্চিত ও একবার প্রসারিত হয়, আমাদের দেহের প্রত্যেক পরমাণুই—মাংস,রক্ত,মেদ, রস আদি সমস্ত বা ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ আদি সমস্ত পরমাণু তদ্রূপ তালে তালে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই এইরূপ। সূর্য্যও সমষ্টিভাবে এইরূপে একবার আকুঞ্চিত ও একবার প্রসারিত হইতেছে। আমাদের হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চন ও প্রসারণে যেমন রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত ও সর্ব্বশরীরে পরিচালিত এবং সংশোধিত হয়, সূর্য্যের সেই স্পন্দন তদ্রূপ জীবাণু ও জীব-সকলের ভিতর দিয়া প্রাণপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত ও প্রবাহিত করিতেছে। আবার এইরূপ কোটি কোটি সূর্য্য তারকা আর এক মহান্‌ কেন্দ্রের আকুঞ্চন ও প্রসারণের দ্বারা প্রাণপ্রবাহে পরিপুষ্ট হইতেছে। সেই মহান্‌ কেন্দ্রকেই আমরা আদিত্য বলি ও বিরাট্‌ দেবতা বলিয়া সম্বোধন করি। বেদ সেই মহান্‌ কেন্দ্রের দিকে লক্ষ্য করিয়াই অধিকাংশ মন্ত্র প্রয়োগ করেন।

যাহা হউক, চৈতন্যময়ী সর্ব্বপ্রথম নিজ স্পন্দনে যখন স্পন্দিতা বা ঈক্ষণময়ী হন—সর্ব্বপ্রথম কম্পনে যখন সেই ঈক্ষণশক্তি হইতে সত্ত্ব, রজ, তমোগুণ সাম্যাবস্থাচ্যুত হইয়া পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, অর্থাৎ বেদান্তের কথায় যখন সর্ব্বপ্রথম সৎস্বরূপ ঈক্ষণময় হন, তখন তাঁহাতে অহং জ্ঞান স্ফুরিত হয়। এই প্রথম কম্পন বা স্পন্দন বিরাট্‌ ব্রহ্ম নামে অভিহিত। তার পর সেই অহংজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সেই কম্পন দিক্‌ বা মহাশূন্য ও কাল—এই দুই কল্পনায় আপনাকে কল্পিত করে। অর্থাৎ আপনাকে যেন মহাকাল ও মহাশূন্য বলিয়া পরিজ্ঞাত হয়। সে কম্পন তখন ঘনীভূত হইতে থাকে ও নিরবয়ব ছেদহীন কালাতীত চৈতন্য সেই অহংজ্ঞান আকারে ঐ দিক্‌ ও কাল কল্পনা সাহায্যে ঘন হইয়া উঠিতে থাকে ও তখন সর্ব্বত্র ও সর্ব্বক্ষণ সেই অহংজ্ঞান স্বাধীনতার আনন্দ সম্ভোগে সর্ব্বকাল ও সর্ব্বদিগ্ব্যাপী হইয়া পড়ে।

তার পর সে সর্ব্বকাল সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপী চৈতন্য সেই স্পন্দনে ভাবপূর্ণ হইয়া

পড়েন না হৃদয়ময় হন। এই ভাবই পৌরাণিক বিষ্ণুতত্ত্ব। ভাবই ভগবানের চরণ—ভাবই ভগবানের গতি। এই জন্য বিষ্ণু বিরাটের চরণরূপে বর্ণিত। এই ভাবই ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ভাবই অস্তিত্ববোধক। ভগবানের চরণ চিন্তা অর্থে—ভগবানের ভাব চিন্তা। প্রাণে যখন ভগবদ্ভাব উদিত হয়, বুঝিও, ভগবান্ চরণ বাড়াইয়া দিয়াছেন, যত্নে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিও। ভাবে ভাবে ভগবান্ চরণ বাড়াইয়া দেন—ভাবে ভাবে হৃদয়ে প্রবেশ করেন; ভাবের সমাদর করিও—ভাব তাঁহার পদবিক্ষেপ। ভাব প্রাণে ফুটিতেছে বলিলে আমি বুঝি যে, মা আমার এক একটী পদ বিক্ষেপ করিয়া হৃদয়ে নামিতেছেন। হায়! মনুষ্যের স্ব স্ব প্রাণে যে সমস্ত রত্ন স্বতঃ ফুটিয়া উঠে, যদি যত্ন করিয়া হৃদয়ে তাহাদের আসন দিতে পারিত—যদি সে সমস্ত রত্ন সঞ্চয় করিতে পারিত, তাহা হইলে ভিখারীর মত মানুষকে পরের দ্বারে ফিরিতে হইত না। কিন্তু ও কথা যাউক।

স্পন্দন এইরূপে ভাবাকারে ঘনীভূত হইবার পর ক্রমশঃ অহংতত্ত্ব হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধতত্ত্ব প্রকটিত হয়। পূর্ব্বোক্ত স্পন্দনের ক্রম বিকাশের ভিতর সংক্ষেপে আমি পাঁচটি স্তর বলিয়া গিয়াছি। সেই পাঁচটি স্তরই ঐ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আদি তন্মাত্রারূপে প্রকাশিত হয় ও ব্রাহ্মী সৃষ্টি এইখানে সূচিত হয়। কাল অবলম্বন করিয়া তন্মাত্রা ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং দিক্ অবলম্বন করিয়া পঞ্চতত্ত্ব ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়; এবং উভয় অবলম্বনে মন সৃষ্ট হয়। এইরূপে বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড রচিত, কল্পিত ও অনুভূত হয়। এক কম্পনে বিভিন্ন ভাবের প্রকট হয়।

কিন্তু সে পূর্ণ স্বাধীন অহংজ্ঞানের জাগরণ এরূপ সমষ্টিভাবে স্বাধীনতা সম্ভোগে নিশ্চিন্ত হয় না। পূর্ণ স্বাধীনতার স্পন্দন চিদাকাশের প্রত্যেক অণুতে অণুতে স্পন্দিত হইতে থাকে, প্রত্যেক সৃষ্ট পরমাণু ঐরূপ স্বাধীনধর্ম্মী বলিয়া প্রত্যেক পরমাণুতে ঐরূপ অহংজ্ঞান ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতে থাকে ও প্রত্যেক পরমাণু বিরাট্ সর্ব্বব্যাপী মহান্ চৈতন্য হইয়াও খণ্ড খণ্ড আণবিক স্বাধীন ভোগের জন্য ঐরূপ আণবিক বা জৈবিক অহংজ্ঞানের সঞ্চাপে ঘনীভূত ও সাবয়ব এবং মন, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্রা ও দেহ বা আধারবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। এইরূপ ব্যষ্টি জীব বা ভোক্তা হওয়া বিরাটের সর্ব্বশক্তিমত্তার একটী শ্রেষ্ঠ পরিচয়। নির্গুণ হইয়াও সগুণ, নিরাকার হইয়াও সাকার, ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত হইয়াও ইন্দ্রিয়ময়, ভাবাতীত হইয়াও ভাবগ্রাহী, অপরিমেয় হইয়াও পরিমিত, এক হইয়াও বহু।

যাহা হউক, মায়ার স্পন্দন হইতে এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড কল্পিত ও জীব রচিত বা অনুভূত। এই আমি ঈশ্বর গড়িয়া ফেলিলাম—তিন কথায় ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া দিলাম।

ঈশ্বর-গড়া, জগৎ-গড়া পণ্ডিত পথে ঘাটে মিলে; সুতরাং আমিও না গড়িব কেন? বাল্যকালে বিদ্যালয়ে পণ্ডিত মহাশয় একদিন "ভগবান্ এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন" এইরূপ একটী পাঠ পড়াইতেছিলেন; আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—পণ্ডিত মহাশয়! ঈশ্বর সমস্ত গড়িয়াছেন—ঈশ্বরকে গড়িয়াছে কে? অন্য একটী বালক মুহূর্ত্তে গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর দিয়াছিল—"কুম্ভকার!" কুম্ভকারের প্রতিমা নির্ম্মাণ আমার সে সমপাঠীর প্রাণে এই ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছিল।

বস্তুতঃ কুম্ভকারের ঈশ্বর নির্ম্মাণ আর ভাষায় আমাদের সৃষ্টিতত্ত্ব অঙ্কিত করা সমান কথা। কুম্ভকারের প্রতিমা যেমন নির্জীব পুত্তলিকা মাত্র, সাধারণ লোকের পক্ষে শাস্ত্রের অঙ্কিত ঈশ্বরাদিও তদ্রূপ বুঝিও। সাধক হইলে এবং সেই প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে, তবে যেমন কাজ হয়, প্রতিমা গঠনের ইতরবিশেষে যেমন তাহার ক্ষতি হয় না; এবং শুধু প্রতিমা যেমন সাধক ছাড়া অন্যের নিকট পুত্তলিকা ভিন্ন অন্য কিছু নহে—এই সমস্ত ঈশ্বর-তত্ত্বাদি অঙ্কনও প্রায় তদ্রূপ। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে, সাধনার দ্বারা হৃদয়ে তত্ত্বসকল উন্মেষিত হইলে, তবে ইহা প্রতিমার মত সাহায্যকারী—নতুবা পুত্তলিকা মাত্র।

সাধক! তোমাকে শুধু প্রতিমা দেখাইয়া রাখিলাম। যদি সাধনায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা শিক্ষা করিয়া থাক—যদি তত্ত্বোন্মেষের জন্য ভগবৎশক্তি তোমার হৃদয়ে সংগ্রহ হইয়া থাকে, তবে এ প্রতিমায় তাহা প্রয়োগ করিয়া কৃতার্থ হও; প্রতিমা যেমনই ভাবে গঠিত হইয়া থাক, ফলের ইতরবিশেষ হইবে না। কিন্তু যদি প্রাণ তোমার তত্ত্বান্বেষী অবস্থায় বা সাংখ্যস্তরে প্রবেশ করিয়া না থাকে, তবে বৃথা প্রতিমা লইয়া খেলা করিও না। প্রতিমা লইয়া পুরোহিত মহাশয়েরা খেলা করিয়া আমাদিগকে নির্জীব পুত্তলিকার উপাসক করিয়া তুলিয়াছেন। "ব্রহ্ম" লইয়া খেলা করিয়া করিয়া আমরা নির্জীব "ব্রহ্মবাদী" হইয়া পড়িয়াছি। যে "ব্রহ্ম" শব্দ স্মরণে পূর্ণত্বের অসীম আনন্দে নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হইত, হৃদয়ে শক্তিসমুদ্র আকণ্ঠ ফুলিয়া উঠিত, এখন সেই ব্রহ্ম-ধ্যানে সাধকপুঙ্গবেরা নিদ্রিত হইয়া পড়েন, নাসা-ধ্বনি ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্থাপন করে। হায়, আমরা উভয় দিকে আক্রান্ত হইয়াছি।

যাহা হউক, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, তুমি সাংখ্যস্তরে প্রবিষ্ট কি না, তাহা

আগে বুঝিয়া লইতে হয়; এবং তাহা উপলব্ধি করিবার একটী সুন্দর উপায় আছে। অবশ্য প্রত্যেকে স্ব স্ব জ্ঞানের বিচার করিয়া অনায়াসে নিজ অবস্থা বুঝিতে পারেন, কিন্তু প্রাণময়কোষের স্পন্দন অনুভব যখন কাহারও অনুভূতিতে আসে, তখন বুঝিতে হইবে, তিনি সাংখ্যস্তরের সাধনাব উপযোগী। ভগবচ্চিন্তা করিতে বসিয়া এ স্পন্দন অনুভবে আসে। প্রণালী অনুযায়ী ক্রিয়া সূচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, শরীরের কেন্দ্রে কেন্দ্রে, মণিপুর বা নাভিদেশে অথবা অনাহত চক্রে বা হৃদয়ে, যেখানে শক্তি গুটাইয়া লওয়া যায়, সেই স্থল হইতে রশ্মি যেমন আলোক হইতে চারি ধারে স্ফুরিত হয়, তেমনি ভাবে চারি ধারে একটী স্পন্দন স্ফুরিত হইয়া যাইতেছে অথচ আমি স্থির আছি এবং শরীর হইতে আমার সত্তা ভিন্ন। এরূপ অনুভব আসিলে বুঝিবে, তুমি সাংখ্যস্তরীয় সাধনায় অধিকারী।

এইবার স্পন্দন হইতে কেমন করিয়া সুখদুঃখানুভূতি হয়, তাহা বলিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্পন্দনের ক্রম হিসাবে পঞ্চ তন্মাত্রা, পঞ্চ ভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় রচিত হয়; অথবা এই সমস্ত তত্ত্ব স্পন্দনেরই সূক্ষ্ম ও ঘনীভূত অবস্থার ক্রম মাত্র। মনুষ্য-দেহের পঞ্চ তত্ত্বের প্রত্যেকের দ্বিমুখী গতি হইতে দুইটী করিয়া ইন্দ্রিয় রচিত হয়। অন্তর্মুখী গতি বা আকুঞ্চন দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বহির্মুখী গতি বা প্রসারণ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় রচিত। ব্যোমতত্ত্ব শব্দগুণাত্মক অর্থাৎ শব্দতন্মাত্রিক স্পন্দন ব্যোমাকারে বিকশিত। শব্দাত্মক স্পন্দন যেন ব্যোমের আত্মা—আধেয়, এবং ব্যোম যেন তাহার দেহ বা আধার। এই ব্যোমতত্ত্বের জ্ঞানেন্দ্রিয় বা আকুঞ্চন—শ্রবণ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় বা প্রসারণ—কণ্ঠ। শব্দ—কর্ণের দ্বারা শ্রবণ বা ভিতরে গ্রহণ করি এবং কণ্ঠে প্রসব করি। শব্দ শ্রবণ করিলাম অর্থে আমার দেহস্থ ব্যোমতত্ত্ব আকুঞ্চিত হইল; শব্দ করিলাম অর্থে দেহস্থ ব্যোমতত্ত্ব প্রসারিত হইল। আমরা বাহিরে খুব শব্দসত্ত্বেও সময়ে সময়ে শুনিতে পাই না কেন? যখন শব্দ শ্রবণের জন্য আমার ব্যোমনামীয় তন্মাত্রা বা স্পন্দন-তরঙ্গ আকুঞ্চিত না হয়, তখন বাহিরে শব্দ-ব্যোমতত্ত্বের যতই তরঙ্গ প্রবাহিত হউক, শব্দানুভূতি আমার হইবে না। এই-খানে বলিয়া রাখি, শব্দ স্পর্শ, রূপ রস গন্ধ, এই তন্মাত্রাসকল বাহিরের জিনিষ নহে, ভিতরের জিনিষ। শব্দ অর্থে আমার নিজের এক প্রকারের স্পন্দন, এক প্রকার মাত্রা বা তালের বা পরিমাণের তরঙ্গানুভূতি বা অভিঘাত। স্পর্শ অর্থে আমার নিজের অভ্যন্তরের অন্য একপ্রকার ঘনতর মাত্রার স্পন্দনানুভূতি। রূপ অর্থে আর এক মাত্রার স্পন্দনানুভূতি ইত্যাদি। অর্থাৎ আমার নিজস্ব পাঁচ

প্রকারের স্পন্দন আছে, আর বাহিরের ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ সেই পাঁচ প্রকার স্পন্দনকে পাঁচ প্রকারে অভিঘাত করিতেছে।

যাহা হউক, ব্যোমতত্ত্ব – যাহার আত্মা শব্দতন্মাত্রা, তাহার যেমন আকুঞ্চন বা জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রবণ এবং প্রসারণ বা কর্ম্মেন্দ্রিয় কণ্ঠ, মরুৎতত্ত্বের তদ্রূপ আকুঞ্চন বা জ্ঞানেন্দ্রিয় ত্বক্‌ ও প্রসারণ বা কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত। তেজস্তত্ত্ব—রূপতন্মাত্রা যাহার প্রাণ, তাহার আকুঞ্চন বা জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু এবং প্রসারণ বা কর্ম্মেন্দ্রিয় চরণ বা গতি। অপ্‌তত্ত্বের প্রাণ – রস, তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয় বা আকুঞ্চন জিহ্বা এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় উপস্থ। ক্ষিতিতত্ত্বের প্রাণ গন্ধ, তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয় নাসিকা, কর্ম্মেন্দ্রিয় পায়ু। আর এই সকল আকুঞ্চন ও প্রসারণ বা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় যে কেন্দ্র হইতে প্রসূত, অর্থাৎ এই সকল তরঙ্গ যে স্থলে আঘাত করিলে অনুভূতি জন্মায়, তাহার নাম অন্তর। এই কেন্দ্র যখন এই সকল প্রণালীর ভিতর দিয়া স্বীয় স্পন্দন প্রবাহিত করে, তখনই আমাদের ঐ ইন্দ্রিয়সকল বা স্পন্দনসকল অনুভূতি জন্মাইতে সক্ষম হয়।

আমি এক স্থলে বলিয়াছি, ভগবৎচরণ অর্থে—ভগবদ্‌ভাব। কেন বলিয়াছি, এইবার তোমারা তাহা বুঝিতে পারিবে। তেজস্তত্ত্বের কর্ম্মেন্দ্রিয় চরণ, যাহার দ্বারা গতি প্রকাশ পায়। প্রাণে কোন ভাব উদিত হইয়াছে বলিলে এই বুঝায় যে, সেই জিনিষ হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে; সুতরাং ভগবদ্ভাব প্রাণে উদয় হইয়াছে বলিলে বুঝিতে হইবে, ভগবান্‌ হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন বা চরণ নিক্ষেপ করিয়াছেন।

যাহা হউক, এই মাত্রা হইতে আমাদের ইন্দ্রিয় ও দেহাদি সমস্ত রচিত বলিয়া মাত্রাজ্ঞান হইলে দেহকে বা বস্তুকে যথেচ্ছভাবে গঠিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। মাত্রাজ্ঞানকে হৃদয়ে কার্য্যকারী করিতে পারিলে, বিরাট্‌ শক্তিপ্রবাহের তাল বা মাত্রা বুঝিতে পারিলে স্বচ্ছন্দে অলৌকিক কার্য্যসকল সংঘটিত করিতে সক্ষম হওয়া যায়। সহসা কোন স্থল হইতে অন্তর্হিত হওয়া, সহসা কোথাও আবির্ভূত হওয়া ইত্যাদি কার্য্যসকল এই মাত্রাজ্ঞান চর্চ্চার সিদ্ধি। ছিদ্রহীন প্রাচীরের ভিতর দিয়া কর প্রসারণ করিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে কোন দ্রব্য স্বচ্ছন্দে এইরূপ পুরুষ আনিতে পারেন। মুহূর্ত্তে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে গিয়া ইচ্ছানুযায়ী কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আবার স্বস্থানে প্রত্যাগত হইতে অনেক মহাপুরুষকে শুনা গিয়াছে। এ সকল মাত্রাজ্ঞান ও তদনুযায়ী কৌশল অবলম্বনের ফল।

তবে মোটামুটি বুঝিলাম, মাত্রা অর্থে মায়া বা পরিমিতিময় স্পন্দনের পরিমাণ,

তাল, আকুঞ্চন প্রসারণরূপ ব্যবচ্ছেদ। এই মাত্রাই অনুভূতির কারণ; সুতরাং মাত্রার দ্বারা আমরা সাধারণতঃ আমাদের অস্তিত্ব বা চৈতন্য অনুভব করি, মাত্রার প্রভাবেই অবিচ্ছিন্ন চৈতন্য বিচ্ছিন্ন ও বহুধা হয়; মাত্রার প্রভাবেই এক বিশাল ব্যাপ্তি বহু জীবাকারে রচিত হয়। মাত্রার প্রভাবেই জীবাত্মা শক্তিমান্ বলিয়া আপনাকে জ্ঞাত হন ও সেই সকল শক্তি ক্রমশঃ আপনাতে স্ফুরিত করিয়া লন। মাত্রা হইতে সমস্ত। মাত্রার তারতম্যই—ব্রহ্মাণ্ড বিচিত্ররূপে সম্ভূত হইবার কারণ। আবার মাত্রার স্পর্শ তারতম্যই অবিদ্যা বা অনুভূতি—মাত্রার তারতম্যই শীতোষ্ণসুখদুঃখদ।

এই সকল মাত্রা-স্পর্শানুভূতি আগমাপায়ী, সুতরাং অনিত্য; মরীচিকা যেমন স্বতন্ত্র অস্তিত্বশূন্য, স্পন্দিত তেজ প্রবাহাকারে ঐরূপ পরিদৃষ্ট হয়, এ সকল অনুভূতিও বস্তুতঃ তদ্রূপ; সাধারণতঃ এ অনুভূতিগুলি আত্মস্বরূপ বলিয়া অনুমিত হয়; সুতরাং সাংখ্যস্তরে এগুলির বিচার বিশ্লেষণ আবশ্যক।

এ স্পন্দন বিশ্লেষণ করিতে সর্ব্বপ্রথম এগুলিকে আগমাপায়ী—আগম ও নিগম গুণবিশিষ্ট বা উৎপত্তি ও নাশবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং ইহাদের কোথাও নিত্য অস্তিত্ব অসম্ভব, তাই ইহা অবিদ্যা। আকুঞ্চন ও প্রসারণ, এই দুই প্রকারে উৎপত্তি ও নাশ প্রকটিত হয়।

যখন এ আকুঞ্চন ও প্রসারণ অনিত্যগুণী, তখন উহার বশীভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহা থাকে না; যাহা থাকিতে পারে না, তাহাতে মুগ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তবে কি করিব? তবে কি এ স্পন্দনাভিঘাত রোধ করিয়া দিব? এই স্পন্দনের আকুঞ্চন ও প্রসারণ হইতে আমার ইন্দ্রিয়াদি রচিত। আকুঞ্চন হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও প্রসারণ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় গঠিত, তবে কি সে সকলকে হনন করিব?

ভগবান্ বলিতেছেন, তাহা হইতে পারে না। তাহাদের আসা যাওয়া রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। ইন্দ্রিয়াদি বা ভাবাদির উচ্ছেদ সাধন অসম্ভব। তাহারা আগমাপায়ী—আসা যাওয়াই উহাদের ধর্ম্ম। তবে ঐ সকলের তিতিক্ষা অভ্যাস করাই তোমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত।

তিতিক্ষা অভ্যাস অর্থে—ঐ সকল উৎপত্তি ও নাশ বা যাতায়াতের মধ্যে থাকিয়া উহাদিগকে অপ্রতিহতভাবে যাইতে আসিতে দেওয়া। সাধারণতঃ লোকে তাহা পারে না। মনে কর শীত। শৈত্যানুভূতি হইলেই আমরা তাহার বশীভূত হইয়া পড়ি এবং তাহা হইতে পরিত্রাণের জন্য তৎক্ষণাৎ উত্তাপ সংগ্রহের

জন্য বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে বাধ্য হই। কিন্তু যদি উহাতে আমার তিতিক্ষা থাকিত, তাহা হইলে শীত আমাতে ঐরূপ অনুভূতি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইত না, এবং আমিও তাহার প্রতিরোধ করিতে যত্নবান্ হইতাম না। আমি যদি শীতের মধ্যে কিছু দিন থাকিয়া, তাহাতে কোন অনুভূতি আমার প্রাণে জন্মিতে না দিতাম বা জন্মিলেও তাহা গ্রাহ্যে না আনিতাম, তাহা হইলে ওরূপ অনুভূতি আমাকে ব্যথিত করিতে, আমাকে তদ্বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-শক্তি ফুটাইবার জন্য সচেষ্ট করিতে সমর্থ হইত না।

এইরূপ প্রপঞ্চমাত্রে যদি তিতিক্ষা অভ্যস্ত হইয়া যায়. তাহা হইলে আর আমার প্রাণে কোনরূপ অনুভূতি আসিবে না এবং আসিলেও আমায় বিচলিত করিতে সমর্থ হইবে না। স্পন্দন-সকল আসিবেই; কিন্তু স্পন্দনের বশীভূত হইও না। স্পন্দন যাহাতে অনুভূতি জন্মাইতে না পারে, তদুপযুক্ত কৌশল অবলম্বন কর।

সে কৌশল কি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। জড়-বিজ্ঞানে বুঝিতে পারা যায়, কোন পদার্থের মধ্যস্থ পরমাণু সকল দিকে সমান ভাবে আকৃষ্ট বা স্পৃষ্ট থাকে বলিয়া, তাহারা স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে অবস্থান করে। তাহারা তরঙ্গে বা স্পন্দনে তরঙ্গিত বা স্থানবিচ্যুতি ইত্যাদি কোন প্রকারে বিকার প্রাপ্ত হয় না। জড়ে ও আত্মিক রাজ্যে এই একই নিয়ম কার্য্যকারী। যদি তুমি বাহিরে না থাকিয়া বিরাট্ ব্রহ্মসত্তায় অর্থাৎ এ সমস্ত আত্মারই স্পর্শ, এই জ্ঞানের মধ্যে অবস্থান করিতে থাক, তাহা হইলে স্পন্দনসংঘাত অপ্রতিহত ভাবে তোমার উপর দিয়া বহিয়া চলিয়া যাইবে। তুমি যদি মাতৃঅঙ্কের মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হও, মাতৃঅঙ্কে গা ঢালিয়া দাও, ও স্পন্দনসকল তোমায় বিচলিত করিতে বা তোমার স্বাধীন অবস্থানে বিঘ্ন ঘটাইতে সমর্থ হইবে না। এবং ঐরূপ অবিচলিত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তবে তুমি স্পন্দন বিশ্লেষণে সমর্থ হইবে। অথবা মায়ের এ লীলাময় চঞ্চল স্বরূপ হইতে সবলে দৃষ্টি ফিরাইয়া, তন্মধ্যস্থ স্থির আত্মস্বরূপ সত্তা লক্ষ্য কর, তাহাতেও হইবে।

ইহাই তিতিক্ষা অভ্যাসের নিয়ম। সর্ব্বত্র সর্ব্ব স্পন্দনে মাতৃসত্তা অনুভব কর। আকাশে বায়ুতে, সূর্য্যে চন্দ্রে, জলে স্থলে, অথবা শব্দে, স্পর্শে, রূপে, রসে, গন্ধে, অথবা স্পন্দনে স্পন্দনে, সংঘাতে সংঘাতে বিশাল মাতৃশক্তিপ্রবাহ দর্শন কর, ভাবে ভাবে মাতৃশক্তি উপলব্ধি কর; ভাবকে ভাব বলিয়া বুঝিও না—বিরাট্ অনন্ত শক্তিপ্রবাহের অমৃত-বারি বলিয়া বুঝ; প্রপঞ্চকে প্রপঞ্চ বলিও না—

আনন্দময়ীর আ নন্দস্ফুরণ বলিয়া প্রত্যক্ষ কর; এইরূপে অভ্যস্ত হও—এইরূপে চিন্তাকে ফিরাও; এইরূপভাবে মগ্ন হইতে যত্নবান্ হও, তিতিক্ষা আসিবে। অথবা জড়ের বাহ্য অণুসকলের মত বিচলিত, ক্ষুব্ধ হইতে হইবে না; তন্মধ্যস্থ স্থির সত্তা লক্ষ্য কর; অণুমধ্যস্থ পরমাণুর মত অসংক্ষুব্ধ, স্থির, স্বাধীন হইবে।

ইহাই যোগের আসন। এইরূপে মাতৃঅঙ্কে বসিতে না পারিলে সাধনা হয় না। এইরূপে অবিচল, রোধহীন, ক্লেশশূন্য সুখাসন করিতে না পারিলে মাতৃস্নেহের রসাস্বাদ করিতে সক্ষম হওয়া যায় না। চলিতে ফিরিতে, বসিতে দাঁড়াইতে মায়ের কোল হারাইও না; জানিও,ইহাই সিদ্ধাসন। অন্য শারীরিক অঙ্গাদির সংযমনাত্মক যে সমস্ত পদ্মাসন প্রভৃতির কথা জান, তাহা এরূপ ভাবযুক্ত না হইলে অঙ্গ-পীড়ন মাত্র। যাহাতে স্থিরভাবে ও সুখে অবস্থান করা যায়, তাহাই যোগশাস্ত্রে আসন নামে অভিহিত। তুমি এইরূপ সুখাসন পাতিতে যত্নবান্ হও—স্থির হইবে।

তাহা হইলে মোটের উপর আমরা এই পাইলাম যে, এক বিরাট্ স্পন্দনশক্তি অনন্ত দিক্, অনন্ত কাল ব্যাপিয়া স্পন্দিত হইতেছে ও আমরা সেই স্পন্দন-সমুদ্রে নিমজ্জিত। তাহারই ঘাতপ্রতিঘাত শব্দ-স্পর্শাদি প্রপঞ্চরূপে প্রকাশ পায় ও অনুভূত হয়। এই সকল অনুভূতিই সুখদুঃখের কারণ; এবং এ সকল অনুভূতিতে তিতিক্ষা অভ্যস্ত হইলে, আর ইহারা সুখদুঃখপ্রদ হইতে পারে না। আর—

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫

হে পুরুষর্ষভ! এতে সমদুঃখসুখং ধীরং যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি, সঃ হি অমৃতত্বায় কল্পতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সকল স্পন্দন বা মাত্রা সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন যে ধীর পুরুষকে ব্যথা দিতে না পারে, তিনিই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

যৌগিক অর্থ।—যখন আত্মা এই সকল স্পন্দন পূর্ব্বোক্তরূপে বিনা প্রতিরোধে সহ্য করিতে পারেন, অর্থাৎ যিনি বিরাট্ স্পন্দনমধ্যে আপনাকে অথবা পরমাত্মার স্থির সত্তাকে চিন্তা করিতে পারেন, তাঁহার জড় পদার্থের মধ্যস্থ পরমাণুর মত স্বাধীনতা প্রাপ্তি হয় বা স্পন্দন-তরঙ্গ বিনা প্রতিরোধে তাঁহার উপর দিয়া

প্রবাহিত হইয়া যায়, তাহাদের আগম নিগম বা উৎপত্তি বিনাশ তাঁহার অনুভবে আর আইসে না। তখনই তিনি ধীর পুরুষশ্রেষ্ঠ নামে অভিহিত হয়েন এবং তখন সে পুরুষ আপনার অমরত্ব অনুভবে সমর্থ হন। অমরত্ব জ্ঞান আসিবার কারণ কি? মৃত্যুজ্ঞান পূর্ব্বাবস্থায় থাকে বলিয়া। মৃত্যুভয়ে অহর্নিশ আমরা ভীত বলিয়া সর্ব্বপ্রথম যখন স্বাধীন ভাব উন্মেষিত হয়, নিত্য অস্তিত্বের অনির্ব্বচনীয় আস্বাদ সর্ব্বপ্রথম যখন বিরাটে সংযুক্ত হইয়া অথবা তন্মধ্যস্থ স্থিরসত্তা লক্ষ্য করিয়া জীব অনুভব করে, তখন মৃত্যু আশঙ্কার কবল হইতে মুক্ত হয় বলিয়া এবং ভীতিবন্ধন সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় বলিয়া উহারই উন্মোচন অনুভূতিটী প্রাণকে আবৃত করে। বিরাট্ স্পন্দনে সংযুক্ত হইয়া, বিরাট্ তরঙ্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যখন জীব নিজের অবিদ্যার স্পন্দন হারাইয়া ফেলে, তখন বুঝিতে পারে, বস্তুতঃ এ সব অনুভূতি তাহার স্বরূপ নহে, তাহার উপর আগত রঞ্জনা মাত্র। কল্পনায় নিজ অবিদ্যা জন্মজন্মান্তর ধরিয়া রচনা করিয়া, বিরাটের স্পন্দনে প্রতিঘাত প্রদান করিয়া, ঐরূপ স্পন্দনে আপনাকে অনুভব করিতেছিল।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

অসতঃ ভাবঃ ন বিদ্যতে, সতঃ অভাবঃ ন বিদ্যতে; তত্ত্বদর্শিভিঃ তু অনয়োঃ উভয়োঃ অপি অন্তঃ দৃষ্টঃ।

ব্যবহারিক অর্থ।—অসৎ ভাব বা বস্তু নাই অথবা অসতের উৎপত্তি নাই,এবং নিত্য ভাব বা নিত্য বস্তুর কখনও অভাব বা লোপ হয় না। তত্ত্বদর্শিগণ এই উভয়ের যাহা অন্ত, তাহা দেখিয়াছেন।

যৌগিক অর্থ।—তত্ত্বদর্শী হইলে ঐ স্পন্দনসকল দেখিতে ও তাহার বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হওয়া যায় ও তখন বুঝিতে পারা যায়, যেমন সমুদ্রে ও তরঙ্গে কোনও বিভেদ নাই, তদ্রূপ এ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ও ব্রহ্মে বস্তুতঃ কোন পার্থক্য নাই। ব্রহ্মই ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিলক্ষিত হইতেছেন, ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া স্বতন্ত্র কোন জিনিষ নাই। কনকবলয়ে যেমন স্বর্ণ ছাড়া অন্য কোন পদার্থ নাই, তদ্রূপ এ নিত্য সত্য অস্তিত্ব সর্ব্বত্র বর্ত্তমান; বলয় ভাঙ্গিয়া হার, হার ভাঙ্গিয়া নূপুর করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে স্বর্ণের সত্তা যেমন লোপ হয় না, অথবা তাহার আকারগ্রহণ-শক্তি লুপ্ত

হয় না, তদ্রূপ এক নিত্য চৈতন্যময় অস্তিত্ব নানারূপে প্রতিবিম্বিত হইলেও উহার নিত্যত্বের কোনও বিকার ঘটে না।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধীরত্বপ্রাপ্তি হইলে এ বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলকে এইরূপে নিত্য চৈতন্যময় অস্তিত্ব বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। আর তৎপূর্ব্বে বুঝিতে পারা যায়, এই যে নানারূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই—জগতের এই যে বিচিত্র পদার্থসকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয় এবং আবার পরিবর্ত্তিত ও নূতন পরিণাম প্রাপ্ত হয়, উহাতে বস্তুতঃ সেই নিত্য সত্তার কোন অভাব ঘটে না। প্রতি পদার্থে প্রথমে সাধারণতঃ দুইটী জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়—একটী নিত্য দ্রষ্টা ও একটী শক্তি, দৃশ্য বা নিত্যা প্রকৃতি।

মনে কর, একটী পুষ্প রহিয়াছে। সেই পুষ্পটী মনুষ্যচক্ষে পুষ্প বলিয়া, পশুর প্রাণে আহার্য্য বলিয়া এবং যাঁহারা কখনও পুষ্প দেখেন নাই, তাঁহাদের চক্ষে একটী নূতন জিনিষ বলিয়া প্রতিফলিত হইতেছে। এই বিভিন্ন অনুভূতিগুলি সে পুষ্পটীর ধর্ম্ম নহে, ওগুলি দর্শকদিগের গুণতারতম্য মাত্র। একই পুষ্প হইতে এক প্রকার স্পন্দন চারি দিকে স্ফুরিত হইতেছে এবং সেই স্পন্দন-তরঙ্গ নানা পদার্থে নানা রূপের তরঙ্গ বা অনুভূতি উৎপাদন করিতেছে মাত্র। এই বিভিন্ন অনুভূতি-গুলি বাদ দিলে বস্তুতঃ সেখানে থাকে কি? সেখানে আমরা দুইটী জিনিষ দেখিতে পাই,—প্রথম, কিছু একটা আছে, এইটী হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে; দ্বিতীয়, সেই অস্তিত্ব কোন প্রকারে আমাদের অনুভূতিতে আসিতেছে, এইটুকু বুঝিতে পারি। এই দুইটী সাধারণ ধর্ম্ম প্রত্যেক পদার্থে পরিলক্ষিত হয়। একটী অস্তিত্ব এবং অন্যটী তাহার স্পন্দন, ক্রিয়া বা শক্তি, যাহার দ্বারা উহা চারি ধারে অনুভূতিরূপ তরঙ্গ-ভঙ্গ রচনা করে। যদি তরঙ্গ রচনা না করিত, তাহা হইলে উহার অস্তিত্ব আমাদের উপলব্ধিতেই আসিত না। যতক্ষণ ঐরূপে উহা হইতে তরঙ্গ রচিত হইবে, ততক্ষণ আমরা উহার অস্তিত্ব ভুলিতে পারিব না। এমন অবস্থায় ক্রমশঃ ঐ ফুলটী গিয়া পড়িতে পারে, যখন উহা আর আমাদিগের মত জীবের হৃদয়ে তরঙ্গাভিঘাত বা অনুভূতি জন্মাইতে না পারে; কিন্তু আমাদিগের অপেক্ষা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণে উহার তরঙ্গানুভূতি জন্মাইতে বা উহার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষীভূত করাইতে সমর্থ হয়। ফুলটী শুকাইয়া গেলে আমাদিগের মত সাধারণ জীব মনে করে, উহার অস্তিত্ব বুঝি আর নাই; কিন্তু আমরা সেরূপ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট হইলে বা আমাদিগের ধীরত্ব লাভ হইলে, উহার স্ফুটিত অবস্থার ন্যায় বুঝিতে পারিতাম যে, উহার

অস্তিত্ব যেমন ছিল, তেমনই আছে। তরঙ্গভঙ্গ বা স্পন্দন উহা হইতে পূর্ব্বে যেরূপ স্ফুরিত হইতেছিল, তেমনই স্ফুরিত হইতেছে না, শুধু সেই তরঙ্গের ইতরবিশেষ হইয়াছে মাত্র—লয়াকারে রহিয়াছে।

প্রতি পদার্থ ধীরত্ব লাভের পর ঐরূপ দুই ভাগে বিভক্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়;—একটী অস্তিত্ব ও তাহার শক্তি এবং এই অস্তিত্বটীর দ্রষ্টা এক চেতনা, ইহা বুঝিয়া লইলেই আমাদের সাংখ্য বুঝা হয়।

যাহা হউক, ঐ ফুলটীর বিশ্লেষণ হইতে আমরা এই পাইলাম যে, উহার এক-কালীন বিনাশ কখনও হইতে পারে না—উহার অস্তিত্বের কখনও অপলাপ হয় না; এবং উহা যে কখনও আমাদিগের অনুভূতিতে আসে এবং কখনও আসে না, উহা ঐ ফুলটীর ধর্ম্ম নহে—আমাদিগের ধর্ম্ম। উহার ভিতর একটী জিনিষের শুধু অপলাপ হয় মাত্র; সেটী মাত্রা বা স্পন্দনের পরিমাণ ও স্পর্শভেদ। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিমাণের এমন পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং উহাই মৃত্যু বা দেহান্তরপ্রাপ্তি, তাহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি।

স্থূলতঃ আমরা দুইটী জিনিষ পাইলাম; এবং এই দুইটী জিনিষ লইয়া আমা-দিগকে সাংখ্যস্তর বুঝিতে হইবে। সাংখ্যস্তর ভেদ হইলে বা ব্রহ্মস্তরে উপস্থিত হইলে, তবে চিৎ ও চিতি-শক্তির একত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। এখন উহা বুঝাইতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

সে দুইটী জিনিষ পূর্ব্বে বলিয়াছি; একটী নিত্য অস্তিত্ব, উহার স্পন্দন, শক্তি বা গুণ বা দেহ এবং দ্বিতীয় তাহার দ্রষ্টা। আর বুঝিয়াছি যে, ঐ শক্তির বা দেহের মাত্রার যেরূপই পরিণাম হউক না কেন, উহাদিগের এককালীন লোপ হয় না। এই অস্তিত্ব ও শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বপদার্থের, ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে হরি হর ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলকার সাধারণ সম্পত্তি। এই দুইটী-শূন্য পদার্থ হইতে পারে না—এই দুইটী-শূন্য ভাব হইতে পারে না।

এই যে চেতনা, ইনি ঐ শক্তির কোলেই অভিব্যক্ত হন। যেখানে ঐ শক্তি যতটুকু পরিমাণে স্ফুটিত, চেতনাও সেখানে সেই পরিমাণে অভিব্যক্ত। চেতনের অস্তিত্বকে ফুটাইবার জন্যই যেন শক্তিসত্তার প্রকাশ বা আবির্ভাব। যেমন জগদাদি পদার্থনিচয় না থাকিলে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইতে পায় না ও আলোক বলিয়া কোন পদার্থ বুঝিতে পারা যায় না, তদ্রূপ এই শক্তির রঞ্জনা না পাইলে অণু চেতন বা জীব স্বীয় অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে

না। চিন্ময়ী শক্তি মাতৃস্বরূপিণী হইয়া এই অস্তিত্বকে ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলেন।

মনে থাকে যেন, আমরা সাংখ্যস্তরের কথা বলিতেছি। সাংখ্যস্তরে সাধারণতঃ আত্মা বহু বলিয়া বিবেচিত হয়। আত্মার একত্ব উপলব্ধি সাংখ্যস্তরে হয় না; সুতরাং যতক্ষণ আত্মার একত্বজ্ঞান জীবের না আসে, ততক্ষণ তাহাকে সাংখ্য-স্তরীয় জীব বলিয়া বুঝিতে হয়; এবং ততক্ষণ প্রতি আত্মা মাতৃক্রোড়ে শিশুর মত ঐ পরমাত্মরূপিণী শক্তির ক্রোড়ে অনুমিত হইতে থাকে। তার পর চিন্ময়ী মা আমার ক্রমশঃ বহুত্ব ঘুচাইয়া, এক অদ্বিতীয়ারূপে প্রতিফলিত হয়েন এবং মাতাপুত্র এক হইয়া যায়—আত্মা ও শক্তি, দুই বিভিন্ন ভাব বিলুপ্ত করিয়া দিয়া, একত্বের প্রবল প্রবাহে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিমগ্ন করিয়া দেন।

শক্তির সহিত জীবের এই মাতাপুত্র সম্বন্ধ মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। স্তন্যপায়ী শিশুর মত এই বিশ্বমাতার স্তনপান করিতে করিতে নিজ বিশাল বিভু অস্তিত্ব উপলব্ধির দিকে জীব অগ্রসর হইতেছে। শিশু সন্তান যেমন মাতৃ-রক্তকে স্তনদুগ্ধাকারে পাইয়া নিজ রক্তে পরিণত করিয়া লয়, সেইরূপ আমরাও শক্তিময়ী জননীর শক্তি আহরণ করিয়া, শক্তি ও নিজ অস্তিত্ব এই দুয়ে মিশাইয়া এক করিয়া ফেলিতেছি। আগে এই শক্তিকে নিত্য, অপরিণামী, চিন্ময়ী বলিয়া পরিজ্ঞাত হও, তার পর নিজের নিত্যত্ব বুঝিতে পারিবে। চন্দ্র সূর্য্য,আকাশ তারকা, জগৎ,বৃক্ষ লতা,জীব জড়, যাহা কিছু দেখিতে পাও,সর্ব্বত্র দেখ,এক নিত্যা, অপরি-ণামী চিন্ময়ী শক্তির ক্রোড়ে এক নিত্য চিৎসত্তা প্রতিফলিত। বস্তুর মাত্র বস্তুত্ব ভুলিয়া যাও, শুধু এক অপূর্ব্ব বিশ্বমাতার বিশ্বমূর্ত্তি পরিদর্শন কর। আমি বৃক্ষে বৃক্ষ দেখি না; দেখি, এক অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী স্নেহভারনম্রা জননী বৃক্ষরূপ সন্তান ক্রোড়ে দণ্ডায়মানা। আমি মনুষ্যে মনুষ্য দেখি না; দেখি, এক বিশাল শক্তিময়ী, স্নেহের আধার মা, মানব শিশুমুখে স্তন ঠেকাইয়া দণ্ডায়মানা। আমি সূর্য্যে সূর্য্য দেখি না; দেখি, এক অনন্ত স্নেহময়ী মা অনন্ত শক্তিধারায় সন্তানকুলকে নিমগ্ন করিয়া দণ্ডায়মানা। ধূলিকণা হইতে দেবতালোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সর্ব্ব অণুতে আমি এইরূপ এক স্নেহময়ী জননীকে সন্তান ক্রোড়ে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পাই। তোমরা যদি মাকে দেখিতে চাহ, তবে বস্তুর বস্তুত্ব ভুলিয়া, তাহার অভ্যন্তরস্থ এক নিত্য অপরিণামী মূর্ত্তি দর্শন কর; দেখিবে—অসৎ বলিয়া কিছু নাই, সতের কোথাও প্রত্যবায় হয় না; অনিত্য মাত্রাস্পর্শ এই উভয় সতের পরশপ্রবাহ।

এবং সেই স্পর্শানুসারে আপনাকে মাত্র তদ্বৎ বলিয়া বোধ করা, ইহাই অনুপ্রবিষ্ট জীব বা অণু আত্মার অবিদ্যা। ওই অবিদ্যাই সতে গঠিত অসৎরূপা। অসৎ বস্তুতঃ অসৎ নহে। ইহাই সৎ ও অসৎ কল্পনার চরম সিদ্ধান্ত।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭

যেন ইদং সর্ব্বং ততং, তং তু অবিনাশি বিদ্ধি; কশ্চিৎ অস্য অব্যয়স্য বিনাশং কর্ত্তুং ন অর্হতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—এইরূপে যিনি এই সকল ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া জানিও। সেই অব্যয়ের কেহ বিনাশ করিতে পারে না।

যৌগিক অর্থ।—ঐ যে মাতৃমূর্ত্তির কথা বলিলাম, উহার কুত্রাপি অপলাপ হয় না। সমষ্টিভাবে অথবা ব্যষ্টিভাবে, যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, যাহার উপর চিন্তা পরিচালনা কর, সর্ব্বত্র এই সর্ব্বব্যাপিনী মহামূর্ত্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি হইবে। বস্তু উৎপন্ন হয়, থাকে, আবার লোপ হইয়া যায়, দেহ গঠিত হয়, পরিপুষ্ট হয় ও বিলয় হইয়া যায়; কিন্তু এ অস্তিত্বের কথনও পরিবর্ত্তন ঘটে না। সুকোমল শয্যায় শায়িত হইয়া, স্বপ্নে যেমন জীব শরশয্যায় শায়িত আছি ভাবিয়া যন্ত্রণায় অধীর হয়, সেই সুকোমল শয্যাই তীক্ষ্ণ শররাশির ন্যায় অঙ্গে বিদ্ধ হইতেছে বলিয়া যেমন সে অনুভব করে, তদ্রূপ মাতৃঅঙ্গের সুকোমল আলিঙ্গনে বদ্ধ থাকিয়াও আমরা উহাকে তীক্ষ্ণ শৃঙ্খলের নিপীড়ন বলিয়া ভাবিতেছি—স্নেহের পীড়নকে কণ্টকশয্যা বলিয়া কাতর হইতেছি—মাতৃবক্ষকে অসিশয্যা ভাবিয়া, আপনাকে বিকলাঙ্গ অনুভব করিতেছি—খণ্ডমুণ্ড অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া।

তবে কিসের বিনাশ হয়? বিনাশ বলি কাহাকে? পরিবর্ত্তনই বিনাশ শব্দে অভিহিত। স্পন্দনমাত্রার ইতরবিশেষই বিনাশ। স্পন্দনের মাত্রাই দেহ বা আধার-রূপে পরিকল্পিত ও উহারই পরিবর্ত্তন মৃত্যু বা দেহান্তর নামে অভিহিত, ইহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ সৌর কররাশি যেমন স্পন্দনানুক্রমে মরীচিকারূপে পরিদৃষ্ট হয়, উহাকে সত্যও বলা যায় না, অসত্যও বলা যায় না, নিত্যের একটী অনিত্য রূপ বলিতে হয়; তদ্রূপ অনুভূতিকে সত্য নহে, অসত্যও নহে, নিত্যের একটী অনিত্য রূপ বুঝিতে হইবে। মরীচিকার অপলাপে যেমন সৌর করের অপলাপ হয় না, তদ্রূপ অবিদ্যার অপলাপে উহার উপাদান নিত্য সর্ব্বব্যাপী পদার্থের অপলাপ হইতে পারে না।

কিন্তু অনুভূতিকে এরূপ মরীচিকাবৎ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে সাধারণ লোক পারে না। জ্ঞানের সাংখ্যস্তর অতিক্রম না করিলে, এরূপ ধারণা আনিতে পারা যায় না। যাহা কিছু দেখিতেছি প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভব করিতেছি এ সমস্তের আত্মা হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। ইহা হইল চরম জ্ঞানের কথা—জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় অনুভাব্য। এই জ্ঞানে পৌঁছিতে হইলে, আগে অন্যান্য প্রকার জ্ঞানের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া যে জ্ঞানপন্থা অবলম্বন করিয়া জীবের ধারণাশক্তি ধাবিত হয়, সেই সমস্ত পন্থাটীকে সাধারণতঃ ছয়টী বা সাতটী ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়; এবং সেই এক এক ভাগের আদর্শস্বরূপ এক একখানি দর্শনশাস্ত্র হিন্দুর ধর্ম্মজগৎকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা এইখানে সেই ষড়্‌দর্শনের একটু সংক্ষেপে আলোচনা করিব। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, আমাদিগের ষড়্‌দর্শনের ভিতর যে মতভেদ দৃষ্ট হয়, উহা বস্তুতঃ সোপানশ্রেণীর সোপানে সোপানে যেরূপ ভেদ, তদ্রূপ মাত্র। অর্থাৎ যেমন কোন উচ্চ স্থানে আরোহণের জন্য সোপানশ্রেণী বিনির্ম্মিত হয়, এবং সে শ্রেণীর প্রত্যেক সোপানই সেই উচ্চ আরোহণের লক্ষ্যে গঠিত—প্রত্যেক সোপানেরই লক্ষ্য উর্দ্ধে আরোহণ, এবং প্রত্যেক সোপানই একটী সাধারণ তলে সম্বদ্ধভাবে গঠিত, অথচ যেমন একটী হইতে আর একটী সমধিক উচ্চ, এই দর্শনশাস্ত্রসমূহও তদ্রূপ। দর্শনশাস্ত্র-প্রণেতারা যিনি যে দিক্ দিয়া অনুভব করিয়াছেন বা দেখিয়াছেন, তিনি ততটুকু মাত্র লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা স্ব স্ব দর্শন অনুযায়ী মত—বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রজ্ঞান স্থাপন করিয়া গিয়াছেন সত্য; কিন্তু কার্য্যতঃ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, তাঁহাদিগের দর্শনের ক্রম হিসাবে ভগবান্ যেন তাঁহাদিগের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া, জ্ঞানটীকে এইরূপ ছয়টী স্তরে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন; অথবা একটী ছয়-সোপানবিশিষ্ট শ্রেণী নিস্মাণ করিয়া দিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্র-প্রণেতারা নিজ নিজ ইচ্ছায় স্ব স্ব জ্ঞানকে সাধারণের উপকারার্থ উচ্চ ও নিম্ন ক্রম হিসাবে সাজাইয়া গিয়াছেন, তাহা বলিতেছি না। তবে কোন এক অদৃষ্ট মহাশক্তি যেন তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া সাধারণের কল্যাণ কামনায় ঐরূপ সোপানশ্রেণী গঠিত করাইয়াছেন, এইরূপ মনে হয়।

আমরা এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি; সুতরাং এই স্থলে জ্ঞানেচ্ছুদিগের সুবিধার্থ সে ছয়খানি দর্শনশাস্ত্রের সার মর্ম্ম

লিপিবদ্ধ করিতেছি; এবং উহা হইতেই প্রতিপন্ন হইবে, আমি যে শাস্ত্রগুলিকে উচ্চ নিম্ন ক্রমানুসারে সজ্জিত বলিয়াছি, তাহা অসঙ্গত নহে।

প্রধানতঃ আমাদিগের ছয়খানি দর্শনশাস্ত্র আছে; তাহাদিগের নাম,—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা। আমি এক এক-খানির ইতিহাস বা মর্ম্ম ভিন্ন ভিন্নরূপে নিম্নে দিতেছি ও তাহাদিগের সহিত সাধা-রণ জীবপ্রবাহের গতির কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা দেখাইতেছি।

আর একটী কথা। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, জীবকে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিতে যে জ্ঞানগতির ভিতর দিয়া যাইতে হয়, তাহাই গীতা। সুতরাং দর্শন-শাস্ত্রগুলিকে গীতারই অংশবিশেষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ স্থলে অনেকে মনে করিতে পারেন, গীতা ভগবন্মুখে ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে দর্শনশাস্ত্রগুলি রচিত হইয়াছে; সুতরাং ও কথা বলা ভ্রান্তিমূলক। কিন্তু আমি গীতাকে অপৌরুষেয় বলিয়া জানি। গীতা অনাদিকাল সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কে অতিক্রম করিয়াও বিরাজিত। নিরাকার আত্মাকে সাকারত্ব লাভ করিতে হইলে, যেরূপ স্তরে স্তরে কোষসকল নির্ম্মাণ করিয়া সাকারত্ব লাভ করিতে হয়, সেই অপৌরুষেয় জ্ঞান বা গীতারূপী পরমাত্মা সেইরূপে কোষের পর কোষ গঠিত করিয়া লইয়া বা এক এক কোষ অবয়বত্ব লাভ করিয়া সর্ব্বশেষ ঐ ছয়খানি দর্শনরূপ ষাট্‌কৌষিক দেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূত বা শ্রীকৃষ্ণমুখে ব্যক্ত হইয়াছিলেন। ছয়খানি দর্শনশাস্ত্র যেন উহার ছয়টী কোষ; অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রকে লইয়া গীতা নহে, গীতাকে লইয়া দর্শনশাস্ত্র।

খুলিয়া বলি। সাধারণের এইরূপ ধারণা, যেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত দর্শনশাস্ত্র একত্র সংগ্রহ করিয়া, তাহার বিচার ও বিশ্লেষণপূর্ব্বক সার মর্ম্মটুকু লইয়া এবং নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিয়া গীতা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা নাস্তিকগণের সহিত তুলনীয়। নাস্তিকেরা যেমন বলিয়া থাকেন, দেহ ও তদুপাদানসকল একত্রীভূত হইয়া বা ভূতসকলের সংমিশ্রণে চৈতন্যরূপ একটী পদার্থ বিকশিত হইয়া উঠে; চৈতন্য দেহের কারণ নহে—দেহ বা ভূতসমষ্টিই চৈতন্যের কারণ, উহাদিগের মতও তদ্রূপ। বস্তুতঃ আস্তিক্যবুদ্ধিতে যেমন বুঝিতে পারা যায় যে, দেহ চৈতন্যের কারণ নহে, চৈতন্যই দেহের কারণ; গীতা সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। কালে গীতা অভিব্যক্তি লাভের জন্য বা জগতে প্রকাশ হইবার জন্য পূর্ব্ব হইতে দর্শন-শাস্ত্রাকারে গীতা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। দর্শনশাস্ত্রাদি গীতারূপ একটী চৈতন্যের জনক নহে, গীতাচৈতন্যই উক্ত শাস্ত্রসকলের কারণ। অর্থাৎ আত্মাকে

বুঝিতে হইলে যেমন তাহার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ বুঝিতে হয় বা জীবকে স্ব উপাধিতে প্রবেশ করিতে হইলে যেমন অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় প্রভৃতি কোষে সক্রিয় অবস্থা লাভ করিতে হয় ও পরে আনন্দময় কোষে সে যেমন জাগ্রত হয়, তদ্রূপ গীতারূপ জ্ঞানসত্তায় পৌঁছিতে হইলে, ছয়খানি দর্শনশাস্ত্রোক্ত জ্ঞানশ্রেণীর মর্ম্মের ভিতর দিয়া জীবের জ্ঞান ধাবিত হয়; অথবা জীবের গীতারূপ জ্ঞানোন্মেষণ, উক্ত ছয়খানি দর্শনশাস্ত্রোক্ত জ্ঞানমর্ম্মের ভিতর দিয়া স্বতঃই তাহার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে প্রধাবিত হইয়া থাকে।

আমি কোষ হিসাবে তুলনা করিয়া দেখিতেছি। গীতারূপ পরমাত্মার ন্যায়দর্শন যেন—অন্নময় কোষ, বৈশেষিক—প্রাণময় কোষ, পূর্ব্বমীমাংসা—মনোময় কোষ, সাংখ্য—জ্ঞানময় বা বুদ্ধিময় কোষ, পাতঞ্জল—বিজ্ঞানময় কোষ এবং উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন—আনন্দময় কোষ। এই সাংখ্য ও উত্তরমীমাংসার মধ্যস্থলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামক একটি মত স্থাপিত হইয়াছে, সে কথা পরে বলিব। দর্শনশাস্ত্রগুলি গীতার কোষ বা দেহ—গীতা আত্মা।

প্রথমতঃ ন্যায়দর্শনের সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত দিতেছি। ন্যায়দর্শন—মহর্ষি গৌতম ইহার প্রণেতা। প্রধান মত—সংসার দুঃখময়; এই দুঃখের নাশই মুক্তি। তর্ক ইহার প্রধান অঙ্গ। তর্কের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমাদিগের কর্ম্মফলদাতারূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

সাধারণ মনুষ্যজ্ঞান এইরূপে প্রথমতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং তর্কাদির দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করে।

দ্বিতীয়—বৈশেষিকদর্শন। ইহা মহর্ষি কণাদপ্রণীত। ইহার সার মর্ম্ম—সংসার দুঃখময়। সেই দুঃখের একান্ত নিবৃত্তিই জীবের লক্ষ্য। তত্ত্বজ্ঞানে এই নিবৃত্তি লাভ হইতে পারে। ইহা ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, দিক্, কাল, আত্মা, মনঃ, এই সমস্তকে নিত্য পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু, এইগুলি শরীর বা ইন্দ্রিয়াদিরূপে অনিত্য, কিন্তু পরমাণুরূপে নিত্য সত্য। মহর্ষি কণাদের মতে পরমাণু-সকল নিত্য ও অকারণ। বিরাট্ ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঐ পরমাণুসকল স্পন্দিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডসকল উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মাদি আবির্ভূত হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হয়েন।

ইহা সাধারণ জীবের জ্ঞানপ্রবাহের দ্বিতীয় স্তর। জীব এই প্রত্যক্ষ জগৎসকলের অহর্নিশ পরিবর্ত্তন ও পরিণাম দেখিয়া দ্রব্যসকলের বিশ্লেষণ করিয়া

দেখিতে থাকে ও সকল পদার্থের মধ্যেই পরমাণুসকল প্রত্যক্ষ করে। জীবের সাধারণ জ্ঞান পদার্থবিশ্লেষণের ভিতর ঢুকিয়া এইরূপ ধারণা করে, যেন পরমাণু-সকল নিত্য স্বতন্ত্র পদার্থ এবং ঈশ্বর বলিয়া এক স্বতন্ত্র মহাপুরুষ যেন স্বেচ্ছায় সেই পরমাণুসকলকে এক, দুই, তিন ইত্যাদিরূপে সংযুক্ত করিয়া বিশ্বসকল রচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রথম স্তরে জীব বিচার-বিতর্কের দ্বারা ঈশ্বরের যেন একটী স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুমান ভিন্ন প্রত্যক্ষভাবে ফুটাইয়া লইতে পারে নাই, এই দ্বিতীয় স্তরে সে স্বাতন্ত্র্য স্ফুটতর হয়। পরমাণুতত্ত্ব বর্ণনই এ দর্শনের মূল উদ্দেশ্য।

তৃতীয়—পূর্ব্বমীমাংসা। মহর্ষি জৈমিনি ইহার প্রণেতা। পূর্ব্বমীমাংসার বা মীমাংসাদর্শনের মত, জ্ঞানের দ্বারা দুঃখ-নিবৃত্তি হয় না, কর্ম্মের দ্বারা করিতে হয়। দুঃখের নিবৃত্তি ও অনন্ত সুখের প্রাপ্তি কর্ম্মের দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। বেদই নিত্য পদার্থ, অভ্রান্ত, অপৌরুষেয়, বৈদিক কর্ম্মসকলই দুঃখনিবৃত্তি ও সুখোৎপত্তির হেতু। সেই বেদোক্ত কর্ম্মসকল যথানির্দ্দিষ্ট উপায়ে করিতে পারিলে, অতুল সুখের অধিকারী হইতে পারা যায়। ইহাঁরা বেদকে প্রধান স্থান দিয়াছেন অথচ বেদ ঈশ্বরের কৃত বলিয়া কোথাও অঙ্গীকার করেন নাই। ঈশ্বরের সহিত এ মীমাংসা-দর্শনের বিশেষ সম্বন্ধই নাই। কর্ম্মই প্রধান, কর্ম্মের দ্বারাই জীব দুঃখ ও সুখ লাভ করে, কর্ম্মানুসারেই জীবের গতি সম্বদ্ধ হয়। এই জন্য মীমাংসকদিগকে সাধারণতঃ নিরীশ্বরবাদী বলা হয়। কিন্তু বস্তুতঃ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মহিমা বর্ণনই ইহার লক্ষ্য।

সাধারণ জীব দ্বিতীয়স্তরীয় জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার পর কর্ম্মের দিকে তাহাদিগের লক্ষ্য পড়ে। অর্থাৎ মনে এইরূপ ধারণা আসে, জগতে যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই কর্ম্মের পরিণামরূপে অবস্থিত। আহার না করিলে ক্ষুধানিবৃত্তি এবং আহারের তৃপ্তি অনুভব হইতে কখনও দেখা যায় না। সুতরাং কর্ম্মই সব; কর্ম্ম-প্রবাহই চারি ধারে বিস্তৃত; কর্ম্মেরই ফলস্বরূপ সকল জিনিষ বিদ্যমান। তবে বেদ-বিহিত কর্ম্মাদি করিলে আত্যন্তিক সুখলাভ না হইবে কেন? জ্ঞানানুভূতিতে ত কাহারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে দেখিতে পাই না। কোথাও যাইতে হইলে, 'গিয়াছি' এইরূপ অনুভব করিলে ত যাওয়া হয় না—কিছু দেখিতে চাহিলে চক্ষু না চাহিয়া প্রত্যক্ষ হইল, এরূপ অনুভূতি ত হয় না। তবে জ্ঞানে সুখোদয় কি করিয়া হইবে? এইরূপে এই তৃতীয় স্তরে জীবের কর্ম্মের উপর একান্ত লক্ষ্য পতিত হয়। প্রবল আসক্তির সহিত জীব—যজ্ঞ, মন্ত্রসাধনা ইত্যাদির দিকে ধাবিত হয়। ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য থাকে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কার্য্যতঃ জীব ঐ

অবস্থায় ঈশ্বরনির্ভরতার আস্বাদ না পাইয়া কর্ম্মনির্ভরতায় মত্ত হয়। আত্যন্তিক সুখ-চরিতার্থতার দিকে লক্ষ্য করিয়া এবং সর্ব্বত্র কর্ম্মের ফল দর্শন করিয়া কর্ম্মই তাহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠে।

মীমাংসকেরা দেবতাদিগকে মন্ত্রাত্মক বলেন। এই তৃতীয় শ্রেণীর জীব মন্ত্র-শক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। সাধনোন্মেষণের দ্বিতীয় স্তরে জড় পরমাণু বা কতকগুলি দ্রব্য ও ঈশ্বর, এইরূপ দর্শন করিয়া, পরে মন্ত্র ও দ্রব্যশক্তির সমাবেশ দেখিতে দেখিতে যেন চিৎরাজ্যমুখী হয়।

চতুর্থ—সাংখ্যদর্শন বা নিরীশ্বর সাংখ্য। মহর্ষি কপিল ইহার প্রণেতা। ইহারও সার মর্ম্ম দুঃখবাদ। দুঃখের নিবৃত্তিই জীবের লক্ষ্য। সে দুঃখ ত্রিবিধ; আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। দুঃখের সমাপ্তির উপায়—বিবেক বা প্রকৃতি-পুরুষ-ভেদ। সাংখ্যের মত—কর্ম্মই বন্ধনের হেতু,তত্ত্বদর্শন হইলে কর্ম্ম আর ফলপ্রদ হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ দুঃখ ত্রিগুণা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি নিত্যা, জড়া, আদি অন্ত-হীনা। ইহাই ব্যক্ত হইয়া জগৎরূপে প্রকাশ পায়। ঐ মূলা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বিকারসকল সৃষ্টি স্থিতি ও নাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। উক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশ, এই তিন ধর্ম্ম। প্রকৃতি স্বতই সমস্ত সৃষ্টি করে; কিন্তু সে সৃষ্টি নিজের জন্য নহে, আত্মার জন্য, আত্মারই ভোগ ও মোক্ষ সাধনের জন্য প্রকৃতির পরিণাম সংসাধিত হয়। সে চেতন আত্মা অপরিণামী, নির্ব্বিকার, অসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতি গুণময়ী—পুরুষ, আত্মা বা চৈতন্য নির্গুণ। ঈশ্বরত্ব আত্মার স্বরূপ নহে, সুতরাং আত্মা বহু। আত্মার যত দিন না প্রকৃতি হইতে স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি হয়, তত দিন সে পুরুষ বদ্ধ। ঐ চেতন পুরুষ, অচেতনা জাননশক্তিরূপা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া অহঙ্কার, বুদ্ধি, জ্ঞান, তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয়াদিরূপে সে প্রকৃতিকে পরিণমিত করে। পরিণত করিতে হয় না, প্রকৃতি আত্মার সংযোগে স্বতই পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকে ও তার পর পুরুষের মোক্ষ সাধন করিয়া দিয়া নিবৃত্ত হয়।

তৃতীয় স্তরীয় জীবের কর্ম্মের উপর একান্ত আসক্তি পড়িবার পর, তখন তাহারা কর্ম্ম বিশ্লেষণে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। দেখে, কর্ম্ম যদিও ফলদায়ী বটে, কিন্তু সে ফল চিরস্থায়ী নহে; কর্ম্মক্ষয়ে সে ফলও ক্ষয়িত হইয়া যায়। তখন তাহারা কর্ম্মের আদি কারণ নিরাকরণে যত্নবান্ হয়, এবং যে সকল কর্ম্ম ইচ্ছা না করিলেও আপনা হইতে সংসাধিত হইতেছে, আপনার দেহের সেই সকল

বৃত্তির উপর তাহাদিগের লক্ষ্য পড়ে। দেখে, বস্তুতঃ এই যে সমস্ত কর্ম্ম স্বতঃ সংসাধিত হইতেছে, ইহার কর্ত্তা কে? তখন কর্ম্মের কর্ত্তার দিকে লক্ষ্য পড়ে এবং গভীর চিন্তাশক্তিপ্রভাবে আত্মা ও প্রকৃতি, এই দুই ভাগে আপনাকে বিভক্ত করিয়া দেখিতে থাকে। দেখে, বস্তুতঃ আত্মা নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি বা জ্ঞানশক্তি-রূপ অংশ হইতে সমস্ত কার্য্য সূচিত ও অনুষ্ঠিত হইতেছে। এইরূপে তাহারা এ প্রকৃতির আদি অন্ত খুঁজিয়া পায় না, অথচ চারি ধারে কার্য্যসকলের ভিতর স্থির সত্তার অধিষ্ঠানত্ব দেখিতে পায়। অর্থাৎ শুদ্ধ জড়া প্রকৃতি হইতে এত সুশৃঙ্খলাময় বিজ্ঞানযুক্ত সৃষ্টি ও ক্রিয়া অসম্ভব বলিয়া তাহাদিগের মনে হয়। সুতরাং প্রকৃতির হস্তে সকল কর্তৃত্ব থাকিলেও চৈতন্যের সত্তা তাহাদিগের প্রাণে ধীরে ধীরে উদয় হইতে থাকে এবং তাহারা এ উভয়ের সংযোগই সৃষ্টি ও ক্রিয়ার মূল বলিয়া ধারণা করে। উভয়ের কর্তৃত্ব হইলে কার্য্য উভয় প্রকারের হইত, সুতরাং আত্মা কর্ত্তা হইয়াও নিষ্ক্রিয়রূপে তাহাদিগের হৃদয়ে উপলব্ধ হয়। এইরূপে তাহাদিগের ধারণা প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দুই ভাগে সীমাবদ্ধ হয়; এবং ব্রহ্মাণ্ডসকলকেও তাহারা হরি, হর, ব্রহ্মাদি শক্তিমান্ আত্মার শক্তির অভিব্যক্তি বলিয়া অনুভব করে।

অর্থাৎ কার্য্যতঃ তাহাদিগের জ্ঞান তর্কবিচার হইতে স্থূল জড় পরমাণুবাদে এবং তাহা হইতে স্থূল কর্ম্মবাদে পরিণত হইয়া, শেষ সূক্ষ্ম জড়শক্তি এবং জন্য ঈশ্বরবাদে ধীরে ধীরে পরিণত হয়। প্রকৃতি স্থূল অপরিচ্ছিন্না পরমাণু-সমুদ্রবৎ, এইরূপ ধারণা ছিল, তাহা হইতে ত্রিগুণা, সর্ব্বব্যাপিনী জ্ঞানশক্তি অথচ জড়া শক্তি বলিয়া প্রকৃতিকে তাহারা ধারণা করিয়া লয়। পূর্ব্ববৎ উহাই নিত্য প্রকৃতি বলিয়া বুঝিতে থাকে এবং স্থূল কর্ম্মসকল বিশ্লেষণ করিয়া অচেতনা প্রকৃতি হইতে এরূপ বিজ্ঞানসম্মত কার্য্য হইতে পারে না, এই অনুমান হইতে তাহারা খণ্ড খণ্ড চেতনাধিষ্ঠান দেখিতে পায়। এবং প্রতিক্ষেত্রে আত্মা ও প্রকৃতির সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন ফল দেখিয়া, প্রকৃতি হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে চাহে।

সাংখ্য নিরীশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু জন্য ঈশ্বরবাদ সাংখ্যে স্বীকৃত। দ্বিতীয় স্তরের পরমাণুতত্ত্ব এবং তৃতীয় স্তরের স্ব স্ব কর্ম্মের আধিপত্য বা নিজ নিজ স্বাধীনতা, এই দুই জ্ঞান মিশিয়া ও আরও বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম হইয়া জড় ও চেতনের সংযোগ ও বিভেদরূপ তত্ত্বের জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। দ্বিতীয় স্তরে দেখিয়াছিল, পরমাণুসকল এক ঈশ্বর বা কর্ত্তার ইচ্ছাধীন হইয়া এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিতেছে। তৃতীয় স্তরে দেখে, কর্ম্মসকলই ফলরূপে প্রকাশিত অর্থাৎ ফল কর্ম্মাধীন। সকলেই স্ব স্ব

কর্ম্মানুযায়ী অবস্থা লাভ করিতেছে। চতুর্থ স্তরে কর্ম্মাবধি সমস্তই প্রকৃতি নামক অংশে যুক্ত হইয়া যায়। অর্থাৎ সমস্তই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত, এইরূপ অনুভব হয় এবং ঐ "স্ব স্ব বা নিজ নিজ কর্ম্ম" এই জ্ঞানটী হইতে নিষ্ক্রিয় খণ্ড আত্মার উপলব্ধি আসিয়া পড়ে।

কিন্তু কার্য্যতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব এইখান হইতে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এই দ্বৈতবাদকে গৌণরূপে ঈশ্বরের কল্পিত বিশ্লেষণ বা বিভাগকরণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যাহা হউক, জ্ঞান এই অবস্থায় উন্নত হইলে, আত্মদর্শনের দিকে জীবের লক্ষ্য ধাবিত হয়। অর্থাৎ যে নিষ্ক্রিয়, অপরিণামী, নির্গুণ আত্মার অস্তিত্ব চতুর্থ স্তরে উপলব্ধি হইয়াছিল, সেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবার দিকে জীবের বলবতী ইচ্ছা সঞ্জাত হয় এবং ঐ ইচ্ছাই পঞ্চম স্তর।

পাতঞ্জল দর্শন। ইহার প্রণেতা ভগবান্ পতঞ্জলি। ইনি সাংখ্যের তত্ত্বসকল স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহাই ক্রিয়াযোগ নামে প্রসিদ্ধ। পাতঞ্জলের মতে সাংখ্যোক্ত পুরুষের সাক্ষাৎকার চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা হইতে পারে। অভ্যাস, বৈরাগ্য, তীব্র উৎসাহ এবং ঈশ্বরপ্রণিধান, এইগুলি যোগের উপায়। এই যোগ হইতে দুই প্রকার সমাধি সাধিত হয়। একাগ্র চিত্তের দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং নিরুদ্ধ চিত্তের দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হইয়া থাকে। এই চিত্তের একাগ্রতা ও নিরুদ্ধ অবস্থা লাভের জন্য পাতঞ্জলে প্রণালীসকল বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়বিশেষ ধারণা করিলে অর্থাৎ নাসা, জিহ্বা, শ্রবণ, চক্ষুঃ প্রভৃতিতে চিত্তকে ধারণা করিলে, সেই সকল স্থলে অলৌকিক গন্ধ, রস, শব্দ, রূপ প্রভৃতির অনুভব হয় ও তাহাতে চিত্ত নিবিষ্ট হইয়া যায়। হৃদয়ে ধারণা করিলে চিত্ত স্থির হয় ও জ্যোতিঃ প্রকাশ হয়। মহাত্মাদিগের মূর্ত্তি চিন্তা করিলে চিত্ত স্থির হইতে পারে। অভিমত কোন ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হইতে পারে। স্বপ্ন, নিদ্রাজ্ঞানকে অবলম্বন করিলেও চিত্ত স্থির হইতে পারে। কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই পাতঞ্জলের লক্ষ্য। উহা হইতেই কৈবল্যসিদ্ধি লাভ হয়। ঈশ্বর-প্রণিধান বা ভক্তিসহকারে ভগবদারাধনা করিতে পারিলে, ভগবান্ তাঁহার নিজ সঙ্কল্পসাহায্যে তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন; এবং সেরূপেও যোগী কৈবল্য-লাভ করিতে পারে।

যাহা হউক, পাতঞ্জলে বা জ্ঞানের পঞ্চম স্তরে আমরা শুদ্ধ আত্মতত্ত্ব লাভের জন্য চিত্তক্রিয়াময় প্রচেষ্টার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। এ অবস্থায় মুখ্য লক্ষ্য—বাহ্য কর্ম্ম পরিহার ও অন্তঃকর্ম্মাভিনিবেশ ও তৎশক্তিতে কৈবল্য লাভ।

ষষ্ঠ বেদান্তদর্শন।—বেদের জ্ঞানকাণ্ডই ইহাতে বিশ্লেষিত হইয়াছে বলিয়া এবং জ্ঞান বেদের চরম লক্ষ্য বলিয়া ইহার নাম বেদান্ত। বেদের কর্ম্মকাণ্ড হইতে যেমন পূর্ব্বমীমাংসা, বেদের জ্ঞানকাণ্ড হইতে তদ্রূপ এই উত্তরমীমাংসা। একমাত্র ব্রহ্মই ইহার প্রতিপাদ্য বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মসূত্র বলে। ইহার প্রণেতা মহর্ষি বাদরায়ণ। এই বেদান্তদর্শনের আবার দুই প্রকার মতভেদ আছে—একটী অদ্বৈতবাদ এবং অপরটী বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদের এবং রামানুজ বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের পোষক।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদের প্রধান মত এই, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নাই। তবে যে জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম বিভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করে, তাহার কারণ, মায়া বা ব্রহ্মশক্তি। তত্ত্বমসি, সোঽহং প্রভৃতি বাক্যই অদ্বৈতবাদের অমৃতময় বাণী। ঈশ্বর হইতে জীব অবধি সকলেই ঐ ব্রহ্মমায়ায় আক্রান্ত। জীব নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারিলেই তাহার জগদ্‌ভ্রান্তি তিরোহিত হয় ও নিজ স্বভাব উপলব্ধি করে। বস্তুতঃ ব্রহ্ম বদ্ধও নহেন, মুক্তও নহেন—একও নহেন, বহুও নহেন; অথচ তিনিই সমস্ত। এবং এ জগৎ মরীচিকাবৎ একটী সদসদ্‌রূপা অনির্ব্বচনীয়া প্রহেলিকা।

ব্রহ্মশক্তি বা ব্রহ্মমায়ায় জীব ও ঈশ্বর উভয়ই মায়িক। ব্রহ্মই ঈশ্বর বলিয়া প্রতীয়মান—ব্রহ্মই জীব বলিয়া প্রতীত—ব্রহ্মই জগৎ বলিয়া প্রত্যক্ষীভূত। এই ব্রহ্মমায়া কি? ইহা ব্রহ্মের অবিদ্যানাম্নী শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন—মায়া ও ঈশ্বর অভিন্ন। কেবল যতক্ষণ ভেদজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ মায়া বলিয়া ব্রহ্মের একটি স্বতন্ত্র উপাধি কল্পিত হয় মাত্র। এবং যতক্ষণ এই মায়া কল্পিত থাকে, ততক্ষণ উহাকে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলা হয়। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, জ্ঞানময়, যাঁহা হইতে জগৎ জাত—জগৎ যাঁহাতে অবস্থিত ও যাহাতে জগৎ লীন হয়, এবং যিনি বিজ্ঞানময়, তাঁহাকেই সগুণ ব্রহ্ম বলে বা তাঁহাকে এইরূপ ভাবে কল্পনা করাই ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। যথার্থ ব্রহ্মলক্ষণ—নির্গুণ, নিরুপাধি, সদসৎ আদি লক্ষণের বহির্ভূত; আত্মা, পরমাত্মা নামে যাহা প্রকাশ হয় মাত্র। কিন্তু বস্তুতঃ নামাত্মক বা ব্রহ্ম আদি উপাধি যুক্ত করিলেই আর স্বরূপ লক্ষণ থাকে না—তটস্থ লক্ষণ হইয়া পড়ে, সুতরাং উহা অব্যক্ত।

জগৎ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার মাত্র। ইন্দ্রজালে যেমন দ্রব্যসকল না থাকিলেও দর্শকবৃন্দের চক্ষে সত্যবৎ প্রত্যক্ষীভূত হয়, এ জগৎও তদ্রূপ। ব্রহ্মই জগৎরূপে

প্রত্যক্ষীভূত হইতেছেন। সূর্য্যরশ্মি যেমন মরীচিকারূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়—বারি-বিন্দুসকল যেমন ইন্দ্রধনুরূপে আকাশের গায়ে ফুটিয়া উঠে, জগৎকে তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

জগৎ স্বপ্নের মত অলীক নহে। স্বপ্নে যেমন কোন সত্য পদার্থ নাই—জগৎ সেরূপ নহে। ব্রহ্মই জগৎরূপে কল্পিত হইতেছে। যেমন রজ্জু সর্পবৎ প্রতীত হয়, কিন্তু যথার্থ প্রত্যক্ষ হইলে আর উহাতে সর্পভ্রম থাকে না, ব্রহ্মই তদ্রূপ জগৎরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে। প্রত্যক্ষ হইলে জগদ্‌ভ্রম ছুটিয়া আর জগৎ বলিয়া কোন পদার্থ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এক অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম সর্ব্বত্র অবশিষ্ট থাকিবে। মরীচিকার নিকটস্থ হইলে যেমন আর মরীচিকা পরিদৃষ্ট হয় না, সূর্য্যরশ্মিমাত্র অবশিষ্ট থাকে, ব্রহ্মের নিকটস্থ বা ব্রহ্মযুক্ত হইলে আর জগৎ পরিদৃষ্ট হয় না।

জগৎ ঈশ্বরের সঙ্কল্পমাত্র। সাধারণ মনুষ্য কোন সঙ্কল্প করিলে সে তাহা মনে মনে প্রত্যক্ষ করে; সে সঙ্কল্প সুদৃঢ় হইলে বাহ্য চক্ষুও যেন সেইরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছে, এইরূপ অনুভব হয়। কিন্তু সে সঙ্কল্প একমাত্র তাহারই ইন্দ্রিয়ে উপলব্ধি হয়, সে সঙ্কল্পিত বস্তু অন্য কাহারও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু যদি উক্ত সঙ্কল্প দৃঢ়তর হয়, এবং উহা অপরেও অনুভব করুক, এরূপ ইচ্ছা তাহার প্রাণে বলবতী হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্কল্প অপরেরও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া উঠে। ইন্দ্রজাল বিদ্যা বা আধুনিক মিসমেরিজিম্ হিপন্‌টিজ্‌ম্ ইত্যাদি উক্ত দৃঢ়তর সঙ্কল্প ছাড়া আর কিছুই নহে। এরূপ ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার কথা শুনা গিয়াছে, যেখানে শত শত দর্শকবৃন্দ ঐন্দ্রজালিকের সঙ্কল্পে আকাশে ব্যাঘ্র সিংহাদির আবির্ভাব তিরোভাব ইত্যাদি চাক্ষুষ দেখিয়া ভীত ও বিস্ময়াভিভূত হইয়াছেন। এই সঙ্কল্পময় যাদুবিদ্যা ভারতবর্ষে বহুল পরিমাণে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এই বিদ্যাই মিস্‌মেরিজম্ আদি নামে অধুনা পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রকাশ পাইতেছে, এবং ঘুরিয়া আবার এদেশে নবাকারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। জগদ্‌ব্যাপারও বস্তুতঃ এইরূপ। ইহাই শঙ্করমত।

বস্তুতঃ এই সঙ্কল্প বা যাদুবিদ্যার প্রভাব অনন্ত। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অনেক যাদুকর, মানুষকে মেষ, পক্ষী আদি করিয়া রাখিত, অর্থাৎ স্বীয় সঙ্কল্প-শক্তিপ্রভাবে তাহাদিগকে এমন মুগ্ধ করিত যে, মোহিত ব্যক্তি আপনাকে মেষ, পক্ষী ইত্যাদিরূপে ধারণা করিয়া লইত। যাদুবিদ্যাময়ী রাজকুমারীর উদ্যানে অনেক রাজপুত্রকে এইরূপে বন্দী হইয়া কালাতিপাত করিতে মাতামহীর মুখে গল্পচ্ছলে

সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। উহা অমূলক নহে ; বস্তুতঃই এককালে এ যাদুবিদ্যার প্রচলন এ দেশে স্থানে স্থানে সাধারণ ক্রীড়াস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

মন্ত্রশক্তিও এই সঙ্কল্পশক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। শক্তিমান্ পুরুষ শব্দবিশেষ বা ভাববিশেষ লইয়া তাহার উপর এরূপ সঙ্কল্পশক্তি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন যে, সে শব্দ, ভাব বা মন্ত্র যে কেহ ফলকামী হইয়া প্রয়োগ করে, তাহারই অভীষ্ট তদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। বশীকরণ, স্তম্ভন, মারণ, উচ্চাটন আদি মন্ত্রশক্তির প্রভাবসকল পূর্ব্বকালে সর্ব্বসাধারণের আয়ত্তাধীন ছিল। মন্ত্র ও ইচ্ছাশক্তি-বলে ভগবান্ সাধকের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েন, ইহা আশ্চর্য্য কথা নহে।

মন্ত্র ও ইচ্ছাশক্তি জড় পদার্থের উপরও কত দূর কার্য্যকারী, তাহাও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। দ্রব্যাদি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালনা করিতে—কোন শূন্য পাত্র হইতে ইচ্ছানুরূপ পদার্থসকল বাহির করিতে সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। এক সময়ে জড় পদার্থের উপর এই সকল শক্তির প্রয়োগ আমাদের দেশে অত্যধিক মাত্রায় প্রচলিত ছিল। তখন এমন কি, বৃক্ষাদিকেও এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে তাহারা সমর্থ হইত। কিছুদিন পূর্ব্বে এই কলিকাতা অঞ্চলে একজন স্ত্রীলোককে পথে পথে ঘুরিতে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। সে অনর্গল পয়সা ছড়াইত। তাহাব নিজের অঙ্গের কোন স্থানে হাত দিয়া সে পয়সা বাহির করিত ও চারি ধারে ছড়াইয়া দিত।

বহু দিন পূর্ব্বে আমি একবার এক সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিলাম, তিনি পথ-প্রান্তে ধুনি জ্বালাইয়া উপবিষ্ট ছিলেন ; অনেক লোকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল ; আমি গিয়া তাঁহাকে লৌকিক প্রণাম করিলে, তিনি তাঁহার সেই ধুনি হইতে একটু ভস্ম লইয়া আমাকে খাইতে ইঙ্গিত করিলেন ; আমি উহা বিনাপত্তিতে মুখে নিক্ষেপ করিলাম। ভস্মাংশটুকু জিহ্বায় মিলাইয়া গেল, কিন্তু একটী কঠিন পদার্থ অবশিষ্ট রহিয়া গেল, দন্ত সংস্পর্শে বুঝিলাম, উহা একটী কঙ্কর। তখন উভয়-সঙ্কটে পড়িলাম। সন্ন্যাসিপ্রদত্ত দ্রব্য কি প্রকারে ফেলিয়া দিব, অথবা কঙ্কর কেমন করিয়া গলাধঃকরণ করিব! দুই চারি বার দন্তের দ্বারা চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। কি করিব ভাবিতেছি, সহসা আর একবার পেষণ করিবার জন্য কঙ্করটিকে জিহ্বাসাহায্যে দন্ততলে আনিলে সেটিকে কোমল বলিয়া বোধ হইল। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া

দন্তপংক্তিদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া ধীরে ধীরে চাপ দিলাম, পদার্থটী দ্বিখণ্ড হইয়া গেল; আস্বাদনে বুঝিলাম, সেটী একটী কিস্‌মিস্।

ব্যাপারটী ক্ষুদ্র হইলেও ইহা যে সাধারণ মনুষ্যজগতের পরিজ্ঞাত জ্ঞানের ও বিদ্যার অতীত কোন অলৌকিক শক্তির পরিচয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং সঙ্কল্প বা মন্ত্রশক্তির প্রভাব জড় পদার্থের উপর যে কার্য্যকরী, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায়।

যাহা হউক, তবেই স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়, মনুষ্য স্বীয় সঙ্কল্পশক্তিপ্রভাবে যখন জড় ও চেতনের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারে—একজন মনুষ্য শত শত দর্শককে মুগ্ধ করিয়া আপনার সঙ্কল্পানুযায়ী দৃশ্যসকল দেখাইতে ও অনুভব করাইতে পারে, তখন সংকল্পানুসারে এক ব্রহ্মই যে বিচিত্ররূপে প্রতিফলিত ও অনুভূত হন, ইহা বিচিত্র নহে। সৃষ্টিরঞ্জনা শঙ্করের মতে এইরূপ সত্যের উপর মিথ্যার অনুভূতি মাত্র। অথবা মিথ্যাও নহে; ঐ অনুভূতি সত্য বা মিথ্যা কোন নামেই প্রযুক্ত হইতে পারে না।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। তবে জীবে ও ব্রহ্মে প্রভেদ শুধু উপাধিগত। সাংখ্যবাদীরা এই সন্দেহ করেন যে, আত্মা যদি এক হইত, তাহা হইলে বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকার সংকল্প হইতে পারিত না। বহু আত্মার অস্তিত্বই প্রকৃতিতে বহু প্রকার সংকল্পের কারণ। কিন্তু অদ্বৈতবাদমতে তাঁহাদিগের এ বাদ সমীচীন নহে। প্রথম কারণ—তাঁহারা বহু আত্মা স্বীকার করিলেও এক অবিচ্ছিন্না প্রকৃতি স্বীকার করেন। এক আত্মা হইলে সর্ব্বত্র একমাত্র সঙ্কল্প উজ্জীবিত হইত, বিভিন্ন প্রকারের সঙ্কল্প হইতে পারিত না, তাঁহারা এইরূপ যে আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহার উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃতি যখন এক, তখন প্রত্যেক জীবেরই সংকল্পে সমগ্র প্রকৃতি পরিণমিত ও নিয়মিত কেন না হইবে?

দ্বিতীয় কথা—সংকল্প আত্মার ধর্ম্ম নহে। সংকল্প প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। প্রকৃতি স্বীয় সংকল্পবশে আপনাকে দিক্ ও কাল কল্পনায় কল্পিত করিলে, উহা আপনাকে খণ্ডিত, সীমাবদ্ধ ও বিভিন্ন বিভিন্ন উপাধিতে বিভক্ত করিবার অবসর পায়; সুতরাং একই আত্মা বিভিন্ন বিভিন্ন উপাধিতে বিভিন্ন বিভিন্নরূপে প্রতিফলিত হয় মাত্র। আত্মার বহুত্ব কল্পনা এইরূপে নিরাকৃত করা যায়।

অদ্বৈতবাদের মতে ব্রহ্মের দুই প্রকার লক্ষণ—স্বরূপ ও তটস্থ। তটস্থ লক্ষণ ও সগুণ ব্রহ্ম একই কথা।

এই তটস্থ লক্ষণ লইয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে আর একটী মত প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের মতে জীব ও ব্রহ্ম এক নহে—জগৎ মায়া নহে। নিগুর্ণ অদ্বৈতবাদে জীবকে যেমন ব্রহ্ম বলা হয়, বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদে তেমনই জীবকে অণুমাত্র বলা হয়; এবং সেই জন্য তাঁহারা বলেন, জীব যখন অণু, তখন বহু এবং প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। দেহী ও দেহে যেরূপ প্রভেদ, ব্রহ্ম ও জীবে তদ্রূপ প্রভেদ।

যাহা হউক, এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যে সাংখ্য ও মায়াবাদের মধ্যস্থ একটি স্তর বা উপলব্ধি মাত্র, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আমরা স্থূলতঃ এইমাত্র বুঝিব যে, বেদান্ত প্রচার করিতে গিয়া মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য যদি সগুণ ব্রহ্মকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন, এবং কেবলমাত্র নিগু‍র্ণের দিকে পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি উহা শুধু সন্ন্যাসবাদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিয়া গিয়াছেন। এবং রামানুজ যদি সগুণত্বই চরম সিদ্ধান্ত বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি শুধু সৃষ্টি ও স্থিতিতত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিতে ঐরূপ মত স্থাপন করিয়াছেন।

আমরা শঙ্কর ও রামানুজকে দেখিব না। আমরা বেদান্ত-স্বীকৃত অদ্বৈতবাদের উভয় দিক্ দেখিলাম, কিন্তু যথার্থ অদ্বৈতবাদ বা ব্রহ্মবাদ কি এবং জ্ঞান কিরূপে ক্রমশঃ সেই অদ্বৈতবাদে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারই আলোচনা করিব।

জীব যখন সাংখ্যস্তরে আসিয়া উপস্থিত হয়—যখন আত্মা ও প্রকৃতি দুইটি বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া অনুমিত হয় এবং ঐ আত্মাকে বহু বলিয়া ধারণা জন্মে, তখন সেই আত্মদর্শনের জন্য জীব-প্রকৃতি ধাবিত হয়। এবং ক্রমশঃ পাতঞ্জল-প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে নিবৃত্তি ও কৈবল্যের দিকে জীবের গতি অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু ঐরূপ ব্যষ্টি প্রকৃতি হইতে ব্যষ্টি পুরুষকে বিচ্ছিন্ন করিতে গিয়া সমষ্টি প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্বে লক্ষ্য ফেলিতে বাধ্য হয়। এবং সেই বিরাট্ প্রকৃতি-পুরুষ বা ঈশ্বরভাব প্রাণের উপর আধিপত্য করিতে থাকে। অর্থাৎ তখন প্রতীতি হয়, ব্যষ্টিদেহে যেমন প্রকৃতি ও পুরুষ-সংযোগে সৃষ্টি ও স্থিতি সংঘটিত হয়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডও তদ্রূপ বিরাট্ প্রকৃতি ও পরমাত্মার সংযোগে সৃষ্ট ও স্থিত হইতেছে।

আত্মা অসীম, সর্ব্বব্যাপী ও অবিচ্ছিন্ন, এইরূপ ধারণা হইতে ক্রমশঃ সে জ্ঞান অদ্বৈতবাদে আসিয়া উপস্থিত হয়। আত্মা অখণ্ড অসীম, প্রকৃতিও অনন্ত। দুই অনন্তের স্থান হইতে পারে না—জ্ঞান দুই অনন্ত পদার্থের ধারণা করিতে পারে না

অনন্ত বলিলেই এক বুঝায়। তখন আর সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্ব বলিয়া দুইটি জিনিষ কল্পনায় আইসে না। সর্ব্বব্যাপী বলিলেই সর্ব্ব বলিয়া বিভিন্ন পদার্থ কিরূপে থাকিতে পারে, সর্ব্ব বলিয়া কোন ভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সর্ব্বব্যাপিত্বের অপলাপ হয়। আবার সর্ব্ব বলিয়া পদার্থ অস্বীকার করিলে সর্ব্বব্যাপিত্বের লোপ হইয়া যায়। সুতরাং দুইটি সাপ পরস্পরকে লেজের দিক্ হইতে গ্রাস করিতে থাকিলে কল্পনায় যেমন কোনটিরই অস্তিত্ব থাকে না, তদ্রূপ সর্ব্ব ও সর্ব্বব্যাপী, এই উভয় গুণই পরস্পরকে পরাভূত করিয়া ফেলে ও এক অবর্ণনীয় অদ্বৈততত্ত্ব স্বীকৃত হইয়া যায়।

এইরূপে জ্ঞান, ন্যায়ের বিচার হইতে আরম্ভ করিয়া বেদান্তে আসিয়া পৌঁছায়। নির্গুণ ব্রহ্মচৈতন্যের আভাস্ এইরূপে প্রাণের ভিতর ফুটিয়া উঠে। কিন্তু তবে সগুণ সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল? জ্ঞান তখন বলে সৃষ্টি বলিয়া নূতন কোন অস্তিত্ব নাই। সেই বিরাট্ ব্রহ্ম অস্তিত্বই ব্রহ্মাণ্ডরূপে দৃষ্ট হয় মাত্র। তবে আর তাঁহাকে শুধু নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। নির্গুণত্বের উপর নিশ্চয়ই আর একটি কিছু আছে, যাহা দ্বারা উহা এত বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। জ্ঞান বলে, উহা কি মায়া মাত্র? কিন্তু মায়া কি? মায়া বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। মায়াকে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিলে, কথাটি অসম্ভব হইয়া উঠে। অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মপদার্থ মায়ার দ্বারা বিচ্ছিন্ন কি প্রকারে হইবে? অবিচ্ছিন্ন পদার্থ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। মায়াবাদীরা মায়াকে আবরণস্বরূপ বলেন; কিন্তু ওরূপ বলাও সমীচীন নহে। আবরণের দ্বারা যাহা আবৃত হইতে পারে, তাহা সসীম। তাহা হইলে ব্রহ্মে দোষ আসিয়া পড়ে। নির্গুণ পদার্থ আবার আচ্ছন্ন হইবে কি প্রকারে? সুতরাং মায়া ও ব্রহ্ম একই পদার্থ। ব্রহ্মই মায়া বা ব্রহ্মশক্তি। নির্গুণত্ব সগুণত্ব, এ উভয়ই মায়া। নির্গুণ সগুণ ইত্যাদি কেবল ভাবের প্রভেদ মাত্র। মায়া—ব্রহ্মের শক্তি, মায়াও ব্রহ্ম। যতক্ষণ জীব ব্রহ্মত্বের নিম্নস্তরে থাকে, ততক্ষণই ব্রহ্ম মায়ারূপে পরিদৃষ্ট হন। ব্রহ্মে পৌঁছাইলে স্বরূপ ফুটিয়া উঠে। অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা জীবরূপী ব্রহ্ম এই পর্য্যন্ত দর্শন করিতে সক্ষম হয়। তারপর জীবরূপী ব্রহ্মের ঐ জ্ঞানশক্তিরূপ ব্রহ্মাংশ ঘনীভূত হইয়া কেন্দ্রস্থ হইয়া পড়ে। এবং তখন আপনাকে মায়া বলিয়া না চিনিয়া মায়িক বলিয়া চিনিয়া ফেলে। তখন সৎ ও অসৎ ভেদ থাকে না—তরঙ্গ ও সমুদ্র ভেদ থাকে না—মায়া ও মায়িক ভেদ থাকে না। তখন নির্গুণ অথচ সগুণ—নির্ব্বিশেষ অথচ সবিশেষরূপে সমস্ত

প্রতিফলিত হইয়া উঠে। ইহাই গীতার, উপনিষদের এবং ব্রহ্মবাদের সিদ্ধান্ত। গীতারূপ চরম সিদ্ধান্ত ফুটিয়া উঠিতে এইরূপে ন্যায়ের বিচার হইতে আরম্ভ করিয়া বেদান্ত পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে হয়। জ্ঞান এইরূপে ক্রমশঃ স্তরে স্তরে ঘনীভূত হইয়া আসিতে থাকে ও শেষ গীতায় পরিসমাপ্ত হয়। নির্গুণ ও সগুণ সম্মিলিত ও একীভূত হইয়া এইরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়। দর্শনশাস্ত্র লইয়া গীতা নহে; গীতাকে লইয়াই দর্শনশাস্ত্র। উপনিষদ্ বা বেদ যেন প্রলয়ের সাম্যাবস্থা। দর্শনশাস্ত্রগুলি যেন সর্ব্বভূত এবং গীতা যেন সর্ব্বভূতস্থিত মহেশ্বর।

সমস্ত দর্শনের ঐক্য সম্পাদনের জন্য গীতারূপ মতটী প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ব্রহ্মবিজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রের ভিতর দিয়া ঘনীভূত হইয়া গীতারূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

বেদান্তজ্ঞান—চরম জ্ঞান, ইহা সত্য; বেদান্তদর্শনে সে জ্ঞান—জ্ঞানমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। একমাত্র গীতাতেই সে জ্ঞান মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছে। বেদান্তদর্শনে অদ্বৈতবাদ শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইলেও গীতায় সে অদ্বৈতবাদ মহিমময় ও মূর্ত্ত। শূন্যত্ব যে পূর্ণত্ব ছাড়া আর কিছুই নহে, শূন্যত্ব ও পূর্ণত্ব যে একই পদার্থের দুই প্রকার উপলব্ধি, সগুণ নির্গুণ এক করিয়া ইহা গীতাতেই স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

স্পষ্ট করিয়া বলি, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বা ব্রহ্মের নির্গুণ উপাধির দিকে চাহিলে জগতের যথার্থ অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জগৎ মায়ামাত্র, এরূপ ধারণাই হয়। আবার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা ব্রহ্মের সগুণ উপাধির দিকে চাহিলে জগৎ কল্পনামাত্র মনে না হইয়া ব্রহ্মেরই প্রকৃতি অংশের পরিণাম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর এই পরিণামবাদ এবং অদ্বৈতের বিবর্ত্তবাদ, এ উভয়ই এক কেন্দ্রে গীতায় সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। মায়া সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, অথবা সৎ ও অসৎ উভয়ই—মায়া যে দৃষ্টির তারতম্যে কখনও সৎ এবং কখনও অসৎ বলিয়া বিবেচিত হয় ইহার সম্যক্ কারণ ব্রহ্মত্ব লাভ না করিলে কেহ কখনও বুঝিতে পারে না। সুতরাং একদেশদর্শী বিচারের দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা বৃথা। গীতায় ভগবান্ তাই বলিয়া গিয়াছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৭।১৪

আমাকে না পাইলে, আমার এই দুস্তরা মায়াকে কেহই অতিক্রম করিতে

পারে না। এইটুকুই বেদান্ত হইতে সারাংশরূপে গ্রহণ করিয়া গীতা পরিস্ফুট করিয়াছেন।

বেদান্তস্তরে প্রবেশ করিলে জীব, ব্রহ্ম না হইলে ব্রহ্ম বুঝা যায় না, এ কথা স্বীকার করিয়াও জীবভাবাপন্নবশতঃ বিচারে প্রবৃত্ত হয় এবং সগুণ ও নিগুর্ণ, ব্রহ্মের এই উভয় দিক্ সম্যক্‌রূপে বিচারের দ্বারা দর্শন করিতে প্রয়াস পায়। অবশেষে গীতাস্তরে উঠিলে জীব বোঝে, জ্ঞান ভগবানের চরম মূর্ত্তি হইলেও উহা বিচারের দ্বারা প্রাপ্য নহে। ব্রহ্মকে পাইলে তবে তাঁহার যথার্থ স্বরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হইতে পারে। এবং তাঁহাকে পাইতে হইলে, বিচারের পরিসমাপ্তি করিয়া, বিচারকে বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হয়। ইহাই গীতার স্বাতন্ত্র্য।

বিচারের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস পাইলেও উহা ঐকান্তিক লাভ নহে, গীতা এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। বিচারের দুর্গম পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অবশেষে জীবের প্রাণে ভগবচ্চরণশরণই একমাত্র গতি, এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বাবস্থায় অর্থাৎ বিচার আরম্ভের পূর্ব্বে বা দর্শনশাস্ত্রোক্ত স্তরসকল অতিক্রম করিবার পূর্ব্বাবস্থায় ভগবদাশ্রয়ের জন্য যে একটু মূল আকুলতা জীবের প্রাণে থাকে, দর্শনশাস্ত্রোক্ত স্তরগুলি অতিক্রম করিয়া করিয়া, সেই আকুলতাটুকু মার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত হইয়া, গীতাস্তরে আসিয়া নির্ম্মল, প্রশান্ত, অনন্ত আকারে ব্যাপিয়া পড়ে। চন্দ্রালোক যেমন সূর্য্যেরই রশ্মিমাত্র ও যতক্ষণ সূর্য্যোদয় না হয়, ততক্ষণ মাত্র কার্য্যকারী হয়; প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র যেমন বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ গীতাজ্ঞানই দর্শনশাস্ত্ররূপে হৃদয়ে আলোকরাশি ঢালিয়া দিলেও জীব এই গীতাস্তরে প্রবেশ করিলে আর উহার কার্য্যকারিতা থাকে না।

দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞান ও কর্ম্মসকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত হইয়াছে ও কেহ জ্ঞানকে, কেহ কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠাসন দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গীতায় কর্ম্ম ও জ্ঞান বিভিন্ন জিনিষ নহে, ভক্তির রূপান্তর মাত্র, ইহাই দেখান হইয়াছে। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম,একই শক্তির বিভিন্ন ক্রমের বিকাশ মাত্র। যেমন আত্মা,সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ,—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মকে তদ্রূপ বুঝিতে গীতা উপদেশ দিয়াছেন। এবং তাহা হইতে গীতা অন্য এক সুন্দর সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, কর্ম্মের অভ্যন্তরে যে প্রকারের ভক্তি ও জ্ঞান লুক্কায়িত থাকে, কর্ম্ম সেই প্রকারের ফলই প্রসব করে, কর্ম্ম নিজের আকৃতি অনুযায়ী ফল দিতে অসমর্থ; অর্থাৎ কর্ম্মের ভিতর যে দিকে লক্ষ্য থাকিবে—যে পরিমাণে সেই লক্ষ্যের দিকে আগ্রহ থাকিবে, সেই পরিমাণে

সেই কৰ্ম্ম ফলপ্রসূ হইবে। কৰ্ম্ম ফলপ্রসূ নহে, আসক্তি বা ভক্তিই অথবা অনুভূতিই ফলপ্রসূ এবং জ্ঞানই সেই ফল। একটী বীজের অভ্যন্তরে যেমন শস্য ও একটী তদনুযায়ী বৃক্ষ লুক্কায়িত থাকে, কর্ম্মের অভ্যন্তরে তদ্রূপ ভক্তি বা আসক্তি এবং জ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। জ্ঞান ও ভক্তিহীন কৰ্ম্ম—শস্যহীন বীজ মাত্র।

গীতা এইরূপে সম্যক্‌দর্শন করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রগুলিতে যেন এক একটী অঙ্গ বিশ্লেষিত; গীতা সেই সমস্ত স্তর একত্রে লইয়া পূর্ণকে দর্শন করিয়াছে, সুতরাং আত্মদর্শন গীতাতেই হইয়াছে। বেদান্ত ভিন্ন অন্য দর্শনশাস্ত্রগুলি ক্রমশঃ যেন সমস্ত তত্ত্বকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া "অণোরণীয়ান্" এই তত্ত্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, গীতায় সেই "অণোরণীয়ান্" "মহতো মহীয়ান্"তত্ত্বে পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছে। সকল দর্শনশাস্ত্র যুক্তি লইয়াই ব্যস্ত ও মস্তিষ্কধর্ম্মের মহিমা মাত্র। গীতা আত্মদর্শী, ইহার প্রত্যেক নিশ্বাসের গতি কেন্দ্রের দিকে এবং ইহার সহিত মস্তিষ্ক ধর্ম্মের সম্পর্ক থাকিলেও ইহা প্রাণ-ধর্ম্মের অপূর্ব্ব বিকাশ। খনির অভ্যন্তরে মণি লুক্কা-য়িত, অনেক কষ্টে সে মণি খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়; অশেষ কৌশল ও শক্তির প্রয়োজন, এই ভাবই বেদান্ত ছাড়া অন্য দর্শনে যেন দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্ত যেন সে মণিকে জগৎময় ছড়ান বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু উহা যেন জ্ঞানে! বেদান্তে সে জ্ঞান যেন স্থূলদেহ অভাবে অনুভূতিযোগ্য হইয়া উঠে নাই। বেদান্ত সমস্ত ব্রহ্ম বলিলেও যেন বিচ্ছিন্ন অঙ্গসকল একত্রীভূত করিয়াছেন মাত্র, তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিয়া, তাহাকে ভোগ্য করিয়া তুলিতে পারেন নাই। গীতা বেদান্তের সেই সংযুক্ত অঙ্গে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। বেদান্ত দেবতার সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাকে প্রতিমায় ঢুকাইতে পারেন নাই, যেন কেবলমাত্র জ্ঞানী, শক্তিমানের পক্ষে উহা সুলভ, এইরূপ আভাস দিয়াছেন। কিন্তু গীতা দেবতাকে প্রতিমায় আনিয়া মূর্খাদপি মূর্খের অনুভূতিযোগ্য করিয়াছেন। গীতা তত্ত্ব-সকলের আত্মা—প্রাণ, দর্শনাদিশাস্ত্র অঙ্গমাত্র। এ হিসাবে গীতায় ও দর্শনে আকশ পাতাল প্রভেদ।

সমস্ত দর্শনশাস্ত্রেরই মূল দুঃখবাদ। দুঃখ লইয়াই সমস্ত দর্শনশাস্ত্র ব্যস্ত; দুঃখের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য প্রত্যেক দর্শনকারই পন্থা নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে জ্ঞান বা কর্ম্মের আবশ্যক। সংসার দুঃখের আলয়, ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই; তত্ত্বজ্ঞান না হইলে সুখ হইতে পারে না, ইহাই দর্শনশাস্ত্রগুলির প্রায় সাধারণ সিদ্ধান্ত। কেহ বা কর্ম্মের দ্বারা সুখলাভ হইতে পারে, ইহাও বলিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, সকলেই দুঃখের বিভীষিকায় ভীত হইয়া, সংসাররূপ দুঃখদায়ক অরির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ছুটাছুটি করিয়াছেন।

একমাত্র শঙ্করের মায়াবাদ ভ্রান্তির দিকে সাহস করিয়া ফিরিয়া চাহিয়াছেন। বীর পুরুষের মত ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া, সে ভ্রান্তিরূপ শত্রুকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন; এবং তীক্ষ্ণ চক্ষুর সাহায্যে দেখিয়াছেন, যাহার ভয়ে ভীত হইয়া সকলে পলাইবার চেষ্টা করিয়াছে, বস্তুতঃ উহা অন্য জিনিষ নহে,—উহা আপনারই ছায়া। আপনারই ছায়াকে পিশাচ ভাবিয়া বালকেরা যেমন ভীত হয়, তেমনই জগৎ অপনারই ছায়ার ভয়ে ভীত। এইরূপ দর্শন করিয়া বেদান্ত, সকলকে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিবার জন্য অভয়বাণী ঘোষণা করিয়াছেন। উচ্চৈঃস্বরে মায়াবাদ বলিয়াছেন,—"ভয় নাই—ভয় পাইও না, তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে যে কৃষ্ণা মূর্ত্তিকে ধাবিতা দেখিয়া ভীত হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছ, উহা বস্তুতঃ সত্যও নহে, অসত্যও নহে। স্থির হইয়া দাঁড়াও—সাহস অবলম্বন কর—সাহসে নির্ভর করিয়া চাহিয়া দেখ, ও বিভীষিকাময়ী ছায়া তোমার পদতলে মিলাইয়া যাইবে—অরি চিরদিনের জন্য ধ্বংস হইবে। যেখানে ছায়া দেখিতেছ, সেখানে নিজ অঙ্গ প্রতিষ্ঠিত দেখিবে। ভ্রান্তিকে ভয় নাই, আপনাকে আপনি ভয় পাইও না।"

মায়াবাদের এ অভয়বাণী ভীত জীব-হৃদয়ে অনন্ত সাহস ঢলিয়া দিয়াছে সত্য, বালকের ভূতের ভয় ঘুচাইয়া দিয়াছে সত্য—অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সর্ব্বত্র প্লাবিত করিয়া দিয়া, ছায়ার আর দাঁড়াইবার স্থান রাখে নাই সত্য; কিন্তু ছায়ার উপর শত্রুভাব ছাড়িতে পারে নাই। শত্রুকে মিথ্যা জানিয়াও মিথ্যারই উপর অস্ত্রাঘাত করিয়াছে। এ হিসাবে আচার্য্য অন্যান্য যোদ্ধার মত ব্যবহার করিয়াছেন। শত্রুকে জয় করিয়াছেন, এ হিসাবে মায়াবাদ জগজ্জয়ী বীর হইলেও, অবিদ্যার উপর শত্রুভাব প্রাণ হইতে ঘুচে নাই; এবং অবিদ্যার সহিত শত্রুবৎ আচরণ করিতে ও কার্য্যতঃ সন্ন্যাসের পথে পলাইতেও ছাড়েন নাই।

গীতা এই ছায়া ভাবিয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন সত্য, মায়াবাদের মত শত্রুর দিকে সাহস করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন সত্য; কিন্তু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিশিষ্টভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার পূর্ব্বে—সর্ব্বপ্রথম চাহনিতেই গীতা শত্রুর জন্য কাঁদিয়াছে, আপনার দুঃখে কাতর হইয়া, দুঃখদাতার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া, অস্ত্রনিক্ষেপে উদ্যত হইয়া, সেই দুঃখদাতার জন্য—সেই অবিদ্যার জন্য—সেই মায়া বা ছায়া বা প্রকৃতি, যাহাই হউক;তাহারই জন্য কাঁদিয়া অধীর হইয়াছেন। আপনার

দুঃখ ভুলিয়া—আপনার যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া—আপনার মর্ম্মপীড়ায় জলাঞ্জলি দিয়া, দুঃখের দুঃখে অধীর হইয়াছেন—অবিদ্যার জন্য কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন—শত্রুর জন্য ভালবাসার অশ্রুধারা সর্ব্বপ্রথম গীতার হৃদয় পরিপ্লাবিত করিয়াছে। ইহাই গীতার সর্ব্বপ্রথম অপূর্ব্বত্ব।

"কেন মারিব! কাহাকে মারিব! অবিদ্যা যে উপকারী—অবিদ্যা যে গুরু—অবিদ্যা যে আত্মীয়! না, মারিব না, অবিদ্যায় চিরদিন রাজ্যচ্যুত হইয়া থাকি, সেও ভাল, যে আমার তিলমাত্র উপকার করিয়াছে, সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও তাহাকে আমি মারিতে পারিব না।" গীতা সর্ব্বপ্রথম এই ভাবে কাঁদিয়াছে। সকল দর্শনশাস্ত্রের লক্ষ্য আপনার দুঃখের দিকে—সকল দর্শনকারই আপনার দুঃখে সর্ব্বপ্রথম বিভোর হইয়াছে; গীতা আপনার দুঃখ বুঝিতে গিয়া দুঃখদাতার দুঃখে কাঁদিয়া অধীর হইয়াছে। বিষাদই যোগের সূচনা সত্য, দুঃখ উত্তমরূপে হৃদয়ে অনুভূত না হইলে—দুঃখের তীব্র বৃশ্চিকদংশন প্রাণের ভিতর বিষের জ্বালা ছড়াইয়া না দিলে, সে দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করে না; এবং এই জন্যই সমস্ত দর্শনশাস্ত্রেরই মূল দুঃখবাদ বা দুঃখযোগ। গীতারও মূল তাই—গীতাও দুঃখের জ্বালায় অধীর হইয়া - দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া, দুঃখের বিপক্ষে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে; কিন্তু হায়! গীতার সে দুঃখযোগ সংগ্রামস্থলে গিয়া আত্মদুঃখে মাত্র পর্য্যবসিত হয় নাই। গীতার হৃদয়ের উদার ভাব, সময়ে ঐ অবিদ্যা হইতে উপকৃত হইয়াছে, ইহাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে; এবং যথার্থ কৃতজ্ঞের মত তৎক্ষণাৎ আত্মদুঃখের সহিত পরদুঃখ বা অনাত্মদুঃখ অনুভব করিয়াছে। অন্য দর্শনের দুঃখযোগ আত্মদুঃখ মাত্র; গীতার দুঃখযোগ আত্মদুঃখ নহে—দুঃখের প্রতি অপূর্ব্ব কৃতজ্ঞতার সুপ্রকাশ। ইহার নাম বিষাদযোগ। অন্ততঃ এই জন্যও মায়াবাদ লইয়া গীতার ব্যাখ্যা করা চলে না।

এরূপ অমৃতময় বিষাদে গীতার সূচনা বলিয়াই গীতা যেখানে গিয়া পৌঁছিয়াছে, আর কেহ সেখানে গিয়া পৌঁছাইতে পারে নাই। এমন অমৃতময় আরম্ভ আর কাহারও নাই—এমন অমৃতময় পরিণাম আর কাহারও ঘটে নাই। অবিদ্যা হননে মহাপুণ্য, ইহাই যেন সকলের স্বতঃসিদ্ধান্ত; কিন্তু—

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥

অর্জ্জুনের মুখে হইলেও ইহা গীতারই বাণী।

গীতার দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই,—দর্শনশাস্ত্র, কর্ম্ম ও জ্ঞানের ভিন্নতার দিকেই সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছে ; কিন্তু যে জিনিষের পূর্ণ উদ্বেলিত অবস্থাই কর্ম্ম এবং পূর্ণ প্রশান্ত অবস্থাই জ্ঞান, সে জিনিষটির কথা একবারে বিস্মৃত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহাকে সাধারণ কথায় অনুভূতি বলে, উহা তাহাই ; ভক্তি, আসক্তি বা পূর্ণ আত্মানুভূতি বা পূর্ণ ভাব,ইহা কার্য্যতঃ একই জিনিষ। তড়িতের যেমন চঞ্চলতা, কর্ম্ম– ভাবের তদ্রূপ অবস্থা। তড়িতের যেমন আলোকবিকাশ, জ্ঞান—ভাবেরও তদ্রূপ; দর্শনশাস্ত্র এই জ্ঞান ও কর্ম্ম—এই চঞ্চলতা ও আলোক,এই বিকাশের দিকেই মুখ্য লক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছে। প্রাণের দিকে, অনুভূতির দিকে তাহাদিগের লক্ষ্য না থাকায় এই জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই রসহীন পাদপের অনুরূপ। একমাত্র বেদান্তে সে রস আছে, কিন্তু উহা সাধারণের ভোগ্য নহে এবং মায়াবাদে উহা উপেক্ষিত ; কিন্তু গীতায় সে রস প্রধান। সেই জন্যও মায়াবাদ লইয়া গীতার ভাষ্য ভোগ্য নহে।

গীতার তৃতীয় বিশেষত্ব—মায়াবাদ সমস্তকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন যথার্থ কিন্তু মায়াকে বলিয়াছেন, উহা মিথ্যা এবং সত্য উভয়ই। মায়া মিথ্যাও বটে, সত্যও বটে ; অথবা ইহা মিথ্যাও নহে, সত্যও নহে, ইহা ভাবরূপ কোন এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ—"সদসদ্‌ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ।" গীতা বলেন, মিথ্যা বলিয়া কিছু নাই – ভাবও মিথ্যা নহে, সব সত্য—সব সত্য,মিথ্যার গন্ধ কোথাও নাই,সত্যের অপলাপ কোথাও হয় নাই।

নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।

এমন জোর করিয়া সত্যবাদ প্রচার করিতে কোন দর্শনকারই পারেন নাই। সেই জন্যও মায়াবাদ লইয়া গীতার ব্যাখ্যা চলে না।

যেমন সূর্য্যরশ্মি বিশ্লেষিত করিয়া দেখিলে তাহাতে নানা বর্ণের রঞ্জনা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণ ভাবে দেখিলে তাহাকে শুভ্র ব্যতীত আর কোনরূপে বুঝা যায় না, তদ্রূপ ব্রহ্ম একরস হইলেও উহাকে খণ্ডাকারে দর্শন করিলে জগদাদি উহাতে প্রত্যক্ষীভূত হয় ; কেন না, সমস্তই রসস্বরূপ। সমষ্টিভাবে দেখিলে জগদাদি নামরূপ তিরোহিত হইয়া যায়, এক রসরূপ অস্তিত্বের উপলব্ধিমাত্র অবশিষ্ট থাকে ; কিন্তু যতক্ষণ ভাবের দ্বারা সৃষ্টি খণ্ডিত থাকে, ততক্ষণ উহাই সগুণ ও সৃষ্টিবৈচিত্র্যময় ; সুতরাং ইহার কোনটিকেই অসত্য বলা যায় না। বেদান্তে এইরূপ উভয় দিক্ পরিদৃষ্ট হইলেও, কেহ এই বিশ্লেষিত দৃষ্টির উপর এবং কেহ এই সমষ্টি দৃষ্টির উপর প্রখরভাবে লক্ষ্য স্থাপিত করিয়াছেন,

এবং তাহারই ফলস্বরূপ বেদান্তদর্শন অবলম্বনে অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পরস্পর বিরুদ্ধভাবে পরে একটি বৈষম্য উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু গীতায় এই উভয়ের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—উভয়কেই গীতা, দৃষ্টির তারতম্য-মাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মায়া—এই দৃষ্টি বা ঈক্ষণ-শক্তিমাত্র। ইহাই ব্রহ্মের শক্তি। আপনাকে নির্গুণ ও সগুণভাবে দেখাই ব্রহ্মশক্তি। অনেকে মনে করেন, এই সগুণভাবে দেখাটুকুই মায়া। এই দর্শন তিরোহিত হইলেই স্বরূপ অবস্থা প্রকটিত হয়; এবং এই ভাবে তাঁহারা কেবলমাত্র নির্গুণবাদেরই পক্ষপাতী হইয়া উঠেন; ইহাঁরাই সাধারণতঃ শুদ্ধ অদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদী নামে প্রসিদ্ধ। ইহাঁদের মত, যখন দৃষ্টি সম্পূর্ণ প্রসারিত হইলে এই নির্গুণ অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন ইহাই যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপ—অবশিষ্ট ব্রহ্মে মিথ্যাদর্শন মাত্র।

আবার অন্যে মনে করেন, যখন ব্রহ্মে সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার পরিলক্ষিত ও উপলব্ধি হয়, তখন ইহাও মিথ্যাদর্শন নহে, ইহা সত্য এবং ইহাই প্রামাণিক। তবে তিনি ইহাতে লিপ্ত বা ইহার অধীন নহেন এবং ইহা তাঁহার অঙ্গস্বরূপ বলিয়া, তাঁহাকে নির্গুণ বলা হয় মাত্র। প্রলয়কালে বা তিনি দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া লইলে সৃষ্ট্যাদি বা নামরূপ ভেদসকল তিরোহিত হইয়া গিয়া ব্রহ্মে বিলীন থাকে বলিয়া সেই অব্যাকৃত অবস্থায় তিনি নির্গুণপদবাচ্য। অথবা তিনি অশেষ কল্যাণময় গুণের আধার বলিয়া নির্গুণ। ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে বেদান্তের অন্য শাখা। ইহা ক্রমশঃ এই সগুণভাবের উপর তীব্র লক্ষ্যের জন্য প্রায় সাংখ্যস্তরে নামিয়া আসিয়া পড়িয়াছে এবং চিৎ অচিৎ উভয়ই পরমার্থতঃ স্বীকার করিয়াছে।

এইরূপে বেদান্তের এক এক দিক্ দর্শন করিয়া এক একটা সাম্প্রদায়িক ভাব ধর্ম্মজগতে আবির্ভূত হইয়াছে, কিন্তু গীতা মধ্যস্থলে অথবা স্বরূপে দাঁড়াইয়া উভয় দিক্ আপন অঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া লইয়াছেন। এবং বিচারপন্থায় ভ্রমণ করিলে এইরূপ একদেশদর্শী হইয়া পড়িতে হয় বুঝিয়া, ব্রহ্মত্ব না পাইলে ব্রহ্ম উপলব্ধি হওয়া একান্ত অসম্ভব—এই মহাসত্যকে ভিত্তি করিয়া বিচার-পন্থা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছেন; এবং কেবলমাত্র তৎপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং যথার্থ তত্ত্বদর্শী হইলে এই উভয়েরই অন্ত এককালীন পরিদৃষ্ট হয়, ইহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নির্গুণবাদকে লক্ষ্য করিয়া "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ"—অসৎ ভাবের অস্তিত্ব নাই—মায়া বা জগদ্ভাবাদিও সত্য, এই কথা বলিয়াছেন এবং

সগুণবাদকে লক্ষ্য করিয়া "নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"—নিত্য সত্যের অপলাপ কোথাও হয় নাই, এক সত্যই সর্ব্বত্র সম্পূর্ণভাবে বিরাজিত—সত্য কোথাও বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয় নাই, এইরূপ তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। এবং এই উভয় তত্ত্বই যে তত্ত্বদর্শী হইলে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করে, তাহাও ঐ শ্লোকেরই দ্বিতীয় পাদে "উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ" বলিয়া সর্ব্বজ্ঞানের সার সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাই গীতার আর একটি বিশেষত্ব।

আমরা এইরূপে দর্শনশাস্ত্র ও গীতার আভাস লইয়া তুলনা করিয়া দেখিলে জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়রূপ এই প্রাণময় অপূর্ব্ব মহাসত্যের আবিষ্কার গীতায় দেখিতে পাই। এবং উপনিষদাদিতে প্রধানভাবে থাকা সত্ত্বেও দর্শনশাস্ত্রের চক্ষে ইহা সজীব ও সম্যক্‌রূপে প্রতিফলিত হইতে পায় নাই। গীতায় সেইটুকুই মুখ্যভাবে উপদিষ্ট এবং দর্শনশাস্ত্র যাহা প্রধানভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, গীতায় উহা প্রায় উপেক্ষিত। উহা এই যে, বিচারপন্থায় ব্রহ্ম অপ্রাপ্য, ব্রহ্মের দ্বারা বরিত না হইলে ব্রহ্ম পাওয়া যায় না; সুতরাং মস্তিষ্কবুদ্ধি লইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য ছুটাছুটি না করিয়া প্রাণধর্ম্ম লইয়া ব্রহ্মোদ্দেশ্যে ঢালিয়া দাও।

তাই বলিতেছি, যদি মাকে দেখিতে চাহ, তবে বুদ্ধির দ্বারা দেখিতে চেষ্টা করিও না, ভাবের দ্বারা দেখ—ভাবের পুষ্পাঞ্জলি পায়ে ঢালিয়া দিতে শিক্ষা কর—ভাবে, সঙ্কল্পে মাকে ধরিবার প্রয়াস পাও—ভাবে স্বপ্ন রচনা কর, সে স্বপ্ন সত্য হইবে—ভাবে কল্পনার হেমসিংহাসন প্রস্তুত কর, সিংহবাহিনী সে সিংহাসনে সত্যই আবির্ভূতা হইবেন; তুমি দেখিবে, কল্পনাও মিথ্যা নহে, মিথ্যা বলিয়া কিছু নাই—কিছু নাই—কল্পনাও সত্যের মূর্ত্ত মাত্র।

গীতা বিশেষ করিয়া এই দিকে লক্ষ্য রাখিতে শিক্ষা দিয়াছেন যে, তত্ত্বদর্শী না হইলে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং যাহাতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, সাধকের সেইটুকুই অবলম্বনীয়। সে উপায় শরণাগত হওয়া—দেখিব বলিয়া কাতর প্রাণে অপেক্ষা করা। পৃথিবীর উত্তাল জনরবের মধ্যে তাঁহার মুখের কথা শুনিবার জন্য কান বাড়াইয়া অপেক্ষা কর—জগতের বিচিত্র পদার্থনিচয়ের মধ্যে পলকহীন নেত্রে তাঁহাকে দেখিবার জন্য চাহিয়া থাক। বিচারপন্থায় নিগুর্ণত্বের দিকে মুখ্যভাবে লক্ষ্য পড়িবার কারণ, গুণনিমগ্ন জ্ঞাননিষ্ঠ জীব, গুণের কোলাহল হইতে নিগুর্ণত্বের নির্জ্জন শান্তিতে প্রবিষ্ট হইয়া বিশ্রামের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে, এবং সেই জন্য সগুণের দিক্ হইতে

লক্ষ্য একবারে গুটাইয়া লইয়া, নির্গুণ নির্গুণ করিয়া শুধু নির্গুণ স্বরূপই চারি দিকে পাইতে প্রয়াস পায়। আবার যাহারা কর্ম্মনিষ্ঠ, তাহারা অবিদ্যাপ্রভাবে সগুণকে ভুলিতে পারে না; এবং নির্গুণের দিকে চক্ষু মেলিয়া চাহিতে তাহারা কুণ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র খেলা-ঘরের মায়া বিরাটের খেলা-ঘরের দিকেই পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। এইরূপে ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গস্বরূপ দুইটী দিক্ জীব, স্বীয় সংকীর্ণতাবশতঃ সমন্বয় করিতে পারে না।

যাহা হউক, শুদ্ধ অদ্বৈতবাদে মায়াও যে মহাসত্য, গীতা এই কথাই শিক্ষা দিয়াছেন। যখন শক্তি ও শক্তিমান্ অথবা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি বা মায়া অভিন্ন— এ কথা যখন অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য, তখন সেই মায়াকে বা ব্রহ্ম-শক্তিকে আবার কি প্রকারে মিথ্যাভূতা বলা যাইতে পারে? তাহা হইলে ব্রহ্মও মিথ্যা হইয়া পড়ে; সুতরাং মায়াকে ব্রহ্মের মত একান্ত সত্য না বলিলে চলে না। দ্বিতীয় কথা, ব্রহ্মে ভ্রান্তি অসম্ভব। যখন সমস্তই ব্রহ্ম, তখন ব্রহ্মকে আবার ভ্রান্তির দ্রষ্টা কেমন করিয়া বলা যায়? রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত জগৎ ভ্রান্তিরূপে দৃষ্ট হইতেছে বলিলে ব্রহ্মকে ভ্রান্তির দ্রষ্টা হইয়া পড়িতে হয়; সুতরাং জগৎকে ভ্রান্তি বলা চলে না। সূর্য্যরশ্মি যে মরীচিকারূপে পরিদৃষ্ট হয়, উহা ভ্রান্তি নহে, সূর্য্য-রশ্মির ধর্ম্মই দূর হইতে মরীচিকারূপে প্রতীত হওয়া অথবা চক্ষুর ধর্ম্মই সূর্য্যরশ্মিকে দূর হইতে ঐরূপ উপলব্ধি করা। সুতরাং ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। যাহা কোন না কোন অবস্থায় উপলব্ধি হয়, তাহাকে মিথ্যা বলা যায় না। মায়াবাদ বলেন, যাহার বাধ আছে, তাহাই মিথ্যা— যাহার বাধ নাই, তাহাই সত্য; কিন্তু এ হিসাবেও দেখিলে অদ্বৈতবাদের সত্যে বাধ দৃষ্ট হয়। সগুণ অবস্থায় অর্থাৎ যতক্ষণ জগদনুভূতি থাকে, ততক্ষণ নির্গুণত্বে বাধ সাধিত হইতেছে; সুতরাং কেবলমাত্র নির্গুণই যে সত্য এবং জগৎপ্রকাশ মিথ্যা, ইহা স্বীকার করা যায় না।

এইরূপে নির্গুণ ও সগুণ যে একৈকদেশদর্শন মাত্র, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বিচারে এইরূপ একদেশদর্শনই ঘটিয়া থাকে। তাই গীতায় বিচারপথ মুখ্যতঃ উপে-ক্ষিত এবং যাহা কিছু উপলব্ধি হয়, সমস্ত সত্য বলিয়া পরিগৃহীত। নির্গুণ দর্শনও মায়া, সগুণদর্শনও মায়া—উভয়ই ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্ম যেখানে যেরূপ দর্শন অভিলাষ করেন, সেখানে সেইরূপ ভাবে আপনাকে দর্শন করিতেছেন মাত্র। ব্রহ্ম কামচার। বন্ধন ও মুক্তি উভয়ই ব্রহ্ম-সঙ্কল্পমাত্র। ব্রহ্ম যতক্ষণ বন্ধনকামী, ততক্ষণই বদ্ধ জীব-রূপে সঙ্কল্পের কঠোর নিগড়ে আপনাকে অনুভব করেন; যখন মুক্তিকামী, তখন

মুক্ত সঙ্কল্পে বা সঙ্কল্পের অতীত অবস্থায় অবস্থান করেন। উভয়ই ব্রহ্মশক্তির লীলা-বিলাস। আবার "অনুভূতি নাই" এইরূপ সঙ্কল্প অবস্থায় প্রলয়ে সমস্ত লীন হইয়া যায়। এ সমস্তই ব্রহ্মের এক এক অবস্থার স্বরূপ। ব্রহ্ম বস্তুতঃ অবাঙ্মনসগোচর।

এইরূপে গীতা ব্রহ্মের সমস্ত অবস্থাকেই সত্য বলিয়া পরিগ্রহণ করিয়াছেন; এবং ইহাই গীতার অপূর্ব্ব বিশেষত্ব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, গীতার সূচনাই মায়াকে মিথ্যা বলিয়া ছাড়িতে কাতরতা। বিচার যখন সমস্ত সত্য বলিয়াও মিথ্যার একটু গন্ধ ছাড়িতে পারে নাই—একটু মিথ্যার আভাস স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে, সেই অবস্থায় গীতার সূচনা—সেই মিথ্যাটুকুকে সত্য করিয়া লইবার জন্যই গীতার প্রথম ক্রন্দন; এবং সেই সমস্তই ব্রহ্মে বা ব্রহ্মশক্তিতে যুক্ত হইয়া যাওয়াই গীতার ফল; কিন্তু সে যুক্ত হওয়া বিচারসাপেক্ষ নহে—ব্রহ্মনির্ভরসাপেক্ষ।

যাহা হউক, গীতা এইরূপে "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" এই শ্লোকে এক কথায় সমস্ত মতটুক্ বলিয়া, তার পর এ জ্ঞান একেবারে প্রাণে প্রতি-বিম্বিত হইতে পারে না বুঝিয়া, সাধারণ জীবের জ্ঞানগম্য করিবার জন্য পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে আগে মূল তত্ত্ব অবলম্বন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। "অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্। বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥" অর্থাৎ গীতা যেন বলিতেছেন, তোমাদিগের জ্ঞান এখন সমস্তই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না বুঝিতেছি—তোমাদিগের চক্ষে এখন বিচিত্র জগৎ পরিদৃষ্ট হইতেছে—বিভিন্ন বিভিন্ন অনুভূতিতে তোমাদিগের হৃদয় পূর্ণ; সুতরাং তোমরা এইমাত্র বুঝ, সর্ব্ব বলিয়া যাহা কিছু তোমাদের চক্ষে প্রতিফলিত হইতেছে, ঐ সমস্ত এক অবিনাশী অব্যয় দ্বারা পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ এই সমস্ত পদার্থের উপাদানকেও উৎপত্তি-নাশ-শূন্য বলিয়া উপলব্ধি কর। যাহা সর্ব্ব বলিয়া তোমাদিগের চক্ষে প্রতিফলিত হইতেছে, উহার প্রত্যেক অনুপরমাণু উৎপত্তি নাশবিহীন। তোমাদিগের এই "সর্ব্ব" যাহা দ্বারা গঠিত, যাহা দ্বারা ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত, তাহা অব্যয় ও অবিনাশী বলিয়া হৃদয়ঙ্গম কর। শুধু বুদ্ধিতে জানিলে চলিবে না, অনুভব করিতে হইবে। আহার করিলে উদরপূর্ত্তি হয়, আহার করিয়া বুঝিতে হইবে।

সে বুঝিবার উপায় কাতরতা, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভিক্ষুক দ্বারে দ্বারে যেমন কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করে,—"কে আছ দয়াময়ি! অশক্ত, ক্ষুধা-তুর আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি কর" বলিয়া যেমন সে গৃহস্থের দ্বারস্থ হয়, তেমনই ভাবে জাগতিক প্রত্যেক পদার্থের দ্বারস্থ হইতে হইবে। ভিক্ষুক, গৃহস্থকে সাহায্য করিতে

সক্ষম বুঝিয়া তবে তাঁহার দ্বারস্থ হয়; তুমিও বিশ্বাস করিও, জগতের প্রত্যেক পদার্থই তোমার ভিক্ষা পূরণে সক্ষম, এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া তৃণ, ধূলা বাদ না দিয়া সকলের কাছে ভিক্ষা কর। ভিক্ষুকের লক্ষ্য যেমন গৃহস্থের রূপ বা আকৃতির দিকে থাকে না, গৃহস্থমণ্ডলীর ভিতর দয়ার প্রস্রবণের দিকে যেমন তাহার আকুল প্রাণ পড়িয়া থাকে, তেমনই ভাবে তোমার আকুল প্রাণ জগতের প্রত্যেক পদার্থের বাহ্য রূপগুণের দিকে না চাহিয়া, উহার অভ্যন্তরের বিমল স্নেহের দিকে চাহিয়া থাকুক। সেই দিকে চাহিয়া তুমি কাঁদিয়া বল,—"কই, কে আছ দয়াময়ি! আমি অশক্ত ক্ষুধাতুর,আমায় সাহায্য কর—আমার ক্ষুধা নিবারণ কর!" দেখিবে, প্রতি ধূলিকণা ভেদ করিয়া—প্রতি তৃণ, পুষ্প, লতা, প্রতি রূপ, প্রতি শব্দ, প্রতি অনুভূতি ভেদ করিয়া তোমার চারি ধারে—তোমাকে বেষ্টন করিয়া, অমৃতপাত্র করে লইয়া তোমায় ভিক্ষা দিবার জন্য অন্নপূর্ণারূপে মা আমার বিরাজিতা। আর দেখিবে, তুমি আর সে তুমি নহ—মাতৃরূপের স্নেহপাতে তুমি শিবত্ব লাভ করিয়াছ—তুমি মহেশ্বর হইয়াছ। প্রতি অণু পরমাণু অন্নপূর্ণা—প্রতি অণু পরমাণুর প্রতিবিম্বপাতে তুমি শিব।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সমস্তই সত্য। দর্শনশাস্ত্রের ভেদসকল বাস্তব ভেদ নহে, দর্শনের তারতম্য মাত্র। প্রপঞ্চ ভ্রান্তি নহে—ভুলে পড়িয়া জগদ্দর্শন করিতেছি না, ইচ্ছা করিয়া আপনাকে বিভিন্নরূপে অনুভব করিতেছি মাত্র। ব্রহ্মে ভুল অসম্ভব। জলে যেমন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বা যন্ত্র সাহায্যে দেখিলে জীবাণুসকল দেখিতে পাওয়া যায়—সূর্য্যকিরণকে যেমন বিশ্লেষিত করিয়া দেখিলে বর্ণরঞ্জনাসকল দেখিতে পাওয়া যায়, জগদাদি দর্শনও তদ্রূপ। যত দৃষ্টি বিস্তৃত হইতে থাকিবে, বিভিন্নতা ততই একত্বের দিকে অগ্রসর হইবে; এবং অতি-বিস্তারে এক তত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই পরিদৃষ্ট হইবে না। এই বিচিত্র জগৎ জ্ঞানচক্ষে দেখিলে পরমাণুসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না; এবং এই পরমাণুর কথা ভাবিলে বৃক্ষ লতা পর্ব্বত, চন্দ্র সূর্য্য আকাশ, এই সমস্তই এক বিশাল পরমাণু-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া যায়—পরমাণুর একটী বিরাট্ সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই অনুভূতিতে আইসে না—সমস্ত চাক্ষুষ জগৎ যেন এক অনুভাব্য পরমাণু-সমুদ্রে মিশাইয়া যায়; আবার এই পরমাণুসকলের উপাদানের কথা ভাবিতে গেলে আর যখন পরমাণুও চক্ষে ঠেকে না, তখন শুধু শক্তির স্পন্দনমাত্র অনুভূতিতে আসিতে থাকে। এইরূপে স্তরে স্তরে একই পদার্থ বিভিন্নরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে

মাত্র। এক স্তরে যাহা আছে এবং অনুভাব্য, অন্য স্তরে তাহা আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; সুতরাং উহা উপেক্ষিত ও ভ্রান্তি বলিয়া ধারণা হয়। কিন্তু বস্তুতঃ ভ্রান্তি নহে, শক্তির ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ-ক্রিয়া-প্রকাশ এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তরীয় গ্রহণ-শক্তির গ্রাহ্য মাত্র।

যাহা হউক, বিচারমার্গ যখন আমাদিগের অবলম্বনীয় নহে, তখন আর অধিক মস্তিষ্কজ্ঞান লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। দর্শী হইতে পারিলে তখন আর মীমাংসার বাকী থাকিবে না এবং দর্শী হইতে না পারিলে মীমাংসা কোন প্রকারেই সংসাধিত হইতে পারিবে না, এ কথা আমরা স্থির সিদ্ধান্তস্বরূপ লইয়াছি। সংক্ষেপে তিনটী মত অথবা পর পর তিন স্তরে ব্রহ্ম কিরূপে প্রস্ফুরিত হন, তাহা আমরা নিম্নে তুলনা করিয়া দেখিতেছি।

১। সাংখ্যমতে আত্মা বহু—প্রকৃতি এক, আত্মা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহা বস্তুতঃ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ও তাঁহার মহিমা জ্ঞানশক্তিকে ভিন্ন করিয়া দেখিয়া, কেবলীভাব পাইবার জন্য কথিত।

২। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতে ব্রহ্ম এক হইলেও আত্মা বহু। অচিৎ প্রকৃতি ও ঈশ্বর লইয়াই ব্রহ্ম। প্রকৃতি ও পুরুষ ব্রহ্মেরই উভয় অঙ্গস্বরূপ মাত্র। ইহা ঈশ্বরত্ব ও ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টা।

৩। মায়াবাদ মতে একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মই অবস্থিত। আমরা যাহা দেখিতে শুনিতে পাই, এ সমস্ত সৎও নহে, অসৎও নহে, এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় মিথ্যা বা সদসৎ অনুভূতি মাত্র। ইহা চিৎতত্ত্বের একত্ব ও নির্গুণবাদ স্থাপনের প্রচেষ্টা।

৪। গীতার মতে একরস একমাত্র ব্রহ্ম অবস্থিত, উনি যখন যেরূপে আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন সেইরূপ আপনাকে আপনি উপলব্ধি করেন। যাহা কিছু উনি দর্শন করেন, সে সমস্তই আপনাতে সূত্রে মণিগণের ন্যায় গ্রথিত বা বোধ করিয়া রচিত করেন। অথচ এই সূত্র ও মণি একই পদার্থ। সূত্র যেন তাঁহার নির্গুণ অংশ এবং মণিগণ যেন তাঁহার সগুণ অংশ। অনুভূতি-সকল মিথ্যা নহে, মিথ্যা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। যাহা কিছু ধারণায় আইসে, সমস্তই এক সত্যের সত্য লীলা। ইহাই আর্ষ ব্রহ্মবাদ।

যাহা হউক, দৃষ্টি যতক্ষণ না উন্মেষিত হইবে, অথবা জীবরূপী ব্রহ্ম যতক্ষণ না আপনাকে এই সগুণ ও নির্গুণের কেন্দ্রস্থরূপে দর্শন করিবেন, অর্থাৎ জীবভাবে যতক্ষণ আমরা আক্রান্ত থাকিব, ততক্ষণ আমরা কিরূপ ধারণা করিব? দিক্ ও কাল,

ব্রহ্মের এই উভয় কল্পনায় খণ্ডিত হইয়া তিনি যে বহুরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন, এবং আপনাকে খণ্ড জীব বলিয়া অনুভব করিতেছেন, এ খণ্ড উপলব্ধি যতক্ষণ তাঁহার থাকিবে, ততক্ষণ এই বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিকে কিরূপে বুঝিব? গীতা বলেন, পদার্থ বলিয়া যতক্ষণ জ্ঞান থাকিবে, ততক্ষণ সমস্ত পদার্থকেই ব্রহ্মের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ভাবিবে। যতক্ষণ খণ্ড জ্ঞান থাকিবে,ততক্ষণ ব্রহ্ম সাংখ্যস্তরীয়,এ কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং সাংখ্যস্তরেই তখন ব্রহ্মকে বুঝিতে চেষ্টা করিবে। তাই পরশ্লোকে দেহ ও দেহী বা প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দুই সিদ্ধান্ত লইয়া সাংখ্যস্তর বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ; এবং ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক উপায়ে কি প্রকারে আপনার মুক্ত অবস্থার স্বরূপ জীব দেখিতে পায়, তাহার শিক্ষা দিয়াছেন, আগে আপনার ভিতর নিজের নিত্যত্বটুকু সাংখ্যস্তরে দেখিতে বলিয়াছেন।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮

ভারত! নিত্যস্য অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য শরীরিণঃ ইমে দেহা অন্তবন্ত উক্তাঃ ; তস্মাৎ যুধ্যস্ব।

ব্যবহারিক অর্থ।—নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয় দেহীর দেহসকলই নশ্বর বলিয়া কথিত হয় ; সুতরাং তুমি যুদ্ধ কর।

যৌগিক অর্থ।—এই নিত্যানিত্য বিবেকই এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য। সাংখ্যস্তরে প্রকৃতি পুরুষ, দেহ ও দেহী, আধার ও আধেয়, এইরূপে ব্রহ্ম বিভক্ত হইয়া পরিদৃষ্ট হয়েন। এক অংশকে নিত্য অবিনাশী, অপরিণামী বলিয়া অনুভূত হয় ও অন্য অংশ পরিবর্ত্তনশীল, নশ্বররূপপ্রকাশিনী শক্তিরূপে প্রতীত হইয়া থাকে।

প্রকৃতির এক অংশ—যাহা আমার অবিদ্যাখ্য প্রকৃতি, উহাই পরিবর্ত্তনশীল মাত্র। বহির্জগতে বিরাট্ বিদ্যা প্রকৃতি যেমন পরিবর্ত্তনশীলা, অন্তর্জগতে আমার প্রকৃতিও তদ্রূপ। বহির্জগতে গুণময়ী প্রকৃতি পরমাণুরূপে ও পরমাণুপুঞ্জ বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডরূপে যেমন উঠে, ফুটে ও মিলাইয়া যায়, অন্তর্জগতে আমার গুণময়ী অবিদ্যা প্রকৃতিও তদ্রূপ স্পন্দনের তারতম্যে বিচিত্র অনুভূতি আকারে জন্মাইতেছে—রহিতেছে—আবার মিলাইয়া যাইতেছে। বহির্জগতে হরি হর ব্রহ্মাদি তাঁহাদিগের শক্তিময়ী প্রকৃতির সংযোগে যেমন সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কার্য্য সম্পাদন

করিতেছেন, অন্তর্জগতে আমরাও তদ্রূপ আমাদিগের শক্তিময়ী প্রকৃতির সংযোগে বিচিত্র অনুভূতিসকলের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়কার্য্য সম্পাদন করিতেছি ও ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রগ্রন্থি রচনা করিতেছি। তবে আমরা ব্রহ্মাদি পুরুষের প্রকৃতি-রচিত ব্রহ্মাণ্ডাদিতে বসবাস করি বলিয়া এবং আমাদিগের শক্তি তাঁহাদিগের শক্তির অধীন বলিয়া, আমাদিগের প্রকৃতি বহিঃপ্রকৃতির দ্বারা অহর্নিশ স্পন্দিত ও চালিত হইয়া থাকে। সমুদ্রে যেমন এক বিন্দু বারির স্থান, অধিকার ও স্বাধীনতা, বিরাট্ প্রকৃতিতে আমাদিগের অধিকার ও স্বাধীনতা তদ্রূপ।

অনেকে বোধ হয় জানেন, আমাদিগের শরীরস্থ রক্ত রস মাংসাদি কণাসকল জীবাণু ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদিগের শরীরের রক্তস্রোত হৃৎপিণ্ডের দ্বারা সমস্ত দেহে সঞ্চালিত হইতেছে। রক্তকণারূপী জীবাণুসকল সমস্ত দেহে সঞ্চালিত ও আমাদিগেরই দেহের পোষণশক্তির দ্বারা পুষ্ট হইতেছে। এই রক্ত-কণারূপী জীবাণুসকলকে আমাদিগের দেহের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে যেরূপ উপলব্ধি হয়, সৃষ্টিকর্ত্তাদির সহিত আমাদিগের সম্বন্ধও তদ্রূপ। আমাতে ও আমার দেহস্থ একটী জীবাণুতে যেরূপ সম্পর্ক, ব্রহ্মাদিতে ও জীবরূপী আমাতেও প্রায় সেই সম্পর্ক। আমার দেহটীকে বিরাট্ বলিয়া ধরিয়া লইলে, আমার এই দেহযন্ত্রাদির বিরাট্ গতির তাড়নে জীবাণুসকল সম্বর্দ্ধিত, পুষ্ট, সঞ্চালিত ও নানা-রূপ ভাবান্তর প্রাপ্ত হইতেছে দেখিতে পাই ; অথচ দেহস্থ সেই বিরাট্ গতির মধ্যে থাকিয়াও যেমন সে নিজের হর্ষ শোক অনুভব করে, আমরাও বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের স্রোতে নিমগ্ন থাকিয়া আপনাপন হর্ষ শোক তদ্রূপ অনুভব করি মাত্র। আমারই প্রাণশক্তি যেমন সেই জীবাণুর দেহে প্রাণশক্তি ছড়াইয়া দেয়, বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণশক্তিও তদ্রূপ আমাদিগের দেহে প্রাণশক্তি ঢালিয়া দিতেছে। আমরা জীবিত থাকিতেও আমাদিগের দেহস্থ জীবাণুসকল যেমন স্ব স্ব কর্ম্মবশে মৃত্যু ও জন্মরূপ পরিবর্ত্তন লাভ করে, ব্রহ্মাদির আয়ু বা ভোগকাল সত্ত্বেও তদ্রূপ আমরা জন্ম মৃত্যু আদি বহুবার প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

এইরূপ তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদিগের প্রকৃতিকে বিরাটের অধীন অথচ স্বতন্ত্ররূপে পরিলক্ষিত হয়। স্বাতন্ত্র্য লাভই জীবগতির একটী লক্ষ্যের স্থান—বিরাট্ আত্মা বহু হইবার কল্পনা করিবার পর সেই কল্পনা-বিচ্ছিন্ন খণ্ড আত্মাসকল ধীরে ধীরে আপনাপন স্বাতন্ত্র্য ঘনীভূত করিয়া লইতে থাকে ও এইরূপেই পরমাত্মা জীবাত্মরূপে সীমাবদ্ধ হন। আমিত্বের আবরণ জীবাত্মা এইরূপে সর্ব্বপ্রথম ক্রমশঃ

দৃঢ়তর করিয়া তুলিতে থাকে ও পরে আমিত্বের গণ্ডী সম্পূর্ণভাবে প্রকটিত হইলে তখন জীব আবার ধীরে ধীরে আমিত্বের জ্ঞানটুকু লইয়া অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিতে করিতে অন্তর্মুখে প্রবেশ করিতে থাকে। ইহা আমি পূর্ব্বে বিশদরূপে বুঝাইয়াছি।

জীব যখন মনুষ্যরূপে পরিণত হয়, তখন বুঝিতে হইবে, তাহার আমিত্বের পূর্ণ ঘনীভুত ও সঙ্কীর্ণতম অবস্থা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে, এবং তখন তাহা হইতে সারাংশটুকু লইয়া, স্থূল কোষসকল পরিত্যাগের সময় হইয়া আসিয়াছে; অর্থাৎ বেদান্তের কথায় অন্নময় কোষের কার্য্য করিবার অবসর আর তাহার নাই, মনোময় আদি সূক্ষ্ম কোষে তাহার কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং মনোময় কোষের কার্য্যশৃঙ্খলার বিশ্লেষণই মনুষ্য জীবনের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। এই মনোময় কোষেই জগদাদি প্রতিবিম্বিত,—শীতোষ্ণ, সুখ দুঃখ, স্ত্রী পুত্র, মাতা পিতা, শব্দ রূপ স্পর্শ আদি ভাবসকল মনোময় কোষেরই গুণ, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমি যখন কোন পদার্থ দেখিতেছি বলিয়া অনুভব করি, তখন বুঝিতে হইবে, বাহ্য প্রকৃতির এক প্রকার স্পন্দন আমার মনে ভাবতরঙ্গ জন্মাইতেছে মাত্র। আমি একটী বৃক্ষ দেখিতেছি বলিলে এই বুঝায় যে, বহির্জগতের এক প্রকার তরঙ্গ আসিয়া আমার মনে বৃক্ষরূপ একটী তরঙ্গ তুলিতেছে বা আমার মন বৃক্ষরূপ আকার পরিগ্রহণ করিতেছে। আমি যখন আমার পিতাকে সম্মুখে দেখি ও পিতা বলিয়া পরিজ্ঞাত হই, তখন বুঝিতে হইবে, বাহিরের এক প্রকার স্পন্দন আমার মনে আঘাত করিয়া আমার মনকে তদাকারে পরিণত করিতেছে এবং সেই পিতার মন হইতে যে প্রকার ভাবের তরঙ্গ পূর্ব্ব হইতে ছুটিয়া আমার মনকে স্নেহাদি অনুভূতিতে মগ্ন করিয়াছিল, এখন আমার মন পিতৃদর্শনে সেই সকল ভাবকে পুনরায় ফুটাইয়া স্নেহময় পিতৃ আকার পরিগ্রহণ করিয়াছে। পিতার স্নেহাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সংস্কার ছিল—পিতার স্নেহ ও ভালবাসা পূর্ব্বে আমার মনে যে প্রকার সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছিল, আজ পিতৃমূর্ত্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায়, সেই সকল ভাব মনের ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাহা কিছু আমরা মনে অনুভব করি, তাহা আর কিছুই নহে, আমাদিগের বোধই সেই সকল অনুভূতিরূপ আকার গ্রহণ করে মাত্র। আমি অনুভব করিতেছি অর্থে—আমার বোধ তদাকার প্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং প্রপঞ্চাদি যাহা বাহিরে দৃষ্ট হইতেছে, তাহা আমার বোধের সহিতই বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত। আমার মনই

বৃক্ষলতাদি আকার-সকল ধারণ করিতেছে—আমার মনই অনুভূতির অনুসারে আকার গ্রহণ করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, এ সকল আমার মনেরই পরিবর্ত্তন মাত্র। বাহিরে স্পন্দন আছে মাত্র, যথার্থ জগৎ মনে; আমার মনকে আমি ইচ্ছা করিলে এমন অবস্থায় লইয়া যাইতে পারি, যখন বাহিরে এ জগৎ যেমন আছে, তেমনই থাকিলেও ইহার অস্তিত্ব আমার দ্বারা উপলব্ধ হইবে না। আবার এই মনকে এমন ভাবে পরিণত করা যায় যে, এই জগৎই অন্য প্রকার দেখিতে পাওয়া যাইবে। সুতরাং যাহা কিছু আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর ও অনুভূতিতে আসে, সেগুলি মনের দ্বারাই রচিত এবং মনেরই তরঙ্গভঙ্গ মাত্র—তাহাতে মন ছাড়া আর কোন পদার্থই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জলের তরঙ্গ-সকল যেমন জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, বিষয়সকলও তদ্রূপ মন ছাড়া আর কিছুই নহে। বাহ্য স্পন্দনের ঘাত প্রতিঘাতে মনকে যে যত স্বল্প পরিমাণে স্পন্দিত হইতে দেয়, অর্থাৎ যে যত অল্প মাত্রায় বাহ্য তরঙ্গকে মনের উপর আধিপত্য করিতে দেয়, সে তত নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে বুঝিতে হইবে।

যাহা হউক, বিষয়সকল যেমন মন ব্যতীত কিছুই নহে, প্রকৃতিও তদ্রূপ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমার ভোগাকারীয় বিষয়-সকল যেমন মন হইতে জন্মে, মনে অবস্থান করে ও পুনরায় মনেই মিলাইয়া যায়, প্রকৃতি, জগৎ বা দেহাদি আধারও তদ্রূপ ব্রহ্মে জাত, অবস্থিত ও লীন হইয়া থাকে। এই ফুটিয়া উঠা, থাকা ও মিলাইয়া যাওয়া অবস্থাগুলি নশ্বর দেহ বলিয়া কথিত হয়; এবং উহার উপাদান বা আধেয় বা পুরুষ অবিনাশী অপ্রমেয় হইয়া রহিয়া যায়। শুধু এইরূপে মিলাইয়া যায় বা আদি কারণে লুকাইয়া পড়ে বলিয়া, এই প্রকৃতি অংশকে সাধারণতঃ অন্তযুক্ত বলা হয়। শক্তিত্বের প্রকাশটুকুই দেহপদবাচ্য এবং উহাই পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া জন্ম, মৃত্যু আদি ব্যবধানযুক্ত হইয়া দৃষ্ট হয়; সুতরাং নাশাদির আশঙ্কা অমূলক।

ভাবসকলও ঠিক এইরূপ। মায়া, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়াদি, এ সমস্তও এইরূপ পরি-বর্ত্তনশীলতাবশতঃই সান্ত বলিয়া উক্ত হয়। বস্তুতঃ নাশ বলিয়া কিছুই নাই। আমাদিগের মনে যে ভাবসকল যখন উদিত হইবে, সে সমস্ত ভাবেরই মধ্যে এই-রূপে নিত্য পদার্থের অন্বেষণ করা উচিত। তোমার মনে নানা প্রকারের ভাব উদিত হইতেছে। তুমি যদি সেই ভাবসকলে মুগ্ধ না হইয়া, যাহা ভাবরূপে পরিণত

হইতেছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখ, অর্থাৎ সাগরের তরঙ্গভঙ্গে মুগ্ধ না হইয়া যদি সমগ্র সাগরকে দর্শন কর, তাহা হইলে যেমন তরঙ্গমাত্রই সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই নহে বলিয়া বিবেচিত হয়, তদ্রূপ মনে যখন যেরূপ তরঙ্গ উঠুক না কেন, প্রত্যেকটীতেই যদি মনের সত্তামাত্র দেখিতে অভ্যাস কর, তাহা হইলে দেখিবে, বিনাশ বলিয়া কোন পরিবর্ত্তন নাই।

চিত্তাকাশ দর্শন করিবার ইহা একটী প্রকৃষ্ট উপায়। কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া, মানসিক অনুভূতিসকলের দিকে লক্ষ্য করিয়া উপবিষ্ট হও। মনে পর পর যে ভাবতরঙ্গ সকল উঠিতে থাকিবে, প্রত্যেকটীকেই মনমাত্র বলিয়া ধারণা করিতে থাক। যে ভাবই উঠুক না কেন, ইহা মন ব্যতীত আর কিছুই নহে, এইরূপ চক্ষে প্রত্যেকটীকে দর্শন কর—দেখিও, একটীও যেন বাদ না যায়। যদি প্রত্যেক ভাব-তরঙ্গটিকে এইরূপে মন বলিয়া চিনিতে বা লক্ষ্য করিয়া যাইতে পার, একটিও যদি অসাবধানতাবশতঃ এইরূপে বিশ্লেষিত না হইয়া পলাইয়া যাইতে না পারে, তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই চিত্তাকাশের জ্যোতিঃ পরিদৃষ্ট হইবে ও ভাবাদি আর কিছুই উঠিতে থাকিবে না। ইহা প্রত্যেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

যাহা হউক, যখন ভাবসকল কার্য্যতঃ অবিনশ্বর এবং একমাত্র অবিনশ্বর পদার্থেরই প্রতিবিম্ব মাত্র—তখন তাহাদের রূপান্তরে যে বস্তুগত কোন পার্থক্য সংঘটিত হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত। তখন আবশ্যক বুঝিলে আর ভাবাদির বিপক্ষে যুদ্ধ ক'রবার বাধা কি হইতে পারে? যাহা নিত্য স্থায়ী নহে, তাহার আধিপত্যের অধীনে থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে। যে ভাব নিত্য থাকিবে ও নিত্য আছে, তাহার নিত্য আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখাই মনুষ্যত্ব। যখন মনুষ্যভাবাপন্ন হইয়া আপনার সে নিত্যত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না—যাহা কিছু তোমার উপলব্ধিতে আসিতেছে, সমস্তই যখন তুমি মুহূর্ত্ত পরেই নাশ হইতেছে বলিয়া অনুভব করিতেছ, তখন সে নশ্বর অনুভূতি রাখিবার আবশ্যক নাই। কারণ, যখন এই নশ্বর অনুভূতির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, তখন দেখিবে, বস্তুতঃ যাহা নশ্বর বলিয়া দেখিতেছিলে, তাহা নশ্বর নহে, তাহাও অবিনশ্বর, নশ্বররূপে তোমার অবিদ্যায় প্রতিফলিত হইতেছিল মাত্র। তখন বুঝিবে—

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯

য এনং হন্তারং বেত্তি যশ্চ এনং হতং মন্যতে, উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ; অয়ং ন হন্তি ন হন্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—যে ইহাকে হন্তা মনে করে এবং যে হত মনে করে, তাহাদিগের উভয়ের কেহই জানে না যে, বস্তুতঃ ইহা কাহাকেও হত্যা করেও না এবং হত হয়ও না।

যৌগিক অর্থ।—এই হত ও হন্তারক জ্ঞান, উভয়ই কল্পনা মাত্র। পূর্ব্বোক্তরূপে যখন প্রত্যেক ভাবের মূল সত্তাটুকু অপরিণামী বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে, কেবল তখনই এ হন্তা ও হতজ্ঞান তিরোহিত হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রহ্ম স্বীয় কল্পনানুযায়ী আপনাকে দর্শন করেন এবং যখন যে স্তর দর্শন তাঁহার অভিলাষ হয়, তখন সেই স্তরের উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। তাহা হইলে বিনাশ উপাধি কি প্রকারে থাকিতে পারে? সবই যখন ব্রহ্ম, তখন বিনাশ উপাধি কি প্রকারে তাহাতে সম্ভবপর হয়? বিনাশ অর্থে দৃষ্টির বহির্ভূত হওয়া মাত্র—ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হওয়া। কিন্তু এ দেহের বা প্রকৃতি নামে ব্রহ্মের যে পরিচয়, তাহার কথা পরে বলিব। এখন সাধারণতঃ জীবকে যেমন জন্মমৃত্যুর অধীন বলিয়া উপলব্ধি হয়, সেইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলেও যে দেহাতীত নির্গুণ অংশটুকু থাকে, তাহার কথা বলি। মূলতত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম হইলে, তার পর সগুণ ভাবটুকু বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টরূপে উভয়ের একত্ব প্রতিপাদিত হইবে। সেই জন্য যাঁহারা জড় বলিয়া পৃথক্ প্রকৃতি স্বীকার করেন, তাঁহারাও আত্মার যে প্রকার সত্তা মানিয়া লইয়াছেন, সেই প্রকার সাংখ্যজ্ঞান হইতে আগে আত্মার সাধারণ ধর্ম্মসকল বর্ণনা করিয়া দেখান হইতেছে।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

অয়ং কদাচিৎ ন জায়তে বা ম্রিয়তে, ন ভূত্বা বা ভূয়ঃ ভবিতা, অয়ং অজঃ নিত্যঃ শাশ্বতঃ পুরাণঃ, হন্যমানে শরীরে ন হন্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—ইনি কখন জন্মগ্রহণ করেন না কিম্বা মৃত্যুর কবলে পতিত

হন না ; অথবা উৎপন্ন হইয়া আবার উৎপন্ন হইবেন না। ইনি জন্মহীন, নিত্য, ক্ষয়শূন্য, পুরাণ। শরীর ধ্বংস হইলেও ইনি হত হন না।

যৌগিক অর্থ।—ইহাই আত্মার স্বরূপ। আত্মাকে যিনি যত দূর অধিক দর্শন করুন, এ স্বরূপের কখনও পরিবর্ত্তন হয় না। সাংখ্যমতে প্রকৃতি বলিয়া পৃথক্ একটা পদার্থ স্বীকৃত হইলেও আত্মার যে স্বরূপ স্বীকৃত হয়, তাহা বেদান্তসিদ্ধ। ইহা যোগস্থ হইয়া উপলব্ধি হইতে পারে। মনকে আজ্ঞাচক্রে বা স্বীয় কেন্দ্রে লীন করিতে পারিলে আত্মার এ স্বরূপ প্রকটিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আমাদিগের সাধারণ চক্ষে দ্বৈতভাব ঘুচিবার পূর্ব্বেও আত্মার এই স্বরূপ প্রকটিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং দেহাদি বিনশ্বর, জন্ম মৃত্যুর অধীন হইলেও আত্মার নিত্যত্ব অস্বীকৃত হয় না।

মন যখন কেন্দ্রীভূত হইয়া লীন হইয়া যায়, তখন উহাতে আত্মার প্রতিবিম্ব সম্যক্ পরিদৃষ্ট হয়। আত্মার প্রতিবিম্ব মনেরই তরঙ্গের চারি ধারে বিক্ষিপ্ত হইতেছে ও ইন্দ্রিয়াদিতেও আত্মজ্ঞান ফুটাইতেছে। চঞ্চল জলের উপর চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব যেরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া চারি ধারে ছিন্নভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, আমাদিগের সাধনার সাধারণ অবস্থায় আত্মোপলব্ধি তদ্রূপ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চারি ধারে পরিস্ফুট হইতেছে মাত্র।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১

হে পার্থ! এনম্ অজম্ অব্যয়ম্ অবিনাশিনং নিত্যং যঃ বেদ, স পুরুষঃ কথং কং ঘাতয়তি কং হন্তি।

ব্যবহারিক অর্থ।—হে পার্থ! এই অজ, অব্যয়, নিত্য, অবিনাশীকে যিনি জানিয়াছেন, সে পুরুষ কেমন করিয়া কাহাকে হনন করেন বা হনন করান?

যৌগিক অর্থ।—যখন অজ, নিত্য, অবিনাশী ও অব্যয় বলিয়া আত্মা মাত্র ঘটে ঘটে বা দেহে দেহে প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে,তখন হত্যা আত্মপক্ষে অসম্ভব। কিন্তু এ ধারণা যত দিন না সমাধিস্থ হইয়া আত্মোপলব্ধি হয়, তত দিন বুদ্ধির দ্বারা পরিগৃহীত হইলেও প্রাণে সুপ্রতিষ্ঠ হয় না। এই জন্যই আমাদিগের শাস্ত্রে ক্রিয়াযোগের এত সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ণভাবে ব্রহ্ম উপলব্ধি হইবার

পূর্ব্বে এইরূপে আত্মোপলব্ধির জন্য যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান নিত্যক্রিয়ার অঙ্গস্বরূপ আদিষ্ট দেখিতে পাই। এবং উহাই সমধিক প্রবল ভাবে হিন্দুর ধর্ম্মজগতে প্রতাপ বিস্তীর্ণ করিয়াছে। এই ক্রিয়াযোগের অঙ্গসকল সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে মনুষ্য, দেহ হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, দেহস্থ কোন একটি চক্রে সুখে—দেহের সহিত সম্বন্ধশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে পারে এবং তখন তাহার দেহ মৃতবৎ বিবেচিত হয়। এরূপ অনেক সমাহিত সাধুর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ব্যক্তি অনেক সময় চিকিৎসকাদির দ্বারা মৃত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আবার কিছুদিন পরে তাঁহার সমাধিভঙ্গে মৃতদেহে জীবনসঞ্চারের মত চিকিৎসকেরা তাঁহাকে জীবিত দেখিয়াছেন। এ কথা পরে বলিতেছি।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

নরঃ যথা জীর্ণানি বাসাংসি বিহায়, অপরাণি নবানি গৃহ্লাতি, তথা দেহী জীর্ণানি শরীরাণি বিহায়, অন্যানি নবানি সংযাতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বসন পরিগ্রহণ করে, আত্মা সেইরূপ জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করিয়া থাকেন।

যৌগিক অর্থ।—দেহ কি? মনের সংস্কার মাত্র। মনের সংস্কার ঘনীভূত হইয়া, বাহ্য প্রকৃতি হইতে উপাদানসকল সংগ্রহ করিয়া দেহ রচনা করে। সাধারণ মনুষ্য এই দেহরচনারূপ কার্য্যের জন্য বাহ্য প্রকৃতির নিকট একান্ত ঋণী। বিজ্ঞানময় কোষ যত দিন না দৃঢ় ও ঘনীভূত হয়, তত দিন দেহ ধারণ যে তাহারই স্বেচ্ছাধীন, এ কথা জীব বুঝিতে পারে না; এবং তত দিন সে মনে করে, যেন অন্য কোন ইচ্ছাশক্তি তাহাকে এইরূপে দেহ হইতে দেহান্তরে চালিত ও আবদ্ধ করিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞানময় কোষ ঘনীভূত হইলে বুঝিতে পারা যায়, আত্মা স্বীয় ইচ্ছায় আপনার সংস্কারের বিচার করিয়া নিজ দেহ আকাঙ্ক্ষা করে। নিজের কর্ম্মসকল বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়া এবং সেই সকল কর্ম্মের যেরূপ পরিণাম হওয়া আবশ্যক, তাহা উপলব্ধি করিয়া, বাহ্য জগতে যে অবস্থায় যে স্থলে অবস্থান করিলে সেইরূপ পরিণাম সুসম্পন্ন হইতে পারিবে, সেই স্থলে ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া

জন্মগ্রহণ করে। জন্মগ্রহণ করে অর্থে—বাহ্য জগতে সেইরূপ ফুটিয়া উঠে। মনে যেমন অনুভূতিসকল ফুটিয়া উঠে, মন ঘনীভূত হইলে, সে সকল অনুভূতি যেমন সম্যক্‌রূপে প্রতিফলিত হয়, বিজ্ঞানময় কোষ ঘনীভূত হইলে এই জন্ম মৃত্যু পরিগ্রহণের বিচারসকল তদ্রূপ বুঝিতে পারা যায়। একটী পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য বাহ্য জগৎকে যে ভাবে অনুভব করে, একটী শিশু সে ভাবে পারে না ; তাহার কারণ, শিশুর মনোময় কোষ পূর্ণবয়স্কের মনোময় কোষের মত ঘনীভূত হয় নাই। দুই হাত দূরের পদার্থ শিশুর মনে অনুভূতি জন্মাইতে পারে না। জগতের বিচিত্র চিত্রাবলী শিশু-চক্ষে প্রতিভাত হয় না। শব্দতরঙ্গ শিশুর প্রাণকে অনুভূতিপূর্ণ করিতে পারে না ; তাহার কারণ, শিশুর মন স্পন্দিত হইবার যোগ্য এখনও হয় নাই ; তরঙ্গসকল অবাধে তাহার ভিতর দিয়া চলিয়া যায়। কালের সঙ্গে সঙ্গে মন যত ঘনীভূত হইতে থাকে, বাহ্য জগতের বিভিন্ন স্পন্দন তাহার মনের উপর বিভিন্ন বিভিন্ন স্পন্দন তুলিতে ততই সমর্থ হয় বা ততই বিভিন্ন বিভিন্ন অনুভূতি তাহার প্রাণে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। জগতের বিভিন্ন প্রকার ঘাত প্রতিঘাত তখন সে ধরিতে সমর্থ হয়।

এইরূপ বিজ্ঞানময় কোষ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। আমাদিগের মৃত্যু, জন্ম, অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ইত্যাদির কারণ বিজ্ঞানময় কোষেই ফুটিয়া উঠে। কেন এই অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি—কেন এ অবস্থা ছাড়িয়া অন্য নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় আমায় যাইতে হইবে—পূর্ব্বে কিরূপ অবস্থায় ছিলাম—কিরূপ অবস্থায় পরে যাইতে আমি কৃতসঙ্কল্প, এ সকল বিজ্ঞানময় কোষেই স্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। বিজ্ঞানময় কোষ ঘনীভূত হয় নাই বলিয়া আমরা ইহা দেখিতে পাই না। যাঁহাদিগের বিজ্ঞানময় কোষ ঘনীভূত হইয়াছে, তাঁহারা প্রত্যক্ষবৎ এ সকল অনুভব করিতে পারেন ; এবং তাঁহারাই ত্রিকালদর্শী নামে পরিচিত।

অর্থাৎ বিজ্ঞানময় দেহ গঠিত হইলে জীব বুঝিতে পারে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে প্রবেশ তাহারই বিচারাধীন। আমরা যেমন অভাবের তাড়নায় কখনও আহারে, কখনও নিদ্রায়, কখনও অর্থোপার্জ্জনে সঙ্কল্পবদ্ধ হই ও সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করি, যেখানে যে অবস্থায় যাইলে সেই সকল অভাব পূরণ হইবে, মনের ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যেমন তদ্রূপ কার্য্যে নিযুক্ত হই, আমাদিগের অনন্ত জীবনের গতি সম্বন্ধেও তদ্রূপ আমরা আমাদিগের বিজ্ঞানময় দেহ সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া থাকি। রোগ হইলে আমরা সে রোগের উপশমের জন্য যেমন চিকিৎসকের নিকট যাই—জ্ঞানেচ্ছু হইলে যেমন আমরা জ্ঞানীর শরণাগত হই, এ সকল যেমন

আমাদিগের মনেরই সঙ্কল্প ও বিচারসাপেক্ষ, এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে জন্ম পরিগ্রহণ করা—কখন ধনীর প্রাসাদে—কখনও দরিদ্রের কুটীরে—কখনও সত্ত্বগুণান্বিত—কখনও রজোগুণাবলম্বী—কখনও তমসাচ্ছন্ন হইয়া জগতে দুষ্কর্ম্মের ক্ষয় ও নূতন কর্ম্মের উদ্যোগ ইত্যাদি আমাদিগের অনন্ত জীবনপ্রবাহের জটিল রহস্যসকল ভেদ করিতে বিজ্ঞানময় কোষেই আমরা সঙ্কল্পবদ্ধ হই। যখন যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করি, যখন যেরূপ দুঃখ বা সুখভোগ শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হয়, বিজ্ঞানময় কোষে তদ্রূপ বিচার করিয়া লইয়া আমরা জগতে আবির্ভূত হই। অবস্থান্তরসকল আমারই বিচার ও ইচ্ছাসাপেক্ষ। ঈশ্বর আমাদিগের ইচ্ছানুসারেই আমাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করেন।

জগতে আবির্ভূত হওয়া অর্থে কেহ স্থানের ব্যবধান বুঝিবেন না। বুঝিবেন না, যেন মরিয়া আমরা কোন লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে চলিয়া যাই, আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইলে যেন সেই লক্ষ লক্ষ ক্রোশ ফিরিয়া আসিতে হয়। মরণ ও জন্মের মধ্যে স্থানের ব্যবধান নাই। মরিলাম অর্থে—সাধারণ জগতের ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে অন্তর্হিত হইলাম মাত্র। অর্থাৎ আমার সে অবস্থা সাধারণের ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা প্রত্যক্ষগোচর হইবার উপযুক্ত আর রহিল না।

এ মৃত্যু কেমন করিয়া সংঘটিত হয়? কিরূপ প্রণালীতে জীবাত্মা দেহ হইতে বহির্গমন করেন? সাধারণতঃ বার্দ্ধক্য অবস্থায় যখন জীবাত্মা দেখেন, ইন্দ্রিয়সকলের ভিতর দিয়া দীর্ঘকাল শক্তির যাতায়াতে উহাদিগের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হইয়াছে, আর পূর্ব্ববৎ কার্য্যকারিতা নাই বা পূর্ব্বের মত অনুভূতি উৎপাদন করিতে সক্ষম নহে, তখন অথবা ইন্দ্রিয়াদি সবল ও কার্য্যক্ষম থাকিতেও কর্ম্মের বৈচিত্র্যপ্রভাবে তাঁহার নব কলেবর ধারণ আবশ্যক বলিয়া যখন বিবেচিত হয়, তখন অন্য দেহ পরিগ্রহণের জন্য পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার স্বতঃস্ফুরিত শক্তিকে আর স্ফুরিত হইতে না দিয়া, কূর্ম্ম যেমন আপনার মধ্যে আপনি অঙ্গ গুটাইয়া লয়, তেমনি ভাবে শক্তিকে আপনার ভিতর অনুপ্রবিষ্ট করিয়া লয়েন। তখন দেহের ভিতর প্রলয় সংসাধিত হইতে থাকে। দেহস্থ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চ তত্ত্ব আত্মশক্তির বিচ্ছেদে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে থাকে। এই অবস্থার স্বরূপবর্ণনা শাস্ত্রে প্রলয় নামে বিবৃত হইয়াছে। আমরা সে দৈহিক পরিবর্ত্তনের কথা এ স্থলে আলোচনা করিব না; শুধু আত্মার বহির্গমনের প্রণালীটুকু দেখিব।

সাধারণতঃ জীব ইন্দ্রিয়পথে নিষ্ক্রান্ত হয়েন। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসা, মুখ আদি দিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন। যে মনুষ্য জীবিত অবস্থায় যে প্রকার বৃত্তির সমধিক চালনা করে, মৃত্যুকালে তৎকার্য্যকারী ইন্দ্রিয়পথ অবলম্বন করিয়া তাহার প্রয়াণ সংসাধিত হয়। অতিরিক্ত হীনচিত্ত সংকীর্ণপ্রাণ ব্যক্তি পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া বিনির্গত হয়; অত্যধিক উদরপরায়ণ ব্যক্তিগণ, যাহারা উদরপূর্ত্তির দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছে, তাহারা গুহ্যদ্বার দিয়া বহির্গত হয়। কামুক লিঙ্গপথে প্রস্থান করিতে বাধ্য হয়। সাধারণ মৃত্যুভয়-শঙ্কিত বুদ্ধিজীবী জীব মুখবিবর দিয়া, মেধাবিশিষ্ট শান্তপ্রকৃতি ধর্ম্মভীরু জীব নাসিকা, চক্ষু অথবা কর্ণপথে প্রস্থান করে। সাধারণ জীবমণ্ডলীর এইগুলিই মৃত্যু-দ্বার। ধর্ম্মপ্রাণ সাধনাতৎপর—ভগবান্‌ই যাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, এরূপ ব্যক্তি ললাটপথে বিচরণ করেন, এবং যাঁহাদিগের সাধনা কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে, তাঁহারা ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া ব্রহ্মলোকে মহাপ্রয়াণ করেন। নিম্নদ্বার দিয়া বহির্গমন নিম্নগতির লক্ষণ।

জীবাত্মা যখন দেহ হইতে বহির্গত হইবার জন্য আপনার স্ফুরণশক্তি দেহের দিক্ হইতে ফিরাইয়া লয়েন, তখন মনোময় কোষ ক্রমশঃ আচ্ছন্ন, জ্যোতিহীন হইয়া পড়িতে থাকে—অনুভূতিসকল ক্রমশঃ লোপ হইয়া যায়—জ্ঞানের বিকাশ রোধ হইয়া যায়—প্রাণশক্তি অঙ্গসকল হইতে অপসৃত হইয়া যাইতে থাকে।

মন যখন এইরূপে ক্ষীণতর হইতে থাকে, তখন তাহার জীবিত অবস্থার প্রধান প্রধান ভাবগুলি মাত্র শেষ পর্য্যন্ত স্বপ্নবৎ উপলব্ধি হইতে থাকে। যেগুলি অস্থায়ী দুর্ব্বল—জীবিত কালে অল্প সময় মাত্র মনের উপর আধিপত্য করিয়াছিল, সেগুলি আগে মিলাইয়া যায়। যে ভাবগুলি যত অধিক ক্ষণ মনের উপর জীবিতাবস্থায় কার্য্যকারী থাকিত, সেইগুলি তত অধিক ক্ষণ বিকশিত থাকে। মনের অনুভূতি-শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যাইবার শেষ মুহূর্ত্তে সেই জন্য যে ভাবটি সমধিক প্রবল ছিল—সেই ভাবটিই স্ফুরিত থাকে।

ভাবের সঙ্গে বেদান্তোক্ত প্রথমসৃষ্ট তেজস্তত্ত্ব বা শক্তির সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শক্তির সহিত ইন্দ্রিয়সকলও তদ্রূপ সম্বন্ধবদ্ধ। প্রাণে একটি ভাব ফুটিলে সেই ভাবটি শক্তিকে উদ্দীপ্ত করে, এবং সেই শক্তিটুকু—সেই ভাবটি যে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, সেই ইন্দ্রিয়পথে ছুটিয়া যায়।

প্রাণে ভাবসকল ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য ইন্দ্রিয়সকল চঞ্চল হইতে

সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। হৃদয়ে ক্রোধ উদ্ভূত হইলে হস্তপদ সঙ্কুচিত ও দৃঢ় হইয়া উঠে, লোভ উপস্থিত হইলে রসনায় লালা নিঃসৃত হয়। কোন পদার্থের দর্শন কল্পনায় আসিলে চক্ষুঃ বিস্ফারিত বা দর্শনযোগ্য আকার গ্রহণ করে। ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ইন্দ্রিয়সকলও যে সঞ্চালিত হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন প্রাণের সমস্ত ভাব মন হইতে মিলাইয়া যাইতে থাকে, কেবলমাত্র জীবিতাবস্থার প্রবল ভাবগুলি উজ্জীবিত থাকে, তখন পূর্ব্বোক্ত কারণে সেই সেই ভাব যে ইন্দ্রিয়ের উপর কার্য্যকারী, সেই ইন্দ্রিয়পথে প্রাণ-শক্তিকে চালিত করে। সুতরাং জীবাত্মাও সেই ইন্দ্রিয়ে গিয়া অশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সমস্ত শক্তি বা তেজ সংগৃহীত হইলে সেই ইন্দ্রিয়পথেই তিনি নির্গত হইয়া যান।

মনে কর, কোন ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় একান্ত উদরপরায়ণ ছিল। তাহার মনের উপর আহারের চিন্তাই চিরদিন প্রবলভাবে আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে। তাহার মৃত্যুকালে মনোময় কোষ হইতে অনুভূতিসকল যখন ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতে থাকিবে, তখন একমাত্র আহারচিন্তাই স্বপ্নবৎ উজ্জীবিত থাকা সম্ভব। যে ভাব যত অধিক ক্ষণ প্রাণে কার্য্য করে, সে তত বলশালী হয়; এবং অন্যান্য ভাব মিলাইয়া গেলেও সেইটীই শেষ পর্য্যন্ত মনে ফুটিয়া থাকে। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবগুলি মিলাইয়া গেলেও সেই প্রবল ভাবটী প্রতিরোধ অভাবে সমস্ত মনের উপর আধিপত্য করিবার অবসর পায়। সুতরাং উদরপরায়ণ ব্যক্তির সমস্ত ভাব মিলাইয়া গেলেও শেষ মুহূর্ত্তে যে আহারচিন্তাই বলবতী থাকিবে, ইহা স্থির। সাধারণতঃ আহার ক্ষিতি ও রসতত্ত্বের পোষক। আহার অপরিমিত ও লোভযুক্ত না হইলে ইহা রসতত্ত্বের পরিবর্দ্ধন করে, এবং অপরিমিত ও লোভযুক্ত হইলে ক্ষিতিতত্ত্বের পরিচালক। সুতরাং উদরপরায়ণের আহার ক্ষিতিতত্ত্বের উপর সমধিক ক্রিয়াশীল। মৃত্যুকালে এই উদরপরায়ণের হৃদয়ে যখন সমস্ত ভাব সুপ্ত হইয়া পড়িবে, কেবলমাত্র তাহার জীবনের আহার-সংস্কারের স্বপ্ন জাগরিত থাকিবে, তখন ক্ষিতিতত্ত্বের কর্ম্মেন্দ্রিয়-পথে তাহার শক্তির ও আত্মার গতি হইবে। ক্ষিতি-তত্ত্বের কর্ম্মেন্দ্রিয় পায়ু; সুতরাং উদরপরায়ণের আত্মা ও শক্তি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে গুহ্যদ্বারেই অবস্থান করিবে, এবং মৃত্যুরূপে পরিবর্ত্তনটুকু সম্পূর্ণরূপে সংসাধিত হইলে ঐ পথেই নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইবে।

জীবাত্মা এইরূপে আপনার সংস্কারানুযায়ী ঊর্দ্ধ অথবা নিম্নপথে বহির্গত হন। ঊর্দ্ধ অথবা নিম্নপথে বহির্গমনই ঊর্দ্ধ অথবা নিম্নগতির চিহ্ন। যোগী পুরুষদিগের প্রাণে মৃত্যুর সময় ভগবদ্‌ভাব প্রবল থাকে বলিয়াই তাঁহারা ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া নির্গত হইয়া যান। যেমন উদরপরায়ণের দৃষ্টান্তে বুঝিয়াছি, আহারের প্রবল সংস্কার মৃত্যুর সময় মনে ফুটিয়া থাকে বলিয়া সে নিম্ন ইন্দ্রিয়পথে বিনির্গত হয়—তদ্রূপ যোগীর প্রাণের প্রয়াণকালের ভগবদ্‌ভাব তাঁহাকে ঊর্দ্ধে বা ব্রহ্মরন্ধ্রে নীত করে, এবং তিনি সেই পথে নির্গত হইয়া বায়ু ভেদ করিয়া শর যেমন নির্ব্বিঘ্নে লক্ষ্যে গিয়া পৌঁছায়, তেমন ভাবে ব্রহ্মলোকে গিয়া উপনীত হয়েন।

ইহা হইতে প্রধানতঃ এই তত্ত্বটি উপলব্ধ হইতে পারে যে, প্রাণের উপর ভগবচ্চিন্তার সংস্কার অন্যান্য চিন্তা অপেক্ষা প্রবল হইলে তবেই মৃত্যুর পর ঊর্দ্ধ-লোক প্রাপ্তি ঘটিতে পারে। অন্যথা কোন প্রকারেই হইতে পারে না। এবং সেই জন্যই যাহাতে মৃত্যুকালে ভগবচ্চিন্তা প্রাণে সজাগ থাকে, তাহার প্রকৃষ্ট উপায় অবধারণাই সাধকজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। কোন প্রকারে মৃত্যুকালে ভগবদ্ভাব প্রাণে যাহাতে ফুটিয়া উঠে, তাহার কোন পন্থা আছে কি না, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে চিন্তা যত অধিক ক্ষণ প্রাণে কার্য্যকরী থাকে, উহা তত দৃঢ়ভাবে খোদিত হইয়া যায়। এবং যখন সমস্ত সংস্কার মিলাইয়া যাইতে থাকে, তখন যেটী গভীর ভাবে খোদিত, সেটী ক্ষয়িত হইয়া যায় না। যেমন একখানি প্রস্তরখণ্ডের উপর যদি কতকগুলি রেখা অঙ্কিত করা যায়, এবং তার পর অন্য কোন পদার্থ দিয়া যদি সেই প্রস্তরখানিকে ঘর্ষণ করা যায়, তাহা হইলে ক্রমশঃ যেমন অগভীর রেখাগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়া, কেবলমাত্র গভীর ভাবে খোদিত রেখাগুলি অবশিষ্ট থাকে, মৃত্যুকালে মনোময়-কোষের অবস্থা তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। এবং সেই জন্যই ভগবচ্চিন্তার গভীর সংস্কার প্রাণের উপর আধিপত্য করাই যে ঊর্দ্ধগতির একমাত্র উপায়, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই ভগবৎসংস্কারকে সুদৃঢ় করিবার একটী প্রণালী যোগীদিগের বিদিত আছে। সাধকমাত্রেরই উহার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। প্রত্যহ নিশাকালে শয়ন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যথাসাধ্য পবিত্রভাবে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া শয়ন করিবে। শয়ন করিয়া ভগবানের পদ্মনাভমূর্ত্তি চিন্তা করিবে। চিন্তাকালে চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত থাকিলেও ললাটের দিকে উহা আকৃষ্ট করিয়া রাখিবে। পদ্মনাভমূর্ত্তির প্রধান লক্ষণ, ভগবানের নাভিস্থানস্থ পদ্মমধ্যে ব্রহ্মার অধিষ্ঠান। তুমি ভাবিবে, যেন

ভগবান্ সমুদ্রে শায়িত এবং তাঁহার নাভিস্থল হইতে একটী পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া, তাহা হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যখন তুমি তন্ময় হইতে অভ্যস্ত হইবে, তখন বুঝিবে, তোমার চিন্তা প্রগাঢ় হইয়াছে। অবশ্য চিন্তায় তন্ময় হওয়া একেবারে ঘটিবে না ; চিন্তা করিতে করিতে প্রথম প্রথম তুমি নিদ্রিত হইয়া পড়িবে ; কিন্তু তাহাতেও কাজ হইবে। একটু আগ্রহের সহিত চিন্তা করিলেই তোমার চিন্তা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে এবং ধীরে ধীরে নিদ্রা যেমন আসিতে থাকিবে, তোমার মনে হইবে, যেন তুমি ঐ ধ্যেয় মূর্ত্তিতে মিলাইয়া যাইতেছ। এইরূপ ধ্যেয়মূর্ত্তির সহিত মিলিত হইয়া যাওয়া গাঢ়তর হইলে তুমি সেই নিদ্রা ও জাগরণের সঙ্গম সময়ে অনুভব করিবে, যেন তুমিই সাগরশয্যাশায়ী এবং তোমারই নাভিস্থলে ব্রহ্মশক্তি অধিষ্ঠিত। তখন তোমার আত্মা নিদ্রাকালে অপূর্ব্ব দৃশ্যসকল দেখিতে পাইবে। উহা স্বপ্ন মনে করিও না, আধ্যাত্মিক জগতের ছবি বলিয়া ভাবিবে, এবং তখন হইতে যদি আজ্ঞাচক্রে মনকে সংযত রাখিতে অভ্যাস কর ও কৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে তুমি তোমার নিদ্রাবস্থার স্বরূপ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইবে।

নিদ্রাকালে আত্মা অনন্তশয্যাশায়ী হন। আপনার কারণ-শরীররূপ সাগরে তিনি ভাসমান থাকেন ; অথবা প্রাজ্ঞ পুরুষে বা কারণবারিশায়িত নারায়ণে মিলিত হইয়া যান। সুপ্তিতে জীব ঈশ্বরে একীভূত হয়, ইহা শ্রুতির কথা। এবং ব্রহ্মা বা সৃষ্টিশক্তি তাঁহার নাভিপদ্মে কেন্দ্রীভূত হইয়া অবস্থান করেন। তুমি নিদ্রাবস্থায় রক্তবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় সৃষ্টিশক্তিকে বা স্থূল প্রাণশক্তিকে নাভিস্থলে যোগমগ্ন দেখিতে অভ্যাস করিবে। ঐ ব্রহ্মশক্তি তোমার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ ভাবে তোমার স্থূল শরীরের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দেহাভ্যন্তরে সৃষ্টি-কার্য্য সম্পাদন করেন, ক্রমশঃ তাহা দেখিয়া পুলকিত হইবে।

এইরূপ ভাবে নিদ্রিতাবস্থায় দেহাভ্যন্তরে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কার্য্য এক আনন্দ-রসে পর্য্যবসিত হয়, এবং উহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় বলিয়াই শাস্ত্রে শয়নকালে পদ্মনাভমূর্ত্তি চিন্তা করিবার বিধান করিয়াছেন।

যাহা হউক, নিদ্রাকালে এইরূপে জাগ্রত থাকিবার অভ্যাসে দৃঢ়ীভূত হইতে থাকিলেই বুঝিবে, তুমি মৃত্যুসময়ে জাগ্রত থাকিবার অভ্যাসে অভ্যস্ত হইতেছ। মৃত্যুকালে ধীরে ধীরে যখন তুমি মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতে থাকিবে, তখন এই অভ্যাস তোমায় জাগ্রত রাখিতে সক্ষম হইবে। তখন তুমি বহি-

জগতের চক্ষে মৃত্যুর গভীর অন্ধকারে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছ বলিয়া অনুমিত হইলেও তুমি আপনি প্রত্যক্ষভাবে বুঝিতে পারিবে, তুমি এক অপূর্ব্ব শান্তিময় অনন্ত-বিস্তৃত স্নিগ্ধ সাগরে শায়িত হইতেছ; এবং তোমার শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া যোগস্থ হইতেছেন। ঐ শক্তির কেন্দ্রই ব্রহ্মলোক; এবং উহা প্রত্যক্ষ হইলেই বুঝিতে হয়, তুমি ব্রহ্মলোকে নীত হইতেছ।

নিদ্রাকে খণ্ড মৃত্যু বলিয়া বুঝিবে। এবং প্রতি খণ্ডমৃত্যুতে এইরূপে ব্রহ্ম-দর্শনে অভ্যস্ত হইলে মহামৃত্যুর আশঙ্কায় আর তোমায় ভীত হইতে হইবে না। মৃত্যু বিভীষিকাময়ী না হইয়া তখন সত্য জীবনের সন্ধান বলিয়া দিবে। তোমার সমস্ত জীবন ধরিয়া যাহা কিছু করিতেছ, বুঝিও, ইহা এক দিনের অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছ।

রঙ্গমঞ্চের অভিনেতৃবর্গ যেমন আপনাপন অভিনয় দেখাইবার পূর্ব্বে আপনার অভিনয়টুকু অভ্যস্ত করিয়া লয়, সারা জীবনব্যাপী তোমার কর্ম্মকুঞ্জ তদ্রূপ বুঝিবে। মৃত্যুশয্যা সে অভিনয়ক্ষেত্র—মৃত্যুই তোমার সে অভিনয়। কিরূপভাবে তুমি তোমার অভিনেয় অংশটুকু অভ্যাস করিয়াছ, মৃত্যুসময়েই তাহার পরীক্ষা। যদি প্রত্যহ সেই মহা অভিনয়ের অভ্যাস নিয়মিতরূপে করিতে থাক, তবেই তুমি সুচারুভাবে অভিনয় করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে সমর্থ হইবে। এখন হইতে সে অভ্যাস যদি না কর, তাহা হইলে রঙ্গমঞ্চে হাস্যাস্পদ হইবে মাত্র।

এই জন্যই এক হিসাবে মরণের জন্য প্রস্তুত হওয়াই যেন জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যাহা হউক, মৃত্যুকালে আপন সংস্কারানুযায়ী আত্মা আপনার নির্গমনোপ-যোগী দ্বারে উপস্থিত হইলে তখন ধীরে ধীরে তাঁহার প্রাণশক্তি গুটাইয়া আসিয়া তাঁহাতে লিপ্ত হইতে থাকে; এবং দেহের বাহিরে আসিয়া ব্যোমপরমাণুতে গঠিত একটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। দেহ হইতে অল্প ঊর্দ্ধে এই মূর্ত্তি সংসাধিত হয়; এবং দেহাভ্যন্তর হইতে প্রাণশক্তি আসিয়া ঐ দেহে আশ্রয় লাভ করে। স্রোতের জলে যেমন মরাল ভাসিতে ভাসিতে আসিতে থাকে, তেমনই ভাবে আত্মা দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঐ প্রাণময় দেহে আশ্রয় লাভ করেন। এ স্রোতটি শুভ্র সূত্রের আকারে বহির্গত হয়। আত্মা বহির্গত হইবার পরও এই সূত্রটী কিছু ক্ষণ দেহে সংযুক্ত থাকে। যতক্ষণ না সমস্ত শক্তিটুকু নিঃশেষিত হইয়া বহির্গত হইয়া আসে, ততক্ষণ এই সূত্র

পরিদৃষ্ট হয় ; এবং ততক্ষণ জীবাত্মা পরিত্যক্ত জীর্ণ দেহের নিকট অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময়ে যখন অন্নময় স্থূল দেহের বাহিরে গিয়াও আত্মা সে দেহের সহিত ঈষৎ সংযুক্তভাবে তাহার নিকট অবস্থান করেন, তখন সে স্থলে পবিত্র-ভাবে ঈশ্বরের নামাদি কীর্ত্তন করিলে, তিনি তাহা শ্রবণ করিতে সক্ষম হন, এবং তাহাতে তাঁহার মনোময় কোষে ভগবৎসংস্কার ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইতে পারেন। মৃত্যুকালে মৃত ব্যক্তির নিকটে শোক করিতে নাই ; তাহাতে তাহার চিত্তবিভ্রম ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বলিয়াছি, মৃত্যুক্ষণই অভিনয়ের সময়। সে সময় চিত্তবিভ্রম ঘটিলে সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইতে পারে ; এবং উর্দ্ধগতিরও ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। আবার মৃত্যুসময়ে ঈশ্বর-স্মরণ করিয়া তাহার প্রাণে ঈশ্বরভাব সজাগ করিয়া দিতে পারিলে, তাহার উর্দ্ধগতির পক্ষে সাহায্য করা হয়। আমি এ সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। কোন পল্লীগ্রামে একটী কৃষক মৃত্যুকালে কি প্রকারে অপরের সাহায্যে সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কৃষকটীর মৃত্যুসময় উপস্থিত ; তাহার চারি ধারে স্ত্রী পুত্রাদি আত্মীয়বর্গ তাহাকে বেষ্টন করিয়া শোকে মর্ম্মভেদী চীৎকার করিতেছে। প্রতি-বেশীরা তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া তাহাদিগের সে শোকাকুল ভাব দর্শন করিয়া অশ্রুপাত করিতেছে। শোকের সে হৃদয়বিদারক দৃশ্য শান্তিকে সরাইয়া দিয়াছিল। দারুণ অশান্তির মধ্যে সে কৃষকের আত্মা দেহ হইতে বহির্গত হইতেছিল, এমন সময়ে তাহাদিগেরই একজন ব্রাহ্মণ প্রতিবেশী সে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া সকলকে সরাইয়া দিয়া, কৃষকের আত্মীয় স্বজনকে মৃদু ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, যে তোমাদিগকে এত দিন ধরিয়া ভরণ পোষণ করিয়া আসিল,আজ মৃত্যুসময়ে তাহার হৃদয়ে অশান্তির উচ্ছ্বাস তুলিয়া কেন কৃতঘ্নতা করিতেছ ? এস, আমার সঙ্গে এই মহামুহূর্ত্তে ভগবৎনাম কীর্ত্তন কর। উহাকে সারা জীবনব্যাপী পরিশ্রমের পর শান্তিতে বিশ্রাম লাভ করিতে দাও।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দৃঢ় আদেশে তাহার আত্মীয়বর্গ বস্তুতঃই শোক প্রকাশে বিরত হইল এবং ব্রাহ্মণের সহিত সমস্বরে তাহারা ভগবৎনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণের ঈশ্বরনাম স্মরণে লোচনদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। শোকের উচ্ছ্বাস নিভিয়া গিয়া সেখানে ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইল। কৃষকের দেহ ক্রমশঃ স্পন্দনহীন মৃতদেহে পরিণত হইল—কৃষক মরিল।

উক্ত গ্রামখানি কোন নদীতীরে অবস্থিত। সেই নদীর কূলে বসিয়া জনৈক

গৈরিকধারী পুরুষ নদীর শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন। এমন সময়ে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্নান করিবার জন্য সেই ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটটী গ্রাম হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ব্রাহ্মণ সেইখানে সেই গৈরিক বসনধারী পুরুষকে সাধু বিবেচনা করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সেই সাধু ঐ গ্রামখানি লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "———নামে কোন কৃষক কি এইমাত্র মারা গিয়াছে?" অত শীঘ্র গ্রামের সংবাদ সেই ঘাটে আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া কৃষকের মৃত্যু-বৃত্তান্ত সাধুকে বলিলেন, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কিরূপে কৃষকের মৃত্যুসংবাদ জানিলেন। তখন সাধু ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনার দ্বারা ঐ কৃষকের যথেষ্ট উপকার সংসাধিত হইয়াছে। দেহত্যাগের পর সেই কৃষক এইমাত্র আমার নিকট আসিয়াছিল। আমি অর্দ্ধঘণ্টা মাত্র এখানে আসিয়া একটু বিশ্রামের জন্য এই বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়াছি। স্থানটী নির্জ্জন পাইয়া আমি একটু ভগবচ্চিন্তা করিতেছিলাম। সহসা দেখিলাম, একটী জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহে আমার সম্মুখস্থ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল এবং সদ্গতির জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করিল। আমি তাহাকে ভগবৎনাম শুনাইয়া দিয়াছি, তাহার সদ্গতি হইয়াছে। তাহার মৃত্যুকালে আপনি ঐরূপে ঈশ্বরনাম কীর্ত্তন না করিলে তাহার এই সুযোগ ঘটিত না।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, মৃত্যুকালে প্রাণে কোন প্রকারে একটু ভগবদ্ভাব উদিত হইলে সদ্গতি অনিবার্য্য।

যাহা হউক, এইরূপে আত্মা দেহত্যাগ করেন। এইরূপে পরিত্যজ্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ অবলম্বনে প্রেতাদি লোকসকল ভোগ ও তাহাও অতিক্রম করিয়া শক্তি অনুযায়ী জ্ঞানযুক্ত বা অজ্ঞান অবস্থায় বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত উঠিয়া, পুনরায় আপন কর্ম্মানুযায়ী দেহ ধারণের জন্য বহির্ম্মুখী হইয়া ধীরে ধীরে বাহ্য জগতে প্রকাশ পান।

আমাদিগের এই বাহ্য জগতের ঠিক পরের সূক্ষ্ম স্তরই ভুবর্লোক। জীবমাত্রকেই ভুবর্লোক অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। সাধারণ জীবপ্রবাহ দশ দিন হইতে এক বৎসরের মধ্যে এই প্রেতলোক অতিক্রম করে। জীবিতাবস্থায় যাহাদিগের চিত্তে প্রবল আশক্তি বর্ত্তমান থাকে—কোন কার্য্য করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প প্রাণে বর্ত্তমান থাকিতে যদি কেহ দেহত্যাগ করে,—মনের কোন প্রবল বাসনা অপূর্ণ

থাকিতে যদি কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে এই লোকে অধিক দিন বসবাস করিতে হয়। এই লোকে কর্ম্মের বেগটুকু ক্ষয় হয়। যেমন কোন জিনিষ ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাতে শক্তিপ্রয়োগ বন্ধ করিয়া দিলেও কিছুক্ষণ উহা পূর্ব্ব-শক্তিবলে ঘুরিতে থাকে, এবং শক্তি নিঃশেষিত হইলে ক্রমশঃ স্থির হইয়া যায়, মৃত্যুর পর আমাদিগের ইহলোকের সংকল্পের বেগসকল যতক্ষণ প্রবল থাকে, যতক্ষণ সে বেগটুকু মন্দীভূত হইয়া না যায়, ততক্ষণ তদ্রূপ আমরা এই প্রেতলোকে থাকিতে বাধ্য হই। ঐ বেগটুকু ক্ষয়ীভূত হইয়া গেলেই আমরা এই লোক অতিক্রম করি।

প্রেতলোকে ভোগ্য সামগ্রী আছে, অথচ ভোগের তৃপ্তি নাই—ইহাই প্রেতলোকের যন্ত্রণা। ইচ্ছামাত্র আপনার সংকল্পানুযায়ী পদার্থ পাওয়া যায়, কিন্তু সে বস্তু ভোগ করিয়া ভোগের তৃপ্তি তাহাতে পাওয়া যায় না। কোন বস্তু আহারের ইচ্ছা হইলে, সে আহার্য্য-সামগ্রী তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই জগতে আহারে যেমন ক্ষুধা নিবৃত্তির একটী শান্তি আছে, প্রেতলোকে তাহার তিলমাত্রও নাই। খাইতেছ, পান করিতেছ, কোন জিনিষ স্পর্শ করিতেছ ; অথচ খাইয়া পান করিয়া, ইহ জগতে যে সুখানুভূতি আছে, সেখানে উহা বিরল বা সামান্য মাত্রই পাওয়া যায়। ইহাই প্রেতলোকের বিড়ম্বনা।

ইহ জন্মের যে সংকল্প প্রবলভাবে বর্ত্তমান থাকে, প্রেতলোকে উহা ভোগ হয় বলিয়া আমাদিগের প্রেতশরীরও তদ্রূপ আকারে গঠিত হয়। রসনার পরিতৃপ্তি করিতে যাহারা সদসৎ বিচারজ্ঞানশূন্য হইয়া যথেচ্ছ আহারে অভ্যস্ত, প্রেতলোকে তাহাদিগের লোলজিহ্বা বক্ষঃস্থল অবধি প্রসৃত হইয়া ঝুলিতে থাকে। এইরূপে যে ইন্দ্রিয়ের অযথা ব্যবহার ও যথেচ্ছ চরিতার্থতায় ইহ জীবনে আমরা অভ্যস্ত হই, প্রেতশরীরে আমাদিগের সেই ইন্দ্রিয় অযথাভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগের আকারকে বিকট করিয়া তুলে। অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। যে সকল দুরাকাঙ্ক্ষাকে প্রাণের ভিতর আমরা অহরহঃ পোষণ করি, প্রেতলোকে সেই সকল আকাঙ্ক্ষা অগ্নিশিখাবৎ হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হয়, এবং অসীম জ্বালা প্রদান করে।

যাহা হউক, ইহলোকস্থ সংকল্পসকলের বেগানুযায়ী এইরূপে প্রেতলোকে জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করিয়া, তার পর আমাদিগের প্রেতশরীর ক্ষয় হইয়া যায়। অর্থাৎ ইহলোকে যেমন অন্নময় কোষে মৃত্যু সংসাধিত হইয়াছিল, প্রেতলোকেও

তদ্রূপ আমাদিগের প্রেতশরীরেরও মৃত্যু সংসাধিত হয় এবং তখন আমরা মনোময় দেহ লাভ করিয়া, স্বর্গলোকে পুণ্য কর্ম্মের ভোগের জন্য নীত হই।

এইরূপে স্তরে স্তরে আমাদিগের এক একটী আবরণ খসিতে থাকে। এই আবরণ খসার নামই মৃত্যু। কিন্তু বলিয়া রাখি, এইরূপে স্থূল আবরণ খসিয়া যত সূক্ষ্ম আবরণ প্রকাশ পাইতে থাকে, আমাদিগের অনুভূতিও তত ক্ষীণ ও স্বপ্নবৎ হইয়া যায়। যাঁহাদিগের সূক্ষ্মশরীর সাধনা প্রভাবে কার্য্যক্ষম হইয়াছে, তাঁহাদিগের মনোময় কোষে বিজ্ঞানময় বা স্বর্গ ও উদ্ধতমলোকের ভোগসকল সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয় এবং এই সকল আনন্দময় নগরের আনন্দ সম্ভোগ করিতে তাঁহারা সক্ষম হয়েন। কিন্তু সাধারণ জীবের, যাহাদিগের ঐ সূক্ষ্ম কোষ বা আবরণসকল সাধনা প্রভাবে এখনও যথোচিত সংস্কৃত ও পুষ্ট হয় নাই, তাহাদিগের স্বর্গাদি উদ্ধতর লোকের ভোগসকল স্বপ্নবৎ অনুভূত হয় এবং বিজ্ঞানময় কোষের অনুভূতি তাহাদিগের প্রায় থাকে না। জীব অজ্ঞান হইয়া গেলে সে যেমন আপন অস্তিত্ব অবধি উপলব্ধি করিতে পারে না, বিজ্ঞানময় কোষে তেমনই সাধারণ জীব আপনার অস্তিত্ববোধ অবধি প্রায় হারাইয়া ফেলে। এবং পুনরায় কি ভাবে জগতে অবতীর্ণ হইতে হইবে—কিরূপ ক্ষেত্রে, কিরূপ সময়ে, কিরূপ অবস্থায় অবতীর্ণ হইতে হইবে ও কোন্ কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, ইত্যাদিরূপ আপনার বিচার-রহস্য সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতে পারে না।

যাঁহারা সাধনা-তৎপর এবং ঈশ্বরপরায়ণ, প্রেতলোকটি তাঁহারা মুহূর্ত্তে ভেদ করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু সাধারণ মনুষ্য প্রেতলোকের তৃপ্তি ভোগ না করিয়া ইহা অতিক্রম করিতে পারে না। সারা জীবন নিকৃষ্ট চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া যাহারা দেহত্যাগ করে, তাহাদিগের প্রেতলোকের যন্ত্রণা অবর্ণনীয়।

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে অধিক বলিবার আবশ্যক এ স্থলে নাই। দেহসকল যে বস্ত্রবৎ আমাদিগের অঙ্গের আবরণ মাত্র, এইটুকু বুঝাইবার জন্য আমি আর একটী কথা বলিব। উহা পরকায়-প্রবেশ। অনেক সাধু সম্বন্ধে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে আপনার দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। আজিকালিকার দিনে অসম্ভব বিবেচিত হইলেও ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অনেক যোগীর ইহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে, এবং অনেক যোগীকে এখনও এরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা এ

সমস্তের সন্ধান রাখেন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে এরূপ যোগীর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন।

কেমন করিয়া যোগীরা এ শক্তি সংগ্রহ করেন, ইহা জানিবার জন্য কেহ কৌতূহল-পরবশ হইতে পারেন। কিন্তু ইহা অপ্রকাশ্য বলিয়া আমি সবিস্তারে বর্ণনা করিতে পারিলাম না। তবে স্থূলতঃ ইহা যে প্রকারে সংসাধিত হইতে পারে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। মনুষ্য চেষ্টা করিলে, দেহের ভিতর থাকিয়াই দেহের সহিত অসংবদ্ধভাবে আপনি অবস্থান করিতে পারে। যেমন একটী সুপক্ক ফলের মধ্যস্থ অষ্টি (আটি)—যাঁহারা সাধনাতৎপর, তাঁহাদিগের অবস্থাও এইরূপ হইয়া যায়। অর্থাৎ সুপক্ক ফলের বীজ যেমন শাঁসের সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে না, তেমনই সাধকদিগের সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহের অভ্যন্তরে অসংলগ্নভাবে অবস্থান করে। যিনি যে পরিমাণে ভগবচ্চিন্তায় তৎপর থাকেন, তিনি সেই পরিমাণে স্থূলদেহের সহিত এইরূপে অসংবদ্ধ হইতে পারেন এবং সেই সকল লোকের দেহত্যাগের সময় স্থূলদেহের সহিত বিশেষ বন্ধন থাকে না বলিয়া তাঁহারা বিনাক্লেশে বহির্গত হইতে পারেন।

আবার যাঁহারা তত ঈশ্বরমুখী না হইয়াও শুধু শক্তিলাভের জন্য ইচ্ছুক হয়েন, তাঁহারা দেহের সহিত অসম্বদ্ধ হইবার জন্য কৌশল-সকল অবলম্বন করেন। আমাদিগের দেহের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মদেহের গমনাগমনের নাড়ী-প্রবাহ বা পথসকল অবস্থিত। সে সকল পথের যোগশাস্ত্রোক্ত নামসকল শুনিয়া সাধারণ পাঠকের কোন উপকার হইতে পারিবে না। বরং কতকগুলি জটিল রহস্য হৃদয়ে উপস্থিত হইবে। অনেক মনুষ্যকে ঐরূপে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, কূর্ম্ম, চিত্রা প্রভৃতি নামসকল উচ্চারণ করিতে শুনা যায়—অনেক যোগীনামধারী পুরুষকে ঐ সকল পথের বর্ণনা করিতেও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই। কিন্তু তাঁহাদিগের সে বর্ণনা শুনিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, তাঁহারা যোগশাস্ত্র-লিখিত বর্ণনাগুলিই যথাশ্রুত বলিয়াছেন। একটী পথেরও যথার্থ সন্ধান জানেন না। এমন কি, ঐ নাড়ীগুলি যে কি, সে সম্বন্ধেও জ্ঞানের আভাস দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা আপনাদিগকে তাহাদিগের অজ্ঞাত কতকগুলি জটিল রহস্যের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং ঐ সকল সাধারণের পক্ষে জটিল শব্দের আবৃত্তি করিয়া সাধারণকেও জটিল রহস্যে নিক্ষেপ করেন। ফলতঃ কতকগুলি

যোগশাস্ত্রের শব্দ সংগ্রহ ছাড়া আর কিছুই হয় না। আমি সেই জন্য শব্দের ধান্দায় পাঠকবর্গকে ফেলিতে চাহি না।

যাহা হউক, স্থূলদেহের সহিত আপনাদিগকে অসম্বদ্ধ করিতে যাঁহাদিগের ইচ্ছা ঈশ্বরলাভেচ্ছা অপেক্ষা বলবতী, তাঁহারাও কৌশলের দ্বারায় এ শক্তি লাভ করিতে পারেন। প্রথমতঃ প্রবল যত্নের সহিত চিন্তাশূন্য হইয়া অবস্থান করিবার অভ্যাস করিতে হয় এবং চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার উপায় অবলম্বন করিয়া কিছু দিন থাকিতে হয়। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার অনেক প্রণালী আছে। সে সম্বন্ধে পরে বলিব। যখন কিছুদিন কেহ এই অভ্যাস করেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে প্রথমতঃ একটী শূন্যবৎ ভাব উপস্থিত হয় এবং তিনি যেন দেহের মধ্যে থাকিয়াও অবলম্বন হীন হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় চিত্তের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র শিশুকে সঞ্চালিত করিলে, সে যেমন চমকিত হইয়া উঠে, অথবা স্বর্গে শূন্য হইতে পড়িয়া যাইতেছি, এরূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হইলে নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন ভীত হইয়া শয্যা দৃঢ়-করে ধারণ করিয়া আশ্বস্ত হয়—প্রথম যখন কাহারও চিত্তে ঐরূপ শূন্য-ভাব প্রকাশিত হয়,তাহারও অবস্থা তদ্রূপ। সেই সময়ে সাধারণতঃ তাহার চিত্ত ঘুরিয়া বহির্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় এবং স্থূল দেহ অবলম্বন করিয়া পুনরায় আশ্বস্ত হয়। এইরূপ কিছুদিন হইবার পর ক্রমশঃ তাহার আশঙ্কা তিরোহিত হইতে থাকে, এবং তখন অন্তরের মধ্যেই শুভ্র জ্যোতীরেখাবৎ কোন পদার্থ প্রত্যক্ষীভূত হয়। তখন সাধক সেই জ্যোতীরেখা অবলম্বন করিবামাত্র দেখে, পূর্ব্বে স্থূলদেহ অবলম্বন করিয়া তাহার যেমন ভয় তিরোহিত হইত, এই জ্যোতীরেখা অবলম্বন করিয়া তদ্রূপ ভয়শূন্য হইতে পারা যায়। তখন তাহার চিত্ত আর বহির্মুখে ধাবিত হইতে চাহে না এবং জলনিমগ্ন ব্যক্তি যেমন কাষ্ঠখণ্ড পাইলে উহা ধরিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিশ্বাস ফেলে, তেমনিই ভাবে চিত্ত সেই জ্যোতীরেখা ধারণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

এই যে জ্যোতীরেখা, ইহাই যোগশাস্ত্রোক্ত কোন নাড়ী বুঝিতে হইবে। চিত্ত এই নাড়ীর সন্ধান পাইলে তখন তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানেচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে, এবং ক্রমশঃ ঐ পথ ধরিয়া কোন্ দিকে যাওয়া যায়, এইরূপ দেখিবার বাসনা যেন প্রাণে সজাগ হয়। সে অবস্থায় বাসনা সজাগ হওয়া সহজসাধ্য নহে। কিছুদিন ঐরূপে জ্যোতিঃপথ অবলম্বনে অভ্যস্ত হইবার পর ঐরূপ বাসনা ফুটিবার অবসর পায়। কিন্তু বাসনা যেমন ফুটিতে বিলম্ব হয়, তেমনই এ অবস্থার সুবিধা এই যে,

বাসনা মাত্রেই বাসনার পূরণ হয়; তখন সে সেই নাড়ীপথে আমাদিগের সূক্ষ্মদেহস্থ কোন একটী কেন্দ্রে গিয়া পড়ে।

এই কেন্দ্রগুলি চক্র নামে অভিহিত। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা আদি চক্রসকল প্রাণশক্তির এক একটী কেন্দ্র মাত্র। প্রতি কেন্দ্রের বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রকার কাজ আছে এবং ঐ কেন্দ্রে স্থিরভাবে অবস্থান, করিতে পারিলে সেই কেন্দ্রের কার্য্যসকল সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এবং সেই কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া ইচ্ছা করিলে অলৌকিক কার্য্যসকল সম্পাদন করিতে পারা যায়। কেহ দেহ হইতে বহির্গমন করিয়া অন্য শরীরে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিলে, তখনই সেই কেন্দ্র হইতে একটী সূক্ষ্ম জ্যোতীরেখা বিনির্গত হইয়া অন্য দেহের সেই কেন্দ্রে গিয়া সংযুক্ত হয় এবং সেই রেখা অবলম্বন করিয়া আত্মা আপন দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হন।

এইরূপ পরকায়-প্রবেশ হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, দেহত্যাগ বস্ত্রত্যাগ অপেক্ষা কোন ভীতিজনক ব্যাপার নহে। তবে যাহাদিগের আত্মা এই দেহরূপ বস্ত্রের সহিত একান্তরূপে সম্বদ্ধ, তাহাদিগকে এই দেহত্যাগের সময় অতিরিক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে হয়। পূর্ব্বে অমি অষ্টির তুলনায় বলিয়াছি, পরিপক্ক ফলের অষ্টি যেমন ফলের মধ্যে থাকিয়াও তাহার সহিত কোন বিশেষভাবে আবদ্ধ থাকে না, অল্প বেগ প্রদানে উহা ফল হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়ে, যাঁহারা সাধনাদির দ্বারা আপনাদিগকে সুপক্ক করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা তেমন অনায়াসে দেহরূপ আবরণটী হইতে বহির্গত হইয়া যান। কিন্তু সাধারণ মনুষ্য অপক্ক ফলের অষ্টির মত ফলের ভিতর দৃঢ়রূপে চারি দিকে সম্বদ্ধ থাকে। অপক্ক ফলের আঁটিটীকে বাহির করিতে হইলে ফলটীকে যেমন রীতিমত পেষণ করিতে হয় সাধারণ জীবাত্মাকে দেহত্যাগের সময় তদ্রূপ পেষণ-যন্ত্রণা অনুভব করিতে হয়। মৃত্যু-যন্ত্রণা এই পেষণের যন্ত্রণা মাত্র। যেখানে যেখানে আত্মা আবদ্ধ—যেখানে যেখানে দেহের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত, সেইখানে সেইখানে যন্ত্রণা প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে। এইরূপে দেহের কেন্দ্রে কেন্দ্রে, মর্ম্মে মর্ম্মে অবর্ণনীয় যাতনার অনুষ্ঠান হয়। সে যাতনায় অধীর হইয়া জীবভাবাপন্ন আমরা সাহায্যের জন্য চারি ধারে চাহিতে থাকি। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগের দিকে, ঔষধপথ্যাদির দিকে, স্থান, কালাদির দিকে, চারি ধারে সাহায্যের আশায় আমাদিগের প্রাণ ছুটাছুটি করে। কিন্তু সে যন্ত্রণা লাঘব করিবার কেহ নাই। ক্রমশঃ হতাশ হইয়া জীব

ভয়ে অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে থাকে। দুরন্ত অন্ধকার চারি দিক্ হইতে আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে। সে অন্ধকারের মধ্যে সে ঊর্দ্ধপদ ও নিম্নমুখী হইয়া ছুটিতে থাকে। কোথায় কত দূর অসীম অন্ধকার-সমুদ্রের ভিতর জীবাত্মা সাহায্যের আশায় খরতর বেগে নিম্নমুখী হইয়া এইরূপে ধাবিত হয়। আশ্বাসের স্থান খুঁজিয়া যত না পায়—সাহায্য করে, এমন কাহাকেও খুঁজিয়া না পায়, ততই ক্রমশঃ ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া যায়। কিন্তু সে চীৎকার শব্দহীন। পক্ষাঘাতে শব্দযন্ত্র যাহাদিগের কার্য্যাক্ষম হইয়াছে, সেই সকল পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী যেমন বাক্যোচ্চারণের বহু প্রয়াস করিয়াও শব্দমাত্র উচ্চারণ করিতে পারে না এবং দারুণ যন্ত্রণায় তাহার প্রাণ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে থাকে—এই মৃত্যুকালীন অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ।

এইরূপে জীব যত অন্ধকারে ছুটাছুটী করিতে থাকে, মর্ম্ম ও চক্রসকল হইতে বন্ধনসকল তত একে একে ছিন্ন হইয়া যায়। এবং বহু কষ্টে বন্ধনশূন্য অবস্থা লাভ করে। তখন জীব একেবারে অজ্ঞান হইয়া যায়। এবং ধীরে ধীরে সেই মকরকুম্ভীরাচ্ছন্ন অন্ধকার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়। এ মৃত্যু-যন্ত্রণার কথা লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না। এ অন্ধকার-সমুদ্রের ভীষণতা স্বপ্নেও বুঝি কল্পনায় আসে না। জীবের এই শেষ মুহূর্ত্তের ইতিহাস ভীষণ। শুধু এই যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যও ভগবৎস্মরণ জীবের একান্ত অনুষ্ঠেয়। ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রাণে থাক বা না থাক, অন্ততঃ মৃত্যুকালীন এই যন্ত্রণার ভয়েও জীবের সাবধান হওয়া উচিত। আত্মার স্বরূপভাবের চিন্তা হৃদয়ে গাঢ় করিয়া তুলিতে পারিলে এ যন্ত্রণা অনুভবে আইসে না; এবং মৃত্যুকালে জীব স্বচ্ছন্দে দেহত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। সেই জন্য পরশ্লোকে আত্মার যথাসাধ্য স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩
অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪

শস্ত্রাণি এনং ন ছিন্দন্তি, পাবকঃ এনং ন দহতি, আপঃ এনং ন চ ক্লেদয়ন্তি,

মারুতঃ ন শোষয়তি। অয়ং অচ্ছেদ্যঃ, অয়ং অদাহ্যঃ, অয়ং অক্লেদ্যঃ অশোষ্য এব চ; অয়ং নিত্যঃ, সর্ব্বগতঃ, স্থাণুঃ অচলঃ সনাতনঃ।

ব্যবহারিক অর্থ —অস্ত্র-সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না—অগ্নি ইহাকে দহন করিতে পারে না—জল ইহাকে দ্রবীভূত করিতে পারে না—বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না। ইনি অচ্ছেদ্য, ইনি অদাহ্য, ইনি অক্লেদ্য, ইনি অশোষ্য, ইনি নিত্য, সর্ব্বগত, অচল, স্থির, সদা সমভাববিশিষ্ট।

যৌগিক অর্থ।—আত্মার এইরূপ স্বরূপের কথা হৃদয়ে অহরহঃ ধারণা করিতে হয়। আত্মা যে জাগতিক পদার্থ-সকলের মত দহন শোষণাদি গুণযুক্ত নহে—আত্মা যে নিত্য সর্ব্বদা এক ভাবসম্পন্ন, অপরিণামী, স্থির, এই চিন্তাটী হৃদয়ে বিশেষভাবে ফুটাইয়া রাখিতে হয়। এইরূপ চিন্তার দৃঢ়তা প্রাণে আসিলে মৃত্যুভয় ও মৃত্যু-যন্ত্রণা ব্যথিত করিতে পারে না। সেই জন্যই আত্মার স্বরূপের কথা এখানে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথম মৃত্যু এইরূপ বসন পরিত্যাগ মাত্র এবং আত্মা এইরূপ অপরিণামী—এই দুইটী তত্ত্ব প্রাণে প্রতিষ্ঠিত না হইলে সাধনাপথে অগ্রসর হইতে পারা যায় না।

মৃত্যুভয়ই সাধনাপথের সর্ব্বপ্রথম অন্তরায়। মরণাশঙ্কায় জীব-জগতের অন্তরাত্মা অহর্নিশ চকিত। মরণের বিকট পিশাচমূর্ত্তি জীবের প্রাণে অহর্নিশ অধিষ্ঠিত থাকিয়া হৃদয়কে শোষণ করিতেছে। আপনার বিরাট্ উদার ভাব ভুলিয়া জীব, মরণের ভয়ে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইতেছে। মৃত্যুস্বপ্নের দারুণ মোহ জীবমর্ম্মকে অহর্নিশ কুণ্ঠিত, সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। যে হৃদয়ে মৃত্যুভয় যত বেশী, সে হৃদয় তত ক্ষুদ্র, তত সঙ্কীর্ণ, তত উদরতাবঞ্চিত। সমস্ত ভয়ের মূল কারণ—মৃত্যু। মৃত্যুভয়ই সমস্ত ভয়ের মূল উপাদান। রোগ, অর্থনাশ, প্রিয়জন হইতে দূরে অবস্থানজন্য চিত্তমালিন্য, একাকী নির্জ্জনে অবস্থানসময়ে চিত্তচাঞ্চল্য, এ সমস্তেরই মূল কারণ মৃত্যুভয়। মৃত্যুভয়ই নানারূপে রূপান্তরিত হইয়া জীবের উপর আধিপত্য করে। সহসা শব্দাদি শুনিয়া আমরা যে চমকিত হইয়া উঠি, উহা মৃত্যুভয় হৃদয়ে কতটা আধিপত্য করিয়াছে, তাহারই প্রমাণ। একটু কিছু অস্বাভাবিক ঘটিলে জীবহৃদয় যেন চকিত ও বিত্রস্ত হইয়া উঠে, যেন অবলম্বনহীন, যেন আশ্রয়-

শূন্য, যেন অসহায়, এইরূপ ভাবে প্রাণ পূর্ণ হইয়া পড়ে। মৃত্যুভয়ই ইহার একমাত্র কারণ।

অশক্ত মনুষ্য যেমন যষ্টির উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হয়, যষ্টি খুলিয়া লইলে যেমন সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, আমরাও তদ্রূপ কতকগুলি বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান করি। যখনই তাহার কোনটী বিচলিত হয়, যখনই তাহার কোনটী হইতে আমরা বিচ্যুত হই, তখনই আমরা কাঁপিয়া উঠি, মৃত্যুভয়ে অশক্ত প্রাণ আমাদের পড়িয়া যাইবার উপক্রম করে। এই ভয় যাহার হৃদয়ে যত অধিক, সে তত জাগতিক পদার্থের উপর নির্ভর করে, জগতের পদার্থ-সকলকে তত হৃদয়ে আকড়াইয়া ধরে। তাহার হৃদয়ক্ষেত্র সেই স্তম্ভস্বরূপ ভাবসকলের দ্বারা তত পূর্ণ ও স্থানশূন্য হইয়া পড়ে। হৃদয়ের উদারতা তত তাহার ঘুচিয়া যায় ও জাগতিক পদার্থের উপর মায়া প্রবলতর হয়। আপনার অপনার বলিয়া তত স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গ, অর্থ, স্বাস্থ্য ইত্যাদিকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে এবং তাহাদের একটির অভাবে যষ্টিহীন পঙ্গুর মত কাঁপিয়া উঠে। মৃত্যু-ভয়াক্রান্ত আমরা কোন গতিকে যেন এই সকল নানা পদার্থে নির্ভর করিয়া তবে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছি,—এইরূপ অনুভব করি। এ সকল না থাকিলে যেন সব শূন্য হইয়া যায়—আপনার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। তাই পদে পদে আমরা চকিত, ভীত, আশঙ্কাপূর্ণ প্রাণে জগতে বিচরণ করি। আমাদিগের আনন্দে তাই ব্যাপকতা নাই। আমাদের কার্য্যে তাই উদ্যম-পূর্ণতার স্ফূর্ত্তি নাই — আমাদের জগৎ সম্ভোগে তাই জীবন্ত অনুরাগের রঞ্জনা নাই। আমাদের সকল কাজ যেন বিষাদে ঘেরা, আমাদিগের আনন্দ যেন ফল্গুনদীর মত উচ্ছ্বাসশূন্য। প্রাণভরা আনন্দ যাহাকে বলে, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস যাহাকে বলে, প্রাণভরা আবেগ যাহাকে বলে, সে সকল আমাদিগের হৃদয়ে তাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একমাত্র মৃত্যুভয় এ সকলের অন্তরায়।

কিন্তু এ মৃত্যুভয়ের প্রয়োজন আছে। ইহার কার্য্য অতি বিশাল। এই মৃত্যুভয়ই আত্মাকে আপন অস্তিত্বের অনুসন্ধানে ব্যস্ত করে। মৃত্যুভয় বা নিজ অস্তিত্বের আভবজ্ঞান একই কথা। জীব যখন ক্রমশঃ তমসাক্রান্ত জড়াদি অবস্থা হইতে সত্ত্ববিকাশসম্পন্ন স্ফুটচৈতন্য অবস্থার দিকে আসিতে থাকে, এই মৃত্যুভয়ই তাহার তখন একমাত্র সাহায্যকারী। রাখাল যেমন

তাড়না করিয়া করিয়া পালিত পশুবৃন্দকে গৃহাভিমুখে লইয়া আসে, মৃত্যুভয় তেমনই জীবকে তাড়াইয়া তাড়াইয়া সত্ত্ববিকাশের দিকে লইয়া আসিতেছে। জীবের চৈতন্য যে কেন্দ্রে যে কেন্দ্রে ফুটিয়া উঠে—যখনই কোন বিষয় উপলব্ধি করে, অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার উপর নির্ভর করিয়া আপনার অস্তিত্ব যেন অনুভব করে। এবং এইরূপে ক্রমশঃ জীবের সে অনুভূতিগুলি ঘনীভূত হয়—ইন্দ্রিয়সকল প্রশস্ত, সমধিক দৃঢ় ও কার্য্যকারী হইতে থাকে। জীব আপন অস্তিত্বকে তাহাতে প্রতিফলিত করিয়া, তাহাতেই আত্ম-অস্তিত্ব অনুভব করিয়া যেন কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়। কিন্তু এ আশ্বাস অধিকক্ষণ থাকে না। মৃত্যু দ্রুতবেগে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তাড়া দেয়। স্থূল বিষয়াদি বা দেহাদি হইতে জীবকে বঞ্চিত করে। অপক্ক বা শিশু জীব প্রতিফলিত হইবার ক্ষেত্রের অভাবে আবার আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে ও পুনরায় অস্তিত্ব অনুভবের জন্য চারি ধারে শক্তি প্রসৃত করিতে চেষ্টা করে। শিশুকে আদর করিতে করিতে মা তাহাকে উত্তোলন করিবার সময় বা ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিবার সময় কখনও শিশু যেমন চমকিত, ভীত হইয়া চারি ধারে হস্তপদ বিস্তৃত করিয়া উঠে ও পুনরায় মাতৃক্রোড়ে পড়িয়া তবে যেমন আশ্বস্ত হয়, সেইরূপে জীব মৃত্যুর দ্বারা আপনার প্রতিফলিত হইবার ক্ষেত্র হইতে বঞ্চিত হইয়া চমকিয়া উঠিয়া শক্তি চারি ধারে যথাশক্তি বাড়াইয়া দেয় ও পুনরায় নব স্থূলদেহ লাভ করিয়া তবে যেন আশ্বস্ত হয়। পুনরায় নূতন দেহে নূতন ভাবে প্রতি-ফলিত হইয়া ও তাহাতেই আপনার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া, তবে যেন কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করে। কিন্তু সে চমকিত অবস্থার ভয় দূরীভূত হয় না। সম্যক্‌ভাবে উহা অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয় না, তাহার সংস্কার বর্ত্তমান থাকে। তাই জীব মনোবৃত্তির একটু ইতস্ততঃ অবস্থায় বা স্থূল-বিষয়াদির একটু ব্যতিক্রমে অধীর হইয়া পড়িয়া চমকিত হইয়া উঠে।

যাহা হউক, আবার মৃত্যু আসে, আবার তাহার তাড়নায় জীব চমকিত হয়, আবার অস্তিত্ব হারাইয়া, আশঙ্কারূপ চাপে পড়িয়া আত্মশক্তি প্রসৃত হয়, আবার সেই শক্তিপ্রভাবে জীব নব কলেবর ধারণ করে, নূতন করিয়া নিজ অস্তিত্ব অনুভব করে, নূতন জীব সাজিয়া কতকটা শান্ত হয়।

এই ভাবে মৃত্যুর তাড়নায় তাড়নায় আমাদিগের আত্মশক্তি ক্রমশঃ স্ফুরিত

হয়, ক্রমশঃ বহুসংখ্যক বাহ্য বস্তুর উপরে আত্মপ্রতিফলন করিয়া আপনার অস্তিত্ব অনুভবকে অমরা বিস্তৃত করিতে থাকি। বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক শাখা-প্রশাখা-নির্ম্মিত মঞ্চের উপরে লতিকা যেমন বুক পাতিয়া নিশ্চিন্ত থাকে ও পরিবর্দ্ধিত হয়, অপক্ক বা শিশু জীবও তদ্রূপ বাহ্য বিষয় ও স্থূলদেহের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপে বর্দ্ধিত হয়। শিশু-জীব অর্থে সাধারণ শিশু নহে। অশীতি বর্ষের বৃদ্ধও শিশু-জীব হইতে পারে। শিশুজীব বলিতেছি, যাহারা স্থূল অবলম্বনশূন্য হইলে অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, তাহাদিগকে। যাহার যে পরিমাণে এই স্থূল অবলম্বন-শূন্য অবস্থাতেও আত্ম-অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবার শক্তি হইয়াছে, সে জীব সেই পরিমাণে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অনেক সাধারণ শিশুও হয় ত যুবা জীব, অনেক বৃদ্ধও হয় ত স্তন্যপায়ী জীব—এ কথা যেন স্মরণ থাকে।

যাহা হউক, ক্রমশঃ যখন সে শিশু জীব বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বা অনেকবার মৃত্যুতাড়নায় তাড়িত হইয়া, শেষে একটী সবল জীবরূপে পরিণত হয়, তখন হইতে ক্রমশঃ স্থূলের অভাবেও সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রে অস্তিত্ব অনুভব করিতে সক্ষম হয়। মঞ্চের স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গেলেও পরিবর্দ্ধিত ও দৃঢ় পুষ্ট লতিকা যেমন ঝুলিয়া পড়ে না, নিজ দৃঢ়তায় নিজে যেমন ঠিক থাকে, তেমনি ক্রমশঃ স্থূল অবলম্বনসকল সরিয়া গেলেও জীব, আত্ম উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হয় না—ঠিক থাকে ; এবং তখন যেন ক্রমশঃ আমি এই স্থূল পদার্থ নহি—আমি ইহাতে প্রতিফলিত হইয়া উহাই আমার স্বরূপ বলিয়া ভাবিতেছি, এইরূপ ধরণের জ্ঞান একটু একটু করিয়া ফুটিয়া উঠিতে থাকে। মৃত্যু-সংস্কার প্রবল থাকিলেও তখন উহা আর তত বিভীষিকাপ্রদরূপে হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে না। গৃহস্থের গাভী মাঠ হইতে বিতাড়িত হইয়া যত গৃহপ্রাঙ্গণের নিকটবর্ত্তিনী হয়, তত যেমন তাড়নাও শ্লথ হয়, এইরূপ যত আমরা স্থূলশূন্য অবস্থাতেও আত্মোপলব্ধি করিতে সক্ষম হই, মৃত্যুভয় ও মৃত্যুতাড়নাও তত মন্দীভূত হইয়া আসিতে থাকে।

যাহা হউক, এইরূপে মৃত্যু ও মৃত্যুভয় আমাদিগকে তাড়াইয়া তাড়াইয়া গৃহাভিমুখী করিতেছে। এ হিসাবে মৃত্যু ও মৃত্যুভয় আমাদিগের অশেষ মঙ্গল-কর। রাখাল গোপাল লইয়া গৃহে ফিরিতেছে, যেগুলি চলিতে অনিচ্ছুক, বেগে যাইতে চাহিতেছে না—যেগুলি বিপথে ছুটিয়া পলাইতে চাহিতেছে—গৃহাভিমুখে যাইতে ছাহিতেছে না—সেই গাভীগুলির পৃষ্ঠেই রাখালের যষ্টি বেগে পড়িতেছে ; যেগুলি গৃহাভিমুখী হইয়া গৃহে বৎস পাইবার উল্লাসে অথবা প্রবাস হইতে স্বগৃহ-

প্রবেশের মত আনন্দে আনন্দিত হইয়া উৎসাহে প্রফুল্লচিত্তে গৃহাভিমুখে ছুটিতেছে —গম্য পথ হইতে অন্য পথে যাইতেছে না, সেগুলি সকলের অগ্রে চলিয়াছে— রাখালের যষ্টি তাহাদিগকে স্পর্শও করিতেছে না। তদ্রূপ আমরাও যদি গম্য পথে গৃহাভিমুখে চলিতে থাকি, যদি বিপথে না যাই—যদি স্থূল হইতে আত্মোপলব্ধি গুটাইয়া লইয়া স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়াস পাই, তাহা হইলে আর মৃত্যুভয়ের তাড়না থাকিবে না—মৃত্যুভয়ের মর্ম্মভেদী কশাঘাত আর সহ্য করিতে হইবে না—মরিতেছি বলিয়া আর কাঁদিতে হইবে না।

যে পরিমাণে আমরা গৃহমুখী হইব, যে পরিমাণে আমরা স্বরূপ অবস্থার দিকে লক্ষ্য ফিরাইব, যে পরিমাণে আমরা স্বাবলম্বী হইতে পারিব, যে পরিমাণে আমরা স্থূল দেহাদিতে আত্মাভিমান কমাইতে সক্ষম হইব, সেই পরিমাণে আমরা মৃত্যুভয়ের তাড়না হইতে পরিত্রাণ পাইব, সেই পরিমাণে আমরা জগতের আনন্দ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব, সেই পরিমাণে উল্লাস, উৎসাহ, সজীবতা, স্ফূর্ত্তি ও তত্ত্ববিকাশময় উদার ভাব প্রাণে ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে। স্বরূপকে ধরিয়া রাখিতে আর মঞ্চাদিতে হৃদয়ক্ষেত্র পূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে না; আপনার শক্তিতে আপনি দাঁড়াইয়া থাকিবে। তোমার মৃতভাব, বিষাদাচ্ছন্ন ভাব দূরীভূত হইয়া জীবন্ত আনন্দময় ভাব প্রাণের ভিতর ফুটিতে থাকিবে। মৃত্যু—মৃত্যু—মৃত্যু করিয়া আশঙ্কায় আর তোমায় অহর্নিশ সশঙ্কিত থাকিতে হইবে না।

জীবের শৈশবাবস্থায় যে মৃত্যু সাহায্যকারী, যৌবনাবস্থায় উহা কিরূপে সাধনাপথের অন্তরায়, ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল। বৃক্ষ বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইলে আর যেমন মঞ্চের আবশ্যকতা থাকে না, মৃত্যুভয়ও যে কেবল সেইরূপ শৈশবাবস্থায় একটী সাহায্যকারী স্বপ্ন, এইরূপ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

যখন মনুষ্যোচিত জ্ঞানলাভ করিয়াছ, যখন সাধনাপথে যাইতে অভিলাষ করিয়াছ, তখন বুঝিতে হইবে, তুমি আর নিতান্ত শিশু নহ; সুতরাং তোমার এ সাধনাপথের অনন্তযাত্রা যাহাতে আনন্দপ্রদ হয়, প্রতি পদে চমকিত না হইয়া প্রতি পদে যাহাতে আনন্দের সন্ধান পাও, তাহার চেষ্টা কর। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মৃত্যুভয় উপকারী হইলেও যাতনাপ্রদ, সকল যন্ত্রণার মূল। তুমি আত্মমুখী হও, আর মৃত্যুভয় থাকিবে না, আর মৃত্যুর নিকট হইতে কোন উপকারের প্রত্যাশা তোমায় করিতে হইবে না।

কিরূপে আত্মমুখী হওয়া যায়? আত্মচিন্তা করা—আত্মমুখী হওয়া সমান

কথা। আত্মচিন্তা কর, স্বরূপের ধ্যান কর—আনন্দ পাইবে। মৃত্যু—কল্পনামাত্র হৃদয়ঙ্গম কর, মৃত্যুভয় তিরোহিত হইবে। তোমার আনন্দ বিচ্ছেদশূন্য বিমল হইয়া চিরস্থায়ী হইবে। তাই গীতার এই স্থলে মৃত্যু যে বসন পরিবর্ত্তন মাত্র, এবং আত্মা নিত্য সর্ব্বব্যাপী বিভু—এই কথা বিশদভাবে বর্ণিত।

কিন্তু এই আত্মচিন্তার জন্য প্রাণে প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা না জাগিলে, আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হয় না। সে প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা কোথায় পাইবে? অনেক সময়ে আমরা কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়া ফেলি। কর্ত্তব্য বুঝিয়াও অনেক সময় সে কর্ত্তব্যকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। তাহার কারণ—অভাবের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি হয় না বলিয়া। সে কার্য্য আমাদিগের কোন্ অভাবটী পূরণ করে এবং সে অভাবের পূরণ আমাদের পক্ষে কত উপকারী, সে অভাবে আমরা কত দূর ক্ষতিগ্রস্ত, এটুকু যতক্ষণ না সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, ততক্ষণ সে অভাব মোচনের জন্য প্রাণে প্রবল তৃষ্ণা জাগে না, এবং ততক্ষণ তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জলপানের জন্য যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করে, সেরূপ আগ্রহ আমরা অভাব মোচনের জন্য প্রকাশ করিতে পারি না। আমরা মুখে মৃত্যুভয় মৃত্যুভয় করি সত্য, কিন্তু মৃত্যু যথার্থ কত যন্ত্রণাদায়ক, সাধারণ অবস্থায় মৃত্যুভয় কিরূপে আমাদিগকে সমস্ত আনন্দসম্ভোগে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে—মৃত্যুর কশাঘাত কিরূপ মর্ম্মভেদী, সেইটুকু যতক্ষণ না সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, ততক্ষণ এ মৃত্যু-স্বপ্নের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য প্রাণে প্রবল আকুলতা জাগে না এবং ততক্ষণ স্বাধীন আনন্দের আস্বাদে বঞ্চিত থাকিতে আমরা বাধ্য হই।

মৃত্যু কেমন করিয়া আমাকে সমস্ত আনন্দে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, আমি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও মৃত্যুর যাদুমন্ত্রে কি প্রকারে দীন, হীন, ক্ষুদ্র, নীচাদপ নীচ সাজিয়া বসিয়া আছি, এটুকু জানিতে হইলে মৃত্যুর সহিত আগে পরিচিত হওয়া চাই—মৃত্যুর ধ্যান করা চাই—মৃত্যুর স্বরূপ অবগত হওয়া চাই।

যাহা হউক, মৃত্যুর স্বরূপ অবগত হইবার প্রণালী সম্বন্ধে আমরা এ স্থলে আলোচনা করিব না। মৃত্যুর স্বরূপ অবগত হইবার পর—মৃত্যু কি ভাবে আমাদিগকে অহর্নিশ শিক্ষকের মত প্রহার ও তাড়না দ্বারা সজাগ ও কর্ম্মে চৈতন্যযুক্ত করিয়া রাখে, ইহা সুন্দররূপে হৃদয়ে অনুভব করিবার পর—তবে বুঝিতে পারা যায়, মৃত্যু বসন পরিত্যাগ ব্যতীত আর কিছুই নহে—তবে বুঝিতে পারা যায়,—যে মৃত্যুকে এত দিন মহারাক্ষসী ভাবিয়া আসিতেছিলাম, উহা

রাক্ষসী নহে—আমার মা। যাহাকে কশাঘাত ভাবিয়া আসিতেছিলাম, উহা কশাঘাত নহে, উহা মাতৃস্নেহের পূর্ণ অভিষেক। দূর হইতে যাহাকে তাণ্ডব নৃত্যশীলা প্রলয়ঙ্করী উন্মাদিনী বলিয়া ভীত হইতেছিলাম, কাছে গিয়া দেখি, কোথায় সে ভীষণতা, কোথায় সে নৃশংসতা! সে আমার ভুবনমোহিনী জননী, অনন্ত স্নেহের, অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার।

তখন—শুধু তখনই আত্মস্বরূপ ফুটিতে আরম্ভ হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায়, আমাকে অস্ত্রসকল ছেদন করিতে পারে না—সলিল আমাকে দ্রবীভূত করিতে পারে না—বায়ু আমাকে শোষণ করিতে পারে না। আমি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য—আমি নিত্য, আমার অস্তিত্বের কখনও বিলোপ হয় নাই—আমি সর্ব্বগত, আমার অস্তিত্ব কোথাও কুঞ্চিত নহে, আমি অচল-প্রতিষ্ঠ, আমার অস্তিত্ব মুহূর্ত্তের জন্য কোথাও হইতে অপসৃত হয় না। আমি সনাতন, আমার আদি অন্ত কেহ কখনও সন্ধান করিতে পারে না।

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

অয়ং অব্যক্তঃ অয়ং অচিন্ত্যঃ অয়ং অবিকার্য্যঃ উচ্যতে; তস্মাৎ এনং এবং বিদিত্বা (ত্বং) অনুশোচিতুং ন অর্হসি।

ব্যবহারিক অর্থ।—ইনি অব্যক্ত, ইনি অচিন্ত্য, ইনি অবিকার্য্য, অতএব এই-রূপে ইহাঁকে বিদিত হইয়া আর অনুশোচনা করিও না।

যৌগিক অর্থ।—এই আত্মা অব্যক্ত, চক্ষুরাদি দ্বারা ইনি ব্যক্ত হন না। ইনি অচিন্ত্য, মনেরও ইনি অবিষয়ীভূত, এবং অবিকার্য্য, কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির দ্বারাও বিকার প্রাপ্ত হন না—এইরূপ কথিত আছে। সেই জন্য ইহাঁকে এইরূপে জ্ঞাত হইয়া তবে অনুশোচনার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

এইরূপে ইহাঁকে যতক্ষণ জানিতে না পারা যায়, ততক্ষণ শোকের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। অর্থাৎ যত দিন না আত্মার স্বরূপভাব প্রকটিত হয়—জীব যতক্ষণ না আত্মভাবে অবস্থান করে, ততক্ষণ মৃত্যুর কশাঘাত তিরোহিত হয় না, মৃত্যুর তাড়না নিবৃত্ত হয় না। সময়ে সময়ে মনের দ্বারা বিচার করিয়া আমরা আত্মস্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করিয়া থাকি এবং অব্যক্ত জিনিষকে ব্যক্ত করি-বার প্রয়াস পাই। বিকারযুক্ত বাক্যের দ্বারা অবিকার্য্য পদার্থ প্রকাশ করিবার যত্ন বিফল প্রয়াস মাত্র। সহস্রছিদ্র কুম্ভ লইয়া বারি আনয়ন করা যেমন

অসম্ভব, অথবা শূন্যকে রজ্জুগ্রন্থি দ্বারা আবদ্ধ করা যেমন অসম্ভব, আত্মস্বরূপ—বাক্যে প্রকাশ করিবার প্রয়াসও তদ্রূপ।

তবে কিরূপে ব্যক্ত হয়? তবে কি ইহার প্রকাশ কোথাও নাই? তবে কি এমন কোন ক্ষেত্র নাই, যেখানে ইনি প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারেন? ইন্দ্রিয়ে যেমন বাহ্য বিষয় প্রত্যক্ষীভূত হয়—মনে যেমন ভাবসকল প্রত্যক্ষীভূত হয়, তেমনি ভাবে ইনি প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারেন, এরূপ স্থান কোথায়? জ্ঞানে যেমন কার্য্যশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষীভূত হয়, ইনি কি তেমনই ভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়েন? অথবা যথার্থই যদি ইনি অব্যক্ত—যথার্থই যদি অচিন্ত্য, তবে আবার কেমন করিয়া ব্যক্ত ভাবাপন্ন হইবেন, তবে আবার কেমন করিয়া চিন্তাপূর্ণ মনোময় ক্ষেত্রে অনুভূতিযোগ্য হইবেন? যাঁহাকে একবার অব্যক্ত বলা যায়, তাঁহাকেই আবার ব্যক্ত কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? অথবা যাঁহাকে অচিন্ত্য বলা যায়, তাঁহাকেই আবার চিন্তার দ্বারা অনুভূত হইবার কথা কেমন করিয়া ধারণ করিতে পারা যায়?

ইহা অব্যক্ত ইন্দ্রিয়ের পক্ষে—ইহা অচিন্ত্য মনের পক্ষে, ইহা অবিকার্য্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পক্ষে। যতক্ষণ মনকে মন বলিয়া ধারণা থাকিবে—যতক্ষণ প্রাণকে প্রাণ বলিয়া অনুমিত হইবে—যতক্ষণ ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয় বলিয়া হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে, ততক্ষণ ইহা অব্যক্ত—ততক্ষণ ইহা অচিন্ত্য—ততক্ষণ ইহা অবিকার্য্য। যতক্ষণ মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, দেহ ইত্যাদি বিভিন্ন বিভিন্ন জ্ঞানে হৃদয় পূর্ণ থাকিবে, ততক্ষণ আত্মা অব্যক্ত অচিন্ত্য ইত্যাকার ধারণা ঘুচিবে না। যতক্ষণ সমস্ত ধারণা, সমস্ত বৃত্তি, সমস্ত অনুভূতি একীভূত না হইবে, ততক্ষণ আত্মাও এক অচিন্ত্য দুর্ব্বোধ বিষয় বলিয়া প্রাণে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

বিভিন্ন বিভিন্ন অনুভূতিগুলি আমাদের হৃদয়-কুম্ভের ভিন্ন ভিন্ন ছিদ্র। আমরা সহস্রছিদ্র কুম্ভ লইয়া বসবাস করি। একই জল ছিদ্রের তারতম্যে বিভিন্ন বিভিন্ন আকারে আমাদিগের এ কুম্ভ পরিপূর্ণ করে। যে দিকে যখন এ কুম্ভ ডুবাইয়া ধরি, সেই দিক্ হইতেই তখনই সেই একই জিনিষ সহস্র নূতন আকারে হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হয়; আবার নূতন দিকের সন্ধান করি; সহস্র ছিদ্র দিয়া কুম্ভ শূন্য হয়—বিষয় হইতে বিষয়ান্তর কুম্ভ পরিপূর্ণ করে। এইরূপে সহস্র ছিদ্র দিয়া একই বিষয় হৃদয় পরিপূর্ণ করে—কিন্তু সহস্র প্রকারে। কুম্ভ মুহূর্ত্তে পূর্ণ হইতেছে; মুহূর্ত্তে শূন্য হইতেছে—সংস্কার-ছিদ্র বাড়িতেছে মাত্র। নূতন করিয়া

হৃদয় ডুবাই—নূতন বারি সহস্র ছিদ্রপথ দিয়া হৃদয় পরিপূর্ণ করে, আবার উঠাইয়া লই—আবার সে বারি শত ছিদ্র দিয়া বহির্গত হইয়া যায়;—সংস্কার-ছিদ্র বাড়িয়া যায় মাত্র। এই ভাবে বিষয়ে বিষয়ে আমাদিগের এ সহস্রছিদ্র কুম্ভ ডুবাইয়া ধরিতেছি, প্রতি বিষয় হইতে সংস্কারটুকু মাত্র সংগ্রহ করিয়া সমস্ত বারি বাহির করিয়া দিতেছি। এ ছিদ্রময় কুম্ভ কিছুতেই পরিপূর্ণ করিতে পারিতেছি না।

শুনিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ একবার বিকারের ভাণ করিয়াছিলেন। মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া বিকারের ঘোরে মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া রোগযন্ত্রণায় অধীর হইয়াছিলেন। তার পর বৈদ্যবেশে আসিয়া সে রোগমুক্তির এক অভিনব পন্থা ব্যক্ত করিয়া দর্শকবৃন্দমধ্যে বিস্ময় ও আশঙ্কার সঞ্চার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যদি কেহ সহস্রছিদ্র কুম্ভ পূর্ণ করিয়া বারি আনয়ন করিতে পারে—যদি সে সহস্র ছিদ্রের একটী দিয়াও এক বিন্দু বারি না পড়ে, তবে সেই জলে শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করিলে শ্রীকৃষ্ণ রোগ-মুক্তি লাভ করিবে। ছিদ্রময় কুম্ভ জলপূর্ণ করিয়া আনিতে কে সক্ষম হইবে? দর্শকবৃন্দ কেহ স্বীকৃত হয় না—অসম্ভব ভাবিয়া কার্য্যে কেহ অগ্রসর হইতে চাহে না; অসম্ভব—অসম্ভব বলিয়া বৈদ্যরাজের বাক্যে সকলে প্রতিরোধ করিল। বৈদ্যরাজ বলিলেন, সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব সত্য; কিন্তু সতীর পক্ষে সম্ভব। যদি কেহ সতী থাক—যদি কেহ কায়মনোবাক্যে সতীত্বব্রত পালন করিয়া থাক—কার্য্যে অগ্রসর হও—সহস্রছিদ্র কুম্ভ পূর্ণ হইয়া আসিবে। বিন্দুমাত্রও বারি ঝরিবে না। শ্রীকৃষ্ণ রোগমুক্ত হইবেন।

তখন স্থানীয় রমণীবৃন্দের মধ্যে বিষম উদ্দীপনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে বলিয়াছিল; কিন্তু নিজে কেহ অগ্রসর হইতে চাহে নাই। আপনাপন মনের অবস্থা সকলেই জানে—আপনাপন পাতিব্রত্যের কথা কাহারই অগোচর নহে; বিশেষতঃ যদি কুম্ভ পরিপূর্ণ করিয়া বারি আনিতে না পারে, সমাজে নিন্দনীয়া হইবে—লজ্জায় অধোমুখী হইতে হইবে—চিরদিন কলঙ্কের পসরা শিরে বহন করিতে হইবে। এ দুঃসাহসিক কার্য্যে ইচ্ছা করিয়া কেমন করিয়া অগ্রসর হইব। প্রথমতঃ কার্য্যটী অসম্ভব, দ্বিতীয়তঃ মনে আপনাকে দোষহীনা জানিলেও যদি আপনার অজ্ঞাতে কোনরূপ পাপের সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহা হইলে অপ্রতিভ হইতে হইবে—অসতী বলিয়া দুর্নাম রটিয়া যাইবে। হায়! কেহই অগ্রসর হইতে চাহে না, শ্রীকৃষ্ণ বুঝি বাঁচে না। যে যে রমণীর সতীত্বের কথা বিশেষরূপে প্রচারিত ছিল—সতী বলিয়া যাহাদিগের খ্যাতি

বিস্তৃত ছিল, সেই সকল রমনীকে অগ্রসর হইবার জন্য সকলে অনুরোধ করিতে লাগিল। সতীত্বের গরবে গরবিনীরা কুণ্ঠিতা হইলেও জনসাধারণের অনুরোধে কার্য্যে অগ্রসর হইল—সহস্রছিদ্র কুম্ভ লইয়া জল পূর্ণ করিতে চলিল। হরি হরি! কুম্ভ জলপূর্ণ করিয়া জল হইতে উত্তোলন করিবামাত্র সহস্রধারে জল ঝরিয়া পড়িল— পূর্ণ কলসী মুহূর্ত্তে শূন্য হইল। বিদ্রূপের হাস্যরোল চারি ধারে পড়িয়া গেল—আতঙ্কে সতীকুল শিহরিয়া উঠিল।

একে একে অনেক রমণী আসিল. অগ্রসর হইলেও বিপদ্, না হইলেও বিপদ্। একে একে অগ্রসর হইতে লাগিল, কেহ পারিল না। সহস্রছিদ্র কুম্ভ পূর্ণ করিয়া কেহ বারি আনিতে পারিল না। শ্রীকৃষ্ণ বুঝি আর বাঁচে না!

তখন শ্রীমতীকে এ কার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য সকলে ধরিয়া বসিল। শ্রীমতী আপনার ভাবনা ভাবিতেছিলেন না। ছিদ্রপূর্ণ কুম্ভ লইয়া তাঁহাকে বারি আনিতে অনুরোধ করিলে তিনি পারিবেন কি না—সমাজে লাঞ্ছিতা হইবেন, অসতী বলিয়া অখ্যাতি ঘোষিত হইবে, এ সকল চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তিনি ভাবিতেছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ, তিনি ভাবিতেছিলেন—জগৎপতির অপূর্ব্ব লীলা-রহস্য, তিনি ভাবিতেছিলেন—বৈদ্যনাথের রোগবিকার! এ কি অপূর্ব্ব লীলা! শ্রীকৃষ্ণের আবার বিকার কোথায়! নির্ব্বিকারের বিকার অসম্ভব—অসম্ভব!

তবে এ বিকারের ভাব কেন জগন্নাথ—তবে রোগী সাজিয়া মাতৃক্রোড়ে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ কেন—বৈদ্য সাজিয়া আপনি আবার ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছ কেন—সহস্রছিদ্র কুম্ভ সাজিয়া জলপূর্ণ হইবার জন্য উপস্থিত হই-য়াছ কেন—সতী সাজিয়া কুম্ভ পূর্ণ করিতে গিয়া অখ্যাতির পসরা শিরে তুলিয়া লইতেছ কেন—আত্মীয় সাজিয়া রোগভয়ে সশঙ্কিত হইয়া রহিয়াছ কেন? মাতা সাজিয়া পুত্র-দুঃখে বিষাদান্বিতা কেন?

সকলে ধরিয়া বসিল। শ্রীমতী সহস্রছিদ্র কুম্ভ লইয়া জলপূর্ণ করিতে জলে নামিলেন। কোথায় জল? এ যে নারায়ণ—কোথায় কুম্ভ? এ যে জগদাধার! শ্রীকৃষ্ণে জগৎ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণে কুম্ভ পূর্ণ হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণে শ্রীমতীর হৃদয় ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীমতী কুম্ভ উত্তোলন করিলেন, বিন্দুমাত্র জলও ঝরিয়া পড়িল না, শুধু নয়নের জল বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছিল—সহস্রছিদ্র কুম্ভের জল কুম্ভ হইতে উথলিয়া পড়িতেছিল। সে জলের অভিষেকে শ্রীকৃষ্ণ বাঁচিল।

এইরূপ সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণকে বিকারের ভাণ করিয়া জীবে জীবে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। জ্ঞানরূপী বৈদ্য আসিয়া বলে, যদি তোমার সহস্র ছিদ্রপূর্ণ হৃদয়কুম্ভ জলপূর্ণ করিতে পার, তবেই শ্রীকৃষ্ণ রোগমুক্ত হইবে।

আমরা পারি না—অপরকে করিতে বলি, আপনারা পারি না। সহস্র ছিদ্রে সহস্র প্রকার অনুভূতি দেখিতে পাই—সহস্র ছিদ্র দিয়া সহস্র প্রকার জল বহির্গত হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের বিকারের ভাণ তিরোহিত হয় না।

যদি শ্রীমতীর মত হইতে পারিতাম—যদি জ্ঞানী, যোগী, সাধু, ইত্যাদি সতীত্বের পরিচয়ের দিকে লক্ষ্য না করিতাম—যদি সহস্রছিদ্র পথ দিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতে দেখিতে পাইতাম—যদি বিষয়, ইন্দ্রিয়, হৃদয়, মন, প্রাণ, ঐ সমগ্র বিভিন্ন বিভিন্ন ধারণাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইত, তাহা হইলে কুম্ভ ভরিত—তাহা হইলে জীবভাবরূপ বিকার তিরোহিত হইয়া আত্মা রোগমুক্ত হইত—আত্মার রোগের ভাণ তিরোহিত হইত।

ছিদ্রে ছিদ্রে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন কর—ছিদ্রে ছিদ্রে অনুভূতিরূপে মা আমার হৃদয়-কুম্ভে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছেন ভাব—হৃদয়কে হৃদয় ভাবিও না, জগদাধার ভাব—সংস্কার-ছিদ্রকে ছিদ্র ভাবিও না, জগদম্বা ভাব—মুখে বল জগন্নাথ—প্রাণে বল জগন্নাথ—হৃদয়ে বল জগন্নাথ—ছিদ্রের মুখে মুখে জগন্নাথকে ধরিয়া রাখ, ছিদ্র দিয়া যাহা কিছু প্রবেশ করিবে, যেন জগ-ন্নাথস্পর্শে জগন্নাথ হইয়া আইসে। তবে ছিদ্রে জল পড়িবে না—তবে সহস্রছিদ্র কলসী পরিপূর্ণ থাকিবে—তবে সহস্র ঝারায় স্নান করিয়া তোমার শ্রীকৃষ্ণ রোগমুক্ত হইবে।

সমস্ত ধারণা এক না হইলে ছিদ্র বুজিবে না—সমস্ত বিষয়ে একদর্শন না হইলে আত্মার বিকারলীলা ভাঙ্গিবে না—সমস্ত বলিয়া যাহা কিছু, একে পরিণত না হইলে আত্মার স্বরূপ প্রতিভাত হইবে না; এবং এইরূপে আত্মার স্বরূপ যত দিন প্রতিভাত না হইবে, তত দিন শোক ঘুচিবে না।

ইহা অব্যক্ত, ব্যক্ত করিয়া কেহ তোমায় শিখাইতে পারিবে না—ইহা অচিন্ত্য, চিন্তা দ্বারা ভাবে আনিয়া, বাক্যে প্রকাশ করিয়া, কেহ তোমায় আঁকিয়া দেখাইতে পারিবে না—ইহা অবিকার্য্য, ইহাকে ভাববর্ণনা দ্বারা বিকৃত করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে কেহ পারিবে না। তুমি বিদিত হও। তুমি বিদিত হইবার জন্য অন্যের মুখ চাহিও না—তুমি আপনি বিদিত হও। কেহ

তোমায় বলিতে পারিল না বলিয়া অনুশোচনা করিও না—কেহ তোমায় সাহায্য করিতে পারিল না বলিয়া শোক প্রকাশ করিও না—কেহ তোমার ধান্ধা ঘুচাইতে পারিল না বলিয়া বিষাদপীড়িত হইও না।

আপনার যন্ত্রণা আপনি অনুভব করে, অন্যে অনুভব করিতে পারে না। তোমার আপনার যন্ত্রণা তুমি আপনি অনুভব কর। মৃত্যুর কশাঘাত কেমন করিয়া তোমার মর্ম্ম ভেদ করিতেছে, আপনি সে দিকে লক্ষ্য কর। সে কশাঘাত তোমাকে কোন্ মঙ্গল-পথে চালিত করিবার জন্য নিযুক্ত, আপনি তাহা ভাব। মৃত্যুকে মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া বিদিত হও—তখন মৃত্যুর ভয় তিরোহিত হইবে—তখন আত্মার স্বরূপ ফুটিবে—অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবে—তখন অচিন্ত্যকে চিন্তায় পাইবে—তখন অবিকার্য্যকে তোমার ভাবের বিকারে—তোমার ভাবের সজ্জায় সজ্জিত হইয়া হৃদয়-কুম্ভ পূর্ণ করিতে প্রত্যক্ষ করিবে। সাধারণ কথায় যাহাকে যোগ বলে—প্রাণায়ামাদির সাহায্যে প্রাণকে স্থির করিয়া মনে মিলাইয়া যে স্বরূপ প্রতিভাত হয়—সেই স্বরূপ উপলব্ধির জন্য যে সকল প্রক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়, সে সম্বন্ধে পরে বলিব। সাধারণের কৌতূহল চরিতার্থ করা মাত্র উদ্দেশ্য হইলে লিখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু কৌতূহল নিবারণ মাত্র যাঁহাদিগের উদ্দেশ্য, তাঁহাদিগের জন্য এ পুস্তক নহে, কৌতূহলের তাড়নাবশে পুস্তকের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা দর্শন করিতে আমি নিষেধ করি। পর পর যে যে বিষয় পুস্তকে সন্নিবেশিত হইবে—পর পর সেই সেই বিষয় শৃঙ্খলানুক্রমে হৃদয়ে ধারণ করিতে পাঠকবর্গকে আমি অনুরোধ করি। সেই জন্যই এ স্থলে মৃত্যু সম্বন্ধে এত করিয়া বলিলাম। মৃত্যুর ধারণা হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে ফুটাইয়া তুলিতে এত করিয়া অনুরোধ করিলাম। যোগাভ্যাসের ফললাভ করিতে হইলে আগে মৃত্যুর ধারণায় হৃদয় ভরিয়া লইতে হয়। যোগী হইব—ধর্ম্মাত্মা হইব, এ ধারণা লইয়া যোগী হওয়া যায় না। মরিব, মরণের ছবি জীবনে দেখিব—জীবনকে মরণের সজীব মূর্ত্তি বলিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিব, এইরূপ ধারণা হইলে তবে যোগী হওয়া যায়।

মোটের উপর আমরা এই কথাগুলি পাইলাম। আত্মস্বরূপ অব্যক্ত অচিন্ত্য, ইহা না জানিলে শোক দূরীভূত হয় না—মৃত্যুকে জীর্ণ বাস পরিত্যাগের মত না বুঝিলে আত্মা নিত্য, সর্ব্বগত, এ জ্ঞানলাভ ঘটে না—মৃত্যুকে স্বপ্নমাত্র বুঝিতে হইলে মৃত্যুর প্রগাঢ় চিন্তা, মৃত্যুর প্রগাঢ় ধ্যান হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়।

মৃত্যুযন্ত্রণা, মৃত্যুর যথার্থ স্বরূপ, মৃত্যুর বিভীষিকা তবে করাল মূর্ত্তি ধরিয়া অভিব্যক্ত হয়, তবে তাহার কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য প্রাণ কাঁদে—তবে সে ক্রন্দনের বেগে মৃত্যু-ঘোর ছুটিয়া যায়।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥২৬

অথ এনং চ নিত্যজাতং নিত্যং বা মৃতং মন্যসে ; মহাবাহো। তথাপি ত্বং এনং শোচিতুং ন অর্হসি।

ব্যবহারিক অর্থ।—অথবা যদি ইহাকে নিত্যজাত বা নিত্যমৃত বলিয়া অনুমান কর, তথাপি মহাবাহো! তুমি ইহার জন্য শোক করিতে পার না।

যৌগিক অর্থ।—এই শ্লোকে 'মহাবাহো' বলিয়া জীবকে সম্বোধন করিতেছেন। এ সম্বোধনের অর্থ, সাহসের উদ্বোধন।

কিন্তু যদি বল, এ আত্মসাক্ষাৎকার হইলে তখন অবশ্য আর শোকের কারণ থাকিবে না। যখন মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়বর্গ, বিষয়াদি সমস্তেই আত্মার স্বরূপ ফুটিয়া উঠিবে—যিনি দূর হইতেও দূরে—নিকট হইতেও নিকটে, তাঁহাকে যখন দূর নিকট সমস্ত ব্যাপিয়া অবস্থিত দেখিতে পাইব—তখন আর ইন্দ্রিয়-মায়াদির জন্য শোকের কোন কারণ থাকিবে না সত্য—কিন্তু এখন ত সে অবস্থা হয় নাই। এখন কখনও যে তাঁহাকে বহু দূরে—কখনও তাঁহাকে প্রাণের ভিতরে, কখনও তাঁহাকে অভ্রমালা ভেদ করিয়া শূন্যের পর শূন্য ঠেলিয়া—কখনও তাঁহাকে মর্ম্মের পর মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিয়া—ভাবের পর ভাব পদদলিত করিয়া, তবে ঈষৎ আভাসরূপে —ছায়ামাত্র-রূপে ফুটিয়া উঠিতে দেখিতে পাই ; এখন কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত হই? ইন্দ্রিয়-ভাব-নিমগ্ন প্রাণ—এখনও জন্ম-মৃত্যুর পূর্ণ রহস্য সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, মৃত্যুযন্ত্রণার ভ্রূকুটিবিভ্রম এখনও জাগাইয়া তুলিতে পারে নাই—মৃত্যুতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া এখনও মৃত্যুঞ্জয় করিয়া তুলিতে পারে নাই—এখন কি করে? এখনও প্রাণে অমাবস্যার ঘোর ভৈরব অন্ধকার মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসে নাই। এখনও হতাশে প্রাণের আশা বিশুষ্ক হইয়া যায় নাই, তাই মাকে আনা হয় নাই, এখনও মায়ের আসিতে বিলম্ব রহিয়াছে, এখন করি কি?

ভগবান্ বলিতেছেন, যদি মৃত্যু সম্যক্ উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বেই শোক পরি-ত্যাগ করিতে ইচ্ছা কর, তবে যুক্তি দ্বারা করিতে প্রয়াস পাও। এখন সাধারণ

অবস্থায় তোমরা যেমন নিত্য মরিতেছ, নিত্য জন্মাইতেছ, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী থাক—যদি তাহাই স্বীকার করিয়া লও, তাহা হইলেও ত শোকের কোন কারণ দেখিতে পাই না। আজ মরিবে—কাল আবার নূতন হইয়া জন্মাইবে; এই পুরাতন জগৎ পুনরায় নূতন চক্ষে দেখিবে; নূতনরূপে জগৎ তোমার চক্ষে চিত্রিত হইবে—নূতন রঙ্গে রঙ্গিণী হইয়া, নূতন বেশভূষায় ভূষিত হইয়া—নূতন ভাবের উৎস ছুটাইয়া—নূতন হইয়া নূতন করিয়া তোমায় মজাইবে—আজ যাহা পুরাতন—যাহা তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই আবার পাইবার জন্য লালায়িত হইবে, তাহাই আবার প্রিয় হইয়া উঠিবে; মধুর মধুর বলিয়া তাহারই লালসায় অধীর হইবে! এই সূর্য্য,এই চন্দ্র,এই প্রকৃতি,এই বৃক্ষলতা, এই লোকসমাজ সব—কিন্তু তুমি নূতন হইবে, তুমি নূতন সাজে সাজিয়া,স্মৃতির চিত্রক্ষেত্রখানি যথাসাধ্য মুছিয়া,তাহার উপর নূতন রঙ্গের রঞ্জনা দিয়া, নূতন রসে সেই সকলকে সিক্ত করিয়া আস্বাদন করিবে। ইহ জন্মে যাহার সহিত দৃঢ় মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ, পরজন্মে তাহাকেই হয় ত পরম শত্রু বলিয়া গ্রহণ করিবে। আজ যাহাকে পুত্র বলিয়া স্নেহধারায় অভিষিক্ত করিতেছ, দুই দিন বাদে হয় ত তাহাকেই পিতা বলিয়া তাহারই স্নেহকণার ভিখারী হইতে হইবে। আজ যাহাকে কুলটা বলিয়া ঘৃণা করিতেছ, দুই দিন বাদে - উভয়েরই নব কলেবর ধারণের পর তাহাকেই হয় ত সতী বলিয়া সমাদর করিবে। আজ যাহার প্রবঞ্চনায় প্রবঞ্চিত হইয়া মর্ম্মদাহে পুড়িতেছ—প্রবঞ্চনার মত মহাপাপ নাই বলিয়া যাহাকে ধিক্কার দিতেছ, ভগবানের নিকট যাহার বিচার প্রার্থনা করিতেছ, দুই দিন বাদে তুমি হয় ত প্রবঞ্চনার ফাঁদে ফেলিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিবে। আজ ধর্ম্মচর্চ্চায় রত থাকিয়া তুমি হয় ত জগতে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রখ্যাতি লাভ করিয়াছ; তুমিই আবার কে জানে, হয় ত জগতের সকল প্রকার অধর্ম্ম কার্য্যে অগ্রণী হইবে। আজ যাহাদের আপন ভাবিয়া অক্লান্ত অধ্যবসায়ে ভরণপোষণ ও সেবা করিতেছ, দুই দিন বাদে তোমার সেই আপনার লোকই তোমার দ্বারে ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হইলে মুষ্টিভিক্ষাতেও বঞ্চিত হইবে। নূতন আত্মীয় পাইয়াছ, নূতন জনক জননী পাইয়াছ, নূতন ভ্রাতা ভগ্নী পাইয়াছ, পুরাতনকে আর চিনিতে পারিবে না। যে গৃহ আপনি নির্ম্মাণ করিয়াছ, সেই গৃহ হয় ত আপনাকেই ভাঙ্গিতে হইবে; যে সংসার আপনি পাতিয়া আপনি তাহাতে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছ, সেই সংসারে আপনাকেই দাসত্ব করিতে হইবে। চিরপ্রার্থী হইয়া যাহার শরণাগত হইয়াছ, চির-প্রার্থী হইয়া সেই হয় ত তোমার শরণাগত

হইবে। সব ঠিক আছে—সব সেই একই আছে, শুধু তুমিই বদলাইয়াছ—তোমারই শুধু এমন এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যাহাতে সমস্ত জগৎ এক হইয়াও বিভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে। ইহা অপেক্ষা আনন্দের আর কি আছে—ইহা অপেক্ষা কৌতূহলপ্রদ আর কি হইতে পারে? তোমরা ছায়াবাজী দেখ, এই ছায়াবাজীর কথা ভাবিয়া দেখ; অপূর্ব্ব আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইবে।

সময়ে সময়ে পূর্ব্বজন্মের ঘটনা স্মরণ হইবার কথা সাধারণ মনুষ্যমধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। আমি একটী ঘটনার কথা বলিতেছি।

এক সময়ে কোন একটী প্রান্তরের মাঝে একটী প্রৌঢ় ব্যক্তি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রামলাভ করিতেছিল। বৈশাখের মধ্যাহ্ন,প্রচণ্ড রৌদ্রে, তপ্ত লৌহকটাহবৎ প্রান্তর জ্বলিতেছিল। বায়ুপ্রবাহ সে উত্তাপ বহন করিয়া জীবহৃদয় শোষণ করিতেছিল। প্রচণ্ড রৌদ্রে বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত যেন ঝলসিয়া যাইতেছিল। বৃক্ষতলস্থ সেই লোকটীর নিকটে জলপূর্ণ কুম্ভ ছিল; সে তাহা হইতে জলপান করিতেছিল।

এমন সময়ে আর একটী পথিক সেই বৃক্ষসমীপে উপস্থিত হইল। রৌদ্রে বিদগ্ধ হইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন ঝলসিয়া গিয়াছিল—তৃষ্ণায় কণ্ঠ হইতে বক্ষঃস্থল অবধি বিশুষ্ক হইয়াছিল। বৃক্ষতলস্থ লোকটীকে জলপান করিতে দেখিয়া সানুনয়ে তাহার নিকট একটু জল প্রার্থনা করিল।

সহসা উভয়ের চিত্তে ভাবান্তর ঘটিল। প্রথম লোকটী তীব্র স্বরে কহিল,—"তোমার সে অট্টালিকা কোথায়—সে দ্বারবান কোথায়? মনে পড়ে, আমি তোমার দ্বারে বহু পূর্ব্বে একদিন এইরূপ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, তুমি কর্কশ স্বরে দ্বারবানের দ্বারা আমাকে তোমার দ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিয়াছিলে। আজ তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে কাতর হইয়া তুমি এই প্রান্তর মাঝে আমার নিকট বারি প্রার্থনা করিতেছ। তোমার জীবন এখন আমার অধীন।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি লজ্জায় অধোবদন হইল। কি যেন বহু দিনের হারাণ স্মৃতি তাহার প্রাণে ফুটিয়া উঠিল। তাহার চিত্তে যেন কেমন এক প্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। "কই, আমার ত অট্টালিকা নাই—কখনও ছিল না। অথচ মনে হইতেছে; মনে হইতেছে কেন বলি—সত্যই ত ছিল – অট্টালিকা—দ্বারবান সত্যই ত একদিন আমার ছিল—একদিন সত্যই ত এই ব্যক্তি আমার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া জল প্রার্থনা করিয়াছিল। সত্যই ত, কবে—কবে—বহু দিন—বহু দিন।" এইরূপ ভাবে তাহার প্রাণ পূর্ণ হইতেছিল; তাহার মুখে বাক্যো-

চ্চারণ হইতেছিল না—সে একদৃষ্টিতে প্রথমোক্ত লোকটির দিকে চাহিয়া এইরূপে পূর্ব্বজন্মের ঘটনা দর্শন করিতেছিল। প্রথম লোকটী পুনরায় তাহাকে বলিল,—"তোমার মনে পড়িতেছে, না? বহু পূর্ব্বে; কবে, তাহা আমিও ঠিক করিতে পারিতেছি না; কিন্তু তুমি তাড়াইয়া দিয়াছিলে, ইহা সত্য; তুমি আমায় জল দাও নাই, ইহা সত্য। কিন্তু কবে বলিতে পার?"

উভয়ে আশ্চর্য্যে কিছুক্ষণ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এ জগৎ তাহাদিগের চিদাকাশে অন্য জগতের ছবিতে ঢাকিয়া গিয়াছিল। উভয়েই পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতির স্ফুরণে সহসা যেন দ্বিগুণ চৈতন্যযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে প্রথম ব্যক্তি বলিল,—"আমি তোমায় জল দিতেছি—পান কর। আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম।"

দ্বিতীয় ব্যক্তির তৃষ্ণা তখন বড় একটা ছিল না। বিস্ময়-কৌতূহলে তাহার প্রাণ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহার শরীর কাঁপিতেছিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে জল পান করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের উভয়েরই চিত্ত হইতে ছবি বিদূরিত হইল। তাহারা আর প্রত্যক্ষভাবে সে ঘটনা অনুভব করিতে সক্ষম হইল না। শুধু স্বপ্নের মত স্মৃতিটুকু তাহাদিগের মনে ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া রহিল মাত্র। বৃক্ষতলস্থ প্রথম ব্যক্তিটী সাধনা-পথে কিছু অগ্রসর হইয়াছিল, সে বুঝিল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, ইহা পূর্ব্বজন্মের একটা ঘটনার উদ্ভাসিত স্মৃতি।

যাহা হউক, আমাদিগের যদি চক্ষুঃ থাকিত—আমরা যদি ত্রিকালদর্শী হইতাম, তাহা হইলে আমাদিগের জীবনের পূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তী ইতিহাস এইরূপে দেখিতে পাইতাম—তাহা হইলে বার বার এমন করিয়া জগতের প্রেমে মজিতাম না—শান্তির প্রশান্ত তরঙ্গহীন সমুদ্রে হৃদয় ভরিয়া থাকিত—হৃদয় বিস্তৃত হইয়া উদার আকাশের মত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া থাকিত; করতলগত আমলকীর মত এ ব্রহ্মাণ্ড পরিদর্শন করিতাম। কিন্তু সে দিন আসিতে এখনও বিলম্ব আছে।

কেন আমরা উভয় দিক্ দেখিতে পাই না, ভূত এবং ভবিষ্যৎ কেন আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না? আমাদিগের চৈতন্য এখনও তত সবল হয় নাই বলিয়া। পূর্ব্বে বলিয়াছি জন্মমরণরূপ কশাঘাতে আমরা ক্রমশঃ পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছি। আমাদিগের চৈতন্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদিগের ভূত ও ভবিষ্যৎ আমাদিগের চক্ষে লুকাইয়া রাখিয়া, সেই চৈতন্য পরিবর্দ্ধনের

আর একটী কৌশল মা আমার অবলম্বন করিয়াছেন মাত্র। বার বার নূতন করিয়া একই জিনিষকে জন্মে জন্মে নূতন চক্ষে দেখিয়া, নূতন চক্ষে ভালবাসিয়া, নূতন প্রকারে তাহার সহিত ভাবের আদান প্রদান করিয়া আমাদিগের চৈতন্য পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। নূতনত্ব আমাদিগের চৈতন্য বর্দ্ধনের একটি প্রধান উদ্দীপক কারণ। পুরাতন লইয়া আমাদিগের ক্ষুদ্র চৈতন্যবিশিষ্ট প্রাণ অধিকক্ষণ ভাব জাগাইয়া রাখিতে পারে না—অধিকক্ষণ উদ্বোধিত থাকিতে অক্ষম। দ্রব্যের নূতনত্ব ঘুচিলেই আমাদিগের প্রাণ সে ক্ষেত্রে তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সে জিনিষ আর আমাদিগের প্রাণে নূতন ভাব জাগাইয়া চৈতন্য স্ফুরিত করিতে পারে না। ইহা আমাদিগের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যদি জগতের প্রত্যেক পদার্থ আমাদিগের চক্ষে পুরাতন বলিয়া প্রতিবিম্বিত হইত—যদি সকল জিনিষকে পুরাতন বলিয়া চিনিয়া ফেলিতাম—যদি আমাদিগের শিশুচৈতন্য প্রত্যেক জিনিষ ইন্দ্রিয়গোচর হইবামাত্র পুরাতন পুরাতন বলিয়া বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিত, তাহা হইলে স্তন্যাভাবে শিশুর মত আমাদিগের চৈতন্য ক্রমশঃ নির্জীব হইয়া পড়িত; অর্থাৎ তমোগুণের প্রগাঢ় আবরণ চৈতন্যকে গ্রাস করিত। আমাদিগের পূর্ণত্ব লাভের আশা চিরদিনের জন্য ঘুচিয়া যাইত। তাই মা আমার ভূত ভবিষ্যৎ উভয় চক্ষে ঠুলি লাগাইয়া দিয়াছেন—তাই প্রতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বার বার জন্মে জন্মে নূতন নূতন বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছি—তাই মা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া যত দিন না চৈতন্য পরিবর্দ্ধিত হয়, তত দিন একই জিনিষ নূতন নূতন করিয়া দেখাইতেছেন। তাই নিত্য পুরাতনী মা আমার নিত্য নূতন সাজে আমাদের চক্ষে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন। নিত্য নূতন রূপে মন ভুলাইয়া আমার চৈতন্যকে ঘুমাইয়া পড়িতে দিতেছেন না। নূতন আস্বাদে মজিয়া আমি বার বার আসিতেছি চৈতন্য সজীব রাখিতেছি—উন্মেষের ব্যাপকতা বাড়াইয়া তুলিতেছি। আর শুধু তাই আমরা মাকে আবার নূতন করিয়া দেখিতে চাহি—তাই আমার ভাবের ছাঁচে মাকে গড়িয়া আমরা হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা দেখিতে চাহি—তাই মায়ের ক্রোড়ে অহর্নিশ থাকিয়াও আমরা মাতৃহারা সন্তানের মত মা মা করিয়া কাঁদি।

তাই মন আমার নূতন করিয়া কাঁদে,—"আয়—আয় মা ভুবনমোহিনী পুত্রহারা উন্মাদিনীর মত একবার এ দীন সন্তানের কাছে ছুটিয়া আয় মা!" তাই প্রাণ আমার নূতন ছাঁদে কাঁদে,—"এস এস প্রাণনাথ। আমার পুরাতন নিষ্পেষিত প্রাণে একবার ভালবাসার আলিঙ্গন দিয়া নূতন প্রেমের উজান বহাইয়া দাও।" তাই

মর্ম্মের অন্তস্তল হইতে ক্রন্দনের বিষাদমাখা শ্বাস উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে থাকে—"কোথায় সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রসঞ্চারী, সর্ব্বপ্রাণ, সর্ব্বস্ব! আমার ক্ষুদ্র নিজস্ব-টুকুকে সমুদ্রমধ্যে দ্বীপের মত আর কেন জাগাইয়া রাখিয়াছ, তোমার অতল তলে মিশাইয়া লও। এ সর্ব্বব্যাপিত্বে আমার মন কই মজে না—এ কোলে করা আমার মনের মত হয় না। আর এক রকমে আমায় নূতন করিয়া কোলে লও। নূতন বেশে আমায় নূতন করিয়া ভালবাস—পুরাতন মা—মা! একবার নূতন করিয়া আমার কাছে এস!"

এইরূপে নূতন নূতন করিয়া বার বার কাঁদিয়া আমাদিগের চৈতন্য স্ফুরিত হইতেছে। নিত্য জন্ম ও নিত্য মরণে এই নিত্য-নূতনের অনুসন্ধান আছে বলিয়া—নিত্য নূতনের আস্বাদ আছে বলিয়া—চৈতন্য স্ফুরণের মন্ত্র লুক্কায়িত আছে বলিয়া, তাই আমরা নিত্য জন্মিতেছি, নিত্য মরিতেছি, এইরূপ ভাবে আবদ্ধ। তবে আর নিত্যজাত ও নিত্যমৃত, এ কথা আমাদিগকে শোকাকুল করিতে পারে না। এ যাদু যে বুঝিয়াছে — এ রহস্য যার প্রাণে ফুটিয়াছে, তার ত আর ইহার জন্য শোকের কোন কারণ নাই। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, তুমি আপনাকে নিত্যজাত বা নিত্যমৃত ভাবিলেও তোমার শোকের কোন কারণ নাই, বরং ইহা আনন্দপ্রদ। একই পদার্থ একই ক্ষেত্রে এইরূপে বার বার নূতন বলিয়া গ্রহণ করিতেছ যদি বুঝিতে পার, তবে এ জগৎ কৌতুকপ্রদ ছাড়া শোকপ্রদ হইতে পারে না। এবং এইরূপ বুঝিলে—এই নূতনত্বকে কৌতুক বলিয়া উপলব্ধি হইলে, তখন পুরাতনের সন্ধানে প্রাণ ঘুরে। তখন প্রাণ যেন নিত্যপুরাতনের আভাস পায়—তখন যেন মাতাপুত্রের চক্ষে চক্ষে মিলিত হয়। বহুদিনের অন্বেষণের পর চারি চক্ষু যেন এক হয়। তখন ধারা বহে—তখন শ্বাস রোধ হয়—তখন অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়—তখন সূর্য্য, চন্দ্র, ব্রহ্মাণ্ড কোথায় ঘুচিয়া যায়—তখন মাতা পুত্রের স্নেহময় আলিঙ্গনের মধ্য হইতে সমস্ত অন্তরায় দূরে অপসৃত হয়—তখন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাবর্গ দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া, মাতাপুত্রের এ অপূর্ব্ব মিলন কৃতাঞ্জলি বেপমান হইয়া দেখিতে থাকে—তখন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কৃতী সন্তানের মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকে—তখন শুধু স্নেহপীড়িত মাতৃকণ্ঠের আবেগরুদ্ধ "আয় আয়" শব্দ ও সন্তানের মুখের অর্দ্ধোচ্চারিত "মা" শব্দ, এই উভয়ে মিলিয়া "ওঁ ওঁ" শব্দ বাজিতে থাকে। তখন আর—আর কি হয়, তাহা বলিতে পারি না।

মর্ম্মের অন্তস্তল হইতে ক্রন্দনের বিষাদমাখা শ্বাস উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে থাকে—"কোথায় সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রসঞ্চারী, সর্ব্বপ্রাণ, সর্ব্বস্ব। আমার ক্ষুদ্র নিজস্ব-টুকুকে সমুদ্রমধ্যে দ্বীপের মত আর কেন জাগাইয়া রাখিয়াছ, তোমার অতল তলে মিশাইয়া লও। এ সর্ব্বব্যাপিত্বে আমার মন কই মজে না—এ কোলে করা আমার মনের মত হয় না। আর এক রকমে আমায় নূতন করিয়া কোলে লও। নূতন বেশে আমায় নূতন করিয়া ভাল বাস—পুরাতন মা—মা! একবার নূতন করিয়া আমার কাছে এস।"

এইরূপে নূতন নূতন করিয়া বার বার কাঁদিয়া আমাদিগের চৈতন্য স্ফুরিত হইতেছে। নিত্য জন্ম ও নিত্য মরণে এই নিত্য-নূতনের অনুসন্ধান আছে বলিয়া—নিত্য নূতনের আস্বাদ আছে বলিয়া—চৈতন্য স্ফুরণের মন্ত্র লুক্কায়িত আছে বলিয়া, তাই আমরা নিত্য জন্মিতেছি, নিত্য মরিতেছি, এইরূপ ভাবে আবদ্ধ। তবে আর নিত্যজাত ও নিত্যমৃত, এ কথা আমাদিগকে শোকাকুল করিতে পারে না। এ যাদু যে বুঝিয়াছে—এ রহস্য যার প্রাণে ফুটিয়াছে, তার ত আর ইহার জন্য শোকের কোন কারণ নাই। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, তুমি আপনাকে নিত্যজাত বা নিত্যমৃত ভাবিলেও তোমার শোকের কোন কারণ নাই, বরং ইহা আনন্দপ্রদ। একই পদার্থ একই ক্ষেত্রে এইরূপে বার বার নূতন বলিয়া গ্রহণ করিতেছ যদি বুঝিতে পার, তবে এ জগৎ কৌতুকপ্রদ ছাড়া শোকপ্রদ হইতে পারে না। এবং এইরূপ বুঝিলে—এই নূতনত্বকে কৌতুক বলিয়া উপলব্ধি হইলে, তখন পুরাতনের সন্ধানে প্রাণ ঘুরে। তখন প্রাণ যেন নিত্যপুরাতনের আভাস পায়—তখন যেন মাতাপুত্রের চক্ষে চক্ষে মিলিত হয়। বহুদিনের অন্বেষণের পর চারি চক্ষু যেন এক হয়। তখন ধারা বহে—তখন শ্বাস রোধ হয়—তখন অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়—তখন সূর্য্য, চন্দ্র, ব্রহ্মাণ্ড কোথায় ঘুচিয়া যায়—তখন মাতা পুত্রের স্নেহময় আলিঙ্গনের মধ্য হইতে সমস্ত অন্তরায় দূরে অপসৃত হয়—তখন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাবর্গ দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া, মাতাপুত্রের এ অপূর্ব্ব মিলন কৃতাঞ্জলি বেপমান হইয়া দেখিতে থাকে—তখন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কৃতী সন্তানের মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকে—তখন শুধু স্নেহপীড়িত মাতৃকণ্ঠের আবেগরুদ্ধ "আয় আয়" শব্দ ও সন্তানের মুখের অর্দ্ধোচ্চারিত "মা" শব্দ এই উভয়ে মিলিয়া "ওঁওঁ" শব্দ বাজিতে থাকে। তখন আর—আর কি হয়' তাহা বলিতে পারি না।

পারিলেও হৃদয়ে সাহস আসে এবং আশঙ্কা দূরীভূত হয়। মৃত্যুর পর সাধারণতঃ জীবের দুই প্রকারের গতি হয়। একটির নাম কৃষ্ণা গতি, অন্যটির নাম শুক্লা গতি। আমরা এ গতি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। এ স্থলে এইমাত্র উল্লেখযোগ্য যে, শুক্লা গতিই একমাত্র সুখপ্রদ। এবং আমরা চেষ্টা করিলে সেই শুক্লা গতি লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারি। অস্তিত্ব থাকিবে সত্য, কিন্তু সে অস্তিত্ব আজিকার মত অনুভব করিতে পারিব কি না; যদি না পারি, কি করিলে অনুভব করিতে সমর্থ হইব—এই রহস্যগুলি প্রতি মনুষ্যজীবনে উদ্‌ঘাটিত হওয়া আবশ্যক।

মৃত্যু আসিবে। শিশুকে যেমন পিশাচের ভয় দেখাইয়া জননী প্রশমিত করেন, তেমনি ভাবে জননী আমার এ দুরন্ত খেলা ভাঙ্গিবার জন্য মৃত্যুরূপ পিশাচের ভয় দেখাইবেন। শিশু বয়স্থ হইলে যেমন সে আর পিশাচ বা জুজুর ভয়ে ভীত হয় না, মা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া নানারূপে তাহাকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াও সক্ষম হয়েন না, তাহার সে কৃত্রিম কোপ ও ভীতি-প্রকাশক অঙ্গ-ভঙ্গিকে ঢাকা দিয়া তাঁহার ভিতরকার স্নেহের মধুময় আনন্দ যেমন ফুটিয়া উঠে, দুরন্ত ছেলেকে ভয় দেখাইতে পারিলাম না বলিয়া মা যেমন হাসিয়া ফেলেন—তুমি যদি জ্ঞানপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান হও, তাহা হইলে মায়ের ঐ কৃত্রিম মৃত্যু আদি ভীতি-প্রকাশক লক্ষণগুলি তিরোহিত হইবে—মা হাসিয়া অধীরা হইবেন। শুধু তখন মৃত্যু ছুটিবে—শুধু তখন মাতা-পুত্রের মুখের হাসির উচ্চ রোল শুনিতে পাওয়া যাইবে—শুধু তখন মাতাপুত্রে সমস্ত ভুলিয়া আনন্দের উৎসে মাতোয়ারা হইয়া থাকিবে।

তাই বলিতেছিলাম মৃত্যুকে চিনিতে হয়। অন্ধকার নিশায় বৃক্ষাদি যেমন পিশাচরূপে ভীতিপ্রদ হয়, বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবার পর যেমন সে ভীতি দূরীভূত হয় এবং একটা নিশ্চিন্ততার আনন্দ প্রাণে ফুটে, মৃত্যুকেও বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে উহার বিভীষিকা দূরীভূত হয় এবং নিশ্চিন্ততার হৃদয়ভরা শান্তি ও সাহস আমরা ফিরিয়া পাই।

কিন্তু এরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে না পারিলেও মৃত্যুর পর যখন পুনর্জ্জন্ম অবধারিত এবং স্থিরসিদ্ধান্ত, তখন এ তৃতীয় আশঙ্কা ভাবিবার বিষয় হইলেও অকিঞ্চিৎকর। অসীম যন্ত্রণাই হউক অথবা অপূর্ব্ব সুখানুভূতিই হউক, কিম্বা ঘোর তমসাচ্ছন্ন অজ্ঞান-তাই হউক, মৃত্যুর পর একটী বিশেষ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া আবার এইরূপ ভাবে যখন জগদনুভব করিতে পারিব, আবার জগতে এমনই ভাবে বিচরণ করিতে ও ভাবের আদান প্রদান করিতে সক্ষম হইব, তখন এ আশঙ্কাও হৃদয়ে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা মরিতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা জাত হইতেছি,—ইহাকে খণ্ডমৃত্যু বলে। এই খণ্ড মৃত্যুতে ও আমাদের জীবনের শেষ মৃত্যুতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। খণ্ড প্রলয় ও মহাপ্রলয়ের যেমন শুধু মাত্রার ইতরবিশেষ, খণ্ডমৃত্যুতে ও আমাদিগের মহামৃত্যুতেও তদ্রূপ মাত্রার ইতরবিশেষ মাত্র। এই খণ্ডমৃত্যু যখন জীব রোধ করিতে সমর্থ হয়, তখন জীব মৃত্যুঞ্জয়ত্বের তটস্থ লক্ষণে ভূষিত হয়। যখন মহামৃত্যু রোধ করিতে সমর্থ হয়, তখন মৃত্যুঞ্জয় হয়।

যাহা হউক, প্রতি খণ্ডমৃত্যুর পর যখন আমরা অস্তিত্ব হারাই না, প্রতি মুহূর্ত্তে মরিতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগের আশ্চর্য্য পবিবর্ত্তন ঘটিতেছে, অথচ যেমন উহা আমাদিগের অনুভূতিতে আসিতেছে না—আমবা যেন একই অবস্থায় রহিয়াছি বলিয়া অনুভব করিতেছি, তখন মৃত্যুর পরও যে একবারে অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিব, ইহা অসম্ভব। জন্মের পর মৃত্যু যেমন সুনিশ্চিত, মৃত্যুব পর জন্মও তদ্রূপ সুনিশ্চিত। জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি, কোন পরমাণুই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, ইহা স্থির-সিদ্ধান্ত। যখন জড় পরমাণু সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা, তখন অধ্যাত্মবিজ্ঞানে যে ইহা আরও দৃঢ়তর সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ করা ভুল। তবে যাঁহারা আত্ম-অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহাপন্ন, যাঁহারা মনে করেন—চৈতন্য, জড় পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন একটা পদার্থ মাত্র,—যেমন বিশেষ বিশেষ ভৌতিক পদার্থ একত্র করিলে তাহাতে উত্তাপ বা মাদকতা বা কোন প্রকারের শক্তি উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, আত্মাও তদ্রূপ ভৌতিক পদার্থের মিশ্রণে জাত একটা শক্তি-মাত্র—তাঁহাদিগের পক্ষে,আত্মার যে সমস্ত লক্ষণ বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত লক্ষণ স্বীকার করিয়া লইয়া, তার পর ধীরে ধীবে এই সাংখ্যজ্ঞানের অনুশীলন করা উচিত। তার পর আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়।

আগে তাহা হয় না। বর্ণপরিচয়েব সময় যেমন বর্ণের আকৃতি বা শ্রেণী স্বীকার করিয়া লইতে হয়, বর্ণপরিচয়ের সময়েই "ক"এর পর "খ" কেন, যেমন বুঝিতে পারা যায় না, তদ্রূপ আগে তাহাদিগের পক্ষে আত্মা স্বীকার করিয়া লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে, তার পর আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভবপর হয়।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥২৮

ভারত! ভূতানি অব্যক্তাদীনি, ব্যক্তমধ্যানি, অব্যক্তনিধনানি এব, তত্র কা পরিদেবনা।

ব্যবহারিক অর্থ।—ভারত! ভূতসকল আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত এবং নিধনে বা অন্তে অব্যক্ত, সুতরাং তাহাতে শোকের কারণ কি আছে?

যৌগিক অর্থ।—ব্যক্ত ও অব্যক্ত, শুধু অবস্থার তারতম্য মাত্র। বস্তুর কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। এক স্থানে অপ্রকাশ হইয়া অন্য স্থানে প্রকাশ হয় মাত্র। জন্ম মৃত্যুর ইহাই তারতম্য। যেমন জলকণা বাষ্পাকার গ্রহণ করিয়া জলে অদৃশ্য ও বায়ুমণ্ডলে ব্যক্ত হয়, আমাদের জন্ম মৃত্যুও তদ্রূপ। যতক্ষণ স্থূল শরীর পরিগ্রহণ করিয়া থাকি, ততক্ষণ এই স্থূল জগতে ব্যক্তভাবে থাকি, স্থূলদেহ ও স্থূল ইন্দ্রিয়-যুক্ত জীবসকলের প্রত্যক্ষগোচর হই—আবার যখন স্থূল দেহ পরিত্যাগ করি, তখন আর জগতের স্থূল ইন্দ্রিয়ে ব্যক্ত হই না—স্থূল জগতের পক্ষে অব্যক্ত হইয়া পড়ি। এ জগৎ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ভুবর্লোকে ব্যক্ত হই।

আমি যখন এই স্থূল জগতে থাকি অর্থাৎ যতক্ষণ আমার শক্তি স্থূল জগৎ উপভোগের অভিমুখিনী হইয়া থাকে, ততক্ষণ এই স্থূল জগৎমাত্রই আমার ইন্দ্রিয়-গোচর বা প্রত্যক্ষীভূত হয় এবং ততক্ষণই স্থূল ভূতসকল আমার পক্ষে ব্যক্ত। আবার আমি যখন স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মলোকে প্রবেশ করি, অর্থাৎ আমার যখন মৃত্যু অবস্থা ঘটে কিম্বা মৃত্যু ব্যতীত এই জীবিত অবস্থাতেই যখন আমি সূক্ষ্মলোকে অবস্থান করি অর্থাৎ যখন আমার শক্তি সূক্ষ্মজগৎ উপভোগের অভিমুখিনী হয়, তখন আর ইহ জগৎ আমার ইন্দ্রিয়গোচর হয় না—সূক্ষ্মলোক আমার ইন্দ্রিয়গোচর হয়। স্থূল জগদভিমুখী হওয়া বা বহির্মুখী হওয়া যেমন একই কথা, সূক্ষ্ম জগদভিমুখী হওয়া বা অন্তর্মুখী হওয়া তদ্রূপ একই কথা। সূক্ষ্ম জগৎ দেখিতে হইলে শক্তিকে সূক্ষ্ম জগদভিমুখিনী করিয়া লইতে হয়। সূক্ষ্ম জগৎ দূরে নহে, এই জগতেরই ভিতর দিয়া ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। যেমন স্থূল ভূতসকলের মধ্যেও ব্যোম অবস্থিত, তদ্রূপভাবে সূক্ষ্ম জগৎ স্থূল জগতের ভিতর ও বাহিরেই অবস্থান করে। ইহা দেখিতে হইলে দেখিবার জন্য একান্ত আগ্রহ প্রয়োজন। আজ আমরা স্থূল জগৎ নির্ব্বিবাদে, স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে ভোগ করিতেছি। কিন্তু কত চেষ্টা, কত অধ্যবসায়ের ফলে তবে আজ আমরা এরূপে এ জগৎ ভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছি—কত দিন ধরিয়া কত প্রকার ক্রিয়া ও অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া জীবনগতি চালাইয়া, তবে এ স্থূল জগতে ব্যক্ত

হইয়াছি ও স্থূল জগৎ আমার ইন্দ্রিয়ে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা কল্পনায় আসে না। এইরূপে যদি সূক্ষ্মজগতে অভিব্যক্ত হইতে হয়, যদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সূক্ষ্ম জগৎ উপভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে তদুপযুক্ত যত্ন ও অধ্যবসায় আবশ্যক। একদিনে তাহা হয় না। সুদৃঢ় বলবতী ইচ্ছার সাহায্য না পাইলে স্থূল জগৎ ও সূক্ষ্ম জগৎ এককালে উপভোগে আইসে না।

ইহ জগতে থাকিয়া সূক্ষ্ম জগৎ পরিদর্শন ও সূক্ষ্ম জগৎ উপভোগ করিবার স্বতন্ত্র পন্থা আছে সত্য, কিন্তু গতি ঈশ্বরাভিমুখিনী হইলে বা অন্তর্মুখে লক্ষ্য স্থাপিত হইলে, উহা আপনা হইতে সংসাধিত হয়। সুতরাং তাহার জন্য স্বতন্ত্র লক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না। শুধু এই বিষয়ে নহে, ভগবৎসাধনায় সকল প্রকার সিদ্ধি আপনা হইতে অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে। সিদ্ধি সিদ্ধি করিয়া ব্যস্ত হইলে ভগবৎসাধনায় বিঘ্ন হয় এবং সিদ্ধিও বহু কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে—এ কথা যেন স্মরণ থাকে।

যাহা হউক, যখন এইরূপে এক স্থানে অব্যক্ত ও অন্য স্থানে ব্যক্ত হওয়া ছাড়া ভূতসকলের অন্য কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না, তখন ইহার জন্য আমাদিগের শোক-বিমূঢ় হওয়া উচিত নহে। জীবিতাবস্থায় স্থূল জগতে ব্যক্ত হইয়াছি, মৃত্যু নামক পরিবর্ত্তনের পরাবস্থায় অন্য জগতে ব্যক্ত হইব—প্রভেদ এইটুকু মাত্র। যাঁহারা ভৌতিক কাণ্ডাদি দেখিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য হইলেও জগৎ ব্যতীত সূক্ষ্মলোকে আস্থা স্থাপন না করিয়া থাকিতে পারেন না। ভৌতিক কাণ্ড বহু স্থানে সংঘটিত হয়, এবং কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার ও সন্ধান করিলে সকলেই উহা দেখিতে পারেন।

জীব ও জড় পরমাণু সম্বন্ধে যেমন এই একই নিয়ম,ভগবৎসম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে এবং সৃষ্টি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ব্রহ্ম যাহাকে বল, সকলের সেই স্থির আদি ও অন্ত,ব্যক্ত ভাবাপন্ন হইয়া লোকরূপে প্রকাশ পাইতেছেন মাত্র। অব্যক্তস্বরূপিণী মা আমার সৃষ্টিরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন, অথবা তিনি ব্যক্ত নহেন,অব্যক্তও নহেন,তাঁহার যে অংশ যখন আমাদিগের জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়াদির গোচর হয়, উহাকেই তখন আমরা ব্যক্ত বলি, বাকী অংশ অব্যক্ত বলিয়া প্রকাশ করি। বস্তুতঃ ব্যক্ত ও অব্যক্ত বলিয়া কিছুই নাই। আজ যেরূপ ইন্দ্রিয় পাইয়াছ, যেরূপ শক্তিতে অভিভূষিত হইয়াছ, সেইরূপ ভাবে মাকে দেখিতেছ মাত্র। স্থূল ইন্দ্রিয় পাইয়াছ, স্থূলভাবে মায়ের স্থূল অঙ্গরূপে জগৎ পরিদর্শন করিতেছ। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ফুটাইয়া তুল,

মায়ের সূক্ষ্মাংশ এই স্থূলবৎ তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে। অব্যক্ত অংশ ব্যক্ত হইয়া উঠিবে। তখন এই স্থূল জগৎ বিশাল সমুদ্রে তৃণখণ্ডসকলের মত তোমার গ্রাহ্যেই আসিবে না। চন্দ্র, সূর্য্য আদি বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল তরঙ্গে আবর্জ্জনারাশির মত তোমার ইন্দ্রিয়ের সম্মুখ হইতে অপসৃত হইয়া যাইতে থাকিবে। তুমি মাতৃ-স্নেহ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবে।

তোমার মন ও প্রাণ, যাহার আদি অন্ত একই এবং স্থির, তুমি সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাহার সেই আদি ও অন্ত যেখানে এক হইয়াছে, সেইখানে চাহিয়া থাক। প্রত্যেক জিনিষের আদিও যাহা, অন্তও তাহাই। তোমার প্রাণশক্তি যখন স্থির হইয়া মিলাইয়া যাইবে, মনের তরঙ্গ যখন তোমাকে চঞ্চল করিতে পারিবে না, সমুদ্রে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর মত যখন তাহাতে লীন হইয়া যাইবে, সেই নিস্তরঙ্গ অবস্থায় যাহা আদি ও অন্ত, তাহাই অব্যক্ত ব্রহ্ম নামে অভিহিত। অভ্যাসের দ্বারা সেই চিরস্থির অবস্থার দিকে লক্ষ্য ফিরাও। তুমি স্নিগ্ধ শান্তির সন্ধান পাইবে।

কিন্তু আমরা স্থূল ইন্দ্রিয় পাইয়াছি, এই স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মায়ের এই বিরাট্ ব্যক্ত রূপ অহর্নিশ দেখিতে পাইলেও ইহাতে আমাদিগের প্রাণ সন্তুষ্ট নহে। আমরা যেন তাঁহাকে অলৌকিক ভাবে অস্বাভাবিকভাবে ফুটিয়া উঠিতে দেখিতে চাহি। ইহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রাণ আমাদের নূতন নূতন করিয়া ব্যস্ত। তাই যদি চাহ—তোমার এ স্থূল ইন্দ্রিয়ের সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর যদি সেই স্থির অব্যক্ত কারণস্বরূপাকে নূতনরূপে ফুটাইয়া তুলিতে চাহ, তাহাও হইবে। এই চক্ষে তুমি মায়ের আমার যে মূর্ত্তি দেখিতে চাহ, তাহাই দেখিতে পাইবে। যেরূপ সংস্কারে মাকে আমার মূর্ত্তিমতী করিয়া হৃদয়াভ্যন্তরে অহর্নিশ পূজা কর, সেই ব্যক্ত ও অব্যক্তের যেরূপভাবে আরাধনা কর, সেইরূপ ভাবেই সজ্জিত হইয়া মা তোমার চক্ষে প্রতিভাত হইবেন। শিব, শ্যামা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ, চৈতন্য অথবা অন্য কিছু যাহাই তোমার সংস্কার হউক—ভগবৎসম্বন্ধে তোমার যেরূপ সংস্কারই থাকুক—তোমার হৃদয়ে মায়ের যেরূপ সংস্কার-মৃত্তিকা-গঠিত প্রতিমূর্ত্তিই বিরাজিত হউক, তাহাতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাই তোমার মত সজীব সাকাররূপে তোমারই চর্ম্মচক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। ধীর অব্যক্ত শান্ত স্থির কারণস্বরূপ অব্যক্তে তোমার পক্ষে সুপ্তা জননী ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিয়া তোমারই প্রতিমায় অধিষ্ঠিতা হইবেন। তোমার চর্ম্মচক্ষুঃ সার্থক হইবে।

ভাবিও না, ইহা আশাতীত—ভাবিও না, ইহা আশ্বাসবাণী মাত্র—ভাবিও না, ইহা ভাবোদ্দীপক ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। ইহা একান্ত সত্য। অব্যক্ত হইতে জগৎ যেমন ব্যক্ত হইয়াছে—অব্যক্ত হইতে তোমার দেবতা তেমনই ভাবে ফুটিয়া উঠিবে—অব্যক্ত হইতে সূর্য্য, চন্দ্র যেমন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, অব্যক্ত হইতে তোমার সেই জ্যোতির্ম্ময় আরাধ্য দেবতা তেমনই ভাবে জ্বলিয়া উঠিবে। অব্যক্ত হইতে তুমি যেমন স্থূলরূপে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছ, অব্যক্ত হইতে মাও আমার তেমনই স্থূলরূপে অভিব্যক্ত হইবেন।

এইরূপ ভাবে মাকে জাগাইতে হইলে—এরূপ ভাবে মাকে চর্ম্মচক্ষের গোচর করিয়া ফুটাইতে হইলে মা মা করিয়া ক্রন্দনের প্রয়োজন। কাঁদিতে পারিলেই আসিবেন, অভ্যাস করিলেই কাঁদিতে পারিবে। তোমরা পুরাণে অনেক স্থলে পড়িয়াছ, দেবতাসকল বিপদে পড়িলে ক্ষীরোদসাগর অথবা কারণসমুদ্রের তটে গিয়া আরাধনা করিতেন। সেই অব্যক্ত-সমুদ্র হইতে তাঁহাদিগের আরাধ্য দেবতা উঠিয়া তাঁহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিতেন। তুমিও যদি তোমার দেবতাকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহ, চর্ম্মচক্ষে দেখিতে চাহ, তবে এই স্থূল জগতের ভিতরে যে অব্যক্ত-সমুদ্র অবস্থিত, সেই দিকে চাহিয়া মা মা করিয়া ডাক। কৃতাঞ্জলি হইয়া—বেপমান হইয়া, স্থির চক্ষে সেই অব্যক্ত-সমুদ্রের দিকে তুমি যে নামে ভালবাস, মাকে আমার সেই নাম ধরিয়া আহ্বান কর। চক্ষুঃ হইতে জল ঝরিয়া শুষ্ক হইয়া যাউক —চক্ষের পলক বন্ধ হইয়া যাউক—তোমার আহ্বান যেন বন্ধ না হয়—তোমার তৃষ্ণা যেন কমিয়া না যায়—তোমার সাধনার কথা যেন তুমি ভুলিয়া না যাও। এমনই ভাবে যদি কিছুক্ষণ ডাকিতে পার, এমনই ভাবের করুণ কাতর ক্রন্দন সে অব্যক্ত-সমুদ্রে গিয়া আঘাত করিতে পারে, তবে দেখিবে, যে অব্যক্ত তোমার আদি—যে অব্যক্ত তোমার অন্ত, সেই মহান্ অব্যক্তসমুদ্র হইতে তোমার সেই দেবতা উত্থিত হইবেন। প্রভাতে সমুদ্র হইতে যদি সূর্য্যোদয় দেখিয়া থাক, সূর্য্য যেন জল ভেদ করিয়া উদিত হইতেছেন যেমন মনে হয়, তেমনই ভাবে ধীরে ধীরে, তেমনই ভাবে জাগরণময়ী হইয়া মা আমার উঠিবেন। তোমার জীবনের যথার্থ সূর্য্যদর্শন ঘটিবে—তোমার জীবনের অন্ধকার নিশা ফুরাইবে। সে—সে জাগরণ চিরদিন তোমায় জাগ্রত করিয়া রাখিবে। এবং শুধু তখনই বুঝিতে পারিবে, কেমন করিয়া অব্যক্ত হইতে জগৎ ব্যক্ত হইয়াছে—কেমন করিয়া অব্যক্ত হইতে ভূতসকল ব্যক্ত হইয়াছে।

সৃষ্টির সামান্য অংশ মাত্রই ইন্দ্রিয়ে ব্যক্ত বা প্রকাশিত। অনন্ত সমুদ্রের একটী মাত্র তরঙ্গ দর্শন যেমন, মনুষ্য-জীবনে সমগ্র সৃষ্টির ততটুকু মাত্রই পরিদৃষ্ট হয়। অব্যক্তই সমস্ত। সাধনায় যতটুকু মাত্র শক্তিলাভ করিয়াছি, ততটুকু মাত্রই আমাদিগের অনুভূতিতে আসিতেছে ও ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানগোচর হইতেছে। সাধনায় যত অগ্রসর হইবে, অপ্রকাশ অংশ তত সুপ্রকাশ হইবে। ইহাই সাধনার ঐশ্বর্য্য।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রতি শ্বাসে আমরা মরিতেছি—প্রতি শ্বাসে শ্বাসে আমরা জীবন লাভ করিতেছি। সুতরাং বিশদভাবে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, আমরা শ্বাসে শ্বাসে অব্যক্তে প্রবেশ করিতেছি, অব্যক্ত হইতে নব শক্তি লইয়া প্রকাশিত হইতেছি। তাহা হইলে যদি ঐ শ্বাসের অনুধাবন করিতে পার—ধীরে ধীরে শ্বাসের সহিত কি প্রকার পরিবর্ত্তন হইতেছে, যদি দেখিয়া যাইতে পারি, তবে অব্যক্তের সন্ধান পাইতে পারি। শ্বাসের অনুধাবন কর—শ্বাস কি ভাবে কোথায় আমার দেহাভ্যন্তরে লীন হইতেছে, তাহা দেখিতে চেষ্টা কর - কোথা হইতে শ্বাস আকৃষ্ট হইতেছে—কোথা হইতে শ্বাস প্রক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহার সন্ধান রাখ। স্থিরচিত্তে একটী শ্বাস আকর্ষণ করিয়া, কোথায় সে যায়, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মনকে চালাও। একবারে পারিবে না, বার বার চেষ্টা কর— বার বার শ্বাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মনকে ছুটাইতে যত্নবান্ হও। অব্যক্তের সন্ধানের জন্য তোমার এ যত্ন। সুতরাং সেই অব্যক্তের শরণাগত হইয়া এ কার্য্যে ব্রতী হও। বিফলতা যত আসিবে, তত সেই অব্যক্তকে ডাকিতে থাক। অব্যক্ত স্বীয় আকর্ষণী শক্তিপ্রভাবে যাহাতে তোমায় টানিয়া লয়—যাহাতে তোমার শ্বাস তোমায় পথে ফেলিয়া না যায়, তাহার জন্য প্রার্থনা কর। শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তুমি না যাইতে পার, অন্ততঃ তোমার সে কাতর আহ্বানও যাহাতে যায়, তাহার জন্য সচেষ্ট হও। ক্রমশঃ দেখিবে—তোমার সে কাতর আহ্বান সে অব্যক্তে গিয়া পৌঁছিয়াছে—তোমার সে আহ্বানের প্রত্যুত্তর স্বরূপে অনাহত-নাদ তোমার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে—মা তোমায় ডাকিতেছেন। তখন আশ্বাস পাইবে—তখন সাহস ও বল পাইবে তখন শ্বাসের সঙ্গে অব্যক্তে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে। এবং শুধু তখনই ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে যাইতে ও অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে আসিতে তোমার শোকের কিছু কারণ থাকিবে না। ইহারই নাম প্রাণায়াম। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

আমাদিগের ইন্দ্রিয়ময় দেহের অভ্যন্তর দিয়া দেবলোক প্রবাহিত। অর্থাৎ দেবতাসকল আমাদিগের ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত। কর্ম্মরূপ যজ্ঞের দ্বারা তাঁহারা পূজিত ও প্রীত হন। আমাদিগের পক্ষে অব্যক্ত হইলেও যত্ন করিলে আমরাও দেবতা-সকলের সন্ধান করিতে পারি। ঐ দেবতাবর্গকে সন্তুষ্ট করিতে পরিলে আমাদিগের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়-সকলকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারি। এবং ইহা ছাড়া অন্যান্য সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-সকলও ফুটাইয়া তুলিতে পারি। সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ দেবতাসকল ও দেবলোক পরিদৃষ্ট হয়। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ আদি দেবতা-সকল ও তাঁহাদিগের সাম্রাজ্য ও শক্তি আমাদিগের গ্রাহ্যে আইসে। যেমন মৃত্তিকার তলদেশ দিয়া জলস্রোত প্রবাহিত এবং সেই রসতত্ত্বে অভিষিক্ত হইয়া ওষধিসকল পৃথিবী-বক্ষে পুষ্টিলাভ করে, কিন্তু একটু গভীর তলদেশ অবধি খনন না করিলে সে স্রোত দেখিতে পাওয়া যায় না, তদ্রূপ আমাদিগের এই স্থূলদেহের অভ্যন্তর দিয়া ঐ সূক্ষ্ম দেবলোক প্রবাহিত থাকিয়া, ঐ স্থূল দেহকে পুষ্ট ও কার্য্যশক্তি-সম্পন্ন করিয়া রাখিতেছে। কিন্তু আমরা দেহের অভ্যন্তরস্থ সে স্রোতে প্রবেশ করিতে না পারিলে সে লোক প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। পৃথিবীর বক্ষ যতই বিশুষ্ক হউক, তাহার প্রত্যেক ধূলিকণা বা পরমাণুটি পর্য্যন্ত যেমন অভ্যন্তরস্থ রসপ্রবাহে অহর্নিশ অভিষিক্ত, তদ্রূপ আমাদিগের স্থূলদেহের প্রত্যেক পরমাণু ঐ দেবলোকের সূক্ষ্ম শক্তিপ্রবাহে অভিষিক্ত।

আবার দেবলোকের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মতর তপোলোক বিরাজিত। স্থূলদেহ ভেদ করিয়া যেমন দেবলোকে উপস্থিত হইতে হয়, দেবলোক ভেদ করিয়া তদ্রূপ তপোলোকে প্রবেশ লাভ করিতে পারা যায় এবং উহা প্রত্যক্ষীভূত হয়। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর লোকসকল এইরূপ আমাদিগের দেহের অভ্যন্তর দিয়া বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। উহা এখন আমাদিগের পক্ষে অব্যক্ত হইলেও চেষ্টা দ্বারা আমরা ব্যক্ত করিয়া লইতে পারি। এবং ক্রমশঃ সূক্ষ্মতম হিরণ্ময় কোষের সন্ধান পাইতে পারি।

যাহা হউক, সাধকের সাধনা ঘনীভূত হইলে সে অব্যক্ত-সমুদ্রে তরঙ্গহিল্লোল খেলিতে থাকে। অব্যক্তরূপিণী মা আমার ব্যক্ত হইবার জন্য অধীরা হয়েন। তখন আমারই অভ্যন্তরস্থ দেবলোক ও তপোলোকস্থিত দেবতাবর্গ, আমারই কেন্দ্রস্থিত ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত শক্তিসংঘ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া মাতৃ-আগমনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়ে। তখন তাহাদিগের দেহ হইতে শক্তি

বিনির্গত হইয়া অব্যক্তমুখে ধাবিত হইয়া মাতৃ-অঙ্গে মিলাইয়া যায়। মা আমার সেই শক্তি অনুক্রমে বিস্ফুরিতা হইয়া সাধকের হৃদয় আলোকিত করিয়া দাঁড়ান। যে সাধকের যে প্রকার সংস্কার—যে সাধকের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাবর্গ যে ধরণে উদ্বোধিত, সেই প্রকারের শক্তি মাতৃ-অঙ্গে লিপ্ত হয় বলিয়া বিভিন্ন সাধকের হৃদয়ে মা আমার বিভিন্ন প্রকারে প্রকটিতা হয়েন। এই জন্য মায়ের বহুরূপ আমরা ধর্ম্মজগতে দেখিতে পাই। যে যেরূপ ভাবে কৃতার্থ হইয়াছে, দল্ দল্ করিয়া অব্যক্ত যেরূপ ভাবে উদ্বেলিত হইয়াছে, সে সাধক সেই ভাবেরই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সাধক আপনি ধন্য হইয়াছেন, অপরকে ধন্য করিবার জন্য সে অপূর্ব্ব কাহিনী গাহিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বক্ষেত্রেই অব্যক্ত ব্যক্ত হইয়াছেন মাত্র।

এইরূপে অব্যক্ত যখন ব্যক্ত হইয়া সাধকের অভিলাষ পূর্ণ করে, সাধকের বহু দিনের ক্রন্দনের গাথা যখন এইরূপে করুণার অরুণ রাগে মাকে রঞ্জিত করিয়া বুকের ভিতর টানিয়া আনে, শুধু সেই রক্তরাগময় প্রভাতে সাধক বুঝিতে সমর্থ হয়, কেমন করিয়া অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত ও ব্যক্ত হইতে অব্যক্তাবস্থা সংসাধিত হয়।

আমার জ্ঞানের প্রয়োজন নাই—আমার ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই, আমার আপনার অন্ধকার লইয়া আমি একা থাকি, সেই ভাল। আমি ক্ষণপ্রভার ক্ষীণ আলোকের ক্ষণস্থায়ী চপলা-খেলা চাহি না—আমি আপনার দুঃখে আপনি অশ্রুধারা ঢালি, আমি নির্জ্জন হৃদয়ের নিভৃত কোণে আপনাকে সংস্কার-বস্ত্রে আবৃত করিয়া ধূলায় লুটাইয়া কাঁদি, আমার সেই ভাল। আমি মারামারি কাটাকাটি চাহি না—আমি হুড়াহুড়ি ছুটাছুটি চাহি না—আমি পরের কড়ি ধার করিয়া বৈতরণী পার হইতে চাহি না; অব্যক্তরূপিণী মাকে আমার টানিয়া আনিবার জন্য, অব্যক্তরূপিণী মায়ের আমার অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমি পরের বাটী হইতে রত্ন-সিংহাসন ভিক্ষা করিয়া আনিতে চাহি না; আমার যেরূপ জ্ঞান আছে—আমার যেরূপ সংস্কার আছে—আমার যেরূপ পর্ণকুটীর আছে, তাহাই আমার থাক। জানি, একদিন যখন আমি ক্রন্দনে তন্ময় হইয়া থাকিব, আকুল উদ্বেলিত হৃদয়ে ধূলায় লুটাইতে থাকিব, তখন সহসা মাতৃচক্ষের স্নেহাশ্রু ঝরিয়া পড়িয়া আমার চমক ভাঙ্গিয়া দিবে। আমি দেখিব, মা আমার অজ্ঞাতে আসিয়া আমার শিয়রে বসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া ঝর ঝর

কাঁদিতেছে—অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইয়া উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়াছে, অব্যক্ত ও ব্যক্ত একই হইয়াছে, আদি, মধ্য ও অন্ত মিলাইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমার ব্যক্ত ও অব্যক্ত লইয়া শোক বিলাপ করিবার প্র য়াজন নাই।

পূর্ব্বশ্লোকের "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" এই জ্ঞানের সাধনার পর এই "অব্যক্তাদীনি ভূতানি" ইত্যাদি জ্ঞান ফুটিয়া উঠিবে। কিছু দিন "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ" এই মন্ত্র অভ্যাস কর, তার পর এই অব্যক্ত ও ব্যক্তের একীকরণ জ্ঞান তোমার বুকের ভিতর বাজিবে। "জাতমাত্রের মরণ সুনিশ্চিত, মৃতমাত্রের জন্ম অবশ্যম্ভাবী" এই ধারণাটী চিত্তে বদ্ধমূল হইলে তখন কোথা হইতে জন্মিয়াছি ও মরণের পর কোন্ ক্ষেত্রে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিব, সেই ক্ষেত্রের সন্ধানে প্রাণ অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে; তখন প্রাণ সেই অব্যক্ত কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। অব্যক্ত অব্যক্ত করিয়া প্রাণ আকুল হয়; এবং তখনই অব্যক্তের নিত্য সনাতন স্থির আভাসে হৃদয় শান্তিপূর্ণ হয়। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" এই ধ্রুব সত্যটি সংস্কারে পরিণত কর। অহর্নিশ এই ভাবটি মন্ত্রের স্বরূপ প্রাণের ভিতর কিছুদিন জাগাইয়া রাখ। প্রাণ আর এই আপাত-ব্যক্ত জগতের দিকে চাহিবে না। অব্যক্তকে ব্যক্ত করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে। আসা যাওয়ার কথা ভাবিতে ভাবিতেই কোথা হইতে এ আসা যাওয়া, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্‌বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥

এনং আশ্চর্য্যবৎ কশ্চিৎ পশ্যতি, তথৈব চ অন্যঃ আশ্চর্য্যবৎ বদতি, অন্যশ্চ এনং আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি, শ্রুত্বা অপি চ এনং কশ্চিৎ নৈব বেদ।

ব্যবহারিক অর্থ। -কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যরূপে দর্শন করেন, তদ্রূপ কেহ আশ্চর্য্যবৎ বলেন, কেহ আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ করেন, শুনিয়াও কিন্তু কেহ ইহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না।

যৌগিক ব্যাখ্যা।—এই অব্যক্তকে কেহ আশ্চর্য্যরূপে পরিদর্শন করিয়া থাকেন। সাধক যখন অব্যক্তের সন্ধান পায়—যখন তাহার তৃতীয় চক্ষুঃ উন্মেষিত হয়, তখন অপূর্ব্ব বিস্ময়ে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে। যেখানে প্রপঞ্চকে ব্যক্ত দেখিতেছিল, সেইখানে প্রপঞ্চের আদি ও অন্তস্বরূপকে ব্যক্ত দেখে; যেখানে জগৎ দেখিতেছিল, সেইখানে জগন্মাতাকে পরিদর্শন করে; যে কেন্দ্রে মায়ার চিত্রসকল অহরহঃ ফুটিয়া-উঠিতেছিল, সেই কেন্দ্রে মহামায়ার মোহিনী মূর্ত্তি প্রকটিত হয়।

অপূর্ব্ব বিস্ময়ে তাহার প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে। পুলকে তাহার প্রত্যেক পরমাণু প্রাণময়, চৈতন্যময়, আনন্দময় হইয়া উঠে। জড়দেহ তার চৈতন্যে গঠিত বলিয়া অনুভব করে। কি অলৌকিক পরিবর্ত্তন! ব্রহ্মাণ্ড যেমন ছিল, তেমনই রহিয়াছে; জল, স্থল, বায়ু, আকাশ যেমন ছিল, তেমনই রহিয়াছে, কোথাও কিছু অন্তরায় ঘটে নাই, কোথাও কিছু বিপর্য্যয় সংঘটিত হয় নাই,- অথচ এ কি হইল! মা মা, এ কি দেখিনু মা!

এইরূপে সাধক কৃতার্থ হয়। এ দর্শন আশ্চর্য্য নহে, ইনি আশ্চর্য্য পদার্থ নহেন। যাহা নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র স্বপ্রকাশ, তাহা আশ্চর্য্য হইতে পারে না; তাহা সর্ব্বসাধারণী। কিন্তু এইরূপ সর্ব্বতঃ এবং সর্ব্ব হইয়াও আশ্চর্য্যভাবে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত থাকেন এবং আশ্চর্য্যভাবে সাধকের চক্ষে সে আশ্চর্য্য অব্যক্ত অবস্থা হইতে ফুটিয়া উঠেন। সেই জন্য আশ্চর্য্যবৎ শব্দটির এ স্থলে সার্থকতা। আশ্চর্য্যস্বরূপিণীর এ আশ্চর্য্য লুকোচুরী খেলার প্রত্যেক ভঙ্গিমাটুকু আশ্চর্য্য। লুকান আশ্চর্য্য, ব্যক্ত হওয়া আশ্চর্য্য, পায়ে ঠেলা আশ্চর্য্য, কোলে ধরা আশ্চর্য্য, নির্ম্মমতা আশ্চর্য্য, মমতার মোহ আশ্চর্য্য। ভাবিও না, তাহাতে মায়া নাই। তার যত মায়া, আর কাহারও তত নাই। তোমার কতটুকু মায়া আছে? কতটুকু মায়া লইয়া তুমি সংসারে ঢালাঢালি কর? কতটুকু ভালবাসা লইয়া তুমি জগৎকে আপনার করিতে চাহ? সে কতটুকু? অগাধ অপরিমেয় মায়া বুকে লইয়া, অগাধ অপরিমেয় ভালবাসা বুকে ধরিয়া মা আমার তোমার অপেক্ষা করিতেছেন। দুই চক্ষে তোমায় দেখিয়া সাধ মিটে না বলিয়া তৃতীয় চক্ষু উন্মেষিত করিয়া তোমার দিকে চাহিয়া আছেন। তবু অন্ধ,—তবু মা আমার তোমার দোষ অংশ দেখিতে পান না। দোষ বলিয়া কিছু তাঁর চক্ষে প্রতিঘাত করে না—মঙ্গলময়ীর

মঙ্গলময় চক্ষে সব মঙ্গল, সর্ব্বত্র মঙ্গল। ভালবাসার মোহে মা আমার চক্ষুহীনা। আমাদের দোষ যদি দোষ বলিয়া তার চক্ষে প্রতিফলিত হইত, তবে কি এ অনন্ত যাত্রায় আমারা পদমাত্র অগ্রসর হইতে পারিতাম। আশ্চর্য্য ভালবাসা!

শুধু তাই কি? আশ্চর্য্য, নিত্য হইয়াও কেমন করিয়া অনিত্য প্রপঞ্চরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। আশ্চর্য্য,—সত্য হইয়াও কেমন করিয়া মিথ্যার ভাগে বদ্ধ হইয়াছে। আশ্চর্য্য,—নিগুর্ণ ও সগুণের কেমন করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। আশ্চর্য্য,– একই পদার্থ নিগুর্ণ ও সগুণরূপে লোকচক্ষে প্রতিভাত হইতেছে।

আর আশ্চর্য্য বিরাট্‌ রাজরাজেশ্বরী হইয়াও কেমন করিয়া দীন ভিখারী জীবের সারথিরূপে অবস্থান করিতেছে। সন্তানের হৃদয়-রথের উপর নবারুণের রক্তরাগ ছড়াইয়া রক্তচরণখানি বাড়াইয়া দিয়াছে; পৃষ্ঠে চরণ-চুম্বী কেশপাশ দোলাইয়া হৃষীকেশ-বেশে তাহার গতির সারথ্য করিতেছে; মুখে উছলিত হাসি, ভঙ্গিমায় নিশ্চিন্ততার বিমল লাবণ্য, এক করে বল্গা, অন্য করে কশা, চাহনি বিশাল অথচ অন্তর্ভেদী, আমার মুখাপেক্ষী হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়াছে,—সখ্যভাবের মাধুর্য্যে, স্নেহের ঢল ঢল তরঙ্গে হৃদয় পূর্ণ—আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই করিতেছে, আমি যে দিকে যাইতে চাহিতেছি, সেই দিকে লইয়া চলিয়াছে; অথচ একমাত্র তাহারই ইচ্ছার চরিতার্থতা হইতেছে মাত্র; শক্তি তাহার, ইচ্ছা তাহার, কার্য্য তাহার, কিন্তু এ শক্তি, ইচ্ছা ও কার্য্যের ভিতর সম্ভোগ বলিয়া যে চরিতার্থতাটুকু আছে, সেটুকু আমায় দিয়া রাখিয়াছে; আমার স্বাধীন সম্ভোগের তিলমাত্র অংশ গ্রহণ করে না;—এমন আর কে আছে রে! এমন মা—এমন সখা! এমন সে আর কোথায় পাবি রে! আমায় কর্ত্তা সাজাইয়াছে, সম্ভোগ দিয়াছে!—অথচ অজ্ঞাতে আপনিই কর্ত্তৃত্ব করিয়া চলিয়াছে, আর হাসিতেছে; যখন এইরূপে দেখি, তখন আশ্চর্য্যে, বিস্ময়ে, পুলকে, স্তব্ধ-নেত্রে, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকি মাত্র।

এইরূপে আশ্চর্য্যে কেহ তাহাকে দর্শন করেন। যাহাদের জীবনে এ সার্থকতা ঘটে নাই, যাহাদের ভাব এতটা ঘনীভূত হয় নাই, যাহাদের হৃদয়ে ভাব জন্মাইতেছে, কিন্তু স্থায়িত্ব ও ঘনীভূতি লাভ করিতে না পারিয়া মায়ের মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের উপযোগী হইতেছে না;—সুতরাং ভাবসকল বহির্ম্মুখে ধাবিত,—তাঁহারা

আশ্চর্য্য ভাবে ইহার কথা বলেন। যেমন তরল মৃত্তিকায় মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় না, তদ্রূপ ভাব যতক্ষণ না ঘনীভূত হয়, ততক্ষণ তাহাতে মাতৃমূর্ত্তি রচিত হইতে পারে না। জলদখণ্ডের মত সে ভাব-সকল হৃদয়াকাশ হইতে বরিষণ না করিয়াই বাক্যের আকারে বহির্গত হইয়া যায়। ধরা যে স্থলে সমধিক উত্তপ্ত, সেইখানকার আকাশেই চারি ধার হইতে যেমন মেঘ ছুটিয়া আসিয়া ঘনীভূত হয় ও নির্ম্মল বরিষণে ধরা অভিষিক্ত করে, তদ্রূপ প্রাণ অভাবের বা তপস্যার উত্তাপে উত্তপ্ত না হইলে, ভাবের মেঘ ছুটিয়া আসিয়া ঘনীভূত হইয়া মাতৃমূর্ত্তি প্রকাশিত করিতে পারে না। যথোচিত উত্তাপ না হইলে মেঘ আসিয়া জমিয়া আবার অন্তর্হিত হয়। প্রবল অভাব অনুভব না করিলে ভাবের মেঘ আসিয়া আবার বহির্গত হইয়া যায়। এ মেঘ সেই ভাবের ঢল্ ঢল্ দল্ দল্ সমুদ্র হইতেই উৎপন্ন। সমুদ্র হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া যেমন গগনে মেঘাকারে অবস্থান করে, ভাবময়ীর ভাবসমুদ্র হইতে মায়াবাষ্প উত্থিত হইয়া তদ্রূপ চিদাকাশে মেঘ সঞ্জাত করে।

যাহা হউক, অভাবের স্বল্প উত্তাপতপ্ত হৃদয় হইতে ভাবসকল বাহিরে ধাবিত হইয়া মুখে ব্যক্ত হইতে থাকে। আশ্চর্য্যভাবে সে ভাবময়ীর ভাবকাহিনী-সকল জগতে প্রচার করিতে থাকে। আশ্চর্য্যভাবে লোকের হৃদয়ের ধান্ধাসকল, তাহার অমৃতবাণী অন্তর্হিত করিয়া দেয়। আশ্চর্য্যভাবে জীব-হৃদয়ে ভগবদ্ভাব জাগাইয়া দিয়া ভাবের মেঘ রচনা করিয়া দেয়। আশ্চর্য্যভাবে মনুষ্য-জগৎ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। জনসঙ্ঘ তাহার ইঙ্গিতে উঠিতে চলিতে থাকে, তাহার চরণ-প্রান্তে লুটাইতে থাকে। তার কাতর মাতৃআহ্বানের সঙ্গে আহ্বান মিশাইবার জন্য লোকসকল চঞ্চল হয়। যেমন বাত্যাবিতাড়িত হইয়া সমুদ্র-তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তদ্রূপ জন-সমুদ্রে একটা উত্তেজনা, একটা উদ্দীপনার ভাব জাগিয়া উঠিতে থাকে। সে সাধকের মুখের অভয়বাণী যাহার হৃদয়ে একবার প্রবেশ করে, সে আর কিছু শুনিতে চাহে না, সে আর কাহারও অপেক্ষা করে না, সে আর জগতের ভয়ে ভীত হয় না, সে ভাবের আবেগে মুগ্ধ হয়, হৃদয় উছলিয়া উঠে· ভাবে গদ গদ কণ্ঠে মা মা বলিয়া না ডাকিয়া থাকিতে পারে না।

অন্যে—যাহাদিগের ভাব ততটা ঘনীভূত হয় নাই, যাহাদিগের দর্শন করিবার বা বলিবার শক্তি এখনও জন্মায় নাই, তাহারা আশ্চর্য্যরূপে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করে। এ সকল অলৌকিক কথা তাহাদের চিত্তকে বিস্ময়ে নিমগ্ন করে।

আনন্দে তাহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়, প্রাণ অন্তর্মুখে আকৃষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু এরূপ দেখিয়া, বলিয়া, শুনিয়াও কেহ তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভাবে জানিতে সমর্থ হয় না।

আত্মোপলব্ধি প্রধানতঃ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর সাধক উপাস্য দর্শনে সমর্থ হয়, তাহার ভাব ঘনীভূত হয় এবং মাকে আমার হৃদয়ে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধকের আত্মদর্শন হয় না, ভাব তাহার তত ঘনীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, তবে ভাবরাশি সজাগ হয় এবং বাক্যরূপে সে ভাব জগতে ছড়াইয়া পড়ে। তৃতীয় শ্রেণীর সাধকের হৃদয়ে ভাব স্বতঃ উদিত হয় না। ইহা অন্যত্র হইতে আবির্ভূত হইয়া হৃদয়কে আকুল করিয়া তোলে এবং অভাবের উত্তাপে উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়া ভাবোদয়ের উপযোগিরূপে পরিণত করিয়া দেয়। কিন্তু অবস্থাত্রয়ের প্রত্যেকটিতেই মায়ের আমার অপূর্ব্বত্ব প্রতিপন্ন হয়। আশ্চর্য্য,বিস্ময়, পুলক—প্রত্যেক অবস্থারই সাধারণ লক্ষণ।

প্রথম শ্রেণীর সাধক মাতৃচরণ দর্শনে যখন কৃতকৃতার্থ হয়, তখন বিস্ময়ের বিহ্বলতা তাহার দূরীভূত হয় না,—মূকবৎ, জড়বৎ, মায়ের মুখের দিকে সে চাহিয়া স্থির হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-কার্য্য রোধ হইয়া যায়, চক্ষে জলধারা অবধি প্রবাহিত হয় না। নির্জ্জন, নীরব, নিথর, গগন অপেক্ষা স্বচ্ছ, গগন অপেক্ষা বিশাল কোন শান্তির অনন্তবিস্তীর্ণ জাগরণময় নিত্য স্থির সাম্রাজ্যে মাতাপুত্রে একীভূত হইতে থাকে। লোকচক্ষুঃ সে মিলন দেখিতে পায় না। জগতের লোক সে মিলনোৎসবের আনন্দে প্রবঞ্চিত। লোকের মাঝে, জনতার মাঝে, কোলাহলের মাঝে সন্তানকে আদর করিয়া মায়ের আমার স্নেহের বেগ প্রশমিত হয় না। তাই জগৎচক্ষুঃ হইতে দূরে—অতিদূরে লইয়া গিয়া, প্রাণের পুত্তলিকে বুকে করিয়া, অসীম ব্রহ্মাণ্ড-পুঞ্জ-খচিত নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবলোক অতিক্রম করিয়া উধাও হইয়া যাইতে থাকে। তার নিজের যে কোন লোক নাই। তার নিজের বুঝি কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। সর্ব্বস্ব সে মহেশ্বরাদিকে ভাগ করিয়া দিয়াছে, সর্ব্বস্ব সে সর্ব্বকে দিয়াছে। মাতৃস্নেহ-বিহ্বলা দরিদ্রা মা'টি আমার, উন্মাদিনী মা'টি আমার—তাই সন্তান বুকে লইয়া নির্জ্জনতার জন্য উধাও হইয়া গিয়া, জানি না, কেমন করিয়া কোন্ দেশে নির্জ্জন স্থানের অন্বেষণ পাইয়া

একবার নিশ্চিন্তমনে তাকে স্নেহধারা পান করায়। উন্মাদিনী, উন্মাদিনীর মত তার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। ইহাও সেই অব্যক্ত ক্ষেত্রে।

যাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধক, তাঁহাদিগের সৌভাগ্য এত উজ্জ্বল নহে। তাঁহারা প্রগাঢ় অধ্যবসায় সহকারে ধ্যানাদি প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে প্রয়াস পান; অথবা ভাবাবলম্বনে অন্তর্ম্মুখী হইতে থাকেন। ধ্যান ও জপের প্রকৃষ্ট পন্থা অনুধাবন করিয়া স্থির হইতে স্থিরতর অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন; অথবা ভাবের প্রশান্ততায় মুগ্ধ হইয়া সময়ে সময়ে তন্ময় হইয়া যান। কিন্তু অন্যান্য সময়ে তাঁহারা সেই সমস্ত ভাব ব্যক্ত করিতে থাকেন। সাধারণ জীব-মণ্ডলীকে ভগবদ্ভাবে উত্তেজিত করেন। মূর্খ হইলেও অলৌকিক প্রতিভার বিকাশ তাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাব উপদেশ ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া পণ্ডিত-মণ্ডলী অবধি চমৎকৃত হয় ও তাঁহার শরণাগত হইয়া পড়ে। প্রথম শ্রেণীর সাধনা রাজগুহ্য যোগ। বিরাটে আপনাকে বিস্তৃত করিয়া দেওয়াই ইহার মুখ্য কর্ম্ম। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধনার মুখ্য পন্থা, বিরাট্‌কে আপনার ভিতর প্রতিষ্ঠিত করা। প্রথম শ্রেণীর সাধনা, আপনাকে অনন্তে মিশাইয়া দেওয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধনা, অনন্তকে আপনাতে মিশাইয়া লওয়া। প্রথম শ্রেণীর সাধনায় সমুদ্রে নদীপ্রবেশের ন্যায় সাধককে মাতৃশক্তি-সমুদ্রে মিশাইয়া যাইতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধনায় সমুদ্র হইতে নদীতে যেমন জোয়ারের সময় জল প্রবেশ করিয়া নদীকে আকূল পরিপ্লাবিত করে, তদ্রূপ মাতৃশক্তি আপনার ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া লইয়া আকূল পূর্ণ হইতে হয়। সেই জন্য প্রথম শ্রেণীর সাধনার সাধক প্রশান্ত শূন্যবৎ ভাবাপন্ন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধনায় তেজ উছলিত হইতে থাকে এবং বন্যার পরিপ্লাবনের মত উছলিয়া, কূল অতিক্রম করিয়া চারি ধার পরিপ্লাবিত করে। প্রথম শ্রেণীর সাধনার সাধক গিয়া মাকে জড়াইয়া ধরে। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধনায় মা সন্তানশরীরে স্বল্পে স্বল্পে চরণের ভর দেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধনার সাধক এইরূপে মাতৃকৃপা পাইয়া যদি ধরিয়া রাখিতে পারে, যদি শক্তি বাহির হইয়া না যায়, তবে সে প্রথম শ্রেণীর সাধক হইবার উপযুক্ত হয়, অর্থাৎ শক্তি চারি ধারে বিস্তৃত হইতে না পাইয়া তখন উর্দ্ধমুখে ধাবিত হয়, সন্তানকে উর্দ্ধে মাতৃ-চরণ-সন্নিধানে বহন করিয়া লইয়া গিয়া চরণাঙ্গীভূত করিয়া দেয়।

তৃতীয় শ্রেণীর সাধনা ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তৃতীয় শ্রেণীর সাধনা

শ্রবণ। অনাহত নাদের অফুরন্ত নির্ঝরিণীর সন্ধান লাভ। এই অনাহত নাদের সন্ধান পাইলে তবে এই স্রোতের অভ্যন্তরে যে শক্তি সঞ্চারিত, যে শক্তির প্রবাহে সে নাদ উৎপন্ন, যে শক্তির প্রপাতে সে শব্দ সমুত্থিত, সেই শক্তির নিকটস্থ হওয়া যায়। যেমন দূর হইতে জলপ্রপাতের হু হু গম্ভীর শব্দ ভৈরব রাগে প্রশান্ত ভাবের উচ্ছ্বাসে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করে, এবং দর্শনার্থীদিগকে কোন্ দিকে যাইতে হইবে, তাহার সন্ধান জানাইয়া দেয়, তদ্রূপ এই অনাহত নাদের সন্ধান পাইলে সাধকের আর দিক্‌ভ্রান্তি হইবার বড় একটা ভয় থাকে না। আশ্চর্য্য ভাবে সাধক এই নাদ শ্রবণ করে, পুলকে বিস্ময়ে তাহার প্রাণ ভরিয়া যায়। শব্দের আকুল উজানে সে বিভোর হইয়া যাইতে থাকে। নাদের দিকে তার প্রাণ অহর্নিশ কাণ পাতিয়া রাখে; নাদের সুর লক্ষ্য করিয়া তার প্রাণের গতি ছুটিতে থাকে। কিন্তু এই নাদের সন্ধান পাইলেও, সদ্‌গুরুকৃপায় নাদের মোহন ঝঙ্কার প্রতিধ্বনিত হইলেও সে মহাশক্তিকে জানিতে পারা যায় না। নাদ শ্রবণের পর দ্বিতীয় ও প্রথম স্তরের সাধনার অধিকারী হইলে তবে আশ্চর্য্য-ভাবে সাধক মায়ের সন্ধান পায়। শ্লোকটীর শেষ পাদের ইহাই মর্ম্ম।

এ আশ্চর্য্য নাদ-শ্রবণকে চরিতার্থতা ভাবিও না। আরও ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে সচেষ্ট হও। আরও অন্তর্মুখে ধাবিত হও; শব্দ যে স্রোতঃপ্রপাত হইতে সঞ্জাত, সেই স্রোতঃপ্রপাতের দিকে ছুটিতে থাক।

এ নাদ শ্রবণের অনেক প্রকার উপায় আছে। তন্মধ্যে জপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। জপ ততক্ষণ সুসিদ্ধ নহে, যতক্ষণ উহা হইতে এই নাদের সন্ধান পাওয়া না যায়। জপের মত এত সহজে নাদের সন্ধান আর কিছুতে পাওয়া যায় না। জপের প্রণালী পরে ব্যক্ত করিব।

যাহা হউক, সাধনার এই তিন শ্রেণীর কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হয়। আশ্চর্য্য নাদেই মুগ্ধ হইলে আশ্চর্য্য দর্শন জীবনে ঘটিত না; কিন্তু এরূপ দর্শন হইলেও সম্যক্‌ভাবে মাকে জানিবার উপায় নাই। সম্যক্‌ভাবে মাকে আমার জানিতে কেহ পারে নাই, কেহ কখনও পারিবে না। দুর্ব্বিজ্ঞেয়া মাকে আমার বিজ্ঞানের ভিতর সম্যক্‌রূপে বাঁধিতে কেহ সক্ষম হয় না। অথচ নিত্য জ্ঞানানন্দময়ী সাধকের জ্ঞানের ভিতর অলৌকিক ভাবে, ইন্দ্রজালের মত পূর্ণরূপে বিরাজ করিয়া আশ্চর্য্যে সাধককে মুগ্ধ করেন। কোন কোন সাধক সে আশ্চর্য্য কাহিনী লোক সমক্ষে ব্যক্ত করে। সাধারণ জগতে কোন অলৌকিক ঘটনা

নয়নগোচর হইলে দর্শক যেমন বিস্ময়ে নিকটস্থ অন্যান্য সকলকে আহ্বান করিয়া দেখাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়, এ ক্ষেত্রেও তদ্রূপ দর্শক জগজ্জীবকে দেখাইবার জন্য যেন ছুটাছুটি করে। "কে আমার মাকে দেখিতে চাহিস্ ছুটিয়া আয়" বলিয়া জীবমণ্ডলীকে আহ্বান করে। জগৎ তাহার সে আশ্চর্য্য কাহিনী আশ্চর্য্য ভাবে গ্রহণ করে, সাধক-হৃদয়ে ভুবনেশ্বরীর অভূতপূর্ব্ব অভিব্যক্তির কথা পুলকে শ্রবণ করে; দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু হায়, সে ব্যাকুলতা বহুক্ষণ থাকে না। বিপরীত ভাবের পুনরাবির্ভাবে সব ভুলিয়া যায়; সাধকের মুখে সাধনার কৃতার্থতার কথা শুনিয়াও তাহাদের আর জ্ঞানাতীত জ্ঞানানন্দময়ীকে জানা হয় না। ইহাও এই শ্লোকটীর মর্ম্ম হইতে পারে।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০

হে ভারত! সর্ব্বস্য দেহে অবধ্যঃ অয়ং দেহী নিত্যং; তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ত্বং শোচিতুং ন অর্হসি। যস্মাৎ দেহী শরীরী নিত্যং সর্ব্বাবস্থাস্ববধ্যো নিরবয়বত্বাৎ, নিত্যাৎ চ তত্রাবধ্যোঽয়ং দেহে শরীরে সর্ব্বস্য, সর্ব্বগতত্বাৎ স্থাবরাদিষু স্থিতোঽপি সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য দেহে বধ্যমানেঽপি অয়ং দেহী ন বধ্যো যস্মাৎ, তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতান্যুদ্দিশ্য ন ত্বং শোচিতুং অর্হসি।

ব্যবহারিক অর্থ।—ভারত! সর্ব্বদা সর্ব্বদেহে এই অবধ্য আত্মা বিদ্যমান। সুতরাং ভূতসকলের জন্য তুমি শোকাভিভূত হইও না। দেহী যখন নিত্য সর্ব্বগত, তখন তাহার বধ বা বিচ্ছেদন হইতে পারে না। নিরবয়বের বধাদিকল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ। সুতরাং শোক ভ্রান্তি মাত্র।

যৌগিক অর্থ।—যাহা সর্ব্বগত, তাহার বিলোপ সম্ভবপর নহে। স্থূলভূত বলিয়া যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, তাহারও প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর সে সর্ব্বগতের অধিষ্ঠান স্বীকৃত। সুতরাং সর্ব্বগত ভাবটি স্বীকৃত হইলে ভূত বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থের স্বীকার থাকিতে পারে না। সর্ব্ব ও সর্ব্বগত এক হইয়া যায়। আমরা স্থাবর, জড়, ভূত ইত্যাদি ভাবাচ্ছন্ন হইয়া ব্রহ্মে স্পষ্ট স্থাবর, জড়, ভূত ইত্যাদি ভাব দর্শন করিতেছি মাত্র। এ দর্শনের প্রহেলিকার হনন অর্থে দর্শনের হনন, বধ অর্থে দৃষ্টির পরিবর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। আবার এইরূপ দর্শনের ভিতরও ঈষৎ দৃষ্টি প্রখর হইয়াছে বলিয়া তাই সর্ব্বের ভিতর সর্ব্বগতের

স্বরূপে আমরা সেই নির্ব্বিকার অবস্থার আভাস পাইতেছি। মাকে ও আমাকে বা মাকে ও জগৎকে উভয় বলিতে ভয় পাই না। কিন্তু তাহা হইলেও আত্মা যেরূপে অবিভাজ্য, মা—সে মাতৃবিকাশ, সে মাতৃশক্তি সেইরূপ অবিভাজ্য। অবধ্য আকাশকে কি ছেদ করা যায়—যাহাদিগকে বধ্য ভাবিতেছ, ভীষ্মাদি যে বীরগণের উচ্ছেদ ভাবনা ভাবিয়া কাতর হইতেছ, তাহারাও সেইরূপ অবধ্য, অবিভাজ্য। যে ব্রহ্মচর্য্যাদি ভাব তোমার প্রাণকে আজ বিচঞ্চল করিতেছে, যাহাদিগকে পালনীয় ভাবিয়া তোমার প্রাণ মুগ্ধ হইতেছে, যে শক্তিসকল যজ্ঞাদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মস্বরূপে ফুটিয়া উঠিয়া তোমায় সংস্কারের মধ্যে সংকীর্ণ করিয়া রখিতে চাহিতেছে, যেগুলির পরিত্যাগে বা হননে অধর্ম্ম হইবে ভাবিতেছ, সে সকলের অভ্যন্তরস্থ মূলশক্তিও সেই মা। সেই মাই আমার ও তোমার রূপান্তরদৃষ্টির চক্ষে রূপান্তরিতা হইয়া প্রত্যক্ষা হইতেছেন। সেই নিত্যা সর্ব্বগতা শক্তিই এইরূপে উদ্বেলিত হইয়াছে। সুতরাং রূপান্তরিতা ভাবে মাকে না দেখিয়া, স্বরূপে তাঁহাকে দেখিতে উদ্যোগী হও। তাহাতে কোন শক্তির বিনাশ হইবে না, অঙ্গভঙ্গ হইবে না, তুমি প্রতেক শক্তি-তরঙ্গের ভিতর স্বরূপে মাকে দর্শন কর; আর শোক বলিয়া কিছু থাকিবে না। তখন আর তুমি মায়ের রূপান্তরের মায়ায় মুগ্ধ হইবে না—মায়ের আমার রূপান্তর ভুলিতে ও স্বরূপের প্রতিষ্ঠা করিতে কাতর হইবে না।

কর্ম্ম কি? ব্রহ্মচর্য্যাদি ভাব বা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদি বা প্রাণকার্য্যাদি কিরূপ ভাবে কার্য্যকারী হয়? কিরূপে উদ্ধারের জন্য কৃত কর্ম্মসকলও আমায় আবদ্ধ করে? কিরূপে তাহারা সাধকের সাধনারূপ ঊর্দ্ধমুখী গতি রোধ করে? এই তত্ত্বটি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইলে বুঝিতে পারা যাইবে, সাধকের প্রথম অবস্থায় উহারা গুরুস্বরূপ হইলেও লক্ষ্যচ্যুত হইলে উহারা বন্ধনের কারণ হয়; সুতরাং বধ্য বা পরিত্যাজ্য। কর্ম্ম কিরূপে প্রকাশ পায়? প্রত্যেক কর্ম্মের ভিতর তিনটি অবস্থা সন্নিবেশিত। যেমন প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর, প্রত্যেক ভাবের ভিতর,—তেমনি প্রত্যেক কর্ম্মের ভিতর শক্তি ত্রিধা প্রকাশিত। আরম্ভে—ব্রহ্মা বা সৃষ্টিশক্তি, মধ্য বা বিকাশে—বিষ্ণু বা স্থিতিশক্তি এবং অন্তে মহেশ্বর বা লয়শক্তি ক্রিয়াশীল। কর্ম্মের আরম্ভ সতে, কর্ম্মের অবস্থান চিতে এবং কর্ম্মের লয় আনন্দে। সতের অস্তিত্ববশতঃই জীব-হৃদয়ে স্ফুরণ-শক্তি বিদ্যমান। সতের সেই স্ফুরণ হইলে তাহাতে চিতের প্রতিফলন

বশতঃ সে স্ফুরণ স্থায়িত্ব লাভ করে ও জীবকে সেই স্ফুরণের ধর্ম্মানুসারে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখে। প্রত্যেক স্ফুরণ চিরস্থায়ী হইয়া থাকিত, যদি তার উপর চিদাভাস সম্পাতের পর তম বা লয়শক্তি বা আনন্দ ক্রিয়া না করিত। আমার প্রাণে যখন যে ভাব উদিত হয়, বুঝিতে হইবে, উহা সৎ বা অসৎ হউক, সতের স্ফুরণ-ধর্ম্মবশতঃ উহা হইতেছে। সে ভাব উঠিয়া যে কিছুক্ষণ হৃদয়ের উপর আধিপত্য করে ও ঘনীভূত হইলে সে ভাবটি স্থূল কার্য্যরূপে যে ব্যক্ত হইয়া স্থূল অবয়ব পরিগ্রহণ করে, উহা চিতের আশ্রয়সঞ্জাত বুঝিতে হইবে। জগতের সকল কার্য্য, হৃদয়ের সকল ভাব উঠিয়া কিছু দিন প্রদীপ্তভাবে প্রকটিত থাকিয়া, আবার যে লুপ্ত হইয়া যায়, উহা লয়-শক্তি বা আনন্দের অভিব্যক্তি বুঝিতে হইবে। এই ভাবে বিরাট্ সৃষ্টি হইতে জীব-হৃদয়ের একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভাবোচ্ছ্বাস অবধি একই নিয়মে পরিচালিত হইতেছে। আমাদের প্রাণে যখন কোন কার্য্য সম্বন্ধে ভাব বা সঙ্কল্প উদ্দীপ্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে, আমার হৃদয়স্থ উক্ত কার্য্য বা ভাবের যে পূর্ব্বসংস্কার ছিল, তাহারই সৎ অংশটুকু স্ফুরিত হইয়া উঠিল মাত্র। তার পর সে ভাবটি যে মুহূর্ত্তকাল মাত্র বা বহু কাল ধরিয়া অবস্থান করিল, হয় ত সে ভাবটিকে কার্য্যে পরিণত করিলাম, বুঝিতে হইবে যে, উক্ত সংস্কারের চিদংশ কার্য্যকারী হইতেছে। তার পর হয় ত সে ভাবটী কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই অথবা কার্য্যে পরিণত হইয়া মিলাইয়া গেল; বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বোক্ত সংস্কারের মধ্যে যে আনন্দ অংশটুকু ছিল, তাহা ক্রিয়াশীল হইয়াছে মাত্র। দেখিতে পাই, যে কার্য্যের জন্য একদিন জীবনপাত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম, আর সে কার্য্য আমার আনন্দ-দায়ক নহে। একটী কার্য্য করিয়া তাহার আনন্দটুকু ভোগ হইলেই সে কর্ম্ম পরিসমাপ্ত হইয়া পড়ে। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, কর্ম্ম পূর্ণভাবে সমাপ্ত হইতে না হইতেই অথবা শুধু ভাবে বা সঙ্কল্পে উদিত হইয়াই কর্ম্মরূপে প্রকটিত হইবার পূর্ব্বেই যে বিলীন হইয়া যায়, সেখানে চিত্তে আনন্দশক্তি স্ফুরিত হইতে ত দেখিতে পাই না। বুঝিতে হইবে, সেখানে স্থূল বা ঘনীভূতভাবে চিৎ ও আনন্দশক্তি ক্রিয়া না করিলেও সূক্ষ্মভাবে শক্তিদ্বয় কার্য্যকারী হইয়াছিল। সেই কার্য্যটি সম্বন্ধে যে সংস্কার ছিল, তাহাতে সেই কার্য্য সম্বন্ধে যতটুকুমাত্র চিৎশক্তি ও আনন্দশক্তি ছিল, ততটুকু মাত্র উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। আমার সে কার্য্য সম্বন্ধে যে সংস্কার ছিল, তাহাতে যথোচিত পরিমাণে চিৎ ও আনন্দশক্তি না

থাকায় উহা এইরূপ অসম্পূর্ণ ভাবে সমাপ্ত হইয়াছে মাত্র। মোট কথা, যত অল্পই হউক না কেন, আমার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হউক, কোন ভাব আনন্দস্পর্শ ব্যতীত সমাপ্ত হয় না, অথবা আনন্দস্পর্শ পাইলে কার্য্য সমাপ্তির দিকে ধাবিত হয়, ইহা একই কথা।

তবেই ইহা হইতে এইটুকু পাওয়া যায় যে আমাদের ভাবসকল যখন জাগরিত হয়, তখনই সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবকে স্থায়িত্ব দিবার জন্য আমরা সেই ভাবেই বিভোর হইয়া কার্য্য করিয়া ফেলি ; কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারি না। এবং সেই কার্য্যের ভিতর যতটুকু আনন্দ আছে, ততটুকু আনন্দ যত দিন না স্ফুরিত হয় বা আমাদিগের ভোগে আইসে, তত দিন আমরা সে কার্য্য পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মূল ভাবের স্থায়িত্বের জন্য আমরা সময়ে সময়ে সেই বিশুদ্ধ ভাবটির যে কার্য্য, তাহা ছাড়া অন্য কতকগুলি সাহায্যকারী কার্য্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া বসি ; এবং মূল ভাবটির মূল আনন্দের দিকে কার্য্যের গতি না থাকিয়া ওই আনুষঙ্গিক কার্য্যের যে আনুষঙ্গিক আনন্দ আছে, সেই আনন্দের দিকে কর্ম্ম ধাবিত হইতে থাকে ও এইরূপে মুখ্য ভাবটি গৌণ ও গৌণ ভাবটি মুখ্য হইয়া পড়ে, অর্থাৎ মুখ্য ভাবটি কিয়ৎপরিমাণে অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে।

এইবার মূল কথাটি বুঝিতে চেষ্টা করিব। সাধনার জন্য যখন প্রাণ চঞ্চল হইয়া পড়ে, প্রাণে যখন ভগবদ্ভাব জাগিয়া উঠে, তখন সাধারণতঃ আমরা কতকগুলি সাহায্যকারী কার্য্য অবলম্বন করিয়া বসি ; এবং ক্রমশঃ মূল ভগবদ্ভাবটি গৌণরূপে এবং ওই সাহায্যকারী বা গৌণ কার্য্যটি মুখ্যরূপে অধিষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মচর্য্য ও যজ্ঞাদি ভগবদ্ভাবের প্ররোচনায় সূচিত হইলেও পরে উহা এইরূপে মুখ্য ভগবদ্ভাবটীকে গৌণরূপে পরিণত করে ও ঐ সকল কার্য্যের মায়ায় আমাদিগকে আবদ্ধ করে। ঐ সকল কার্য্যের ভিতর যে আনন্দ আছে, সেই দিকেই ভাবের গতিকে সঞ্চালিত করিতে থাকে। মূল সাধনার গতি এইরূপে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়। এবং সেই জন্য সেই সকল আনুষঙ্গিক কর্ম্ম বধ্যরূপে পরিগণিত হয়।

সাধক! তাই বলিতেছিলাম, ঐ মূল ভাবটির দিকে লক্ষ্য স্থাপিত কর। ভাবে অভিভূত হইয়া ক্ষুদ্র আনন্দের দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইও না। কর্ম্মের ভিতর যে আনন্দ আছে, সে আনন্দের মোহ মুগ্ধ করিবে। ব্রহ্মচর্য্যাদি হইতে

সূচনা করিয়া আশ্রমোচিত ধর্ম্ম কর্ম্ম এবং সাধারণ জীবধর্ম্ম-প্ররোচিত কর্ম্ম-সকলের ভিতর তাহাদের বিশিষ্ট বিশিষ্ট আনন্দ তোমার ভগবদনুসন্ধানকে মন্দগতি করিবে। ক্ষুদ্র আনন্দের ক্ষুদ্র তৃপ্তি তোমায় মহানন্দের মহোল্লাসে বঞ্চিত করিবে। মাতৃ অনুসন্ধানে নিযুক্ত প্রাণ শুধু "মা মা" করিয়া ধাবিত হউক, আশ্রমোচিত কর্ম্মাদি এত দিন যাহা তোমার উপকারী ও রক্ষাকর্ত্তা ছিল, এখন সে সকল কর্ম্মের ভিতরকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শান্তি বা সিদ্ধির মায়া আর যেন তোমার প্রাণকে অভিভূত করিয়া না রাখে। এত দিন, যখন মাতৃঅনুসন্ধানরূপ মহাকর্ম্ম মুখ্যভাবে প্রাণকে কাতর করে নাই, সে অবস্থায় উহারা অত্যাজ্য হইলেও এখন আর উহারা তোমার মুখ্যভাবে মান্য নহে। তোমার আর মুখ্য ভাবে উহাদিগকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে।

কিসের জন্য আশ্রমধর্ম্ম, কিসের জন্য ব্রহ্মচর্য্য, কিসের জন্য জীবনধারণ, কিসের জন্য মন, কিসের জন্য প্রবৃত্তি—এ সকলের মুখ্য লক্ষ্য কি? এ সকল ভাবের স্থূলদেহ—ইহাদের আত্মা কি? এ কর্ম্মমাত্রের, ভাব-মাত্রের, বহির্জগৎ অন্তর্জগৎ সর্ব্বক্ষেত্রের সর্ব্বপরিবর্ত্তনের মূল বা আত্মা—মাতৃ অনুসন্ধান বা মা। মা আমার আত্মার আত্মা—মা সূক্ষ্ম জগতের আত্মা, মা স্থূল জগতের আত্মা, মা ভাবজগতের আত্মা, মা কর্ম্মমাত্রের আত্মা। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি হইতে ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র একটী ভাববিকাশ পর্য্যন্ত, একমাত্র মাকেই আত্মা জানিয়া বেষ্টন করিয়া আছে। একমাত্র মাই সর্ব্বত্র প্রতিপাদ্য। মাকে ও মাতৃঅনুসন্ধানকে সরাইলে সৃষ্টি লোপ হইয়া যায়। কেন না, একটী জীবের লক্ষ লক্ষ জন্ম-মরণ যেমন এক মাতৃঅনুসন্ধানের লক্ষ্যেই ধাবিত, জীবের মাতৃঅনুসন্ধানই যেমন তাহার মহাযাত্রা, অনন্ত বিশাল সৃষ্টি স্থিতি লয়ও তদ্রূপ বিরাট্ মাতৃঅনুসন্ধান মাত্র।

সুতরাং যখন আমি মূল লক্ষ্য ধরিয়া ছুটিয়াছি, তখন ত সর্ব্বকর্ম্মের অভ্যন্তরস্থ মহাসত্য মহানিত্যকে অবলম্বন করিয়াছি। তখন সর্ব্বের আত্মরূপিণীকে চিনিয়াছি, তখন আর বাহ্য জগতের মায়া আমায় অভিভূত করিবে কেন, তখন আর স্থূল আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে কেন? ধান্য পরিপক্ক হইলে যেমন পলাল পরিত্যাজ্য, এখন তদ্রূপ ঐ সকল স্থূল অবলম্বন আমার হেয়। সুতরাং বাহ্যের জন্য আর সাধকের শোক হয় না।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ ৩১

স্বধর্ম্মং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মং অপি অবেক্ষ্য ত্বং ন বিকম্পিতুং অর্হসি। ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ অন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য শ্রেয়ো ন বিদ্যতে হি।

ব্যবহারিক অর্থ।—স্বধর্ম্ম বিচার করিয়া দেখিলেও তোমার বিকম্পিত হওয়া উচিত নহে। তুমি ক্ষত্রিয়, ধর্ম্ম-যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর শ্রেয় কিছু নাই।

যৌগিক অর্থ।—বিরাট্ পরমাত্মতত্ত্ব পরিদর্শন করিলে এইরূপে শোকের কোন কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু ও সকল ছাড়িয়া দিয়া সাধারণের দিক্ দিয়া দেখিলেও ব্যাকুলিত হইবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্ম-যুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ আর কিছুই নাই। স্বধর্ম্ম কি? অনন্ত জীবনস্রোতের ভিতর দিয়া জীব যখন মনুষ্যকুলে উপস্থিত হইয়া মায়া-নিগ্রহে যত্নবান্ হয়, তখন তাহাকে ক্ষত্রিয় বলে। জীবের এই ক্ষত্রিয় অবস্থার স্বধর্ম্ম যুদ্ধ—মায়া-হনন। ইহাই তখন সে অবস্থায় জীবের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। জীব আপনা হইতেই তখন মায়া-হননে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যখন জীবের মায়ার দিকে লক্ষ্য পড়ে, "আমি মায়াবদ্ধ, আমি মায়াভিভূত, আমি ইন্দ্রিয়ের মোহে একান্ত অনুলিপ্ত" ইত্যাদি-প্রকার জ্ঞান যখন জীবহৃদয়ে স্বতঃ স্ফুরিত হইতে থাকে, তখন বুঝিতে হইবে, সে জীব ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী। তাহার হৃদয়ে মায়াহননের উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে। যখন সেই জীব মায়া-হননে সচেষ্ট, তখন বুঝিতে হইবে, তাহার হৃদয়ে সমর সূচিত। এই সমরসূচনার পর জীব যখন মায়ার বিচার করে—যখন মায়ার মোহ প্রবলভাবে শেষ বারের মত জড়াইয়া ধরিলে মায়া বধ্য, কি অবধ্য, এই বিচারে নিযুক্ত হয়, তখন বিচারে যাহাই হউক না কেন, সে মায়া-হননে অগ্রসর না হইয়া থাকিতে পারে না। মায়া-হননই তখন তাহার একমাত্র প্রিয় প্রবৃত্তি হইয়া উঠে। মায়া-হননই যে তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ ও কর্ত্তব্য, ইহা তাহাকে বুঝা-ইতে হয় না; কিন্তু ক্ষিপ্ত কুকুর-দষ্ট ব্যক্তি যেমন কুকুর-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া সকলকে দংশন করিতে যায়, তেমনি ভাবে মায়াক্রান্ত ব্যক্তি আপনার এ স্বধর্ম্মকে অভিদষ্ট করে। তাহার ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় হইয়া পড়ে। এই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য পড়িলে উহাই যে তাহার শ্রেয়ঃ, তাহা

বুঝিতে পারে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ক্ষত্রিয়ের মায়াহননই প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বা প্রিয়। কিন্তু বিমূঢ় অবস্থায় প্রিয় বলিয়া যখন ইহাকে বুঝিতে পারা যায় না, তখন শ্রেয়ঃ বলিয়া ইহাকে বুঝিতে হয় এবং শ্রেয়ঃ বুঝিবার পর তখন উহাই যে প্রিয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। যাহা শ্রেয়ঃ, তাহাই প্রেয়, তখন ইহা অনুভূত হয়। শাস্ত্র শ্রেয়ঃ ও প্রেয়, এই উভয়ের মধ্যে শ্রেয়কেই অবলম্বন করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। কেন না, ক্ষত্রিয়াবস্থা লাভের পূর্ব্বে এবং এমন কি, পাইয়াও সময়ে সময়ে ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম আমাদিগের হৃদয়ে প্রিয় বলিয়া অনুভূত হয়। সেই লক্ষ্যেই শাস্ত্র প্রেয় উপেক্ষা করিয়া শ্রেয়ঃ অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন; এবং সাধারণতঃ সেই জন্য মায়াহনন অর্থে প্রেয়হননই বুঝাইয়া থাকে ও প্রেয় বিসর্জ্জনে আমরা কাঁদিয়া উঠি। কিন্তু যদি শ্রেয়কেই আমরা প্রেয় করিয়া লইতে পারি, অথবা যদি বুঝি, যাহা শ্রেয়ঃ, তাহাই প্রেয়, তাহা হইলে আর বিমূঢ়তা আসিতে পারে না—তাহা হইলে আর আপাতদৃষ্টিতে যাহা প্রিয়, তাহার পরিত্যাগে কাতর হইতে হয় না।

ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম প্রেয়। ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম লইয়াই জগৎ ব্যস্ত। সুতরাং ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের পূর্ব্বে ইহা যে প্রিয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তদ্রূপ সে অবস্থায় ইহা আবার শ্রেয়ঃ। কেন না, মা আমাদিগকে এই ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম দিয়াই অহর্নিশ জাগাইয়া রাখিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম না থাকিলে আমরা তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতাম ও আমাদের চৈতন্যের স্ফুটতর বিকাশ হইত না—ক্ষত্রিয়ত্বে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিতাম না।

এখন আবার প্রাণ যখন সেই ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম ছাড়িতে চাহিতেছে, প্রাণ যখন আর সংস্কারের অধীন না থাকিয়া, নির্ম্মল শান্তিপূর্ণ নিত্য স্থির অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়াছে, এখন যখন প্রাণ সংসারের এ বহুমিশ্র কোলাহলের ভিতর আর থাকিতে চাহে না—এখন প্রাণ যখন মা ব্যতীত অন্য কোন পদার্থে আকৃষ্ট নহে, এখন ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম ত্যাগই প্রাণের প্রিয়; সুতরাং বুঝিতে হইবে, এই ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মের মায়া পরিত্যাগই এখন শ্রেয়ঃ। যে সাধক নহে, যাহার প্রাণ জগৎলালসাতেই পরিপূর্ণ, তাহার পক্ষে ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের মায়া-হনন যথার্থ প্রিয় নহে; এবং তাহার পক্ষে এখন ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম প্রবল থাকিবার বা প্রিয়রূপে প্রতিপন্ন হইবার কারণ আছে; কিন্তু যে মায়ের দিকে লক্ষ্য ফিরাইয়াছে, "মা মা" করিতে যাহার চক্ষু দিয়া অশ্রুজল ঝরিতেছে, সে ইন্দ্রিয়-মায়া পরিত্যাগে অসক্ত হইলেও তাহার প্রাণ যে ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম অপেক্ষা অন্য প্রিয় জিনিষের সন্ধান পাইয়াছে, ইহা সত্য। সুতরাং

ইহাই তাহার পক্ষে এখন শ্রেয়ঃ। তাহার প্রিয় ও শ্রেয়ের অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে, এবং শীঘ্রই উহা লাভ হইবে।

এখন তোমার প্রাণ "মা মা" করিয়া যদি কাঁদিয়া থাকে, যদি মাতৃ-অনুসন্ধান ছাড়া তোমার জীবনে অন্য সকল উদ্দীপনাই বিরক্তিকর হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, তুমি সাধক হইয়াছ। তবে যে মায়ায় গণ্ডী এড়াইতে পারিতেছ না, ইহা ক্ষণস্থায়ী। তোমার যে পরিমাণে ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম থাকার আবশ্যকতা আছে, সেই পরিমাণে মায়া প্রিয়রূপে এখনও প্রতিপন্ন হইতেছে। তোমার ক্ষত্রিয়ভাব পূর্ণরূপে প্রকটিত হয় নাই বলিয়া—সংহার, লয় বা আনন্দ তোমার প্রকৃতিগত ধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম হইয়া উঠে নাই,—এখনই হইবে।

তুমি আপনাকে উদ্বোধিত করিয়াছ—ব্রহ্মশক্তির স্ফুরণ তোমাতে হইয়াছে। তার পর সেই স্ফুরণ অবলম্বন করিয়া চিৎশক্তি কার্য্য করিয়া তোমায় ইন্দ্রিয়যুক্ত করিয়া দিয়াছে, তোমার স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্ব সংগঠিত হইয়াছে। এইবার লয়, সংহার বা আনন্দশক্তির উদ্বোধন হইলে তুমি সংহারমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উঠিবে—তুমি সংহারিণীর উপাসক হইবে—তুমি ভগবদ্‌যুক্ত হইবে। যোগ অর্থে—এক দিকে যোগ, অন্য দিকে বিয়োগ। ভগবানে যোগ, আমিত্বে বিয়োগ, একই কথা। এক দিক্ বাড়িলেই অন্য দিক্ কমিয়া যায়।

এই যোগ বা এই আনন্দশক্তির স্ফুরণ যত দিন না হয়, তত দিন সাধক ক্ষত্রিয়পদবাচ্য নহে। সুতরাং তত দিন শ্রেয়ঃ ও প্রেয় বিভিন্ন বিভিন্ন পদার্থ হইয়া পড়ে। যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা প্রেয় হয় না, যাহা প্রেয়, তাহা শ্রেয়ঃ হয় না। সুতরাং সাধককে শ্রেয়ঃ ও প্রেয় লইয়া মহা বিভ্রাটে পড়িতে হয়। কিন্তু যে যথার্থ ক্ষত্রিয় হইয়াছে, তাহাকে আর এ গোলে থাকিতে হয় না। তুমি যদি ক্ষত্রিয় হইয়াছ, তুমি যদি আনন্দশক্তির স্তরে উঠিয়াছ, তবে মায়া ত্যাগে বিকুণ্ঠিত হইবার কারণ কি? তোমার স্বধর্ম্ম যখন হনন তোমার প্রাণের প্রকৃতিগত ভাবই যখন মায়াত্যাগ, তখন আর বিচারে তোমার প্রয়োজন কি? তোমার প্রাণ যখন মাকে ছাড়া আর কিছু চাহে না, তখন কিছুর দিকে আর চাহিবে কেন?

অর্জ্জুনের একটী মহা আশঙ্কা—"কেন মারিব?" সেই আশঙ্কা এখানে ভগবান্ নিরাকৃত করিলেন।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ৩২

পার্থ ! যদৃচ্ছয়া উপপন্নং অপাবৃতং স্বর্গদ্বারম্ ঈদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ (সুখান্বেষিণঃ) ক্ষত্রিয়াঃ লভন্তে।

ব্যবহারিক অর্থ।-পার্থ! আপনা হইতে উপজাত মুক্ত স্বর্গদ্বারসদৃশ এইরূপ যুদ্ধ, সুখী ক্ষত্রিয়েরাই লাভ করিয়া থাকে।

যৌগিক অর্থ।—এরূপ যুদ্ধ-সংঘটন কয় জনের হৃদয়ে হয়—কয় জনের হৃদয় আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবান্ হয়, কয় জন মহাসুখমুখী হইয়া ধাবিত হয়? এ যুদ্ধ ত সহজে উপস্থিত হয় না। অনন্তজীবন-গতির পথে মনুষ্যকুলে এই ক্ষত্রিয় স্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তবে এ রণসংঘটনার সূচনা হয়। বহু জন্মের পর—বহু আয়াসের পর, তবে তুমি আজ মাতৃমুখী হইয়াছ—তবে তুমি আজ মাতৃসন্ধানোপযোগী চিত্তবৃত্তি পাইয়াছ—তবে তুমি আজ মাতৃঅন্বেষণের পন্থার জন্য চারি দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছ—তবে তুমি আজ আত্মপ্রতিষ্ঠাকেই জীবনের মূল লক্ষ্য বলিয়া বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছ। বুঝিও, ইহাই উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার, বুঝিও, তুমি মায়ের আমার হিরণ্ময় মন্দিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ আর সে দ্বার তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত। বুঝিও, তোমার এ দ্বারে সমাগম মাতৃ-ইচ্ছায় উপপন্ন। তুমি জান না, কে তোমাকে এ দ্বারের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে—তুমি জান না, কার শক্তি তোমাকে এ বহু দিনের ঈপ্সিত উচ্চ স্তরে উত্তোলন করিয়াছে। তোমার পক্ষে ইহা যদৃচ্ছ ভাবে লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু আমি তোমার জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছি—আমি অনেক দূর হইতে সারথ্য করিয়া তোমায় এ দ্বারে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছি, আমি অনেক পরিশ্রম করিয়া তোমায় নরাকারে বিম্বিত করিয়াছি—অনেক যোনির ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে তোমায় ধরিয়া ধরিয়া এ নরকুলে আনিয়া তুলিয়াছি। আমি শুধু আজ তোমার রথের সারথী নহি,—শুধু আজ তোমার অশ্ববল্গা ধরি নাই—শুধু আজ তোমার আদেশ—তোমার ইচ্ছা পূরণ করিতেছি না। তুমি নর, আমি নারায়ণ। নরসমূহ আমার স্থান বলিয়া আমার একটি নাম নারায়ণ। সেই হিসাবে আজ আমি তোমার সারথী হইতে পারি—সেই হিসাবে তুমি মনুষ্যাকারে আমায় সারথী বলিয়া বুঝিয়া থাকিতে পার; কিন্তু বহু পূর্ব্ব হইতে আমি তোমার সারথী—বহু পূর্ব্ব হইতে তুমি যখন "যৎ"রূপ বা "যেরূপ", আমি তখনই সেইরূপ বলিয়া তাহার ভিতর "ই" বা ইচ্ছা বা গতি বা আহ্বানরূপে তোমার সারথ্য করিতেছি। এ স্বর্গদ্বার তাই "যদৃচ্ছয়া উপপন্ন"।

তুমি যখন যেরূপে অবস্থান করিয়াছ, তাহারই ভিতর ইচ্ছারূপে আমি অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া তোমায় চালিত করিয়া আসিয়াছি। তোমারই ইচ্ছারূপে তোমাকে নানাপ্রকার "যৎ" বা যাহা তাহা সাজাইয়া, আমি ইচ্ছারূপিণী তোমার জননী—আমি ইচ্ছারূপিণী তোমার শক্তি—আমি ইচ্ছারূপিণী তোমার গতি—আমি ইচ্ছারূপিণী তোমার শেষ আনন্দমিলনের আধার—আমিই তোমাকে চালিত করিয়া আসিতেছি। আজ তুমি নরকুলে অবতীর্ণ, আজ তুমি নররূপে আবির্ভূত, তাই শুধু নরকুলহৃদয়ে আমার অবস্থান দেখিয়া, আমাকে নারায়ণ বলিয়া বুঝিয়াছ; কিন্তু কুলে কুলে কুলাঙ্গনারূপে থাকিয়া—কুলে কুলে "ই" বা আহ্বান বা "ইচ্ছা"রূপে অবস্থান করিয়া, এ নরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তোমাকে নর সাজাইয়াছি, আমি নারায়ণরূপে প্রতিফলিত হইয়াছি। কুলে কুলে তোমায় কুলেশ্বর করিয়াছি—আমি এলোকেশী – কুলেশ্বরী হইয়া তোমার জীবত্বের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছি। সেই সার্থকতার ভিতর দিয়া তোমার সেই যদৃচ্ছাগতির ভিতর দিয়া আজ এই হিরণ্ময় মন্দিরের দ্বারে তোমাতে আমাতে উপস্থিত। এ মন্দিরে প্রবেশ করিব—সকল কুলের আধার হইয়া এই মন্দিরে আমি বিশ্বরূপ ধরিব—এই মন্দিরেই আমি তোমার সকল কুলের আকুলতাকে কুল প্রদান করিব। এই মন্দিরেই আমি তোমাকে আমার অঙ্গে মিলাইয়া লইব। তুমি আমাকে নারায়ণ না দেখিয়া সর্ব্বায়ন দেখিবে—তুমি নরমূর্ত্তি ছাড়িয়া সর্ব্বমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিবে—তুমি বিশাল ভুবন জুড়িয়া যাইবে। তাই বলিতেছি, ইহা "যদৃচ্ছা উপপন্ন"! যদৃচ্ছয়া উপপন্ন অর্থে—তোমারই ইচ্ছায় উপপন্ন অর্থাৎ আমারই ইচ্ছায় উপপন্ন।

"ই" অর্থে আহ্বান। আমার মহা আহ্বানই ইচ্ছারূপে বিরাজিত। আমার ইচ্ছার তাড়নাতেই তুমি ছুটিয়াছ ও ছুটিতেছ। আমার মহা আহ্বানই তোমায় কোথাও দাঁড়াইতে দেয় নাই। তোমায় কোথাও তৃপ্ত হইয়া বসবাস করিতে দেয় নাই। আমার মহা আহ্বানই তোমায় অহর্নিশ চঞ্চল, উৎকণ্ঠাপূর্ণ, আকুল করিয়া রাখিয়াছে; তোমাকে দিকে দিকে ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরাইয়াছে। আমার মহা আহ্বান কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছে, দেখিবার জন্য তুমি ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক উপলখণ্ড নাড়িয়া দেখিয়াছ; আমার মহা আহ্বান জগতের প্রত্যেক যোনিতে, প্রত্যেক ধূলিকণাতে প্রতিধ্বনিত, তুমি সেই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারে সে ধূলা-কাদা উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিয়াছ ও দেখিতেছ।

আমার মহা আহ্বানের প্রতিধ্বনি তোমায় নিশ্বাস ফেলিবার অবসর দেয় নাই। তুমি ব্যস্ত, আগ্রহান্বিত, চমকিত, উন্মত্ত, ভ্রান্তবৎ দিকে দিকে কান বাড়াইয়াছ, —দিকে দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছ, দিকে দিকে সংঘাত প্রাপ্ত হইয়াছ। প্রতিধ্বনির ধাক্কার মাঝে—অনন্ত আকাশবৎ বিশাল বিস্তৃত আমার ধ্বনির প্রতিধ্বনির দিগন্ত-পরিপ্লাবিত তরঙ্গ-রঙ্গের মাঝে একা আমার ক্ষুদ্র শিশুটি তুমি, আমার এতটুকুটি তুমি, কত প্রতিঘাত পাইয়াছ; যে দিকে প্রতিধ্বনির আবেগে গিয়াছ, সেই দিকে মাথা ঠুকিয়া গিয়াছে—শোণিতস্রাব হইয়াছে—কাঁদিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছ; আবার অন্য দিকে সে প্রতিধ্বনি ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে, আবার অন্য দিকে ছুটিয়াছ, আবার আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াছ। এইরূপে যোনি হইতে যোন্যন্তরে, মায়া হইতে মায়ান্তরে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছ, সে সমস্ত আমারই আহ্বানের প্রতিধ্বনি। বৎস! ধ্বনির সন্ধান পাও নাই,—প্রতিধ্বনি ধরিয়া ছুটিয়াছিলে। ধ্বনির উপর প্রতিধ্বনির এই ক্ষেত্র রচনা করিয়া, তোমাকে সে প্রতিধ্বনির ভিতর স্থাপিত করিয়া, আমার ধ্বনিকে—আমার আহ্বানকে কথঞ্চিৎ দুষ্প্রাপ্য দুর্লভরূপে প্রতিফলিত করিয়া, ভালবাসাকে উদ্বেলিত করিয়াছি মাত্র। আমি কেমন করিয়া তোমায় ভালবাসি, সেই ভালবাসা তোমার বুকে ফুটাইয়া দেখাইবার জন্যই, ভালবাসিতে তোমায় শিখাইয়াছি। তুমি আমায় ভালবাসিতে শিখিয়াছ অর্থে—আমার ভালবাসা তোমার বুকে ফুটিয়াছে। আমি তোমার ভালবাসার কাঙ্গাল নহি। আমি তোমার ভক্তির—তোমার আসক্তির কাঙ্গাল নহি। আমি তোমায় কত ভালবাসি—আমি তোমাতে কত আসক্ত, আমি তাহাই দেখাইতে গিয়াছি। তুমি আমায় ভালবাসিয়াছ অর্থে—তুমি আমার ভালবাসা উপলব্ধি করিয়াছ। বিচ্ছেদ না হইলে উপলব্ধির সূচনা হয় না—তাই প্রতিধ্বনির অবতরণিকা। এখন চারি ধারে ছুটিতে ছুটিতে কেন্দ্রের সন্ধান পাইয়াছ—প্রতিধ্বনির মূল ধ্বনি—মূল আহ্বানে দৃষ্টি পড়িয়াছে; দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া আমার শরণাগত হইয়াছ। আর কি থাকিতে পারি। আমার ভালবাসা যত বুঝিতে পারিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট, আর পার, কি না পার, তাহা দেখিব না; আর অপেক্ষা করিতে পারিব না। মা বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছ—স্তনে দুগ্ধ আসিয়াছে; আর থাকিতে পারি না। এস অঙ্কে—ঐ দেখ, সম্মুখে উন্মুক্ত আমাদিগের আলয়। অঙ্কচ্যুত করি নাই—তবু অঙ্ক চ্যুত ভাবিতেছিলে—

দেখ, তুমি অঙ্কে চল বৎস, মন্দিরে প্রবেশ করি। আর প্রতিধ্বনির দিকে চাহিও না। তুমি মা বলিয়াছ—সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পাইয়াছ—ক্ষত্রিয় হইয়াছ। চল—চল, ব্রাহ্মণ হইবে চল!

শুধু তাহা নহে। ক্ষত্রিয় হইলেই বুঝিতে হইবে, জীব সুখী বা সুখান্বেষী হইয়াছে। সুখান্বেষী হইলে যুদ্ধের সন্ধান পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয় হইলে সুখান্বেষী হইতে বড় বাকী থাকে না। সুখী ও সুখান্বেষী একই কথা। কেন না, সুখান্বেষী হইলে সুখ অনিবার্য্য। ক্ষত্রিয় হইলে ব্রাহ্মণ হওয়া ধ্রুব সত্য।

শুধু তাহা নহে, ইহা অপাবৃত স্বর্গদ্বার। উন্মুক্ত দ্বার, মুক্তির দ্বারে কবাট থাকিতে পারে না। মুক্তি কখনও দ্বার রোধ করিয়া অমুক্ত অবস্থায় বসবাস করে না। ব্রহ্মের দ্বার নির্ম্মুক্ত। আমার মন্দির অপাবৃত দ্বারযুক্ত। তুমি এইখান হইতে এ মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ আমার স্বরূপ-মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। এই নরকুলে থাকিয়াই—এই দ্বারের সম্মুখে থাকিয়াই আমায় প্রত্যক্ষ করিবে। তুমি আমি ভেদ থাকিতে থাকিতেই তুমি আমায় সম্ভোগ করিবে। দ্বিত্বের ভোগ সম্ভোগ করিয়া, তার পর একত্বে বা শূন্যত্বে বা পূর্ণত্বে লীন হইবে। একত্ব, শূন্যত্ব, পূর্ণত্ব একই কথা। তাই দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি—তাই দ্বারের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছি, কে আমার নিকটে আসে। তাই স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত।

শুধু তাহা নহে। যখন তুমি বহু হইতে ছুটিয়াছিলে—যখন তুমি বহুভোগের আশায় গৃহ হইতে বিনিক্রান্ত হইয়া গিয়াছিলে—যখন ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য তোমায় বাহ্যক্ষেত্রে সংকল্পিত করিয়াছিলাম, তখনই তোমার বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ আমার কাঁদিয়াছিল। তখনই গৃহ ছাড়িয়া বৎসহারা জননীর মত তোমার অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছি। চক্ষের পলকের ভিতর আত্মবিস্মৃত হইয়া, আপনার ঐশ্বর্য্যে আপনি মুগ্ধ হইয়া, তোমাকে সব দেখাইব বলিয়া কল্পনা করিতে গিয়া, মায়াকুলহৃদয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি। তাই বুঝি, দ্বার পূর্ব্ববৎ উন্মুক্ত রাখিয়া আসিয়াছি। তোমায় লইয়া আবার এখনি গৃহে প্রবেশ করিব ভাবিয়া অপাবৃত রাখিয়াছি। স্নেহের মোহে দ্বার বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। দ্বার উন্মুক্ত করিতে পাছে বিলম্ব হয়—সন্তানের গৃহ-প্রবেশে পাছে সময়ের বিঘ্ন সাধিত হয়, সেই জন্যও আমার দ্বার উন্মুক্ত।

তার পর যখন তুমি সুখান্বেষী হইয়াছ, তখনই যদৃচ্ছা উপপন্নরূপে তোমায় সেই মন্দির-দ্বারে আনিয়াছি। সুখের অন্বেষণ করিয়াছিলে, সেই জন্যই

তুমি ব্রহ্মত্বের দ্বারে সমাগত। স্বধর্ম্মের দিকে একবার ভাল করিয়া চাহ—স্বধর্ম্ম পালনের জন্য যত্নবান্ হও। এ মহামুহূর্ত্তের সুযোগ ছাড়িও না।

স্বধর্ম্ম—ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ। ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধের বা স্বধর্ম্মের তিনটি অবস্থা,—শত্রুকে পরিচিত হইয়া তৎসমক্ষে উপস্থিত হওয়া, অস্ত্রচালনা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা। সর্ব্বপ্রথম শত্রুকে পরিজ্ঞাত হইয়া, তন্নিকটে উপস্থিত না হইলে অস্ত্রচালনা দ্বারা শত্রুবধ হইতে পারে না। সে জন্য শত্রুশক্তি পরিজ্ঞাত হইতে হয়।

তুমি যখন মনুষ্যকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ, তখন তুমি শত্রুর নিকটস্থ হইয়াছ বুঝিতে হইবে। শত্রুসকল পূর্ণভাবে সমষ্টীভূত হইয়াছে। সম্যক্ প্রকারে ব্যূহিত হইয়া তাহারা তোমার সম্মুখে সমাগত। নরজন্ম ছাড়া অন্য কোন জন্মে অবিদ্যা এত প্রবল কার্য্যকরী নহে। সুতরাং তুমি শত্রু-সমীপে সমাগত; এবং শত্রুর শক্তিও তুমি সম্যকরূপে জ্ঞাত হইয়াছ। তার পর যখন তুমি আত্মপ্রতিষ্ঠায় বঞ্চিত বলিয়া আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ ও সে আত্মরাজ্য লাভের আশায় উদ্‌যুক্ত হইয়াছ, তখন হইতে তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী হইয়াছ বুঝিতে হইবে। তার পর এখন অস্ত্র চালনার সময়ে তুমি তাহাদিগকে মিত্রস্থানীয় বলিয়া বুঝিতেছ। কিন্তু স্মরণ রাখিও, উহারা বস্তুতঃ তোমার শত্রুও নহে, মিত্রও নহে। উহারা "যদৃচ্ছয়া উপপন্ন।" তোমার ইচ্ছা বা আবশ্যকমত, আমার ইচ্ছা বা প্রয়োজনমত সমাগত। উহাদেরও বিনাশ নাই, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। উহারাও ক্ষণ পরে আমারই অঙ্গে মিলাইয়া যাইবে; সে কথা পরে বলিব। সুতরাং এমন সুযোগ — স্বধর্ম্ম-পালনের এমন অবসর আর পাইবে না।

এই স্থলে বলিয়া রাখি, ক্ষত্রিয়দিগের যেমন সাধারণ ধর্ম্ম যুদ্ধ, কিন্তু যুদ্ধের প্রকার বিভিন্ন—কেহ অসি চালনায় দক্ষ, কেহ ধনুর্ব্বিদ্যায়, কেহ মল্লযুদ্ধে, কেহ গদাযুদ্ধে সিদ্ধহস্ত, সাধকদিগের মধ্যে তদ্রূপ আচার ও অস্ত্রভেদ আছে। সে কথা পরে বিচার্য্য। কিন্তু শত্রু সমাগত দেখিলে যেমন অস্ত্র-বিচারে বিলম্ব না করিয়া, যাহা কিছু দ্রুত করতলগত হয়, তাহার দ্বারাই শত্রু-প্রহারে উদ্যত হও, তদ্রূপ যদৃচ্ছাভাবে যাহা কিছু সম্মুখে করতলগত পাইয়াছ, তাহাই শত্রুর বিপক্ষে পরিচালনা কর। "যদৃচ্ছা উপপন্ন" যুদ্ধ "যদৃচ্ছা উপপন্ন" অস্ত্রে আরম্ভ করিয়া দাও। শুধু অবসরের দিকে লক্ষ্য রাখ। বুঝি এমন অবসর আর পাইবে না, এই ভাবটি শুধু প্রাণে জাগাইয়া রাখ। কোন অস্ত্র না থাকে, "মা" নামরূপ মহাস্ত্রও আছে,

তাহাই চালাও। বিলম্ব করিও না, অবসর হারাইও না। যদৃচ্ছা ভাবে যাহা আসিয়াছে, যদৃচ্ছা ভাবে সে অবসর আবার চলিয়া যাইতে পারে। চালাও, অস্ত্র চালাও। মা মা বলিয়া হুঙ্কার ছাড়। ধর্ম্ম বলিয়া যাহা জান, তাহাই কর। ভগবৎলাভ উদ্দেশ্যে করিতেছি ভাবিয়া তাহাই কর। শত্রু বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাই প্রক্ষেপ কর। যদৃচ্ছা উপপন্ন ভাবেই আমায় কুড়াইয়া পাইবে। তুমি সৌভাগ্যশালী সন্তান, তাই এ অবসর পাইয়াছ।

আর একটী কথা। একটী জীবের সমষ্টি জীবন-প্রবাহের পথে ক্ষত্রিয় অবস্থা, আর ব্যষ্টিভাবে জীবনের একদিন যোগক্রিয়া করিতে বসিয়া যখন প্রাণায়াম প্রত্যাহারাদি করিতে হয়, তখনকার অবস্থা একই। পরে ইহা ব্যাখ্যাত হইবে।

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩

অথ চেৎ ত্বম্ ইমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি, ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপম্ অবাপ্‌স্যসি।

ব্যবহারিক অর্থ।—আর যদি তুমি ধর্ম্মগত যুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি ত্যাগ করিয়া পাপযুক্ত হইবে।

যৌগিক অর্থ।—সংগ্রামই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। অবিদ্যা হননই ক্ষত্রিয়াবস্থার প্রকৃতি। এ মায়াহনন বস্তুতঃ হনন নহে, প্রত্যাহরণ মাত্র। এ মায়া হননের যথার্থ মর্ম্ম চারি ধার হইতে মায়া সংগৃহীত করিয়া মহামায়াতে সেই মায়ার প্রক্ষেপ। মহামায়াতে মায়ার সম্পূর্ণ প্রক্ষেপ হইলে তখন বিশ্বরূপিণী মা আমার বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া সাধকের অভীষ্ট পূর্ণ করেন ও সন্তানকে আপন অঙ্গে মিশাইয়া লয়েন। কিন্তু সে কথা পরে বলিব। ক্ষত্রিয়াবস্থায় যখন চারি ধার হইতে মায়া প্রত্যাহৃত করিতে হইবে—যখন চারি ধার হইতে মায়া গুটাইয়া লইয়া কেন্দ্রাভিমুখী করিতে হইবে—সর্ব্ব মায়ায় যখন জলাঞ্জলি দিতে হইবে, তখন ইহা হনন নামেই অভিহিত। সুতরাং ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম মায়াহনন, ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত। স্বধর্ম্ম অর্থে প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। যেমন আহার নিদ্রাদি জীবের স্বধর্ম্ম, তদ্রূপ জীব ক্ষত্রিয়াবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার স্বধর্ম্ম মায়াহনন। যখন সাধকের প্রাণ আহার নিদ্রার মত ভগবদন্বেষণ না করিয়া থাকিতে পারে না, তখনই সে সাধক ক্ষত্রিয়-পদবাচ্য। কর্ত্তব্য বুঝিয়া

নহে—স্বতঃসিদ্ধ ভাবে যখন "মা মা" করিয়া সাধকের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তখনই বুঝিতে হইবে, সাধকের ভগবদন্বেষণ স্বধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়াছে বা প্রকৃতিগত হইয়াছে। যেমন জলের স্বধর্ম্ম শৈত্য, অগ্নির স্বধর্ম্ম উত্তাপ, ক্ষত্রিয়-ভাবাপন্ন সাধকের তদ্রূপ ভগবদন্বেষণই স্বধর্ম্ম। জলের শৈত্যগুণ অপহরণ করিলে যেমন জলের জলত্ব লোপ হয়, অগ্নির উত্তাপ অপহৃত হইলে অগ্নির অস্তিত্ব যেমন আর থাকে না, তদ্রূপ ভগবদন্বেষণশূন্য সাধক হইতে পারে না।

সাধক হইতে হইলে, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী হইতে হইলে নিজের সংস্কারকে এমনই ভাবে গঠিত করিয়া লওয়া চাই, যেন মাতৃ-অন্বেষণ তাহার প্রাণে স্বতঃ উদ্বুদ্ধ হইতে থাকে।

যাহা হউক, যদি এই ক্ষত্রিয় অবস্থায় জীব কোন কারণে তাহার এই প্রকৃতিগত কার্য্য হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে তাহার ধ্বংস সূচিত হইতেছে বলিতে হইবে। যেমন ক্ষুধাতুর আহার্য্য না পাইলে তাহার শরীর বিশীর্ণ হইয়া যায়, নিদ্রালু ব্যক্তির রজনীযোগে নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে যেমন তাহার দেহের পক্ষে অপকার হয়, কেন না—ক্ষুধা নিদ্রা জীব-ধর্ম্ম, তদ্রূপ যে জীবে ভগবৎসাধনই স্বধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে, তাহার সে ভগবৎ-সাধনার ব্যাঘাত ঘটিলে তাহার সূক্ষ্মদেহে অবনতিকর পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। জলে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে তাহার শৈত্য যেমন মন্দীভূত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পাকারে চলিয়া গিয়া সে পাত্রস্থ জলপরিমাণ হ্রাস-প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ক্ষত্রিয় সাধকের সাধনার কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটিলে, তাহার নিজ সংস্কার-সম্বদ্ধ সূক্ষ্মদেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহার অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যে আঘাত লাগে; সুতরাং সাধক কক্ষবিচ্যুত হয়।

তাই ভগবান্ বলেন, প্রকৃতিগত কর্ম্ম ছাড়িও না—স্বধর্ম্ম উপেক্ষা করিও না। তুমি এ অজ্ঞাতপূর্ব্ব সর্ব্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা হইতে বঞ্চিত হইবে—তুমি পাপযুক্ত হইবে। এ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে তোমার কীর্ত্তিরাশিও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। জীবের উন্নতির পথে কীর্ত্তি, রক্ষাকারী স্তম্ভস্বরূপ। কীর্ত্তি শুধু আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য কল্পিত হয় নাই—কীর্ত্তিকে আত্মচরিতার্থতামাত্র ভাবিও না—কীর্ত্তি আমাদিগকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার একটী মহান্ স্তম্ভ। অনেক সময়ে জীব কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া আপনার লক্ষ্য ঠিক রাখিতে পারে না—আপনার মহৎ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া নিম্নস্তরীয় কর্ম্মে প্রবেশোন্মুখী হইতে বাধ্য হয়।

প্রাণের বল হারাইয়া জীব অনেক সময়ে জ্ঞান সত্ত্বেও মোহাক্রান্ত ভাবে আপনার অনুপযুক্ত কার্য্যে আস্থা প্রয়োগ করে, সেই সময়ে কীর্ত্তি তাহাকে রক্ষা করে। লোক-প্রশংসা বা খ্যাতি তাহাকে সহসা তাহার সে প্রতিষ্ঠিত অবস্থা হইতে নিম্নাবস্থায় প্রবেশ করিতে দেয় না। খ্যাতি রক্ষার জন্য প্রাণে বল না থাকিলেও অনুপযুক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না; সুতরাং কীর্ত্তি যে একটী স্তম্ভস্বরূপ হইয়া অনেক সময়ে আমাদিগকে নিম্নগতি হইতে রক্ষা করে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

আমাদিগের মনোময় কোষে এই কীর্ত্তি—দীপ্তি নামে অভিহিত। স্বধর্ম্ম পালনে আমাদিগের মনোময়কোষের জ্যোতিঃ পরিবর্দ্ধিত হয়। মনোময়কোষের বর্ণ আছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই বর্ণছটা স্বধর্ম্ম পালনে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় হইয়া বিকাশপ্রাপ্ত হয়। স্বধর্ম্মের পরিত্যাগে দীপ্তি ম্লান হইয়া যায়— মনোময়কোষের বর্ণ মলিনতা প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে অস্ফুট হইয়া বর্ণরঞ্জনা লুপ্ত হয়, অথবা নিম্নস্তরীয় বর্ণ প্রতিফলিত হয়। এ বর্ণ ফুটাইয়া তুলিতে— আপনার এ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি প্রকটিত করিতে অনেক সময় ব্যয়িত হইয়াছে— অনেক দিনের অনেক সাধনার পর তবে আমরা মনোময়কোষে এমন অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। আজ সহসা স্বধর্ম্মবিমুখ হইয়া তোমার সাধনালব্ধ এ অমূল্য সম্পদ্ হারাইও না।

অতি অপূর্ব্বরূপে এ দীপ্তি আমাদিগের অভ্যন্তরে সঞ্চাত হয়। স্বধর্ম্ম-পালনে জ্যোতিঃ বহির্মুখে ব্যয়িত না হইয়া অন্তর্মুখে ধাবিত হইতে থাকে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভাবসকলের রূপ আছে। আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে বিরাট্ মায়ের প্রাণশক্তি সূর্য্যের অভ্যন্তর দিয়া প্রাপ্ত হইতেছি। আমরা শক্তির জ্যোতিঃসমুদ্রে অহর্নিশ নিমজ্জিত। সেই জ্যোতিঃ ভাবরূপে আমরা ব্যয়িত করি। ভাব প্রকাশ করি বলিয়াই এই প্রাণশক্তির ক্ষয় হয়। বহির্মুখে ভাবকে চালিত করি বলিয়াই সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের সেই জ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া যায়। যদিও বিরাট্ হইতে সেই জ্যোতিঃ পরিপূরণ হয়, কিন্তু যে পরিমাণে ব্যয় হয়, সেই পরিমাণে আমরা পরিপূরণ করিয়া লইতে পারি না; সেই জন্য আমরা দিন দিন ক্ষয়গ্রস্ত হই। যাহা হউক, অন্তর্মুখে যদি এই জ্যোতিঃ চালিত হয়, তাহা হইলে উহা ব্যয়িত না হইয়া সঞ্চিত হইতে থাকে। যে পরিমাণে অন্তর্মুখে ভাব চালিত করিতে পারিব, সেই পরিমাণে ক্ষয় রোধ

হইবে। একবার মা বলিতে পারিলে বুঝিব, কতকটা জ্যোতিঃ সঞ্চিত হইল। স্বধর্ম্ম পালন অন্তর্ম্মুখে গতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং স্বধর্ম্ম পালনে জ্যোতিঃ যে সঞ্চিত হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, এবং স্বধর্ম্মবিমুখ হইলে জ্যোতির অপব্যয়ও অনিবার্য্য।

তবে প্রধানতঃ আমরা এই বুঝিলাম, বহু প্রকারে মা আমাদিগকে ইচ্ছারূপে চালিত করিয়া অপাবৃত স্বর্গদ্বারের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন—বহু কষ্টের ভিতর দিয়া আমাদিগকে সুখান্বেষী করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা তীরের সন্নিকটস্থ হইয়াছি। এখন এই মহা মুহূর্ত্তে যদি স্বধর্ম্ম হইতে বিরত হই, তাহা হইলে আবার পতন অনিবার্য্য। কেন না, কীর্ত্তি বা দীপ্তি, যাহা বহির্জগতে জ্যোতীরূপে আমাদিগের স্তম্ভস্বরূপ হইয়া আমাদিগের এই উচ্চ আসন গঠিত করিয়াছে, তাহা ভগ্ন হইবে—আমাদিগের সিংহাসন ভূমিসাৎ হইবে—আমাদিগকে নিম্নগতি পাইতে হইবে। শুধু স্তম্ভ ভগ্ন হইলেও কথা থাকিত, স্তম্ভ ভগ্ন হইলেও লঘু পদার্থ যেমন আপনার লঘুত্ববশতঃ বায়ুতেও ভাসমান থাকিতে পারে, তদ্রূপ ভাবে আমরা থাকিতে পারিলেও কথা থাকিত; কিন্তু তাহা হইবে না; সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্কন্ধে দুরন্ত ভার আসিয়া তোমার গুরুত্ব বাড়াইয়া তোমাকে নিম্নে চালিত করিবে। পরশ্লোকে সেই কথা বলিতেছি।

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৪

অপি চ ভূতানি তে অব্যয়াম্ অকীর্ত্তিং চ কথয়িষ্যন্তি, সম্ভাবিতস্য অকীর্ত্তিঃ মরণাৎ অতিরিচ্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—পরন্তু লোকসকল তোমার অশেষ প্রকার অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। ধর্ম্মাত্মা ও শূর বলিয়া তোমার যে বহুকালস্থায়ী বহু লোকমুখে খ্যাত কীর্ত্তি আছে, তাহার বিরুদ্ধে বহু লোকমুখ হইতে অকীর্ত্তিরাশি উদ্গীরিত হইতে থাকিবে। এই অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও অধিক। শক্তিমানের অপযশ মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর দুঃসহনীয়।

যৌগিক অর্থ।—আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, অনেক সময় যশঃ, আমাদিগকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করে, সাধারণ জনসংঘের উচ্ছ্বাস আমাদিগের চিত্তের সাময়িক দুর্ব্বলতার মোহ হইতে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। আবার সেই

সাধারণ লোকসমুদ্র যদি আমারই অখ্যাতিতে একবার উদ্বেলিত হইয়া উঠে—একবার যদি অখ্যাতির স্রোত লোকমুখে মুখরিত হয়, তাহা হইলে ঠিক তেমনি ভাবে আবার আমাদিগের দুর্ব্বলতার অবস্থায় উহা অধোগতির মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া দেয়; হৃদয়ের সমস্ত উৎসাহ ও সাহস বিলীন হইয়া যায়; মরণাপেক্ষা ঘোরতর অন্ধকার ক্ষেত্রে আমাদিগকে নিক্ষেপ করে। আমাদিগের মুহ্যমান অবস্থায় জনসংঘের প্রভাব এইরূপে আমাদিগকে উর্দ্ধে তুলিয়া রাখিতে অথবা অধঃপাতে দিতে কথঞ্চিৎ সক্ষম। সেই কারণে মা আমাদিগকে সময়ে সময়ে যশস্কর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ফেলেন। সকলকার পক্ষে অবশ্য নহে, কিন্তু কাহারও কাহারও চিত্তবৃত্তির অবস্থাবিশেষের উৎকর্ষ সাধনের জন্য মা আমাদিগকে ভগবদ্‌-বাক্য প্রচারে নিযুক্ত করেন। যাহার পক্ষে ঐরূপ প্রচার উপকারে আসিতে পারে, মা তাহাকেই ভাব প্রকাশে উন্মুখী করিয়া দেন। নিজে ভাব প্রকাশ করিয়া, সেই ভাবে জগৎকে মাতাইয়া, জগতের মুখ হইতে সেই ভাবের উচ্ছ্বাস শুনিয়া নিজে ধন্য হয়েন ও জগৎকেও ধন্য করেন। আপনি মা বলিয়া ডাকেন—অপরকে মা বলিয়া ডাকিতে শেখান ও তাহাদিগের মুখের সে মাতৃ-আহ্বানের সঙ্গে আপনার মাতৃ-আহ্বান মিশাইয়া এক স্বর্গীয় তরঙ্গ জগতে রচনা করেন। সে লোক-সমুদ্র ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু সে তরঙ্গ বহুকাল জগতের উপর উদ্বেলিত থাকে। তাঁহারা হয় ত জানেন না, কি ভাবে তিনি স্বয়ং সেই লোকসংঘের দ্বারা সাহায্যকৃত। তাঁহার অজ্ঞাতেই তিনি আপনার প্রদত্ত শক্তিরই সাহায্য পাইয়া থাকেন।

যখন সাধক আপনার ভাব ধরিয়া রাখিতে পারে না, অথচ সে ভাব যথার্থই অকৃত্রিম ও শক্তিশালী—মা যখন দেখেন, কোন সন্তানের চিত্ত অনন্ত ভাব উচ্ছ্বাসের কেন্দ্রস্থল হইয়াছে সত্য, অথচ সে ভাবরাশি ধারণ করিয়া রাখিবার আধার তাহার নাই, তখন তিনি তাহার উপকারার্থে সেই ভাবরাশি একটি জন-মণ্ডলে অধিষ্ঠিত করিয়া একটী শক্তি-কেন্দ্র বা শক্তি-মণ্ডল রচনা করেন। তাহাতে, যেমন তাহার হৃদয়ে সে ভাবরাশি সঞ্চিত থাকিলে তাহার উপকার হইত, তেমনই ভাবে কতকটা সেই মণ্ডলের অধীশ্বররূপে থাকিয়া সে সাধক উপকৃত হয় অর্থাৎ তাহার একখানি ক্ষুদ্র হৃদয়ের সহিত জনসংঘের হৃদয় মিলিত হইয়া সে বিরাট্‌ ভাবধারণের জন্য যেন একটী বিরাট্‌ আধার নির্ম্মিত হইয়া যায়। কিন্তু বুঝিতে হইবে, সে চক্র শুধু জনমণ্ডলীর মুখ চাহিয়া নির্ম্মিত হয় নাই, শুধু জন-সমুদ্রের দিকে চাহিয়া সে মণ্ডল রচনা করেন নাই। সে সাধকের অজ্ঞাতে মা তাঁহাকে

এক বিরাট্‌ আধারে পরিণত করিয়া দিয়াছেন। আধেয় ও আধারের বিরাট্‌ সম্মিলন করিয়া মা তাহাকে বিরাট্‌ করিয়া তুলিয়াছেন।

কোন সময়ে একটী গ্রামে একান্ত জলকষ্ট হইয়াছিল; সেই গ্রামের অধিবাসীরা বহু দূরস্থিত স্রোতস্বতীর জল কষ্টে বহন করিয়া আনিয়া জীবন ধারণ করিত। সুতরাং জল তখন সেখানে বহুমূল্য সামগ্রীর তুল্য আদরের। একদিন কোন পথিক একান্ত পিপাসিত হইয়া সেই গ্রামের কোন গৃহস্থের নিকট জল প্রার্থনা করিলে, সে গৃহস্থ তাহাকে অন্য বাড়ীতে যাইবার জন্য অনুজ্ঞা করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। তৃষিত পথিক দ্বিতীয় ব্যক্তির দ্বারে উপস্থিত হইয়া বারি প্রার্থনা করিলে, সেও "জল নাই" বলিয়া অন্য আশ্রমে প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দিল। পথিক তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, একে একে সকল গৃহে নিজ প্রার্থনা জানাইল, কিন্তু কেহই তাহাকে সামান্যমাত্র জল দিয়া তাহার তৃষ্ণা নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করিল না, সকলেই জল নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া অন্য গৃহস্থের নিকট প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিল। তৃষিত পথিক এইরূপে সমগ্র গ্রামখানি পরিভ্রমণ করিয়া, কোথায়ও এক বিন্দু জল না পাইয়া বিফলমনোরথ হইয়া বিষাদে, ক্ষোভে, তৃষ্ণায় কাতর হইয়া, পথপ্রান্তস্থ অরণ্যে প্রবেশ করিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যে মনুষ্যসমাজ এক বিন্দু বারি দিয়া তৃষিত ব্যক্তির তৃষ্ণা নিবারণে কুণ্ঠিত, সে সমাজ পশুসমাজ অপেক্ষা অধম। আর মনুষ্যের মুখ দেখিব না—আর লোকালয়ে প্রত্যাগমন করিব না; মনুষ্য বলিয়া, মনুষ্যকুলে জন্মিয়াছি বলিয়া আর আপনাকে গৌরবান্বিত ভাবিব না। এই অরণ্যে অবস্থান করিব; জল পাই—পান করিব, নতুবা তৃষ্ণায় প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যদি জীবন ধারণ করিতে হয়, তবে অবশিষ্ট জীবন এই অরণ্যেই অতিবাহিত করিব। অথবা কলুষিত মনুষ্যদেহ আর রাখিব না,—আত্মহত্যা করিব।

মনুষ্যকুলের উপর এইরূপ বিদ্বেষ-হৃদয় লইয়া পথিক অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিল। যে অবস্থায় নির্ভীকচিত্তে জীব মৃত্যুর মুখে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়; পথিকের প্রাণে নিরাশার সেই ঘোর তমোময় অবস্থা। তখন রাত্রি হইয়াছে, বহির্জ্জগৎ অন্ধকার—অরণ্য তদপেক্ষা অন্ধকারময়। তাহার হৃদয়ের অন্ধকার সে অরণ্য অপেক্ষাও ঘোরতর। সহসা পথিক দেখিল, সম্মুখে একজন সাধু যোগাসনে উপবিষ্ট। সাধু পথিককে দর্শন করিয়া নিকটে আহ্বান করিলেন এবং গভীর লোকশূন্য অরণ্যে প্রবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

পথিক আপনার সমস্ত ঘটনা আমূল বিবৃত করিয়া তাহার মরণে কৃতসঙ্কল্পতার কথা জানাইল। তখন সাধু ধীরে ধীরে পথিককে বলিলেন, "বৎস! এ গ্রামের লোক তোমায় প্রত্যাখ্যান করায় মহাপাপে কলুষিত হইয়াছে। এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন। এই অগ্নি লও—যাও, সে পাতকীদিগের গৃহে অগ্নিসংযোগ কর। তাহাদিগের পাপ আশ্রম-সকল প্রজ্বলিত হইলে, তাহারা জল আনিয়া সে গৃহদাহ নিরাকরণে সচেষ্ট হইবে; তুমিও সেই জল পান করিয়া তৃষ্ণাবিমুক্ত হইবে। যাও—যাও, তাহাদিগের গৃহে অগ্নি সংযোগ কর।"

সাধুর আদেশে পথিক সাধুর নিকট হইতে অগ্নি লইয়া গ্রামপ্রান্তে গিয়া দুই একখানি গৃহে অগ্নিসংযোগ করিল। তখন অগ্নির তাড়নায় সকলেই স্ব স্ব গৃহ রক্ষা করিবার জন্য সঞ্চিত জলরাশি বাহির করিল। তাহাদিগের গৃহদাহ দূর হইল, পথিকেরও তৃষ্ণা দূর হইল।

এইরূপে ভগবদ্‌বিরহে আর্ত্ত জীব জগতের গৃহে গৃহে ফিরিয়া ভালবাসা বা আত্মদানের সন্ধান করে। আকুল ভাবে জগতের মুখের দিকে চাহিয়া দেখে, কে তার প্রাণের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে সমর্থ। কিন্তু কোথাও বিন্দুমাত্র বারির সন্ধান পায় না। স্বার্থময় জীবসকলের কোন্ অজ্ঞাত হৃদয়-কোণে প্রেম লুক্কায়িত থাকে, জগতের লোক জানিয়াও তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করে না। আর্ত্ত পথিক জগতের উপর ঘৃণাপ্রকাশ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করে। লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বিরাগের নির্জ্জন অরণ্যে সাধক প্রবেশ করে। ভূমণ্ডলে মায়ার ক্ষেত্রে বুঝি এমন কেহ নাই, যে তাহার তৃষ্ণা দূর করিতে সমর্থ! তাহার প্রাণ মরুবৎ, শূন্যবৎ, অমাবস্যার ঘন অন্ধকারমাখা স্তব্ধ রজনীবৎ ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। বহির্জ্জগৎ হইতে সূচনা করিয়া আপনার মন ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তাহার প্রাণ লোল দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছে, কেহ ত তাহার সে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি মিলাইয়া দেয় না। তবে আর কেন; আর জীবনভার বহন করিব কেন—মৃত্যু হয় হউক, এই ভাবে হৃদয়ের নিভৃত, ভাবশূন্য, জনশূন্য প্রদেশে তাহার প্রাণ প্রবেশ করিতে থাকে। তখন সহসা সেইখানে গুরুর সাক্ষাৎ পায়। গুরু তাহার হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দেন এবং বলেন, যাও বৎস! পুনরায় লোকালয়ে যাও, পাপপূর্ণ লোকালয়ে এই অগ্নি গৃহে গৃহে প্রজ্বলিত করিয়া দাও। সাধক সেই মহাগ্নি লইয়া জগতে আইসে. যাহাকে স্পর্শ করে, সেই অগ্নিময় হইয়া উঠে। সমাজের পর সমাজ—দেশের পর দেশ তাহার সেই

মহাগ্নি-স্পৃষ্ট হইয়া শেষ জগতে এক অপূর্ব্ব ভগবদ্‌বিরহের অগ্নিক্ষেত্র ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। প্রতি লোকহৃদয় হইতে গুপ্ত প্রেমপ্রবাহ ছুটিয়া বাহির হইয়া সে অগ্নিপ্রবাহ নিবারণে সচেষ্ট হইয়া পড়ে। সাধক আপনি কৃতার্থ হয়, দহ্যমান জনমণ্ডলীও কৃতার্থ হইতে থাকে। এই সব সাধকই সাধারণতঃ মহাপুরুষ ও অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যুগে যুগে, কালে কালে, বিপ্লবের আবর্ত্তনের তালে তালে এইরূপে এক একজন মহাপুরুষ সাধারণ লোকসমষ্টির হৃদয় লইয়া, আপনার হৃদয়ের সহিত তাহা সংযুক্ত করিয়া শক্তির একখানি বিরাট্ আধাব প্রস্তুত করিয়া লয়েন এবং আপনার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভাবরাশি দিয়া সে আধার পূর্ণ করেন।

এইরূপে সাধারণ জনমণ্ডলী সাধককে অনেক সময়ে রক্ষা করে। সাধকের হৃদয়ের ভাব জনসংঘের উপর চালিত করিয়া, সাধক ও জনমণ্ডলীর মঙ্গলের সূচনা মা করিয়া দেন। মঙ্গলময়ী সাধারণের দিকে মঙ্গলদৃষ্টিতে চাহিয়া সে সাধকেরও মহামঙ্গল সংসাধিত করিয়া থাকেন।

তদ্রূপ আবার কোন জনসংঘ যদি কাহারও অকীর্ত্তি ঘোষণা করে, তাহা হইলে জনসংঘের সেই বিরুদ্ধ কার্য্যে সাধকের অবনতি ঘটিতে পারে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্তম্ভেব মত কীর্ত্তি আমাদিগকে ধরিয়া রাখে। সময়ে সময়ে আমাদিগের প্রাণ করিতে না চাহিলেও কীর্ত্তির মুখ চাহিয়া আমরা সৎকার্য্য করিয়া থাকি। সাধক প্রকৃতিগর্ত স্বধর্ম্ম না করিলে সে কীর্ত্তিরূপ স্তম্ভ যেমন ভগ্ন হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে অকীর্ত্তিরাশি তাহার শিরে গুরুভারবৎ সঞ্চাপ দিয়া তাহার নিম্নমুখী গতি সূচিত করে। স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া গেলেও লঘু দ্রব্য, স্তম্ভের আশ্রয়শূন্য হইয়াও শূন্যে অবস্থান করিতে পারে; কিন্তু তাহাতে অন্য কোন গুরুভার দিলে সে যেমন আর স্বস্থানে থাকিতে পারে না, তদ্রূপ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে কীর্ত্তিরূপ স্তম্ভও ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং অকীর্ত্তিরূপ ভার স্কন্ধে আরোপিত হইয়া আমাদিগকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দিবে না।

শুধু তাহা নহে। অকীর্ত্তি—কালিমা। কীর্ত্তি যেমন আমাদিগের মনোময় কোষের দীপ্তি, অকীর্ত্তি তদ্রূপ আমাদিগের মনোময় কোষের কালিমা। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে মনোময় কোষের দীপ্তি মিলাইয়া যায়, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; কিন্তু তাহা অপেক্ষা উহাতে আরও অধিক অনিষ্ট সংসাধিত হয়। দীপ্তি চলিয়া গেল, যাক; কিন্তু তাহার উপর ঘোর অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হয়। সূর্য্য অস্ত

গেল,—যাক ; সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোক থাকিবে, কিন্তু তাহা নহে—ঘোরতর অন্ধকার কোথা হইতে আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। মনোময় কোষের দীপ্তি গেল—যাক ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে কালিমা আসিয়া উহা মলিন করিয়া দেয়। পঞ্চভূতাত্মক দেহের ছায়া অন্ধকাররূপে মনোময় ক্ষেত্রকে আবৃত করে—ইহাই ভূতকথিত অকীর্ত্তিরাশি। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে আমাদিগের দেহাভিমান ও ভৌতিক জগৎ, মনোময় ক্ষেত্রে সমধিক ছায়া প্রক্ষেপ করে—জগৎমায়া প্রবলতরভাবে হৃদয়ের উপর আধিপত্য করে। ইহাই সাধকের মরণ, অথবা মরণাপেক্ষাও অধিক অনিষ্টকারী।

তাহা হইলে মোটের উপর আমরা এই অবস্থাগুলি পাইলাম— ১। বহু কষ্টে আমরা মনুষ্যকুলে জন্মলাভ করিয়াছি। ২। বহু কষ্টে আমরা সাধক বা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছি। ৩। বহু কষ্টে মাতৃমন্দিরের উন্মুক্ত দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ৪। মাতৃঅনুসন্ধানই আমাদিগের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম হইয়াছে। ৫। আমাদিগকে এই উচ্চ অবস্থায় ধরিয়া রাখিবার জন্য কীর্ত্তি-স্তম্ভ নিম্নে অবস্থান করিতেছে ; অথবা দীপ্তি মনোময় কোষকে কালিমার হাত হইতে রক্ষা করিতেছে। এখন যদি সেই প্রকৃতিগত ধর্ম্মে বা মায়াহননে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে আমাদিগের সে স্তম্ভ ভগ্ন হইয়া যাইবে ; অথবা মনোময় কোষের জ্যোতিঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, সুতরাং পতন অনিবার্য্য। তাহার উপর অকীর্ত্তির ভার চাপিবে ; অথবা ভূত-জগতের ছায়া মনোময় ক্ষেত্রকে অধিক কালিমাগ্রস্ত করিবে। তাহাতে পতন আরও দ্রুততর হইবে।

কিন্তু এ অবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার আর এক উপায় থাকিতে পারিত। কোন জিনিষ স্তম্ভের দ্বারা ঊর্দ্ধে ধৃত হইলেও যদি অন্য কোন ঊর্দ্ধতর স্থান হইতে বন্ধনের দ্বারা সে দ্রব্যটীকে আকৃষ্ট করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে নিম্নস্থ স্তম্ভটী ভাঙ্গিয়া গেলেও এবং অন্য কোন ভারের সন্তাপ সে দ্রব্যের উপর প্রদত্ত হইলেও উহা ঊর্দ্ধতর স্থলের সেই বন্ধনের দ্বারা স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সমর্থ হইতে পারে। সাধকের এরূপ কি কোন বন্ধন নাই? কীর্ত্তি বা দীপ্তি নষ্ট হইলে এবং অকীর্ত্তি বা কালিমা হৃদয় অধিকার করিলে, সে অবস্থায় এমন কোন বন্ধন কি ঊর্দ্ধলোক হইতে প্রসৃত নাই, যাহা সাধককে স্বস্থানে ধরিয়া রাখে?

ভগবান্ পরশ্লোকে বলিতেছেন—থাকে; কিন্তু এ অবস্থায় অর্থাৎ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। হায় হায়! সাধক সর্ব্বদিকে উপায়হীন হইয়া পড়ে।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবং॥ ৩৫

মহারথাঃ ত্বাং ভয়াৎ রণাৎ (যুদ্ধাৎ) উপরতং (নিবৃত্তং) মংস্যন্তে (চিন্তয়িষ্যন্তি); যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা (পুনঃ) লাঘবং যাস্যসি।

ব্যবহারিক অর্থ।—ভীষ্মাদি মহারথীরা, ভয়ে রণে নিবৃত্ত হইয়াছ, এইরূপ তোমায় ভাবিবেন। যাঁহাদিগের নিকট তুমি প্রশংসার্হ ছিলে, তাঁহাদিগের নিকট তোমার লঘুত্ব প্রতিপন্ন হইবে।

যৌগিক অর্থ।—শত্রুর নিকট লঘুতা প্রকাশ হইলে শত্রু প্রবল হইয়া উঠে। মায়াহননে প্রবৃত্ত হইয়া আবার যদি তাহাতে নিবৃত্ত হও, তাহারা ভাবিবে, ভয়ে তুমি নিবৃত্ত হইতেছ। তুমি যে কৃপাপরবশ হইয়া যুদ্ধে বিরত হইতেছ— তুমি যে তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের হননে নিবৃত্ত হইতেছ, এ কথা তাহারা বুঝিবে না। তোমায় ভীত ভাবিয়া তাহারা আরও প্রবল হইয়া উঠিবে। তোমার সম্বন্ধে তাহাদিগের ধারণা অন্যরূপ হইবে।

কিন্তু এ শ্লোকের অন্য প্রকার অর্থ সঙ্গত বুঝিতে হইবে। "মহারথাঃ" অর্থে "ভীষ্মাদি" বা "মায়া" না বুঝিয়া, "মহারথাঃ" অর্থে "সিদ্ধয়ঃ" বুঝিতে হইবে। সাধারণ জনমণ্ডলীর উপর সিদ্ধর্ষিদিগের দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ থাকে। তাঁহারা জীবের বিরাট্ জীবনগতির দিকে চাহিয়া থাকিয়া, কখন্ তাহারা অন্তর্দৃষ্টির উপযুক্ত হয়, সেই শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করেন; এবং অবস্থানুক্রমে যত দূর সাধ্য, তাঁহাদের সে মঙ্গল দৃষ্টি তাহার ঊর্দ্ধমুখী গতির সাহায্য করিয়া থাকে। যে যত অগ্রগামী, তাহার শিরে তাঁহাদিগের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ তত অধিক পরিমাণে বর্ষিত হয়। তাঁহাদিগের মঙ্গল কর হইতে অভয়ের অমৃতধারা তাহাদিগের হৃদয়ের ভীতি বিদূরিত করে। কিন্তু যদি আমরা অগ্রসর হইতে হইতে আবার পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ি, যদি আবার সাধারণ জনসংঘের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া পড়ি, যদি আবার সমষ্টি জীবপ্রবাহের সহিত মিশাইয়া যাই, তাহা হইলে বিশিষ্টভাবে আর তাঁহাদিগের মঙ্গল আকর্ষণ আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। অথবা

আর বিশেষভাবে তাঁহারা ঊর্দ্ধগতির সাহায্য করেন না। তাঁহারা বোঝেন যে, জীবের পশ্চাৎপদ হইবার কারণ ভীতি ছাড়া আর কিছুই নহে। একমাত্র ভীতিই জীবকে সাধারণ জনসংঘের গতি হইতে অগ্রগামী হইয়া যাইতে দেয় না। শুধু ভয়েই সাধক উঠিতে উঠিতে আবার পিছাইয়া পড়ে।

সাধক হয় ত ভাবিতে পারে, বস্তুতঃ সে ত ভয়ে পশ্চাৎপদ হইতেছে না—সে ত মায়ার ভয়ে ভীত হইয়া মায়াহননে নিবৃত্ত হইতেছে না; তবে তাঁহাদিগের এরূপ ধারণা করিয়া লইবার কারণ কি? মায়াকে কেন হনন করিব, মায়া-হননে বস্তুতঃ আমি কি লইয়া আমার "আমিত্ব"কে রক্ষা করিব, আমার অস্তিত্ব কিসে প্রতিবিম্বিত হইবে, এই চিন্তাতেই আমি নিবৃত্ত হইতে চাহিতেছি; ভয়ে বা পারিব না বলিয়া ত নিবৃত্ত হইতেছি না, তবে তাঁহারা আমাকে ভীত ভাবিবেন কেন? শক্তিমান্ তাঁহারা, আমি পশ্চাৎপদ হইলেও আমার হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া কেন তাঁহারা আমায় বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবেন না? ইহার উত্তর, তুমি যে কারণেই নিবৃত্ত হও না কেন, তাহার মূলে ভীতি আছে, ইহা তাঁহাদিগের তীক্ষ্ণ চক্ষে প্রতিফলিত হইয়া পড়ে। তুমি অরির শক্তির ভয়ে ভীত হইতেছ না, ইহা সত্য; কিন্তু আপনার অস্তিত্ব হারাইবার ভয়ে ভীত হইয়াছ। তোমার আত্মপ্রতিষ্ঠা শূন্যবৎ, অনুভূতিহীন, বুঝি অস্তিত্বহীন অবস্থাবিশেষমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে—এই ভয়ে আকুল হইয়াছ এবং সেই ভয় হইতেই মায়ার উপর—শত্রুর উপর তোমার মায়া পড়িয়াছে। তোমার নিজ স্বার্থনাশভয়ই তোমায় এইরূপ শত্রুকে ভালবাসারূপ পরার্থপরতায় উন্মুখী করিয়াছে। পূর্ণ স্বার্থপরতাই পূর্ণ নিঃস্বার্থতা; এইটী পরে বলিতেছি। স্বার্থরক্ষা সকলেই করিতে প্রযত্ন করে ও করিয়া থাকে। সে জন্য স্বার্থরক্ষাজনক এ সংগ্রামে তোমার দোষ নাই। বরং ইহাই সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে পারিলে একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া স্বার্থনাশের ভয়ে ভীত হইলে চলিবে না। ভয়ের নাম-গন্ধ থাকিলে চলিবে না—যে আকারেই হউক, অথবা যে ধরণেই হউক, ভয়ের স্পর্শমাত্র প্রাণকে কলুষিত করিলে চলিবে না। ভয় যে আকারেই আসুক না কেন, বুঝিতে হইবে, উহা সন্দেহের গর্ভ হইতে সঞ্জাত—আমি যে নিত্য চিরস্থায়ী অব্যয়, এ জ্ঞানের বিরোধী। এ জ্ঞানকে আগে পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া চাই; পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা চাই। তার পর ইহা আপনা হইতে প্রতিপাদিত হইবে। তোমার প্রাণে যখন "মায়াহননে কেমন করিয়া অস্তিত্ব থাকিবে", এ

কথা একবার ফুটিয়াছে, তখন সে সিদ্ধর্ষিরা বুঝিয়াছেন, আত্মার স্বরূপে তোমার সন্দেহ আছে; এবং সেই কারণেই তুমি মায়ার মায়ায় দুঃখিত বা কৃপাপরবশ হইয়াছ। তুমি বলিতেছ, আমি হত হই, সেও ভাল, তবু মায়া থাক্। এ কথা অতি উচ্চ। এ কথায় হয় ত ভয়ের লেশমাত্র নাই, এবং যথার্থ পরার্থপরতা বা যথার্থ স্বার্থপরতা, যথার্থ ভগবৎভালবাসা প্রকাশ হয় ত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা উচ্চ অবস্থা বুঝি দুর্লভ, ইহা অত্যন্ত সত্য। কিন্তু ইহাতে তোমার তুমিত্ব ও মায়া, ইহাদিগকে এক চক্ষে পরিদর্শন করা হয় নাই। আপনা অপেক্ষা মায়াকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছ; সুতরাং ইহা মোহ। যথার্থ পরার্থপরতা বা যথার্থ স্বার্থপরতা উভয় দিক্ ঠিক সমান করিয়া দেয়। কোন দিকে আকর্ষণের উচ্চ-নিম্নতা লক্ষিত হয় না। তোমাতে তাহা লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, তুমি যে মায়াকে ভালবাসিতেছ, উহা মায়াকে ভালবাসা নহে—মায়ার মোহকে ভালবাসা। খুলিয়া বলি।—

যথার্থ স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা, ইহা একই জিনিষ। পরার্থপরতা অর্থে—সম্পূর্ণরূপে স্বার্থপরতা। স্বার্থপরতা এ জগতের মন্ত্র—স্বার্থপরতা এ জগতের অস্তিত্ব। আপনার উদ্দেশ্যে কৃত কর্ম্ম সাধারণতঃ স্বার্থপরতার লক্ষণ, এবং অন্যের উদ্দেশ্যে কৃত কর্ম্ম পরার্থপরতার বাহ্যিক লক্ষণ। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে কি দেখিতে পাওয়া যায়? কার্য্যের উদ্দীপক কারণ কি? বস্তুতই যখন অমরা পরদুঃখে কাতর হইয়া সহানুভূতি প্রকাশ করি, বিপন্নকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে আপনার স্বার্থে জলাঞ্জলি দিই—নিঃসহায়কে আপনার স্বার্থের অংশ দিয়া সহায়তা করি, তখন বাহ্যতঃ আমরা সেই বিপন্ন ও নিঃসহায়ের হইয়া কার্য্য করিলেও আমরা কার্য্যতঃ তাহার মুখ চাহিয়া কার্য্য করি না। ঐ পরার্থপরতার কারণ আমার আনন্দ। আমি ঐরূপ কার্য্য করিয়া আনন্দ পাই বলিয়া—ঐরূপ কার্য্যে আমার চিত্তের সাধারণ গতি বলিয়া আমি না করিয়া থাকিতে পারি না। আমার প্রকৃতি ঐরূপ কার্য্যে উন্মেষিতা হন বলিয়া পরার্থ-পরতা আমাতে বিকশিত হয়। আমার প্রকৃতি ঐরূপ কার্য্য করিয়া আনন্দ পান বলিয়া আমার দ্বারা ঐরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। সদানন্দমুখী প্রকৃতি ঊর্দ্ধদৃষ্টিপাতে চাহিয়া অহর্নিশ ছুটিয়াছে। সে আনন্দ উল্লাসের গতিতে কখন স্বার্থময়ী—কখনও পরার্থময়ী সাজিতেছে। যখন যেখানে আনন্দোল্লাস, প্রকৃতি নিজ অবস্থা অনুযায়ী সেইখানে সেইরূপ বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছে। আপনার

প্রয়োজন মত আপনি সাজিতেছে—আপনার স্বার্থ আপনি পূরণ করিতেছে। প্রকৃতি আপনার মহা স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া যুগে যুগে ছুটিয়াছে। এ গতি ক্রমশঃ বিস্তৃতা—ক্রমশঃ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী—ক্রমশঃ ব্রহ্মগ্রাসিনী হইতেছে। সংকীর্ণ অবস্থায় ইহা জগৎচক্ষুতে স্বার্থপরতারূপে প্রতিফলিত; বিস্তীর্ণ অবস্থায় পরার্থপরতারূপে অভিহিত। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি আপনার স্বার্থ কখনও ভুলে নাই—কখনও ভুলিবে না। দয়াবান্ দয়া করিয়া আনন্দ পান, তাই দয়া প্রকাশ করেন এবং জগতে দয়াময় বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ক্রূর ক্রূরতায় আনন্দ পায়, তাই তাহার দ্বারা ক্রূরতার অনুষ্ঠান; পরহিতে আনন্দ পায় বলিয়াই পরহিতব্রতাচারীর পরহিত অনুষ্ঠেয়। সুতরাং পরার্থপরতা কোথায়? পরার্থপরতা বলিয়া জগতে যাহা অভিহিত, তাহা স্বার্থপরতার অবস্থাবিশেষ মাত্র।

জগতের চক্ষে যেরূপেই প্রতিফলিত হউক না কেন, ঊর্দ্ধলোক-সকলে আমাদিগের কার্য্যসকল পূর্ব্বোক্তরূপেই বিশ্লেষিত হইয়া থাকে। কার্য্যের মূল অংশটুকুই ঊর্দ্ধলোকে পরিদৃষ্ট ও আলোচিত হয়। সুতরাং তুমি সাধক, তুমি যে আজ শত্রুর দুঃখে দুঃখিত হইতেছ, মায়াকে হনন করিতে দয়াপরবশ হইতেছ, ইহা তোমার প্রকৃতিগত আনন্দবিশেষ মাত্র। ইহাতে তোমার জগতে গৌরব থাকিলেও ঊর্দ্ধলোকে গৌরবের কিছুই নাই। ঊর্দ্ধলোকে গৌরব ও নিন্দা বলিয়া কোন জিনিষ নাই। একমাত্র অভয়ই ঊর্দ্ধলোকের কিরণ। যার হৃদয় যত ভয়শূন্য, সে তত ঊর্দ্ধলোকের সমীপবর্ত্তী, অথবা যে যত ঊর্দ্ধলোকের সমীপবর্ত্তী, বুঝিতে হইবে, তাহার হৃদয় তত অভয়কিরণে রঞ্জিত। তুমি যখন আপনার অস্তিত্ব হারাইবার আশঙ্কা করিয়াছ, মায়া ছাড়িলে কি লইয়া থাকিবে, এ কথা যখন তোমার প্রাণে উদয় হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, তুমি ভীত হইয়াছ বা তোমার প্রকৃতিতে ভয়ের কালিমা রহিয়াছে। যখন তুমি বলিয়াছ,আমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় হউক, তবু যাহাদের দ্বারা আমি উপকৃত, তাহাদিগকে আমি হনন করিতে পারিব না—তখন তোমার প্রকৃতিতে সঙ্কীর্ণ আনন্দ হারাইবার ভীতিই অধিকতররূপে প্রকটিত হইয়াছে। তোমার প্রকৃতি ঊর্দ্ধদিক্ হইতে ফিরাইয়া নিম্ন দিকে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়াছে। তুমি অবিদ্যার আনন্দকে ভালবাসিয়া তাহার হননে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছ না। তুমি মায়ার পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়া, সেই উপকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গিয়া, অথবা সেই মায়ার কার্য্যের মোহে পড়িয়া তুমি তাহাকে ভালবাসিতেছ, সুতরাং তোমার প্রকৃতি কলুষিত। ঐ কলুষ ভয়ের লক্ষণ।

আমাদিগের প্রকৃতি সময়বিশেষে এমন অবস্থায় আসিয়া পড়ে, যখন উর্দ্ধগতির দিকে চাহিতে সে ভীতা ও সঙ্কুচিতা হইয়া পড়ে; এবং শুধু তখনই এই প্রকারের মোহাচ্ছন্ন বিচারসকল হৃদয়ে সমুত্থিত হয়। আমরা বিচারের ভান করিয়া—পাণ্ডিত্যের ছল করিয়া সময়ে সময়ে এইরূপে আপনাকে আপনি প্রবঞ্চিত করি। উহা আমরা নিজেরা বুঝিতে পারি না, কিন্তু উহার মূল কারণ যে ভয়, ইহা রঞ্জিত হইয়া পড়ে। সুতরাং তুমি যে ভয়ে যুদ্ধে উপরত হইতেছ, ইহা সিদ্ধর্ষি-দিগের চক্ষে প্রতিফলিত হইবে এবং তাঁহাদিগের অভয় দৃষ্টির পথ হইতে সাধারণ জনসংঘের ভিতর প্রবেশ করিয়া আপনি বঞ্চিত হইবে। তোমার প্রকৃতি এখনও তাঁহাদিগের সে অভয় কিরণে রঞ্জিত হইবার উপযুক্ত হয় নাই, এইরূপই তাঁহাদিগের ধারণা হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদিগকে উর্দ্ধে ধরিয়া রাখিবার স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া গেলেও এবং আমাদিগের গুরুত্ব বাড়াইয়া দিয়া আমাদিগের নিম্নগতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেও যদি কোন শক্তি উর্দ্ধ হইতে আমাদিগকে উত্তোলিত করিয়া রাখে, তাহা হইলে আমাদিগের অধঃপতন না ঘটিতেও পারে—আমাদিগের স্বস্থানে আমরা অবস্থান করিতে পারি। কিন্তু হায়! স্বধর্ম্ম ছাড়িলে আমরা চারি ধার হইতে সর্ব্বপ্রকারে আক্রান্ত হইয়া পড়িব। আমাদিগের কীর্ত্তিরূপ স্তম্ভ ভাঙ্গিবে, অকীর্ত্তির গুরুত্ব আমার ভার বর্দ্ধিত করিবে, তাহার উপর সিদ্ধর্ষিদিগের অভয়দৃষ্টির আকর্ষণ ছিন্ন হইয়া যাইবে; সুতরাং আমার পতনের প্রখরতা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

কিন্তু শুধু তাহা নহে, স্বধর্ম্ম ছাড়িলে শুধু তোমার পতনের পথ এইরূপে সুবিস্তৃত হইয়াই ক্ষান্ত হইবে না; পড়িয়াও যদি কোন গতিকে বাঁচ, এই আশঙ্কায় যেন অধর্ম্ম-রাক্ষসী তোমার ধ্বংসের আর একটি ব্যবস্থা করিয়া দিবে। সেটী নিম্নশ্লোকে ব্যক্ত।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিং ॥ ৩৬

তব অহিতাঃ শত্রবঃ বহূন্ নানাপ্রকারান্ অবাচ্যবাদান্ বদিষ্যন্তি; ততঃ দুঃখতরং নু কিং।

ব্যবহারিক অর্থ।—তোমার শত্রুরা নানাপ্রকার অকথ্য বাক্য কহিতে থাকিবে। তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে। ইহা অপেক্ষা কষ্টদায়ক আর কি আছে?

যৌগিক অর্থ।—বাক্য কি? বাক্য ভাবের অভিব্যক্তি। বাক্যশূন্য ভাব হইতে পারে না। যেখানে ভাব, সেইখানেই বাক্য। এমন কোন বস্তু মানুষ জানে না, যে বিষয় সে ভাবিতে পারে, অথচ তৎসম্বন্ধে একটী বাক্যও তাহার জানা নাই। কোন জিনিষ ভাবা অর্থে প্রাণের ভিতর অদ্বস্তুসংক্রান্ত বাক্যগুলি উদ্বোধিত হওয়া। কোন বস্তু ভাবিতেছি বলিলে এই বুঝায় যে, সেই বস্তু সম্বন্ধে কতকগুলি শব্দ উদ্দীপ্ত করিতেছি। মনে কর, আমি একটী কাল পদার্থ ভাবিতেছি। হইতেছে কি? আমার প্রাণে "কাল" এই ভাবটী ফুটিয়া উঠিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে আমার মন "কাল" এই বাক্যটি পাঠ করিতেছে। বাক্যই বাহির হইতে ভিতরে ভাব লইয়া আসে—বাক্যই ভিতর হইতে ভাব বাহিরে চালিত করে। বাক্য যদি না থাকিত, ভাষা যদি না থাকিত, জগৎ ভাবশূন্য হইত, জগদনুভূতি লুপ্ত হইত—জগতে ভাব নিরাকার হইত। আমরা বাক্যের দ্বারা ভগবান্‌কে অন্বেষণ করি। মনুষ্য-জগতের কাছে যেমন শিক্ষা করিয়াছি, জগৎ আবহমান কাল হইতে যেমন ভাবের মূর্ত্তি বাক্যের আকারে গঠিত করিয়া রাখিয়াছে, আমরা তাহারই ভিতর দিয়া তাঁহাকে না খুঁজিয়া প্রথমতঃ থাকিতে পারি না; কেন না, আমরা মনুষ্য। যেমন কাপড়ে আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া বসিয়া ঊর্দ্ধে হাত বাড়াইলে একটী বস্ত্রাবৃত হাত মাত্র পরিলক্ষিত হয়, তদ্রূপ মনুষ্যজগৎ ভাবে আবৃত থাকিয়া ভগবন্মুখী হয়; এবং ভাব-আবরণযুক্ত একটী ঊর্দ্ধগতি মাত্র পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ "নেতি নেতি"ও ভগবান্ নহে, "সোঽহং"ও ভগবান্ নহে, "শিবোঽহং"ও আমার মায়ের স্বরূপ নহে। ব্রহ্মা, শিব, হরিও ভগবান্ নহে বা ভগবানের স্বরূপ নহে; ও সকলই আমাদের ভাবের স্বরূপ—আমাদের বাক্যের স্বরূপ। প্রত্যেক জিনিষ মাত্রেই, প্রত্যেক পদার্থমাত্রেই এই এক কথা। এক পদার্থ দেখিলাম এবং চিনিলাম, বস্তুতঃ কি সেই পদার্থটি আমার পরিজ্ঞাত হওয়া হইল? তাহা নহে—আমার প্রাণে সেই বস্তু-সংক্রান্ত যত প্রকার ভাব ছিল, সেইগুলি প্রতিভাত হইল; সেইগুলি বিশেষ করিয়া দেখিতে দেখিতে তৎসম্বন্ধে আরও কতকগুলি অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্ঞান বা অজ্ঞাত ভাব প্রকটিত হইয়া উঠিবে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহাতেই সে বস্তুর স্বরূপ জানা যায় না। আমাদের হৃদয়ের গুপ্ত অপ্রকাশিত ভাবসকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে মাত্র। কোন বস্তু বিশেষ করিয়া দেখা, পরীক্ষা করা, ধ্যান করা অর্থে—আমার নিজের হৃদয়ের ভিতর দেখা, পরীক্ষা করা, ধ্যান করা। কোন বস্তুর গুণ অন্বেষণ করা অর্থে—

আমার হৃদয়ের গুণ অন্বেষণ করা। বস্তু এক দুর্জ্ঞেয় ব্যতীত কিছুই নহে। সমস্তই সেই এক দুর্জ্ঞেয়। আমার হৃদয়ও সেই এক দুর্জ্ঞেয়। যেমন শুক্তিতে বালুকণা নিক্ষিপ্ত হইলে, সেই শুক্তির শরীরের রস নির্গত হইয়া মুক্তারূপে ঘনীভূত হয়—যেমন আতসবাজীতে কণামাত্র অগ্নিসংযোগ করিলে অগ্নির তারকাপুঞ্জ দলে দলে বিকশিত হইয়া উঠে; পূর্ব্বে সেই শুক্তি বা সেই আতসবাজীতে সে মুক্তা সে তারকাপুঞ্জ ছিল,অথচ ছিল না, দুইই বলা চলে—তদ্রূপ বাহ্য জগতের কোন পদার্থ হৃদয়ে প্রতিঘাত করিলে আমারই হৃদয়ের সেই দুর্জ্ঞেয় সত্তা হইতে একটী ভাব ফুটিয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা উহার উপযুক্ত বাগ্‌দেহ রচনা করে। সুতরাং বস্তুমাত্রেরই যথার্থ স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়—আমার সেই দুর্জ্ঞেয়া মা। এইরূপ বন্ধনও যেমন একটী ভাব, মুক্তিও তদ্রূপ একটী ভাববিশেষ মাত্র। সে কথা পরে বলিব।

যাহা হউক, বলিতেছিলাম, ভাবের দেহ বাক্য; বাক্য না হইলে ভাব নিরাকার হইয়া পড়ে—জগতের সমস্ত ভাবের ও কেন্দ্রের তজ্জন্য একটী শব্দবিশিষ্ট দেহ আছে—উহার নাম প্রণব। উহাই ভাব, উহাই ভাবের প্রাণ, উহাই ভাবের আধার, উহাই ভাবের আধেয়। এই মূল ভাব, এই শব্দ সর্ব্বত্র সর্ব্ব অণুতে, সর্ব্ব পরমাণুতে প্রাণস্বরূপে অধিষ্ঠিত; সর্ব্বত্র প্রতিফলিত হইবার জন্য, সর্ব্বত্র অনুভূত হইবার জন্য, সর্ব্বত্র গোচরীভূত হইবার জন্য, সর্ব্বত্র সর্ব্বকে "এই যে আমি, এই যে আমি" বলিবার জন্য স্নেহভাববিমুগ্ধা মা আমার প্রণব আকারে কেন্দ্র রচনা করিতেছেন। বৃক্ষে পত্রে, পর্ব্বতে নির্ঝরে, চন্দ্রে কুসুমে সূর্য্যে, সাগরে বায়ুতে প্রাণে, সর্ব্বে—সর্ব্বস্থলে, মা আমার "এই যে আমি, "এই যে আমি" বলিয়া আত্ম অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছেন। যে মাকে আমার অন্বেষণ করিতেছে, তাহাকেও বলিতেছেন -"এই যে আমি"; যে অন্বেষণ করে নাই—যদি এমন কিছু থাকা সম্ভব হয়, তবে তাহাকেও বলিতেছেন, "এই যে আমি, এই যে আমি।" "এই যে আমি"ই মায়ের আমার ভাষা--মায়ের আমার ভাব; মায়ের আমার আশ্বাসবাণী—প্রণব। আমার জ্ঞানে শুধু নহে, আমার সর্ব্বাঙ্গে—তোমার প্রাণে শুধু নহে, তোমার সর্ব্বাঙ্গে—রক্ত, রস, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, স্নায়ু, প্রাণ, ভাব, সর্ব্বত্র এই শব্দ—এই আশ্বাসবাণী বিঘোষিত। তোমার বুঝা উচিত, তোমারই দেহের প্রত্যেক পরমাণু এক একটী জীব। তাহাদের প্রত্যেকের ভিতর এই মহা মাতৃ-অস্তিত্ব নিনাদিত!

কোটি কোটি প্রাণ, কোটি কোটি জীব তোমারই অভ্যন্তরে রহিয়াছে, এই মহামন্ত্র কোটি কোটি তন্ত্রীতে তোমার বাজিতেছে। এই সকল জীবপুঞ্জ তাহাদের অজ্ঞাতভাবে এই মহা অস্তিত্বের সুরে সুর মিলাইতে চলিয়াছে। তুমি এইরূপ একটী জীবসমষ্টি মাত্র। আবার তোমার মত কোটি কোটি সমষ্টিও অজ্ঞাতভাবে সেই সুরের তালে দুলিতে দুলিতে সেই মুখে চলিয়াছে; মহাসমষ্টি, মহাসংঘ মাতৃমুখে ধাবিত হইতেছে। ইহাই জীবের অবস্থান পরিপোষণ। এই জন্যই জীবের অস্তিত্ব, জগতের অস্তিত্ব—ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব। মা একমুখে আমাদিগকে ডাকিতেছেন না—মায়ের যেন আপাদ-মস্তক আমাদিগকে ডাকিতেছে। ইহাই যথার্থ বাক্য।

এই বাক্য আমাদের সংস্কারে অহর্নিশ প্রতিঘাত পাইয়া নানারূপের শব্দ-তরঙ্গ বা ভাবতরঙ্গ রচনা করিতেছে; নানা আকার পরিগ্রহণ করিতেছে—নানা ভাব রচিত করিয়া নানা দিকে পরিচালিত করিতেছে। সর্ব্বপ্রথম যখন এই শব্দ ভাবাকারে আমরা শুনিতে পাইয়াছিলাম অর্থাৎ যখন সর্ব্বপ্রথম আমাদের জীব-ভাব উন্মেষিত হইয়াছিল, তখন হইতে শুধু এই কেন্দ্রের দিক্‌নির্ণয় করিতেছি ও সেই দিকে চলিতেছি। শিশুদিগের একটি অবস্থায় আমরা দেখিতে পাই, তাহাদের আমরা আদর করিয়া ডাকিলেও, উচ্চ শব্দে আদর করিলেও তাহারা আমাদের দিকে চাহিতে পারে না, অথচ চারি ধারে মুখখানি ফিরায়; শব্দ তাহার কাণে যাইতেছে, কিন্তু কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছে, বুঝিতে পারে না। শিশুকে কোন জিনিষ ধরিবার জন্য তাহার সম্মুখে ধরিলে, সে ক্ষুদ্র করদ্বয় প্রসারিত করিয়া ধরিতে উদ্যোগ করে, কষ্টে কম্পিত করদ্বয় দ্রব্যাভিমুখে আসিতে থাকে—কিন্তু হাত দুইখানি দ্রব্য হইতে বহু তফাতে বদ্ধ হইয়া যায়—দ্রব্যটীর নিকট আসে না। কেন এমন হয়? লক্ষ্য স্থির হয় নাই বলিয়া। সেইরূপ বুঝিও, আমাদের জীবভাব উন্মেষের অর্থে—আমরা সেই মহা আহ্বান-শব্দ অস্পষ্ট ভাবে—বেসুরা, বেতাল, বিকৃতভাবাপন্ন ভাবে শুনিতেছি, এবং কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছে, তাহার কল্পনা করিয়া কাণ বাড়াইতেছি, কিন্তু নানা দিকে কার্য্যতঃ আমরা ধাবিত হইতেছি। ক্রমশঃ যত লক্ষ্য স্থির হইয়া আসে, ততই আমরা নানাত্ব ছাড়িতে ছাড়িতে একত্বের দিকে যাইতে থাকি। যখন মনুষ্য হইয়াছি, তখন বুঝিতে হইবে, আমাদের লক্ষ্য অনেক স্থির; এবং নানাত্ব আমাদের প্রায় ঘুচিয়া আসিয়াছে। এইরূপে লক্ষ্যমুখী হওয়াই প্রাকৃতিক

ধর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম। কিন্তু প্রায় হইলেও সম্পূর্ণরূপে হয় নাই। তবে আমরা এমন ক্ষেত্রে বা এমন কূলে আসিয়া পড়িয়াছি, যেখানে সেই লক্ষ্য বস্তু লক্ষ্য ও করতলগত হইবে। স্বধর্ম্ম আমাদিগকে বহুপূর্ব্বাকাঙ্ক্ষিত সেই লক্ষ্যে আনিয়া পৌছাইয়া দিবে। কিন্তু যদি এখন স্বধর্ম্ম উপেক্ষা করি—এত নিকটবর্ত্তী হইয়া যদি এখন আবার নানামুখী গতি ধরি, তাহা হইলে কার্য্যতঃ হইবে কি? পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার নানাপ্রকারে সেই মহাশব্দ বেসুরা হইয়া যাইবে; অর্থাৎ বাক্য অবাক্যে পরিণত হইবে।

যেমন সুর লক্ষ্য করিয়া বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মিত হয় এবং সে বাদ্যযন্ত্রে আঘাত করিলে সে শব্দের বাহ্যিক আকার যাহাই হউক না কেন, গভীর হউক অথবা তীক্ষ্ণ হউক—গম্ভীর হউক অথবা মৃদু হউক—বিচ্ছেদযুক্ত হউক অথবা অবিরাম হউক—বীণার মত হউক অথবা মৃদঙ্গের মত হউক, কিন্তু একই সুরমাত্র যেমন তাহাতে ধ্বনিত হয়, তদ্রূপ জীব বা আমরা যে ভাবেই থাকি না কেন—যে ভাবেই ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করি না কেন, একই সুর আমাদিগের ভিতর ধ্বনিত। বাদ্য যখন বেসুরা বাজে, তখন এ কথা বলা যায় না যে, তাহার ভিতর সুর নাই, তদ্রূপ আমরা যতই বেসুরা হই, সুর অহর্নিশ আমাদিগের ভিতর বাজিতেছে। যত আমরা ব্রাহ্মণত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি, তত যেন ঐ বেসুরা ভাব তিরোহিত হইতে থাকে, এবং ততই সুর শ্রুত হইতে থাকে। ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইলে ঐ মহাসুর বা মহাবাক্য আমাদিগের জীবভাবাপন্ন দেহে অহর্নিশ শ্রুত হইতে থাকে। স্বধর্ম্ম আমাদিগকে সেই ব্রাহ্মণত্বের দিকে লইয়া চলিয়াছে; সুতরাং সেই স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে বিমুখ হইলে, অর্থাৎ আবার জীবভাবরূপ বাদ্যযন্ত্রকে বেসুরা করিয়া বাঁধিলে সেই মহাসুর বেসুরা হইয়া বাজিবে—সে মহাবাক্য অবাক্যে পরিণত হইবে। এই জন্য ভগবান্ আদিশ্লোকে বলিলেন, সে মায়া অবাচ্যবাদ কহিতে থাকিবে।

স্বধর্ম্ম পরিত্যাগের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অনিষ্ট ইহাই। এই মহাবাক্যের সুরের দিকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা অগ্রসর হইতেছি। ব্রহ্মাণ্ডের নানারূপ শব্দ শুনিয়া শুনিয়া সে শব্দ শুনিবার অধিকারী হইয়াছি। ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র ভাববাহী বাক্য বা শব্দসকল জন্মজন্মান্তর ধরিয়া শুনিয়া শুনিয়া, শেষ এই মহাবাক্য শুনিবার উপযুক্ত ভাবে এই মনুষ্যদেহরূপ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি। এইবার সেই মহাবাক্য শুনিব। শিশু যেমন মায়ের মুখের "মা" আহ্বান শুনিয়া মাকে

"মা" বলিতে শিক্ষা করে, তদ্রূপ এত দিনের পর মায়ের সেই স্নেহময় আহ্বান শুনিয়া, তবে তাঁহাকে সেইরূপে আহ্বান করিতে শিক্ষা করিব। কিন্তু হায়! আবার এখন যদি শ্রবণ-যন্ত্র অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে, তবে জগতের শব্দকোলা-হলের অসার গর্জ্জন ছাড়া আর কিছু শুনিতে পাইব না—মাতৃ-আহ্বান কাণে পৌঁছিবে না—মাকে "মা" বলিতে শিক্ষা করিব না। আমাদিগের যে নিজের শিখিবার কোন শক্তি নাই। মা দুগ্ধ দিয়া পুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন। মায়েরই দুগ্ধ পান করিয়া শ্রবণযন্ত্র শব্দশ্রবণোপযোগী হইতেছে। আবার মাই "মা" বলিয়া ডাকিয়া আমাদিগকে মা বলিয়া ডাকিতে শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিতে হয়, তাহা ত আমরা জানি না—কি বলিয়া তাঁহাকে ডাকিলে তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, তাহা ত আমরা বলিতে পারি না—কোন্ সম্ভাষণে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলে তাঁহার (আমার ?) প্রাণের আকুল পিপাসা নিবারিত হইবে, তাহা যে আমরা এখনও শিখি নাই। যদি সে মন্ত্র শিখিতে চাও—যদি তাঁর সে আকুলতা বিদূরিত করিতে চাও, তবে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া—তুমি যখন যে দিকে মুখ ফিরাইতেছ, সেই দিকে তখনই দাঁড়াইয়া—তোমাকে কি বলিয়া ডাকিতেছেন শুন! এ বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের তুমি যখন যে দিকে মুখ ফিরাইতেছ, চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী, যে দিকে যাহা অনুভব করিতেছ, সে অনু-ভূতির ভিতর হইতে কি বলিয়া তিনি ডাকিতেছেন, শুনিবার জন্য কাণ বাড়াইয়া দাও। তুমি সে মহা আহ্বান শুনিবার জন্য অধীর হইয়া থাক। স্বধর্ম্ম ছাড়িলেই—অধীরতা কমিলেই জগতের ভাবহীন কোলাহলের ঝঙ্কারমাত্র, যাহা আবহমান কাল শুনিয়া আসিতেছ, তাহাই শুনিবে। সে মহা আহ্বান শুনিতে পাইবে না—সে মহা আহ্বান শিক্ষা করিতে পারিবে না—মাকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখিবে না। মায়ার মোহের অবাক্যই শুনিতে পাইবে। সে অবাক্যসকল আরও বর্দ্ধিত হইবে—আরও বহুরূপে ঘোষিত হইতে থাকিবে।

অর্থাৎ মনুষ্য জীবন পাইয়াছ,—মনুষ্যোচিত জ্ঞান পাইয়াছ; কিন্তু তাহার ভিতর যদি ভগবানের জন্য অধীরতারূপ স্বধর্ম্ম না থাকে, তাহা হইলে সে জ্ঞানরাশি তোমার চক্ষে অন্ধকার আরও বাড়াইয়া দিবে, তোমাকে নাস্তিকতার দিকে ছুটাইয়া লইয়া যাইবে। যত প্রকারের অবাচ্যবাদ শুনিতেছিলে, তাহা অপেক্ষা বহুতর পরিমাণে শুনিতে পাইবে মাত্র। মায়ার কুজ্ঝটিকা আরও ঘোরতর হইবে—আরও দুর্ভেদ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

বস্তুতঃ যে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছ, তাহার ভিতর এ অধীরতা না থাকিলে উহা জঞ্জালমাত্র বুঝিও, এই জন্যই এই শ্লোকে "বহূন্ বদিষ্যন্তি" কথাটী ব্যবহৃত হইয়াছে।

স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মায়াহননে নিবৃত্ত হইলে যে যে প্রকারে তোমার অনিষ্ট সাধন হইবে, তাহা বলিলাম। সুতরাং তোমার যদি আত্মমঙ্গলে যথার্থ দৃষ্টি পড়িয়া থাকে, তবে যুদ্ধে অগ্রসর হওঁয়া যে একান্ত কর্ত্তব্য, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছ। এ যুদ্ধের ফলও অমোঘ, শুধু যুদ্ধে জয়ী হইলেই যে তোমার মঙ্গল হইবে, তাহা নহে; যুদ্ধে অগ্রসর হইলেই ফল প্রাপ্ত হইবে। পরশ্লোকে ইহাই বলিতেছেন।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭

হতঃ বা স্বর্গং প্রাপ্স্যসি, জিত্বা বা মহীং ভোক্ষ্যসে; কৌন্তেয়, তস্মাৎ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ সন্ উত্তিষ্ঠ।

ব্যবহারিক অর্থ।—যুদ্ধে যদি হত হও, স্বর্গ লাভ করিবে, যদি জয়ী হও, পৃথিবী ভোগ করিবে। সেই জন্য বলিতেছি, কৌন্তেয়, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও।

যৌগিক অর্থ।—স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে কিরূপে আমাদিগের ধ্বংস ঘটিতে পারে, তাহা বুঝাইবার পর স্বধর্ম্ম গ্রহণে কি ভাবে আমাদিগের মঙ্গল ঘটে, তাহাই ভগবান্ বুঝাইতেছেন। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে আমরা আশ্রয়বিচ্যুত হই—আমাদিগের আসন ভাঙ্গিয়া যায়—আমাদিগের নিম্নগতি প্রবলতর করিবার জন্য স্কন্ধে অকীর্ত্তির ভার আরোপিত হয়—আমাদিগকে উর্দ্ধ হইতে যে আকর্ষণী শক্তি ধরিয়া রাখিতে সমর্থ, তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হই; এবং তাহার উপর নিম্নে অতল-তলে নিক্ষিপ্ত হইলেও যদি জীবিত থাকি, এই আশঙ্কায় যেন কোন অসুর আমাদিগের মহাবাক্য অবাক্যে পরিণত করিয়া, আমাদিগের সংস্কারদেহটীকে কীটজীর্ণ করিয়া দেয়। পড়িবামাত্র যাহাতে বিচূর্ণিত হইয়া যাই, যেন তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে তাহারা কৃতসংকল্প, ইহা পূর্ব্বে বিশদভাবে বুঝাইয়াছি। তার পর শুধু সেই স্বধর্ম্ম পূর্ণভাবে করিতে না পারিলেও আমাদিগের মহামঙ্গল অনুষ্ঠিত হয়। করিতে পার বা না পার, করিবার জন্য উন্মুখী হইলেও উহা মহা-

মঙ্গলপ্রদ, ইহাই এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য। এই শ্লোকে প্রথম এইটি লক্ষিত হয়—ভগবান্ বলিতেছেন, এ যুদ্ধে হত হইলেই স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে, জয়লাভ করিলে মহী সম্ভোগ করিবে।

সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে দেখিতে পাই, যেন হত হইলে অধিকতর লাভ। কেন না, ভগবান্ বলিতেছেন, হত হইলে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিবে, এবং বিজয় লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; হত হইলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে, সমগ্র স্বর্গ ভোগ হইবে না বা সমগ্র স্বর্গের উপর আধিপত্য স্থাপিত হইবে না। কিন্তু বিজয়ী হইলে সমগ্র মহীর উপর আধিপত্য লাভ হইবে, সমগ্র মহী সম্ভোগে আসিবে। উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ।

মনকে জয় করিতে গেলে, অথবা মনোময় কোষের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে হইলে যেরূপ সাধনার প্রয়োজন হয়—যেরূপ ভাবে মাতৃ-অন্বেষণের প্রবল তৃষ্ণা প্রাণের ভিতর ফুটাইয়া তুলিতে হয়—জ্ঞানের বিজলী আলোককে উপেক্ষা করিয়া, অন্ধকারের ভিতর দিয়া, নির্জ্জনতার ভিতর দিয়া, জগৎ চিরিয়া যেমন করিয়া "মা মা" করিয়া ছুটিতে হয়, তেমন করিয়া ছুটিতে গিয়া যদি কেহ বিফলমনোরথ হয়—যদি কেহ স্খলিতচরণ হয়, তাহা হইলে ভাবিও না, তাহার সে উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছে। একবার 'মা' নাম যাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে—এক মুহূর্ত্তও যার প্রাণ "মা" খুঁজিতে জগৎ ভেদ করিয়া চক্ষুঃ বাড়াইয়া দিয়াছে, নিত্য সাধনা নহে, শুধু একবার - এক নিমেষ মাত্র যার প্রাণ মাতৃঅভাবের বৃশ্চিক-দংশন বুকে সহ্য করিয়াছে, বুঝিও—তাহার জন্য ধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত। আমাদিগের ব্যষ্টি দেহে যেমন মন বা মনোময় কোষ, বিরাটের সমষ্টিদেহে স্বর্গই তদ্রূপ মনোময় কোষ। মনোজয়ে, মাতৃঅন্বেষণে বা আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে গিয়া যদি কেহ ভগ্ন-মনোরথ হয়, তাহা হইলেও বিরাটের মনোময় কোষে সে আশ্রয় পাইবে। অর্থাৎ দেহান্তে বা সাধনার মাত্রানুসারে এই দেহে থাকিয়াই সে অন্তর্জগতের ছবি দেখিতে পাইবে। সময়ে সময়ে সাধকেরা দেবলোকস্থ দৃশ্যসকল স্বচ্ছন্দে দর্শন করিতে পারেন—ভবিষ্যতের অথবা মৃত আত্মা ও মুক্ত বা সিদ্ধ পুরুষদিগের ঘটনাবলী তাঁহাদিগের চক্ষে প্রতিফলিত হইয়া উঠে, ইহা বোধ হয়, সকলেই জানেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, ঐ মনোবিজয়ে আংশিক চেষ্টাই ইহার রহস্য। সাধকদিগের এরূপ ঘটনা দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইয়া থাকেন; কিন্তু কার্য্যতঃ ইহাতে

বিস্ময়ের কিছুই নাই। সাধারণ জগতের লোকচক্ষু জগতের অতি অল্পাংশ-মাত্র দেখিতে শুনিতে পায়। সাধারণ ইন্দ্রিয় লইয়া—সাধারণ জ্ঞান লইয়া যাহা আমরা অনুভব করিতে ও শিখিতে সক্ষম হই, বুঝিও—তাহা সমুদ্রমধ্যে এক বিন্দু বারির মত। সাধারণ মনুষ্যের অধিকার ইহাই। কিন্তু যে "মা" বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার ইন্দ্রিয়সকলের কার্য্যক্ষেত্র, শিক্ষাক্ষেত্র দূর হইতে দূরতর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে! একটী মাত্র মাতৃআহ্বান—একটি-মাত্র 'মা' নামের ঢেউ ব্রহ্মাণ্ডের কত দূর অবধি যে তরঙ্গিত করিয়া তুলে, তাহা সাধারণ লোকের জ্ঞানাতীত। মাতৃনামের তরঙ্গ একটা উত্থিত হইলে, রাজাকে যেমন সম্ভ্রমে লোকে পথ ছাড়িয়া দেয়, তেমনই ভাবে পঞ্চ ভূত হইতে আরম্ভ করিয়া দেবতা অবধি সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইয়া, সে তরঙ্গকে পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তস্তলে প্রবেশ করিবার জন্য অবনতমস্তকে সে তরঙ্গের সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়ায়। আহ্বানকারীর হৃদয়ে ব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্যসকল তাই ফুটিয়া উঠিতে থাকে। ইহাই বিরাটের মনোময়-কোষে স্থানলাভ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ অবস্থা সাধনা বা সংগ্রাম আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই হইতে থাকে। জয় করিতে না পারিলেও এবং জয় করিতে গিয়া পশ্চাৎপদ হইলেও ইহার আংশিক আভাস পাওয়া যায়। মনোজয়ে অসমর্থ হইলেও এরূপ স্বর্গপ্রাপ্তি—এরূপ অপূর্ব্ব অনুভূতি তোমার অধিকারে আসিবে। যদি এত দূরও না হয়, জীবিতাবস্থাতে এরূপ অনুভূতি হইবার পূর্ব্বে যদি তোমার দেহত্যাগ হয়, তাহা হইলেও দেহান্তে বিরাটের মনোময় কোষে বা স্বর্গলোকে উপস্থিত হইয়া এইরূপ দর্শনাদি করিতে পাইবে। এ জগতে যেমন আপন অস্তিত্ব অনুভব কর, তেমনই ভাবে বা তাহা অপেক্ষা অধিক ঘনীভূত ভাবে অস্তিত্ব অনুভব করিয়া, অপূর্ব্ব অনুভূতিসকল পাইতে থাকিবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মৃত্যুর পর মনুষ্যমাত্রেই স্বর্গলোকে যায়। সাধারণ মনুষ্য সেখানে যাহা দর্শনাদি করে, তাহা স্বপ্নবৎ। অতি নিকৃষ্ট ব্যক্তি স্বপ্ন অপেক্ষাও মলিনভাবে অথবা অজ্ঞানাবস্থায় স্বর্গলোক ভেদ করিয়া যায়। সাধুদিগের জ্ঞান স্বর্গলোকে এই দেহের মত প্রবল অথবা তাহা অপেক্ষাও প্রবলতরভাবে প্রস্ফুটিত থাকে। এমন কি, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিজ্ঞানময় কোষ অবধি তাঁহাদিগের অনুভূতি অটুট থাকে।

আর যদি মনোবিজয়ে সমর্থ হও, তাহা হইলে এ স্থূল জগৎ তোমার সম্ভোগে

আসিবে—সম্পূর্ণরূপে তুমি এই পঞ্চভূতাত্মক জগৎকে সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। সাধারণ মনুষ্য যে ভাবে জগৎ ভোগ করে, ইহা উপভোগ মাত্র। শিশুকে যেমন মা দুগ্ধ পান করান বা আপনার রুচি অনুযায়ী আহার্য্য দেন, তেমনই ভাবে তোমরা জগৎ ভোগ করিতেছ মাত্র। তোমরা যখন যাহা ইচ্ছা কর, তখন তাহা পাও না। অশেষ প্রকার চেষ্টা করিয়া তবে তোমাকে জগতে একটা পদার্থ তৈয়ারী করিয়া বা সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। অনন্ত অধ্যবসায় —অনন্ত যত্ন—অনন্ত পরিশ্রমেও তোমার হৃদয়ের সকল আশা ইহ জগতে সফল হয় না। যেন কে ভিতর হইতে তোমার যেটুকু মাত্র প্রাপ্য, সেইটুকু-মাত্র দিতেছে, এইরূপ ভাবে জগদ্ভোগকে তোমরা দেখিয়া থাক। একটী পুষ্পের আবশ্যক হইলে বৃক্ষের নিকট ভিক্ষা করিতে হয়—একটু পানীয়ের আবশ্যক হইলে স্রোতস্বতীর নিকট ধার করিতে হয়—ক্ষুধাতুর হইলে প্রকৃতির অন্নভাণ্ডার কাহার গৃহে সঞ্চিত হইয়াছে, সেইখানে প্রার্থনা করিতে হয়। সহস্র সহস্র অভাবে অহর্নিশ প্রপীড়িত হইয়া রহিয়াছ—সহস্র অভাবের একটা হয় ত পূরণ হইতেছে, বাকি সমস্ত প্রাণে অতৃপ্তির অগ্নিশিখা জ্বালিয়া দিতেছে—অভাবের পীড়নে তুমি অহর্নিশ পীড়িত—জগৎ অভাবময় বলিয়া তোমার চক্ষে প্রতি-ফলিত—অভাবের তাড়নায় তুমি জর্জ্জরিত। কিন্তু যদি মনোবিজয়ে সমর্থ হও, তাহা হইলে এই স্থূল জগৎ পূর্ণভাবে তোমার অধিকারে আসিবে। চেষ্টা, যত্ন, অধ্যবসায়, এ সকলের সাহায্য তোমায় লইতে হইবে না। তোমার ইচ্ছামাত্রে —তোমার সঙ্কল্পমাত্রে সিদ্ধি ছুটিয়া আসিবে। অমাবস্যায় তুমি চন্দ্র দেখাইতে সক্ষম হইবে—মৃত তরুতে তুমি ফুল ফুটাইতে সক্ষম হইবে। তোমার ইচ্ছামাত্রে রাজার ভাণ্ডার তোমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে—তোমার স্পর্শমাত্রে পথের ধূলি আহার্য্যে পরিণত হইবে—মৃত মনুষ্য সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। বিরাটের পঞ্চ ভূত হইতে তোমার ইচ্ছামাত্রে তোমার অভীষ্ট দ্রব্য নির্ম্মিত হইবে। স্থান কালের ব্যবধান তোমার নিকট হইতে দূরে পলাইবে। তুমি একই মুহূর্ত্তে পৃথিবীর উভয় প্রান্তে ইচ্ছা করিলে বর্ত্তমান থাকিতে পারিবে—মুহূর্ত্ত মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিচরণ করিতে পারিবে—সঙ্কল্পমাত্রে এক স্থানে অদৃশ্য হইয়া অন্য স্থানে লোকচক্ষে প্রতিভাত হইবে।

এমন কত বলিব—মনোবিজয়ের ফল কত বলিব। সাধুদিগের অলৌকিক

কার্য্যাবলী দেখিলে ইহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় মাত্র। ইহার নাম মহীভোগ বা স্থূল জগৎ সম্ভোগ।

মোট কথা, মনোবিজয় করিতে গিয়া হত বা পরাভূত হইলেও দেবলোক-সকলের সন্ধান ইহ জগতে থাকিয়াই পাওয়া যায়। এবং দেহত্যাগে সেই সমস্ত লোকে অবস্থান ও দর্শনাদি করিবার শক্তি জন্মে। সিদ্ধর্ষিলোকের মহাপুরুষ-দিগেরও কৃপাদৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায়। এবং মনোবিজয় হইলে সেরূপ শক্তি ত লাভ হয়ই, তাহার উপর এই পঞ্চভূতাত্মক জগতের উপরে পূর্ব্বোল্লিখিত আধিপত্য জন্মায়। সুতরাং এ সংগ্রামের সূচনা হইতে শেষ অবধি সর্ব্বাবস্থাতেই অপূর্ব্ব লাভ।

বিরাট্ জগতের উপর এইরূপ আধিপত্য বিস্তার সাধনার যেমন একটী ফল, তদ্রূপ আপনার ক্ষুদ্র দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের উপর আধিপত্য লাভ ইহার অন্যতম ফল। সাধনার সূচনা করিয়া যদি কেহ বিজয়ী হইতে না পারে বা সাধনাচ্যুত হয়, তাহা হইলেও তাহার মনে সময়ে সময়ে অপরের চিত্তের ভাবসকল প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে এবং চিদাকাশের সন্ধান সময়ে সময়ে লাভ হয়। মনোজয় করিলে এই দেহকে এবং দেহযন্ত্রকে যথেচ্ছভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়। অর্থাৎ দেহস্থ ক্ষিতিতত্ত্বের উপর সম্যক্ অধিকার লাভ হয়। ক্ষিতিতত্ত্বের কেন্দ্র মূলাধার চক্র। সমস্ত তত্ত্বের এক একটী চক্র আমাদিগের দেহাভ্যন্তরে নিহিত। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম ও মন, এই ছয়টী তত্ত্বের কার্য্যকারী কেন্দ্রস্থলকে আমাদিগের ষট্‌চক্র বলে। ক্ষিতিতত্ত্ব হইতে আমাদের দেহের স্থূল অংশ নির্ম্মিত হয়। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমরা আমাদিগের মন অনুযায়ী দেহ রচনা করি। সুতরাং মনোবিজয় হইলে যে আমাদিগের দেহের উপর সম্যক্ অধিকার আসিবে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহাকে মূলাধারগ্রন্থি ভেদ বলে। বিভূতি-লাভ বিচারের সময় এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিব।

তাই ভগবান্ সাধনা হইতে বিরত হইলে কি কি অনিষ্ট সংঘটিত হয়, সে কথা বলিয়া, তার পর সাধনার সূচনামাত্রেই কিরূপে অলৌকিক ক্ষেত্রের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেই কথা বলিয়া সাধনায় কৃতনিশ্চয় হইতে উৎসাহ দেন। সাধক! বুঝিয়া দেখ, স্বর্গদ্বার তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত কি না? সন্দেহের মোহে অভিভূত থাকিও না—"মা মা" করিয়া ছুটিয়া চল। মুহ্যমান হইয়া পড়িয়া থাকিও না। বিচার করিয়া পা বাড়াইতে হইবে না। নির্ব্বিচারে

মাতৃঅনুসন্ধানে ধাবিত হও—নিঃসন্দেহে, অনন্ত উৎসাহে, আনন্দে প্রাণ পূর্ণ করিয়া তোমার মহাকার্য্যে অগ্রসর হও। মাতৃলাভের মহামন্ত্র গ্রহণে কৃতনিশ্চয় হও। তোমার আর কিছু দেখিবার আবশ্যক নাই।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৮

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা, লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ (চ সমৌ কৃত্বা) ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব, এবং পাপং ন অবাপ্স্যসি।

ব্যবহারিক অর্থ।—সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, এ সমস্তের দিকে না চাহিয়া, এ সমস্তকে সমজ্ঞান করিয়া যুদ্ধে উদ্যোগী হও। পাপ তোমায় স্পর্শ করিবে না।

যৌগিক অর্থ।—মাতৃ অনুসন্ধানে প্রাণ যখন উন্মুখী হইয়াছে, তখন আর তোমার জয় পরাজয়, লাভ অলাভ দেখিবার কোন আবশ্যক নাই। মাতৃহারা শিশু মা মা করিয়া যখন ছুটিতে থাকে, তখন যেমন তাহার পথের বিচার আসে না, পথ সুগম কি দুর্গম, এ সমস্ত তার প্রাণ বিচার করে না—একমাত্র মা ছাড়া তার যেমন আর কোন দিকে লক্ষ্য থাকে না, তেমনই ভাবে তুমি 'মা মা' করিয়া ছুটিতে থাক। বিচার ততক্ষণ, যতক্ষণ মাতৃ-তৃষা প্রাণে ফুটিয়া না উঠে। শুভাশুভ নির্ঘণ্ট ততক্ষণ, যতক্ষণ না প্রাণ মাতৃহারা-ভাব প্রাপ্ত হয়। যাহার প্রাণে ভগবদ্‌বিরহ অনুভূত হইয়াছে, তাহার প্রাণ আর কোন দিকে চাহে না—লাভ অলাভ, এ সমস্ত তাহার প্রাণ দেখে না—সুখ দুঃখ, এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানসিক তরঙ্গ তাহার প্রাণকে অভিভূত করে না—জয় পরাজয়, এ সমস্তের দিকে তাহার প্রাণ চাহে না; এক লক্ষ্যে—একমুখে সে দৃঢ়পদবিক্ষেপে চলিতে থাকে। তাহার চক্ষুঃ, শুধু মাকে দেখিবার জন্য চাহিয়া থাকে; তাহার কর্ণ, শুধু মাতৃ-আহ্বান শুনিবার জন্য উন্মুখী হইয়া থাকে, তাহার হস্তদ্বয়, মাতৃ-চরণ পরশের জন্য উর্দ্ধোত্তোলিত থাকে—তাহার জিহ্বায় মাতৃধ্বনি ছাড়া আর কিছুই উচ্চারিত হয় না।

সাধনাত্যাগে অনিষ্টের কথা বলিলাম—সাধনা-সূচনায় লাভের কথা বলিলাম। তোমার হৃদয়ের তেজঃ উদ্দীপ্ত করিয়া দিবার জন্য ভবিষ্যতের চিত্র আঁকিয়া দেখাইলাম। কিন্তু যে সাধক বলিয়া আপনাকে চিনিয়াছে, সাধনার দিকে যাহার লক্ষ্য পড়িয়াছে, তাহার প্রাণ ওসব দেখিতে চাহে না—সুখ-দুঃখের বশিষ্ট ভাব তাহার প্রাণকে সংঘাত করে না; লাভ অলাভ, সিদ্ধি অসিদ্ধি, এ

সব তাহার চক্ষে সমান হইয়া যায়। একমাত্র আত্মপ্রতিষ্ঠা বা মাতৃলাভই তাহার হৃদয়ের উপর আধিপত্য করে। সুতরাং তুমি ও সমস্তের দিকে চাহিও না। যথার্থ মাতৃভাব হৃদয়ে ফুটাইয়া তুলিয়া এই মনোবিজয়ে অগ্রসর হও। জানিও, এ মনোবিজয় শুধু মনের উপর আধিপত্য করিবার জন্য নহে; এ মনোবিজয় শুধু লাভ অলাভের খাতিরে নহে—এ মনোবিজয়, মাতৃচরণ পরশের জন্য—এ মনোবিজয়, মাতৃরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য—এ মনোবিজয়, সংহারিণীর সংহার-মন্ত্র ফুটাইয়া তুলিয়া তাহার অঙ্কে স্থান পাইবার জন্য। এ মনোবিজয় সংহারিণীর বিরাট্ সংহার—খেলা মাত্র।

তোমার ইহাতে পাপ নাই—তুমি ইহাতে কলুষিত হইবে না। কেন না, যাহার ভাবে তোমার প্রাণ পূর্ণ—যাহাকে পাইতে তোমার প্রাণ উদ্যোগী, তাহাকে পাপ পুণ্যের ছায়া স্পর্শ করিতে পারে না। যে মুহূর্ত্তে তাঁহার কথা প্রাণে জাগিয়া উঠে, সে মুহূর্ত্তে মনুষ্য পাপপুণ্য দ্বন্দ্বের অতীত হয়। তুমি প্রতিমুহূর্ত্তে যদি মাতৃলাভ চিন্তায় বিভোর থাক, তাহা হইলে সর্ব্বক্ষণই তুমি পাপ-পুণ্যের অতীত থাকিবে।

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা" অর্থে—সুখ দুঃখকে সমান করিয়া লইয়া। তাই যদি তুমি পারিবে, তাহা হইলে আর তোমার রণের আবশ্যক কি? যদি সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান হয়—লাভ অলাভ যদি সমান জ্ঞান হয়—জয় পরাজয় যদি সমান জ্ঞানই হয়, তাহা হইলে ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে। সমে কৃত্বা অর্থে—উভয়ের মধ্যে সম শক্তির দর্শন মাত্র। একই শক্তির তরঙ্গ—একই স্নেহের উচ্ছ্বাস—একই করুণার আলোক আমাদিগের হৃদয়ের অবস্থাক্রমে সুখ দুঃখ আদি নানাপ্রকারে সংঘাত উপস্থিত করে। সেই সংঘাতগুলি যত দিন আমাদিগের হৃদয়ে একভাবাপন্ন না হইবে, তত দিন বহুরূপের তরঙ্গভঙ্গ রচনা করিবে। আমাদিগের হৃদয় যদি একমুখী হয়, তাহা হইলে মাতৃ-স্নেহের সেই অফুরন্ত স্রোত সেই একই রূপে অনুভূত হইবে মাত্র। সুখ দুঃখাদিকে এইরূপে একই প্রকারে অনুভব করিবার জন্য হৃদয়কে একমুখী করা আবশ্যক, তাহা হইলেই সুখ-দুঃখ সমান হইয়া যাইবে। অর্থাৎ কোন ভাবের তরঙ্গই আর সুখজনক বা দুঃখজনক বলিয়া অনুভূতিতেই আসিবে না। কিন্তু ততটা সমজ্ঞান ইন্দ্রিয়াদির অনুভূতি থাকিতে আসিতে পারে না। ততটা দৃঢ়তা আমাদিগের চিত্ত এখনও পায় নাই। সুতরাং আমাদিগের পক্ষে সমান করিয়া লওয়া অর্থে—উভয়ের মধ্যে সমান জিনিষ দর্শন করিতে অভ্যাস করা। বস্তুতঃ সুখ

ও দুঃখ বলিতে "খ" বর্ণ আকাশের বৈচিত্র্য বুঝায়। অন্তরাকাশ যেখানে দুর্লভ, তাহার নাম দুঃখ এবং যেখানে অন্তরাকাশ সুলভ, তাহার নাম সুখ। অন্তরাকাশেব সঙ্কোচনই "দুঃখ" এবং প্রসারণই "সুখ"-পদবাচ্য। প্রকৃত সুখ-দুঃখ বলিতে অন্তরের সঙ্কোচ ও প্রসারকেই লক্ষ্য করা হয়। যখন উভয়ই একই শক্তির তরঙ্গভঙ্গ, তখন তদ্রূপ ভাবে দেখিলে সমজ্ঞান আসিতে পারে। সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়, এ সমস্ত স্নেহময়ীর স্নেহময় উচ্ছাস বলিয়া জানিও। যে ভাব যখন আসিবে,—জগতের বিচিত্রতা তোমার প্রাণে যখন যে ভাব রচনা করিবে, তাহাকে মায়েরই স্নেহ-তরঙ্গের রঙ্গভঙ্গমাত্র বলিয়া বুঝিও। সুখদুঃখদায়ক হইলেও তাহা প্রাণের উপর অশান্তি বিস্তার করিতে পারিবে না।

পূর্ব্বে তোমায় বলিয়াছি, যুদ্ধ না করিলে অধোগামী হইতে হইবে, তোমার শক্তির নিন্দা করিবে, অর্থাৎ তোমার শক্তিকে নিম্নে চালিত করিবে। নিন্দাকরা অর্থে—নিম্নমুখে সঞ্চালিত করা। যাহা আমাদিগের শক্তিকে নিম্নমুখী করিয়া দেয়, তাহাই নিন্দা। যাহা হউক, এইরূপে তোমার শক্তি নিম্নমুখী হইবে, এই ভয়ে অথবা যুদ্ধ একবার সূচিত হইলে পরাজিত হইলেও লাভ, বিজয়ী হইলেও লাভ, এই আশায় যে তুমি যুদ্ধ করিবে, তাহা বলা শুধু আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি ঐরূপ বিচার করিয়া যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইতে বলিয়াছি। যুদ্ধ করাই যে স্থির সিদ্ধান্ত, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান প্রাণে উদ্বোধিত করিতে বলিয়াছি। কিন্তু যথার্থ যুদ্ধে উদ্‌যুক্ত হইতে হইলে ও সব দিকে চাহিলে চলিবে না। ভাল হইবে, কি মন্দ হইবে—সুখ হইবে, কি দুঃখ হইবে—লাভ হইবে, কি অলাভ হইবে, এরূপ অসম জ্ঞান যুদ্ধার্থ উদ্যোগীর প্রাণে থাকে না।

যুদ্ধার্থ উদ্যোগী হইতে হইলে সমস্ত তরঙ্গকে একই মাতৃ-শক্তি বলিয়া বুঝিতে হয়। শুধু তাহা হইলেই পাপের হাত হইতে আমরা পরিত্রাণ পাই। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়, এ সকলের বিচার প্রাণে ততক্ষণ আসে, যতক্ষণ না আমরা কার্য্যে কৃতনিশ্চয় হই। কৃতনিশ্চয় হইবার পর, তখন সে কার্য্যের কোন অংশই আর সন্দেহজনক, দুঃখজনক বলিয়া যেমন বিবেচিত হয় না, তেমনই সাধনা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইবার পর, মাকে পাইতে হইবে, এই ধারণা বুকে দৃঢ়তর হইবার পর, সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, এ সমস্ত একই মাতৃশক্তি বলিয়া প্রাণে ফুটিতে থাকে। প্রাণ সাধনার জন্য আপনা

হইতে উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠে—সমস্ত কর্ম্মই পুণ্যময় হইয়া যায়। সেই জন্য ভগবান্ আগে সাধনায় কৃতনিশ্চয় করিবার জন্য, সাধনা না করিলে কি কি অনিষ্ট হইতে পারে, এবং সাধনার সূচনায় কি কি মঙ্গল হইতে পারে, তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন।

সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয়, এ সমস্ত মনে করিলেই সমান ভাবে দেখা যায় না—মনে করিলেই জগতের ভাবসকলকে উপেক্ষা করা যায় না—মনে করিলেই মান অপমানকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে সাধারণ মনুষ্য পারে না। যে মাতৃ-অনুসন্ধানে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে, কেবলমাত্র মাকে চাই, এ প্রতিজ্ঞা যাহার প্রাণে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে, সেই ঐ সকল ভাবকে, ঐ সকল তরঙ্গকে উপেক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এবং সে উপেক্ষা আসিবার কারণ, সমস্ত তরঙ্গই মাতৃশক্তি বলিয়া তাহার চক্ষে প্রতিফলিত হওয়া। এই জন্যই সে তরঙ্গের বাহ্যিক মান অপমানরূপ আঘাতগুলি তাহার চিত্তকে কলুষিত করে না।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে স্থূল জগৎ হইতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কল্পনাটি পর্য্যন্ত—নামটি রূপটি পর্য্যন্ত কিছুই মিথ্যা নহে। প্রত্যেক কার্য্যের—প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যেক কণাটী লইয়া দেখিলে উহাকে চিরসত্য বলিয়া চিনিতে পারা যায়। প্রত্যেক পদার্থকে বিশ্লেষিত করিয়া দেখিলে উহাকে একমাত্র নিত্যসত্য মায়ের আমার নিত্য-সত্য বিকাশ বলিয়া চিনিতে পারা যায়। মায়াবাদ এ সমস্তকে একীকৃত করিয়াও যে মিথ্যার আভাস রাখিয়া গিয়াছেন, গীতা সে মিথ্যাটুকু মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করেন না। সে কথা এখানে অবান্তর হইবে। এখানে শুধু চিত্তের ভাবসকলের সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানা আবশ্যক, যে ভাবই প্রাণে উঠুক না কেন, নীচ হইতেও নীচ, উচ্চ হইতেও উচ্চ, যে ভাবই তোমার প্রাণের উপর আধিপত্য করুক না কেন, বুঝিও—উহা তোমার জননী। প্রতি ভাবই যেখানে তোমাকে অভিভূত করিয়া ফেলে, বুঝিও—বিশ্বেশ্বরী মা আমার তোমায় ক্রোড়ে ধরিয়া তোমার জন্য সেইখানেই অমৃতের সন্ধান করিয়া দিতেছেন। যেখানে মাতৃ-অঙ্গে বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড গ্রথিত হইতেছে, সেই বিরাট্ মন্দিরের আলোকলীলা দেখাইবার জন্য তোমাকে অঙ্কে ধরিয়া নানা ভাবে ভাবময়ী হইয়া মা আমার ফুটিতেছেন। মা নিত্য-স্থিরা হইয়াও, নিত্য সন্তান-সন্নিধানে থাকিয়াও সন্তানকে উদ্বুদ্ধ করিতে ভাবরূপ নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যেন নূতন হইয়া আসিতেছেন, এই জন্যই মায়ের একটী নাম

মহামায়া। তুমি প্রত্যেক ভাবকে মা বলিয়া পরিজ্ঞাত হও, পাপ তোমায় স্পর্শ করিবে না। ভাবের বাহ্যিক ভাবাংশে মোহিত হইও না, ভাবের ভিতর মায়ে মোহিত হও—মহামায়ায় মুগ্ধ হও—মায়াতীত রূপের অধিকারী হইবে।

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥৩৯

সাংখ্যে পরমার্থবস্তুবিবেকবিষয়ে এষা তে অভিহিতা বুদ্ধিঃ জ্ঞানং সাক্ষাৎ শোকমোহাদিসংসারহেতুদোষনিবৃত্তিকারণং যোগে তু তৎ প্রাপ্ত্যু-পায়ে নিঃসঙ্গতয়া দ্বন্দ্বপ্রহরণপূর্ব্বকম্ ঈশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মযোগে কর্ম্মানুষ্ঠানে সমাধিযোগে চ ইমামনন্তরমেব উচ্যমানাং বুদ্ধিং শৃণু। তাঞ্চ বুদ্ধিং স্তৌতি প্ররোচনার্থং—বুদ্ধ্যা যয়া যোগবিষয়য়া যুক্তঃ পার্থ, কর্ম্মবন্ধনং প্রহাস্যসি।

ব্যবহারিক অর্থ।—প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকবিষয়ে তোমার নিকট এই অবধি কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তৎপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য প্রজ্ঞাটুকু জ্ঞাত হও, যাহা লাভ করিলে তুমি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

যৌগিক অর্থ।—সাধক হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য পূর্ব্বকথিত জ্ঞানগুলি স্বীকার করিয়া লইতে হয়। সাধনার দ্বারা উপলব্ধি হইবার পূর্ব্বে নিত্য ও অনিত্য, অথবা চিৎ ও অচিৎ, এই দুই প্রকারে সমগ্র তত্ত্ব বিভক্ত হইয়া প্রতিফলিত হয়। সমস্ত তত্ত্ব, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাঙ্গিয়া দুইটী স্তর-মাত্র পরিলক্ষিত হয়—নিত্য ও অনিত্য বা আত্মা ও প্রকৃতি। ভগবান্ সেই জন্য ঐ দুইটির স্থূলতঃ বিচার করিয়া বলিলেন, বস্তুতঃ উহা দুই নহে—একই। অসৎ বা অচিৎ বলিয়া পরমার্থতঃ কিছু নাই। যাহাকে অনিত্য বলিয়া বিবেচিত হয় ও যাহাকে নিত্য বলিয়া ধারণা হয়, উহার মধ্যে প্রভেদ নাই। একই তত্ত্ব সত্য ও মিথ্যা ইত্যাদি ভাবে প্রকাশিত হইতেছে মাত্র। পারমার্থিক সত্য যাহা—যথার্থ সত্য যাহা, তাহা বাক্য দ্বারা বুঝাইতে পারা যায় না। তবে সেইরূপ না বুঝিলে যে সাধনা হইবে না, এরূপ নহে। যাহার যেরূপ জ্ঞান আছে, যাহার যেরূপ ধারণা আছে, সে তাহা লইয়াই সাধনায় কৃতনিশ্চয় হউক। তাহা হইতেই সে সেই নিত্য সর্ব্বগত অব্যক্তের সন্ধান পাইবে।

যাহা হউক, যতক্ষণ একত্বে তোমার পরিণাম না হয়, ততক্ষণ নিত্য অনিত্য, এই ভাবে সমস্ত তত্ত্বকে বিভক্ত করিয়া পরিদর্শন কর, এবং আপনার মূলটুকুকে

নিত্য অপরিণামী বিশ্বাস করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হও। যেটুকু অনিত্য বলিয়া ধারণা আসিতেছে, তাহাও অনিত্য নহে, তবে তাহাতে পরিণাম দেখিতে পাইতেছ বলিয়া যদি অনিত্য ধারণা আসে, তাহাতেও ক্ষতি নাই। সমস্তে নিত্য ধারণা আসে নাই, মূলটিতে নিত্য বলিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিলেও তুমি কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিবে। শিক্ষার্থী যেমন অক্ষরাদিকে শিক্ষকের কথানুযায়ী নামরূপে বিশ্বাস করিয়া বিদ্যালাভ করিলে, তার পর অক্ষর-বিজ্ঞান বুঝিতে পারে, তদ্রূপ যতটুকুতে হউক, নিত্য অপরিণামী, এই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সাধনায় অগ্রসর হইলে তখন নিত্য পদার্থকে কার্য্যতঃ বুঝিতে সক্ষম হইবে। ব্রহ্মাণ্ডময়, চিত্তক্ষেত্রময় নানা পরিণাম এখন তোমার লক্ষিত হইতেছে, সেই সমস্তকে নিত্য বলিয়া বুঝিতে এখন পারিবে না। কিন্তু অনিত্য বুঝিলেও তোমার সাধনা করা কর্ত্তব্য; সাধনা না করিলে তোমার সে অনিত্যভাবকলুষিত প্রাণে তাহা অধঃ-পতনরূপে ফুটিয়া উঠিবে; তুমি কালসঙ্কল্পের মধ্যে থাকিয়া কালাতীত অবস্থার ধারণা করিতে পার না, সুতরাং বহু কাল, বহু জন্মাদির ভিতর দিয়া পরিভ্রমণ করিতেছ বলিয়া তোমার যে ধারণা আছে, সে ধারণার চক্ষে, আবার বহু পশ্চাতে, বহু নিম্নে তোমার গতি হইল, সাধনা না করিলে এইরূপ তোমার বোধ হইবে। তোমার প্রাণ অনুতাপের কল্পনায়, যন্ত্রণার স্বপ্নে, অধঃপতনের মর্ম্মদাহে পুড়িতে থাকিবে। আবার সাধনায় কৃতনিশ্চয় হইলেই, সাধনার সূচনা করিলেই তোমার নিত্যত্বের দিকে গতি খরতর হইতেছে বলিয়া বুঝিতে থাকিবে; সুখ দুঃখাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অনিত্যরূপে কল্পিত ভাবগুলি ক্রমশঃ সমত্বের দিকে ধাবিত হইতে থাকিবে।

তবে এই সাধনারূপ মহাকার্য্য বা স্বধর্ম্ম কি প্রকার প্রজ্ঞার সহিত করিলে তোমার বন্ধন বা ওই অনিত্য কল্পনা হইতে তুমি বিমুক্ত হইবে, তাহাই এইবার বলিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধনায় কৃত-নিশ্চয় হইলেই সুখ দুঃখাদি ভাবসকল আর প্রাণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। তুমি কৃত-নিশ্চয় হইয়া সেই প্রজ্ঞাটুকু অবগত হও।

এই অবধি যাহা বলিলাম, তাহার ভিতর সাংখ্য-মতের অবতারণা আছে, সাংখ্যের মূল তত্ত্বটুকু লইয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। সাংখ্যে মূলতঃ এই তিনটি জিনিষ প্রতিপাদ্য। প্রথম, পুরুষ বা আত্মা অপরিণামী নিত্য; দ্বিতীয় প্রকৃতি বা পরিণামী নিত্য; তৃতীয়, ঐ পুরুষ বহু। সাংখ্য আত্মা বা

পুরুষকেও নিত্য বলেন, প্রকৃতিকেও নিত্য বলেন। তবে পুরুষ অপরিণামী, প্রকৃতি পরিণামী। তবেই প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে নিত্যত্বটুকু সাধারণ। মায়াবাদ এই সাধারণ অংশটুকু লইয়া একীকরণ করিয়াছে, কিন্তু পরিণামরূপ অংশটুকু মায়ারূপে বা ভ্রান্তিরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং সাংখ্যের আত্মার বহুত্ব ভাঙ্গিয়া বেদান্তে এক হইয়া গিয়াছে। পরিণামরূপ গুণটুকু "সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে—এক প্রকার" এইরূপ ভাবে মায়াবাদে স্থান পাইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু গীতায় "নামরূপ" আকারীয় পরিণতিটুকুও সত্য বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে।

যাহা হউক, সাধারণতঃ মানুষের জ্ঞান এই সাংখ্যবাদ অনুযায়ী থাকে, অথবা না থাকিলেও আধ্যাত্মিক জগতের দিকে নিরীক্ষণ করিলে ঐরূপেই প্রতিফলিত হয়। সেই জন্যই ভগবান্ সেই প্রকার জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়াই সাধনার সূচনা করিতে বলিয়াছেন। কেন না, জ্ঞান যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সাধনার তাহাতে অনিষ্ট হইতে পারে না।

এইরূপ সাধারণ জ্ঞানের একটা স্থূল সামঞ্জস্য করিয়া, তার পর পরিণাম যে ক্ষণস্থায়ী, তাহাতে আত্মার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, আত্মা যে অজ, অব্যয়, সে দিকে লক্ষ্য বা বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলিয়া সাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আত্মা বহু বলিয়া মনে হইতেছে, প্রাকৃতিক পরিণাম বা জন্ম-মৃত্যু আদি বন্ধনরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে, হউক ; কিন্তু ঐ আত্মাকে অজ নিত্য বলিয়া ধারণা করিয়া লও। প্রাকৃতিক পরিণাম অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হইলেও, উহার অভ্যন্তর দিয়া যে স্বধর্ম্ম বা আত্মমহিমা তোমার কল্যাণের দিকে তোমায় লইয়া চলিয়াছে, সেইটুকু জানিয়া, সেই প্রাকৃতিক পরিণামকেই অবলম্বন করিয়া যে নিত্যত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাতে বিশ্বাস কর। বিশ্বাস করিয়া স্বধর্ম্ম পালনে কৃতনিশ্চয় হও। স্বধর্ম্ম পালন না করিলে, প্রাকৃতিক ধর্ম্মের ভিতরের এই মঙ্গল গতি না দেখিলে, মঙ্গলময়ী মায়ের মঙ্গল-কিরণের জ্যোতিঃ প্রাণকে আলোকিত করিতেছে, এ আদর্শ বুকের ভিতর না লইলে গতি খরতর হইবে না। প্রকৃতি নামে সম্ভাষণ কর, ক্ষতি নাই ; কিন্তু জানিও, উনি পরমাত্মার প্রকৃতি এবং তাঁহার কর্তৃত্বে, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছায় সন্দিহান হইও না। জন্ম মরণ, সুখ দুঃখ আদি যত প্রকারের মূর্ত্তি ধরিয়াই তিনি তোমার প্রাণে প্রতিফলিত হউন না কেন, তুমি তোমার সে মাতৃধর্ম্মের আদর্শ ভুলিও না, স্নেহময়ী মায়ের আদর্শ দেখিতে কখনও বিস্মৃত হইও

না। কেন না, বস্তুতঃ যে নামেই, যে প্রকার জ্ঞানেই তাঁহাকে তুমি ভাব, তাহা চিন্ময়ী মাতৃভাবাপন্না সেই একই চিরনিত্য, একই পদার্থ—সেই মা।

এই আদর্শ গঠিত করিয়া লইয়া, এই আদর্শে প্রাণ পূর্ণ করিয়া লইয়া সাধনায় কৃতনিশ্চয় হও। আত্মা বহু হয় হউক, পরিণামরূপ অংশ ও অপরিণামরূপ অংশ বিভিন্ন হয় হউক, তাহাতে তোমার সাধনার ব্যতিক্রম হইবে না। কেন না, নিত্যত্বের অপলাপ কেহ করে নাই। তোমার জ্ঞানের ভিতর ওই তিনটী স্তরের মধ্যে সাধারণ যে "নিত্য সত্য," সেইটুকু আদর্শ ধর, সেইটুকু প্রাণে প্রাণে গাঁথ, সেইটুকু উপলব্ধির জন্য সেই দিকে তোমার সাধনা চালাও বা স্বধর্ম্ম পালন কর। তোমার সাংখ্যস্তরের জ্ঞান বলে,—আত্মা বহু অথচ "নিত্যসত্য," প্রকৃতি পরিণামী অথচ নিত্য সত্য। এই নিত্য সত্য ভাব তোমার জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাতেই যখন স্বীকৃত, তখন সেইটুকুই অবলম্বন করিয়া, সেইটুকুই আদর্শ করিয়া সাধনায় উদ্যুক্ত হও। তাহা হইলেই তোমার স্বধর্ম্ম সূচনা করা হইবে।

আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, আদর্শের দিকে লক্ষ্য স্থাপন করিয়া, আদর্শের দিকে যাইতে কৃতনিশ্চয় হও। তাহা হইলেই প্রাণ সাধনায় উদ্যোগী হইবে; তাহা হইলে মা মা করিয়া প্রাণের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম প্রবাহ তাড়িতবেগে ছুটিতে থাকিবে। প্রত্যেক পরমাণু তোমার ব্যোমে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মত দপ্-দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। তোমার সর্ব্বাঙ্গ মা মা রবে সাড়া দিবে।

তুমি নিত্য, এ কথা কখনও ভুলিও না; তোমার মা যে নিত্যা, এ কথা বুক হইতে মুছিও না। সাংখ্য এই প্রকৃতিকে জড় বলিয়াছেন। আমরা সাধারণতঃ জড় বলিতে যাহা বুঝি, সেরূপ জড় বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। তবে এই যে জড়রূপে প্রতিপন্ন প্রপঞ্চ, ইহা কি? ইহাও সেই চিন্ময়ী মা। চৈতন্য যেখানে অচিদ্‌বোধময়, সেই স্থলেই জড়রূপের প্রকাশ। যেখানে চৈতন্য 'অহং' প্রভৃতি জ্ঞানক্রিয়া-প্রকাশময় বা বৈশিষ্ট্যপ্রকাশী, সেইখানেই চৈতন্য আত্মহারা, সেইখানেই চৈতন্য ক্রিয়াশক্তিরূপে বিম্বিত। চৈতন্যের ইহাই জড়ত্ব। যেখানে চৈতন্য স্বীয় কল্পনায় আত্মহারা—সেইখানেই জড়। চৈতন্য সঙ্কল্পযুক্ত হইলেই তাহার নাম শক্তি—তাহাই সৃষ্টি। তাহাতে যেখানে আত্মহারা ভাব, সেইখানেই জড়। আত্মতত্ত্ববোধের সঙ্গে চৈতন্যের জড়দর্শন লুপ্ত হয় এবং জীব স্বরূপভ্রষ্টা হয়। অথবা আত্মতত্ত্ববোধের যত বিকাশ হয়, ততই জড়াত্মক ভাবের

উপর জীবের আধিপত্য বিস্তৃত হইতে থাকে। পূর্ণ বিকাশ হইলে আপনার জড়াত্মক দেহের উপর পূর্ণ আধিপত্য লাভ হয়; তখন ব্রহ্মবোধে আত্মহারা হয় এবং বিরাট্‌ ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির সহিত একত্ব উপলব্ধি করে।

আমরা যখন কোন জিনিষকে প্রাণ দিয়া ভালবাসি, তখন তাহাতে আমরা আত্মহারা হইয়া যাই। যতক্ষণ আমরা তাহাতে আত্মহারা ভাবে থাকি, ততক্ষণ আমরা সেখানে জড়। আমাদের প্রাণ জড় ভাবে তাহাতে লাগিয়া থাকে। অন্য সহস্র শক্তির তাড়নাকে উপেক্ষা করিয়া আমাদের প্রাণ সেইটিকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে। জগতের সমস্ত পদার্থের প্রলোভন আমাদিগের সে আত্মহারা ভাব, সে জড়তা সহসা ভাঙ্গিতে পারে না। ইহা তোমরা প্রতিমুহূর্ত্তে দেখিতে পাও। জগতের খেলাঘরে যে কোন একটা তুচ্ছ পদার্থকে লইয়া তোমরা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীকে কেমন করিয়া ভুলিয়া রহিয়াছ? জান, মাতৃক্রোড়ের সুখানুভূতি অতুলনীয়। জগতে এমন কোন স্পর্শ নাই, যাহা তাহার শতাংশের একাংশ সুখ প্রদান করিতে পারে। অথচ তোমরা তোমাদের ক্ষুদ্র আনন্দে এত আত্মহারা, এত জড়ভাবাপন্ন যে, কোন প্রকারে তোমাদের সে ধারণা তোমাদের প্রাণকে সে ক্ষুদ্র আনন্দ হইতে সরাইতে পারিতেছে না। আরও ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত ধর; প্রায় সকল মনুষ্যের প্রত্যেকেরই আহার, শয়ন, কথন, গমন আদি দৈনিক কার্য্যাবলীর ভিতর এমন এক একটি সংস্কার থাকে, যাহা তাহার একান্ত প্রিয়, যাহাতে সে সম্পূর্ণভাবে আত্মহারা। সহস্র চেষ্টাতেও সে উহা ত্যাগ করিতে পারে না। কেন এমন হয়? তাহার প্রাণ তাহাতে জড়ত্ব পাইয়াছে বলিয়া। মা সন্তানকে ভালবাসে, জগতে এমন কোন পদার্থ মা খুঁজিয়া পায় না, যাহা তাহাকে পুত্রাপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণ করে। কেন?—মায়ের প্রাণগতি ওই পুত্রে জড়ত্ব লাভ করিয়াছে—ওই পুত্রে গিয়া আত্মহারা হইয়াছে। গঙ্গার যেমন জলধারা সমুদ্রে আত্মহারা হয়, মাতৃভালবাসা সেই পুত্রে তদ্রূপ আত্মহারা হইয়া তাহার গতি হারাইয়া ফেলিয়াছে, মা পুত্রে জড় হইয়াছে। আমরা যখন কোন ভাবে মগ্ন হই, তখন আমরা তাহাতে জড়ত্ব প্রাপ্ত হই। যদি আমাদের জগন্মাতার মত শক্তি থাকিত, অর্থাৎ যদি আমরা তাঁর মত বেগে আত্মহারা হইতে পারিতাম, তবে আমাদের ভাবগুলি সঙ্গে সঙ্গে জড়রূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিত, জগৎচক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

এ জগৎ মহামায়ার স্নেহের জড় বিকাশ মাত্র। এ ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক

পরমাণুটি, আমার দেহের প্রত্যেক পরমাণুটী মাতৃস্নেহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। চিন্ময়ী মা আমার স্নেহরূপিণী হইয়া জড়রূপে তোমাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। তোমার প্রত্যেক পরমাণু চৈতন্য, ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণু চৈতন্য। আপনাকে অপনার ভালবাসা বুঝাইতে গিয়া—আপনার স্বরূপ দেখিতে গিয়া এ মাতাপুত্র ভাব পরিকল্পিত হইয়াছে, এক পদার্থ দুইরূপে প্রতিভাসিত হইয়াছে। বস্তুতঃ জড় বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু নাই। তুমি অণুতে অণুতে এ মাতৃস্নেহ সম্ভোগ করিতে শিক্ষা কর। তোমার প্রত্যেক পরমাণু মায়ের স্নেহে নিমজ্জিত, এইরূপ ধারণা কর। রক্ত মাংসের মা, যাহার হৃদয়ে এই মহামায়ার কণামাত্র অধিষ্ঠিত, সে যদি সেই কণামাত্র মায়ার আবেগে পুত্রে এরূপ আত্মহারা হইতে পারে, তবে যিনি মহামায়া, মহামায়াই যাঁহার মহিমাস্বরূপ, তত মায়া বুকে লইয়া সে ব্রহ্মাণ্ডের মা কতটা আত্মহারা হইতে পারে, কতটা জড়ত্ব পাইতে পারে, ভাবিয়া দেখ। তোমার রক্তমাংস-গঠিত মা এক বিন্দু মায়া বুকে ধরিয়া, তোমার জন্য যদি সমস্ত জগৎকে উপেক্ষা করিতে পারে, তোমার সৌন্দর্য্যে যদি অন্ধ হইতে পারে, তবে মহামায়া স্বয়ং তোমাতে মাতৃস্নেহে কতটা অন্ধ, একবার কল্পনা কর! এ ছবি একবার ভাবিয়া দেখ। স্নেহোন্মাদিনী এলোকেশীর পুত্র বুকে ধরিয়া এ উন্মাদনার ভাব একবার প্রাণ ভরিয়া দেখ। তোমার সমস্ত ঘোর ছুটিয়া যাইবে—তুমি আপনাকে মায়ের ক্রোড়ে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইবে।

তোমরা মায়া কথাটী লইয়া বড় গোলে পড়িয়া যাও। মায়া অর্থে—সাধারণতঃ তোমরা ভ্রান্তি কথাটী ধরিয়া লও। ভগবান্ শঙ্করের বেদান্তভাষ্য ইহাই শিখাইয়া গিয়াছে। দেশের উপর এই ভাবটী প্রবল আধিপত্য করিতেছে। এই সংস্কার দেশে বদ্ধমূল। কিন্তু এ ভ্রান্তি যে কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর না। জ্ঞানের তীব্র আলোক বিকীর্ণ করিতে গিয়া শুধু তেজের সহায়তা গ্রহণ করিয়া, শঙ্কর সূর্য্যের মত উত্তাপ দেশে ছড়াইয়া গিয়াছেন। মাতৃ-দুগ্ধ পানে পুষ্ট বলীয়ান্ পুত্র, মাকে যাহারা শুধু স্বার্থসিদ্ধির জন্য উৎপীড়িতা করে, কর্ম্মফলরূপ স্বর্গাদি লাভই যাহাদের চরম লক্ষ্য, মাতৃ-ঐশ্বর্য্যই যাহাদিগের তস্করবৎ উদ্দেশ্য, তাহাদিগের দমনের জন্য তাহাদিগের সেই সকল ঐশ্বর্য্যকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। ঐন্দ্রজালিক যেমন নানাবিধ দ্রব্য করতল হইতে বাহির করিয়া দর্শকবৃন্দের হাতে দেয়, এবং দর্শকবৃন্দ সেই সমস্ত

বস্তু লইয়াই মুগ্ধ হয়, ঐন্দ্রজালিকের দিকে চাহিয়া দেখে না ; অজ্ঞানমুগ্ধ কর্ম্মানুরাগীদিগের তদ্রূপ ব্যবহার রোধ করিতে মা আমার শঙ্কররূপে "কিছু নাই," "আমি আছি" বলিয়া একটী হাততালি দিয়াছেন। অমনই সমস্ত ভ্রান্তি বলিয়া দর্শকবৃন্দ বুঝিয়াছে। আবার "কিছুই নাই" বলিয়া যে সকল শূন্যবাদী পূর্ব্ব হইতে চীৎকার করিতেছিল, ঐ হাততালিতে 'আমি আছি" এই কথা ঐন্দ্রজালিকের দিকে তাহাদের লক্ষ্য ফিরাইয়া দিতেছে। এইরূপে শূন্যবাদী ও খণ্ড কর্ম্মফল-বাদীকে পূর্ণবাদের দিকে এক হাততালিতে ফিরাইয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ঐন্দ্রজালিকের মোহন-মন্ত্রে শূন্যবাদীরা তাহার অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছিল, ঐন্দ্রজালিকের স্বর্গাদি ফল বা যাদুদ্রব্যসকলের মোহে খণ্ড কর্ম্মবাদীরা আপনা-দিগকে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাই ঐন্দ্রজালিক শঙ্করবেশে এক হাততালিতে উভয়ের দৃষ্টি আপনাদিগের দিকে ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বুঝিও, বিচাররূপ রণ-প্রাঙ্গণে মায়াই অস্ত্ররূপিণী হইয়া শঙ্করকে ঐরূপে রণবিজয়ী করিয়াছেন মাত্র। রণের সময় মায়ের আমার ঐ রণ-মূর্ত্তি, ভোগের সময় নহে। মায়ের উহা রণমূর্ত্তি – ভোগমূর্ত্তি নহে।

মায়া অর্থে ভালবাসা। মহামায়া অর্থে বিরাট্ ভালবাসা। প্রপঞ্চ অর্থে ভ্রান্তি বুঝিও না, ভালবাসা বুঝিও। যখন তুমি কাহাকেও ভালবাস, তখন তোমার সমস্ত মূর্ত্তি যেমন ভালবাসাময় হইয়া উঠে, এ সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার তদ্রূপ মায়ের আমার মহামায়া বা ভালবাসাময় মূর্ত্তি। তোমরা আপনাদিগকে অনিত্য ভ্রান্তিতে বদ্ধ আছ বলিয়া মনে করিও না, মায়ের ভালবাসার অঞ্চলে বিজড়িত, এইরূপ ভাব। তোমাদের অঙ্গে লৌহ-নিগড় বদ্ধ নহে, মায়ের আলিঙ্গনের কোমল পীড়নে তোমরা পীড়িত। তোমরা মায়ের মুখের দিকে চাহ না, নিম্নদিকে চাও, বহির্দ্দিকে চাও, সেই জন্য তোমাদের এত শিরঃপীড়া হয়—সেই জন্য তোমরা সত্য মিথ্যা, ভ্রান্তি অভ্রান্তি, নিত্য অনিত্য, ইত্যাদি ব্যোমতরঙ্গসকল প্রত্যক্ষ কর ; যেগুলি তোমার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অপসারিত হয়, সেগুলিকেই অনিত্য বলিয়া তোমাদের ধারণা হয়। যখন তোমরা গুণাতীত অবস্থায় যাও, তখন তোমরা গুণসকলকে মিথ্যা বলিতে কুণ্ঠিত হও না। যখন গুণের মধ্যে দৃষ্টি থাকে, তখন নির্গুণ অবস্থাটী উপলব্ধি করিতে পার না। জানিও, এ উভয় অবস্থার কোনটিও পূর্ণাবস্থা নহে। উভয়ই অবস্থাবিশেষ মাত্র। মায়াই নির্গুণরূপে তোমায় উপলব্ধি করায়—মায়াই সগুণরূপে তোমায় বিস্মিত করায় ;—মহামায়াই মুক্তি-

রূপে ফুটিয়া উঠে, তুমি ভাব—মুক্ত। মহামায়াই বন্ধনরূপ কল্পনা করে; তুমি ভাব—বদ্ধ। ভালবাসার সমুদ্র মা আমার যে কি, সে দিকে চাহ না, অবস্থাগুলির দিকে তোমরা চহিয়া থাক। তোমাদের কোন্ কথাটা ঠিক? দেখ, সাধারণতঃ তোমাদের শির যে দিকে থাকে, সেই দিক্‌টিকে তোমরা উৰ্দ্ধদিক্ বলিয়া অভিহিত কর। দিবাভাগে আকাশের যে দিক্ তোমরা উৰ্দ্ধ বল, নিশাকালেই সেই দিক্‌টাই তোমরা নিম্ন বল। তুমি ভারতে বসিয়া বা পৃথিবীর এক প্রান্তে বসিয়া যে দিক্‌টাকে যে মুহূর্তে উৰ্দ্ধদিক্ বলিতেছ, আমেরিকা বা পৃথিবীর অপর অংশে বসিয়া তোমারই মত মনুষ্য সেই দিক্‌টাকেই সেই মুহূর্তে নিম্ন দিক্ ভাবিতেছে। অবস্থার ধান্ধার দিকে চাহিলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। তোমরা আপন আপন অবস্থার চক্ষে মাকে দেখ, মায়ের চক্ষে আপনাকে দেখ না। কাহারও স্বরূপ অবগত হইতে হইলে আপনার চক্ষে দেখিলে চলে না। তাহার চক্ষে তাহাকে দেখিতে হয়, তাহার অবস্থার ভিতর নিজেকে কল্পনা করিয়া লইয়া, তাহার অবস্থার ভিতর দৃষ্টি চালাইয়া দিয়া, তাহার অবস্থায় আপনি দাঁড়াইয়া, তবে তাহাকে বুঝিতে বা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। তোমরা মাকে আমার আপনার চক্ষে অহর্নিশ দেখিতে চেষ্টা কর। আপনাদিগের ক্ষুদ্র জীবনগতির মাপকাঠি দিয়া মায়ের অবস্থা-সকলের পর্য্যালোচনা করিলে ঐরূপই ঘটিয়া থাকে। উৰ্দ্ধ অধঃ বলিয়া বস্তুতঃ যেমন একই ক্ষেত্র আমাদিগের অবস্থার তারতম্যে অভিহিত হয়, বিশাল ব্যোমমণ্ডল যেমন ঐরূপ দিক্-কল্পনার ক্ষেত্র মাত্র, তেমনি এ ব্রহ্মাণ্ড মহামায়ার স্নেহভরা হৃদয়ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছু নহে। নিত্য অনিত্য, সত্য মিথ্যা, এইরূপ নানা কল্পনায় মাতৃ-স্নেহই কল্পিত হয়। তুমি স্নেহ-সমুদ্রের যে দিক্‌টাকে আপন অবস্থানুসারে নির্গুণ বলিতেছ, অপর একজন সেই স্নেহ-সমুদ্রের সেই দিক্‌টাকেই সগুণ বলিতেছে। উৰ্দ্ধ অধঃ যেমন একই ব্যোম, সগুণ নির্গুণ, সত্য মিথ্যা বা নিত্যা-নিত্য সেইরূপ একই স্নেহময়ী মা।

তাই বলিতেছিলাম, মহামায়া মাকে আমার—মায়াতীতারূপে যিনি অদ্বৈত-বাদীর চক্ষে প্রত্যক্ষীভূত হয়েন, সেই মাকে আমার—মায়ামণ্ডিতা বলিয়া যিনি দ্বৈতবাদীর চক্ষে উদ্ভাসিতা হয়েন, সেই মাকে, সেই মায়াকে তোমরা অনিত্য, ভ্রান্তি, অজ্ঞান বলিও না। উহা অজ্ঞান নহে, ভালবাসিয়া অজ্ঞান; উনি জড়

নহেন, ভালবাসিয়া জড় ; উনি তুই নহেন, ভালবাসিতে গিয়া তুই। সে ভালবাসা যেখানে তোমাদিগের দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হইতেছে না, সেইখানেই তোমরা ভ্রান্তি নাম দিতেছ—মায়ের অস্তিত্ব অপলোপ করিতেছ, মায়ের ক্রোড়ে শুইয়া, মায়ের দ্বারা পরিধৃত হইয়া, সেই মাকেই অবজ্ঞা করিতেছ, সেই মাকেই রাক্ষসী বলিতেছ, সেই মাকেই পদতলে নিষ্পেষিত করিতে উপদেশ দিতেছ। "কিছু নাই—প্রপঞ্চ মায়া মাত্র, উহা স্বপ্ন—উহাকে বিচারের পদতলে ফেলিয়া বীরের মত দাঁড়াও।" মায়ের অঙ্কে থাকিয়া যে এত বড় কথা বলে, তাহাকে অন্য অবস্থা হইতে অকৃতজ্ঞ দেখা যায়। মাকে যে রাক্ষসী বলে, তাহার জিহ্বায় উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা বিদ্ধ করা উচিত—যে মিত্রভাবে সাধনা করে, তাহার হৃদয়ে এইরূপ ধারণা আসিয়া পড়ে। কিন্তু কার্য্যতঃ আমাদের বলিবার কিছু নাই। কেন না, স্নেহময়ী মা আমার তাঁহার প্রয়োজনানুযায়ী তাহাকে দিয়া ঐরূপ বলাইতেছেন মাত্র। সুতরাং তাহার অবস্থার পক্ষে উহা ঠিক। উহা শত্রুভাবের সাধনা। সে কথা পরে বলিব। মায়ের স্নেহের আমার ব্যতিক্রম কোথাও নাই। যাহাদিগের ধারণা যেরূপ, তাহাদিগের বুঝা উচিত, কে তাহাদিগের মুখ দিয়া ঐরূপ কথা বাহির করিতেছে। সে কি জ্ঞান নহে? জ্ঞান কি—সে কি মহাশক্তি নহে? মহাশক্তি কি—সে কি মায়া নহে? মায়া কি—সেই জ্ঞান, সেই শক্তি কি, তার আদরের, তার প্রিয়, তার প্রাণের একমাত্র সেই সময়ের উপাস্য নহে? একই সময়ে সে যখন সেই জ্ঞানের পূজা করিতেছে—সেই সময়েই সেই জ্ঞান দিয়াই, যেখান হইতে সে জ্ঞান অন্যরূপে মূর্ত্ত, সেইখানেই পদাঘাত করিতেছে। ইহারই নাম জগতে মত-স্থাপন! মাতৃবক্ষে থাকিয়া মায়ের এক চরণে পুষ্পাঞ্জলি, অন্য চরণে লগুড়াঘাত, ইহাই জগতের বাদপ্রতিষ্ঠা! ইহা লইয়াই ধর্ম্মবীর-সকলের এত গৌরব! তাই মা আমার হাসিয়া অধীরা। তাই মায়ের আমার মুখখানি হইতে হাসির রেখা নিমিষের জন্য অন্তর্হিত হয় না। শিশুদিগকে এইরূপ ক্রীড়া করিতে দেখিয়াই মা আমার স্মেরাননা!

তবে এইরূপ করিতে করিতেই বালক উভয় চরণেরই বৈশিষ্ট্য ভোলে ; সগুণ নির্গুণ, সত্য মিথ্যা, জ্ঞান অজ্ঞান, এই উভয় পদেই তখন শিশু পুষ্পাঞ্জলি দেয়, উভয় চরণ ধরিয়াই, শিশু তখন মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া পদতলে লুটালুটি করিতে থাকে ; তখন শিশু সব ভুলিয়া যায়—তখন শিশু ভোলানাথ হয়—বিশ্বেশ্বর হয়—চক্ষু খুলিয়া যায়—ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দে আনন্দের উচ্ছ্বাস ফুটিয়া

উঠে, মায়ের চরণ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। "মা" "মা" করিয়া শিশু আপনাকে হারাইয়া ফেলে। যে, যে চক্ষু দিয়াই দেখুক—মা ভিন্ন কাহাকেও কেহ কোথাও কখন দেখে নাই!

তাই আবার বলি, মায়া অর্থে—ভ্রান্তি বুঝিও না। উহা মতবাদ। যে যাহা বলিবে, সকল কথার সকল মতের মূল অর্থ সেই মা বুঝিবে। লোকে এইটুকু করে না বলিয়া কোন মতেরই ভিতর হইতে মূল মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। দেখ, শঙ্কর বিশাল অদ্বৈত-জ্ঞানে জগৎ উজ্জ্বল-কিরণ-জ্বালাময় করিয়া যাইবার পর, মহাপ্রভু চৈতন্য, প্রেমের তরঙ্গে—প্রাণের তরঙ্গে কেমন সে দেশ প্লাবিত করিলেন। সর্ব্বস্ব মায়ে সমর্পণ করিয়া—প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া জ্যোতির্ম্ময় মাতৃমন্দিরের সম্মুখে দেশকে লইয়া গিয়া উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা মাতৃ-অঙ্গে মিলাইয়া গেলেন। তাঁহাদিগের সে আলোকমন্দির সম্ভোগ হইল। কিন্তু সহযাত্রীরা আলোকের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, আলোকের দিকে চাহিয়া না থাকিয়া, আপনাদিগের দিকে চাহিল। মায়া, অনিত্য, মিথ্যা অথবা পাপ তাপ যন্ত্রণা ইত্যাদি সংস্কাররূপ আপনাদিগের পরিচ্ছদের দিকে তাহাদের দৃষ্টি ধীরে ধীরে নমিত হইল। তাহারা সে আলোক অপেক্ষা আপনাদিগের মতকে ভালবাসে—দেখিল, তাহাদের পোষাক মলিন, ছিন্ন, শত গ্রন্থিযুক্ত পোষাক। আর আলোকের নিকট যাইতে পারিল না। "আমি পাপী," "আমি তাপী," "আমি দীন হীন," অথবা "জগৎ মিথ্যা—কর্ম্ম মিথ্যা" আজ তাই কণ্ঠে কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত। আপনার পোষাক দেখিতেই কাঁদিয়া আকুল!

কোন লোক বরযাত্রিরূপে একবার তাহার প্রতিবাসীর পুত্রের বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। বরের শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে যখন সে যাইতেছিল, তখন অনুজ্জ্বল আলোকে তাহার আপন পরিচ্ছদের দোষ সে তত দেখিতে পায় নাই। গৃহ হইতে বহির্গত হইবার সময় যদিও সে জানিত যে, তার পোষাক ঈষৎ মলিন, তবু এক প্রকারে চলিয়া যাইবে, এইরূপই সে মনে করিয়াছিল। তার পর যখন বিবাহ-বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন সে সভার আলোকমালার তীব্র উজ্জ্বল আলোকে সে আপনার দিকে চাহিয়া দেখে, তাহার পরিচ্ছদ অতিরিক্ত মলিনরূপে প্রতিফলিত হইতেছে। সকলের পোষাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার, তাহার পোষাক বড় মলিন। পোষাকের মলিনত্ব আলোকের উজ্জ্বলতায় স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে। তখন তার আর সে সভা দর্শন করা হইল না—সে আপনার

পোষাক ঢাকিতে বাহিরে বাহিরে লুকাইয়া ঘুরিতে লাগিল। পোষাক—পোষাক করিয়া আপনাকে শত ধিক্কার দিতে দিতে অশান্তিপূর্ণচিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

আজ মনুষ্যকুলকে সেইরূপ ব্যবহার করিতে দেখিতে পাইতেছি। প্রপঞ্চ মিথ্যা, এইরূপ ধারণাবদ্ধ জীবের হৃদয়ে মহাপুরুষের প্রেমের বন্যা যখন লাগিল, তখন প্রেমিক ভাসিয়া চলিয়া গল, কিন্তু যে সে প্রেম পায় নাই—সে সেই মিথ্যার আবর্জ্জনা বুকে লইয়াই আবদ্ধ হইয়া রহিল। মিথ্যাই সত্যরূপে তাহাকে ধরিয়া রাখিল। "আমি দীন হীন, আমি মহাপাপী, আমি হেয়, তৃণাপেক্ষা তুচ্ছ," এই কথা বলিতেই তাহাদিগের অনুকরণ-করা প্রেম ফুরাইয়া যাইতেছে – সে মহাপুরুষ যে প্রাণের আলোক-তরঙ্গ সম্মুখে ধরিয়া গিয়াছেন, সহযাত্রীরা সে আলোকে আপনাদিগের পোষাক দেখিতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে মহাপুরুষের মত সে আলোকে—সে অমৃত-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িতে কেহ পারিতেছে না। সভা সন্দর্শন হইতেছে না, পোষাক পরিদর্শন হইতেছে মাত্র!

এইরূপই ঘটিয়া থাকে। পরের মতে কাজ করিতে গেলে এইরূপই সংঘটিত হয়। শ্রীশঙ্কর গিয়াছেন—সে তেজ কয় জন হৃদয়ে ধারণ করিতে আজ সক্ষম? কয় জন কার্য্যতঃ তাঁহার শক্তিতে উজ্জীবিত? তাঁহার মত-রূপ খোলসটুকু লইয়া দম্ভে শঙ্কর সাজিতেছে। শ্রীচৈতন্য গিয়াছেন—কয় জন প্রেমে তাঁহার মত আত্মহারা—কয় জন তাঁহার মত আত্মসমর্পণে কৃতসঙ্কল্প। সকলেই তাঁহার খোলস পরিতে ব্যগ্র।

তাই বলি, যখন তুমি "সোঽহং" বল, "প্রপঞ্চ মিথ্যা" বল, তখন "স" ভুলিয়া, মাতৃ-পীড়করূপে প্রতিপন্ন হও। যখন "দীনহীন, পাপী তাপী" বল, তখন আত্মপ্রবঞ্চকরূপে প্রতিপন্ন হও। কিছু বলিতে হইবে না। খোলসের দিকে চাহিও না। শঙ্করের প্রাণ লও—মহাপ্রভুর প্রেম লও। শঙ্করের তেজে দণ্ডায়মান হও—চৈতন্যের প্রেমে প্রেমিক হও। যদি দেখিতে চাহ,—তাঁহাদিগের স্বরূপ দেখ—তাঁহাদিগের পোষাক লইয়া গোলমাল করিও না। তাঁহাদের মত দেখিতে যাইও না। আগে টানে পড়িয়া টান অনুভব কর, তার পর বলিও। আগে মায়ের বা মায়ার পূজা কর—তার পর বর পাইয়া তোমার যথার্থ মত ফুটিয়া উঠিবে। তুমি কি অবলম্বন করিয়া কোন্ মতে চলিতেছ, বুঝিবে।

এইরূপ মায়ের পোষাক লইয়া আগে গোলমাল করিও না—আপনার

পোষাক লইয়া আগে বিমনা হইও না। জলও ভাসাইয়া লইয়া যায়, বায়ুও উড়াইয়া লইয়া যায়; তোমরা জল কি বায়ু, বিচার করিতে বসিও না। তাহাদের সেই টানটী লক্ষ্য কর। মাকে টানিয়া বুকে লইয়া আপনি মা হও; অর্থাৎ শঙ্করের মত সোঽহং জ্ঞানময় হও। অথবা আপনাকে মায়ে ঢালিয়া দিয়া মায়ে মিলাইয়া যাও—বা শ্রীচৈতন্যের মত আত্মনিবেদন কর—একই কথা। শঙ্কর চৈতন্য একই—নির্গুণ সগুণ একই—সত্য ভ্রান্তি একই—তুমি মা বলিতে মত বিস্মৃত হও, তখন বুঝিবে।

সাধকের পক্ষে ভ্রান্তিযুক্ত অর্থে—আপনাকে ভুলিয়া যাওয়া, আত্মহারা হইয়া ভ্রমণ করা। ভ্রান্তি আত্মহারা করে! মাতা পুত্রে আত্মহারা হক—পুত্র মায়ে আত্মহারা হক, মা আমার ভ্রান্তিময়ী। ভ্রান্তিই যদি জগৎকারণ হয়, তবে এ ভ্রান্তি অমূল্য! এ ভ্রান্তি শুধু মাতা-পুত্রের ভোগ্য। এ ভ্রান্তি দেবতার ভোগ। মায়াবাদ এ ভ্রান্তিরই অপব্যবহার। এ ভ্রান্তিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সন্ত্রাসে পথ ছাড়িয়া দেয়। মা ভ্রান্তিময়ি! তবে একবার আয় মা—এই কোটি কোটি পুত্রকে এক ভ্রান্তিতে ডুবাইয়া, আপনি তাহাদের সঙ্গে ভ্রান্তিতে ডুবিয়া, মা মা করিয়া ভ্রান্তির ব্রহ্মাণ্ড-ভেদী ধ্বনি ভিতরে যেমন করিয়া শুনিতেছিস্, তেমনি করিয়া বাহিরে একবার শুনিতে দে মা! একবার মা মা রবে মনুষ্য-জগতের শ্রবণ-কুহর পূর্ণ করিয়া দে ভ্রান্তিময়ি! তোর ভ্রান্ত পুত্র ভ্রান্ত ধারণায় বিভ্রান্ত হইয়া তোর ভ্রান্তিতে আপনাকে হারাইয়া ফেলুক!

আমরা মূল কথা হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। মায়া সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় ইহা বিশদভাবে বলিব। এখন জীবসকলে যে বহুভাব আছে, সৃষ্টি সম্বন্ধে যে প্রকৃতি ও পুরুষ জ্ঞান আছে, যে জড়গুণ ও জড়াতীত চৈতন্য জ্ঞান আছে, তাহা লইয়াই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে যেরূপ প্রজ্ঞার সহিত কার্য্য করিতে হয়, তাহাই বলিতেছি। সেই প্রজ্ঞাটুকুর কথা ভগবান্ পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকের ভিতর আভাষ দিয়াছেন, এবং পর শ্লোকগুলিতেও আভাস দিবেন। সেটী স্থূলত: আর কিছুই নহে, ভগবানে বুদ্ধিযুক্ত হওয়া—বুদ্ধির দ্বারা মাকে জড়াইয়া ধরা। তোমরা এখন ভেদ বুদ্ধি লইয়া আছ, সুতরাং সেই সেই ভেদ-বুদ্ধির সাহায্যেই ধরিতে হইবে। অর্থাৎ এখন তোমরা প্রত্যেক জিনিষকে বিভিন্ন বিভিন্নরূপে দেখিতেছ, পরমার্থতঃ বিভিন্ন না হইলেও বিভিন্নরূপে একই জিনিষ তোমাদের চক্ষে প্রতীয়মান হইতেছে—একই শক্তি বিভিন্নরূপে

তোমাদের হৃদয়ে নাচিতেছে—একই মা আমার বিভিন্ন বিভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তোমায় বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিতেছে। তুমি সেই প্রত্যেক ভিন্ন শক্তি বা ভাবটীকে মাতৃ-বুদ্ধির দ্বারা জড়াইয়া ধর। এখন বৃক্ষ লতা, চন্দ্র সূর্য্য, আকাশ, মনুষ্য পশু, এ সকল বিভিন্ন রূপ তোমার চক্ষে প্রতিফলিত না হইয়া ছাড়িবে না। এখন কাম ক্রোধ, লোভ মোহ, ভক্তি প্রেম, স্নেহ ভালবাসা, এই সকল বিভিন্ন ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া মা আমার আসিতেছেন এবং আসিবেন। এখন কাম তোমায় অভিভূত করিবে, ক্রোধ তোমার বুদ্ধি ধ্বংস করিবে, মোহ তোমায় আচ্ছন্ন করিবে, ভক্তি তোমায় বিগলিত করিবে—স্নেহ তোমায় লৌহ-নিগড়বৎ জড়াইয়া ধরিবে। এখন কর্ণ, শব্দ বলিয়া মাকে আনিবে—জিহ্বা, রস বলিয়া মাকে আনিবে। এ সকলের দ্বারা বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবে তোমায় এখন অভিভূত হইতেই হইবে। ভগবান্ বলিতেছেন, যখন আসিব, তখন ত তোমাকে মুগ্ধ করিবই, কিন্তু আসিয়া চলিয়া যাইবার পর যে মূর্ত্তিতে আসিয়াছিলাম, যখন আবার সেই মূর্ত্তিটী স্মরণে আসিবে, তখন আমিই সেই মূর্ত্তিতে আসিয়াছিলাম, এই বুদ্ধি বুকে ফুটাইয়া তুল। ক্রোধ আসিয়া যখন তোমার বুকে আধিপত্য করিবে, তখন ত অভিভূত হইবেই, কিন্তু তার পর যখন সেই ক্রোধের কথা মনে পড়িবে, তখন ভাবিও, মা-ই আমার ঐ মূর্ত্তিতে আসিয়াছিলেন। কাম আসিয়া যখন চিত্তক্ষেত্রকে উদ্রিক্ত করিবে, তখন ত তুমি অন্ধ হইবেই, কিন্তু যখন সেই কাম পাছু ফিরিবে, তখন মা'ই আমার ঐ মূর্ত্তিতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম কর। ছদ্মবেশিনী যত রকম ছদ্মবেশে তোমায় নাচাইবে, সে ছদ্মবেশিনী চলিয়া যাইবার সময় তাহার পশ্চাতে মা বলিয়া প্রণাম করিও। যে ভাব ইন্দ্রিয়সকল বহন করুক না কেন, যে ভাব হৃদয়কে বিচলিত করুক না কেন, তুমি বুদ্ধির দ্বারা এই অভ্যাস কর, প্রত্যেকটীকেই যেন অন্ততঃ চলিয়া যাইবার পরও একবার মা বলিয়া পূজা করিতে পার। ছদ্মবেশিনীর পশ্চাতে পশ্চাতে এইরূপ প্রণাম কর—চলিয়া যাইবার পরও তাহাকে এইরূপে চিন। বুকের কবাটে ধাক্কা মারিয়া অপসারিত হইবার পরও মা বলিয়া তাহাকে সম্ভাষণ কর। দেখিবে, ছদ্মবেশিনী আর বহু দিন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবে না, হাসিয়া অচিরে একদিন তোমার ললাট চুম্বন করিবে। কাম আসে আসুক, তুমি পরক্ষণেই বল—'জয় মা'; ক্রোধ আসে আসুক, তুমি পরক্ষণেই বল—'জয় মা'; ভক্তি আসে আসুক,

তুমি পরক্ষণেই বল 'জয় মা'; বিবেক আসে আসুক, তুমি পরক্ষণে বল —'জয় মা'; চন্দ্র সূর্য্য, আকাশ পাতাল, অন্ধকার আলোক, দ্বেষ হিংসা, স্নেহ প্রেম, যাহা আসে আসুক, তুমি পরক্ষণে কেবলমাত্র 'জয় মা' 'জয় মা' বলিতে থাক। বিজয়া মা আমার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তিতে—স্থিরা সনাতনী মূর্ত্তিতে তোমার অবসাদ দূর করিয়া দিবেন।

তোমরা প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি লইয়া মাথা ঘামাও; তোমরা গুণ, মায়া, প্রপঞ্চ ইত্যাদি হইতে দূরদেশে অবস্থিত কোন এক জিনিষকে ধরিয়া গুণাতীত হইতে চেষ্টা করিয়া থাক; তোমরা উপস্থিত অন্ন পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত অন্নের জন্য প্রয়াস কর। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, আগে এইরূপে বুদ্ধির দ্বারা আমাতে যুক্ত হও। যাহাকে খুঁজিতে চেষ্টা করিতেছ, তাহার স্বতন্ত্র গৃহ নাই, অথবা স্বতন্ত্র গৃহ থাকিলেও তাহার সে গৃহে সন্ধান করিয়া যাইবার প্রয়োজন এখন নাই; সে তোমার দ্বারে প্রতি মুহূর্ত্তে আসিতেছে, তুমি আপনার দ্বারপ্রান্তে তাহাকে ধরিবার জন্য উদ্যোগী থাক। তুমি যেন তোমার গৃহে বসিয়া আছ, আর মা যেন ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া তোমার দ্বারে আসিতেছেন। তুমি বার বার ঠকিতেছ। তুমি আর না ঠক—আর না বঞ্চিত হও; অন্ততঃ চলিয়া যাইবার পরও তাঁহাকে মা বলিয়া পরিজ্ঞাত হও। দুই বার, দশ বার, শতবার অথবা সহস্র বার এইরূপ কর। ছদ্মবেশিনী প্রতিবারে বঙ্কিম নয়নে, আড়ে আড়ে তোমার এই ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিবেন। তখন ধীরে ধীরে হাসির উৎস তাঁর প্রাণে ফুটিবে—তখন একবার আসিয়া হাসিয়া ফেলিয়া ধরা পড়িয়া যাইবে। ইহারই নাম বুদ্ধিযুক্ত হওয়া—ইহাই প্রজ্ঞা।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০

ন ইহ কর্ম্মযোগে অভিক্রমনাশঃ অস্তি, প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে; স্বল্পম্ অপি অস্য ধর্ম্মস্য মহতো ভয়াৎ ত্রায়তে।

ব্যবহারিক অর্থ।—এইরূপ কর্ম্মযোগের আরম্ভে কখনও বিঘ্ন নাই, প্রত্যবায়ও নাই; ইহার স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যা।

যৌগিক অর্থ।—আমি পূর্ব্বশ্লোকে যে ভাবে যুক্ত হইতে বলিয়াছি, উহা সমস্ত দিবারাত্রির কার্য্যের পক্ষেও যেমন, এবং একবার ঈশ্বরচিন্তা করিতে বসিলেও তদ্রূপ করণীয়। অর্থাৎ তোমার সারাদিনের কার্য্যসকলকে ঐ ভাবে যুক্ত করিতে চেষ্টা ত করিবেই, নিত্যক্রিয়ারূপে যখন ঈশ্বর আরাধনা করিতে সচেষ্ট হও, তখনও ঐ ভাবে যুক্ত হইতে সচেষ্ট হইবে। মুদিতনয়নে নির্জ্জনে শুদ্ধচিত্তে বসিয়া যখন তুমি মায়ের আমার চরণ দুখানি হৃদয়ে আঁকিতে ব্যস্ত হও, ধীর স্থির সংযত উদ্যমের সহিত যখন তুমি তোমার উপাস্য দেবতার সিংহাসন রচনায় নিযুক্ত হও, তখন তোমার সংস্কারের ছায়াবাজী ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিয়া তোমার সে চরণ-চিত্র মুছিয়া দেয়—তোমার সে সিংহাসন ভাঙ্গিয়া দেয়। তুমি কত সাধে—কত যত্নে—কত আকুলতার সহিত তোমার সংস্কারের কাদামাটি লইয়া ইষ্টদেবকে গড়িতেছিলে, সহসা কোথা হইতে কর্দ্দমরাশি আসিয়া সে মূর্ত্তি বিকৃত করিয়া দিল। তুমি কোন জ্যোতিঃ কল্পনায় তোমার ইষ্টমূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিতে নির্জ্জনে বুকের ভিতর গিয়া সুসংযতভাবে উদ্যম করিতেছ, কোথা হইতে অন্য কি বর্ণচ্ছটা আসিয়া তোমার সে মূর্ত্তি ঢাকিয়া দিল। তোমার প্রতিমা নির্ম্মাণ হইল না—তোমার পূজা হইল না, তুমি আকুলভাবে কাঁদিয়া, শক্তিহীন ভাবিয়া প্রণাম জানাইয়া জগতের কার্য্যে নিযুক্ত হইলে। এইরূপ সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু এবার ফুটাইয়া তুলিব, এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া তুমি পূর্ব্বোক্ত প্রকার বুদ্ধিযোগের অনুষ্ঠান কর অর্থাৎ ইষ্ট চিন্তা করিতে বসিয়া প্রাণের ভিতর যে ভাব, যে ছবি উদয় হউক না কেন, তুমি সেইটীকেই ছদ্মদেশী ইষ্টদেবতা বলিয়া ভাব। যে চিত্র প্রাণে ফুটুক না কেন, সেইটীরই পদে তোমার প্রাণের পুষ্পাঞ্জলি দাও। এক মূর্ত্তি যাইতেছে, অন্য মূর্ত্তি আসিতেছে। মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি—চিত্রের পর চিত্র—ভাবের পর ভাব, কত রূপ তোমার হৃদয়ক্ষেত্রে ফুটিয়া উঠিতেছে—উঠুক, তুমি প্রত্যেকটীর চরণে প্রণাম করিবার জন্য বুদ্ধিযুক্ত হইয়া থাক। প্রত্যেকটীর চরণে যেন তোমার অর্ঘ্য প্রদত্ত হয়, তোমার ভক্তির গন্ধানুলেপন না মাখিয়া কোনটী যেন ফিরিয়া না যায়। যাহা সাধ্য, যতগুলি ছবিকে পার—যতগুলি ভাবকে পার, এইরূপে পূজা করিও। আঁকিতেছ শিব, হয় ত সর্পমূর্ত্তি দেখিলে, তুমি ঐ সর্পমূর্ত্তিকেই ছদ্মবেশী দেবতা বলিয়া প্রণাম দাও। তুমি জানিও, যখনই তুমি হৃদয়-সিংহাসনে তোমার দেবতাকে বসাইবার

জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, তখনই সে হৃদয় দেবতার অধিকারে গিয়াছে ' ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেহ নাই, যে আর তখন ঐ সিংহাসন স্পর্শ করিতে পারে। যেরূপ আসুরিক ভাবই তোমার হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করুক না কেন,—যেরূপ চিত্র আসিয়াই তোমার হৃদয়-ক্ষেত্র মণ্ডিত করুক না কেন, জানিও, তোমার দেবতাই ঐরূপ ছদ্মবেশে আসিয়াছেন ; তুমি পূজা কর। কিছুক্ষণ এইরূপ করিতে পারিলে সে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া দেবতা তোমার ফুটিয়া উঠিবে। ছদ্মবেশের খেলা হাসিতে হাসিতে সরাইয়া দিয়া, তোমার দেবতা স্বরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবেন। চতুরা মায়ের লুকাচুরি খেলা ভাঙ্গিবে। তখন পূজায় প্রীতা হইয়া মা তোমায় মোক্ষরূপ বা সমাধিরূপ আর এক খেলাঘরে প্রবেশ করিতে দিবেন।

এইরূপ প্রারম্ভের নাশ নাই—বিফলতা নাই—বিঘ্ন নাই। ইহার স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও তোমার হৃদয়ের দুরন্ত অভাব বিনষ্ট হইবে, তুমি তোমার দেবতার সন্ধান পাইয়া জন্মমৃত্যুরূপ মহাসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তোমার এ আরম্ভের নাশ নাই ; কেন না, কালভয়বারিণী মাতৃলাভই তোমার সঙ্কল্প। তোমার এ আরম্ভে বিঘ্ন নাই ; কেন না, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী জননীই তোমার লক্ষ্য। আরম্ভ মাত্রই তোমার মহাভয়ের পরিত্রাতা ; কেন না, অভয়া জননী তোমার উপাস্য।

যদিও কর্ম্মমাত্রেই সিদ্ধি—যদিও কোন কর্ম্মই বৃথা যায় না—যদিও যতটুকু মাত্র কর্ম্ম, ততটুকু মাত্রই সিদ্ধি ; কিন্তু অন্য কর্ম্ম অপেক্ষা ইহার একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। কর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই, কর্ম্মের তিলমাত্র বিফল নহে। কর্ম্মই ঘনীভূত হইয়া ফলরূপে আমাদিগের অনুভূতিতে আসে। কারণ পুঞ্জীভূত হইয়াই কার্য্য হয়। যাহা কিছু দেখিতে শুনিতে বা উপভোগ করিতে পাই, আমারই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মই ঐরূপে প্রস্ফুটিত হইতেছে মাত্র। কর্ম্ম আলোচনার সময় এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। এখন কেবলমাত্র বিঘ্নের কথা, আরম্ভ, নাশের কথা বলি। প্রতি কর্ম্ম আরম্ভেই ফল পাই না কেন, প্রতি কর্ম্ম আরম্ভ মাত্রেই ফলরূপে ফুটিয়া উঠে না কেন ? কালরূপ একটা ক্ষেত্রে আমরা সঙ্কল্পের দ্বারা আবদ্ধ বলিয়া—কালের দিকে আমাদের লক্ষ্য থাকে বলিয়া ; অর্থাৎ কর্ম্মটা এতক্ষণ হইল, এতটা হইল, এইরূপ একটা ধারণা থাকে বলিয়া। আমাদিগের জন্মমরণরূপ মোহ এইরূপে

একটা কালের গণ্ডী আঁকিয়া দিয়াছে বলিয়া, আমরা এইরূপ একটা কালের সাপেক্ষতা দেখিতে পাই। কিন্তু এই অপূর্ব্ব বুদ্ধিযোগে এ কাল-সাপেক্ষতা দাঁড়াইতে পারে না। কেন না, যে জিনিষ এ যোগের লক্ষ্য, সে জিনিষে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান মিলাইয়া গিয়াছে—সে জিনিষে অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানরূপে চিরপ্রতিষ্ঠিত। সেই জন্য যতটুকু মাত্রাতেই আমরা এ কর্ম্মের সূচনা করি না কেন, আমাদিগের ঐ কালকল্পনা সর্ব্বাগ্রেই তিরোহিত হইবে। আমরা পদে পদে বুঝিতে পারিব, জন্মমরণরূপ বা জীবন মরণভয়রূপ মহাশঙ্কট অপসারিত হইয়া যাইতেছে। যে মুহূর্ত্তে তুমি মা বলিয়া একবার ডাক, সেই মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাও, তোমার অবসাদ বিদূরিত হইয়া যায়—সেই মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাও, প্রাণ যেন কেমন একটা চিরবর্ত্তমান ক্ষেত্রে গিয়া লাগিয়া যায়—প্রাণ যেন কি একটা চিরদিনের আশ্রয়, অবলম্বন পাইয়া কৃতার্থ হয়। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলিতেন,—মা গো! তোমায় ডাকিতে হয় না; তোমায় ডাকিব, এই কথাটুকু স্মরণ হইবামাত্র তুমি সন্তানকে নিজ অঙ্কে তুলিয়া লও—তুমি আপন অঙ্গে যুক্ত করিয়া লও—তুমি সাযুজ্য-পদ প্রদান কর। মাতৃ-সন্তানের এ মহাবাক্য মাতৃ-সন্তানমাত্রেই অনুভব করে—মাতৃ-সন্তানের এ অপূর্ব্ব সম্ভোগপূর্ণ আশ্বাসবাণী প্রতি সন্তানকে আনন্দে আত্মহারা করিয়া তুলে। মাতৃহারা ভাব ভুলিয়া প্রতি সন্তান মাতৃভাবে আত্মহারা হয়। প্রতি সন্তান আপনাকে মায়ের বরপুত্র বলিয়া বিবেচনা করে।

তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, এ বুদ্ধিযোগের তিলমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও মহাভয় বিদূরিত হইয়া যায়—একবার মা বলিতে পারিলেও প্রাণটা অমরত্বের দিকে ছুটিয়া চলিয়া যায়। জীব! সাধক! ভীত হইও না—এ অমোঘ আশ্বাসবাণী প্রাণ হইতে মুছিও না—মায়ের এ অপূর্ব্ব স্নেহের উৎসাহবাক্য বুকে গাঁথিয়া রাখ। স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও মহাভয় যে আমাদিগের ঘুচিবে, এ চিরসিদ্ধান্ত প্রাণে প্রতিষ্ঠিত কর। দৈনন্দিন কার্য্যমধ্যেও যেমন এবং ঈশ্বর উদ্দেশ্যে নিত্যক্রিয়া সম্বন্ধেও ইহা তদ্রূপ।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ ৪১

ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়স্বভাবাঃ) একৈব বুদ্ধিঃ, কুরুনন্দন। অব্যবসায়িনাং বুদ্ধয়ঃ বহুশাখা বহুভেদা ইতি এতৎপ্রতিশাখাভেদেন হি অনন্তাশ্চ।

ব্যবহারিক অর্থ।—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একমাত্র হইয়া থাকে। এই প্রজ্ঞা বিষয়ে সংশয়রহিত হইলেই বুদ্ধি একমুখী হয়। কিন্তু অনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অনন্ত, বহু শাখাবিশিষ্ট। যোগে সংশয়যুক্ত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি বহুমুখী।

যৌগিক অর্থ।—ভগবান্‌কে চাই, এরূপ কৃতনিশ্চয় হইলে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রজ্ঞা হৃদয়ে ধারণ করিলে তখন বুদ্ধি একমুখী হইয়া যায়; হৃদয়ে সমস্ত চিত্তবৃত্তির আবির্ভাবকে ভগবান্ বলিয়া চিনিলে অথবা চিনিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইলেও বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হইয়া যায়—বুদ্ধির গতি চারি ধার হইতে গুটাইয়া অসিয়া একমুখে ছুটিতে থাকে। প্রাণের দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত বুদ্ধি তন্ময় হইয়া যাইতে থাকে। বুদ্ধি তখন যথার্থ বুদ্ধি নামের উপযুক্ত হয়। অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির নামই বুদ্ধি, এবং অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তির নাম চিত্ত, সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা বৃত্তির নাম মন। মনকে দিয়া একবার সঙ্কল্প করাইয়া লইতে পারিলে তখন চিত্ত বা অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি ফুটিয়া উঠে। তখন পূর্ব্বোক্ত প্রজ্ঞা অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক বস্তুর ভিতর মাকে অন্বেষণ করিতে সে বৃত্তিসকল ধাবিত হয়। এবং তখন নিশ্চয়ই সে আরাধ্য বস্তু পাইব, এইরূপ সংশয়রহিত ভাব প্রাণকে উৎসাহপূর্ণ করিয়া তুলে। প্রাণে আর সংশয় ফুটে না—সন্দেহ আসিয়া প্রাণকে আর বিচলিত করে না। সমস্ত অন্তঃকরণটুকু পূর্ণ বিশ্বাসে রঞ্জিত হইয়া উঠে। কিন্তু যাহারা কৃতনিশ্চয় নয়, যাহাদিগের মন সঙ্কল্প করে নাই, অথবা যাহাদের সঙ্কল্প মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিকল্পে পরিণত হইয়া যায়, তাহাদিগের অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তিও বা চিত্তও আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে—বুদ্ধিও নিশ্চয়াত্মিকা হয় না। সে বুদ্ধি বুদ্ধি নামের যোগ্যই নহে। তোমাদিগের যে বুদ্ধি আছে—যে বুদ্ধি লইয়া তোমরা ঘর কর, উহা বুদ্ধি নামের উপযুক্ত নহে। কেন না, মনের বিকল্প ধর্ম্মের দ্বারা চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তনশীলা এবং সেই পরিবর্ত্তনশীলা চিত্তবৃত্তির তাড়নায় তোমাদিগের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া যায়। আজ যাহাকে এক রকম দেখিতেছ, কাল তাহা অন্যরূপ দেখ—আজ মায়ের সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা আছে, কাল তাহা অন্যরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। নানা প্রকার উদ্যমের দিকে তোমাদিগের বুদ্ধি বা নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি ধাবিত থাকে।

বুদ্ধির দর্শনশাস্ত্রোক্ত নাম মহত্তত্ত্ব। এই মহত্ত্বের সহজাত আর একটী তত্ত্ব

আছে, যাহার নাম অহংতত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্বেই মহামায়া পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হন। এই মহত্তত্ত্ব যতক্ষণ না এক প্রকার অনুসন্ধান দ্বারা একরূপে তরঙ্গিত হয়, ততক্ষণ মা আমার ইহাতে বিম্বিত হইতে পান না, এবং ততক্ষণ তাহার সহজাত অহংতত্ত্ব বা আমাতে ও সে মায়েতে সম্বন্ধের পূর্ণ অনুভূতি আসে না। মহত্তত্ত্বে বা মহামায়ার অঙ্কে আমি আছি, ইহা সত্য ; কিন্তু উহা অলক্ষ্য। মহত্তত্ত্ব স্থিরীকৃত হইলে আমি বা ঐ অহংতত্ত্ব লক্ষ্য হয়। এই বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব ব্যক্ত ঈশ্বর বা হিরণ্যগর্ভ।

তাই বলিতেছিলাম, মা মা করিয়া তোমার অনুসন্ধানবৃত্তি তোমার প্রাণের প্রত্যেক ভাবের ভিতর ঢুকিতে থাকুক—প্রত্যেক ভাবের চরণে মা মা করিয়া লুটাইয়া পড়িতে থাকুক। তখন তোমার ঐ মহত্তত্ত্ব এক প্রকার অনুসন্ধানে, এক প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির দ্বারা একই প্রকার তরঙ্গে উদ্বেলিত থাকিবে। এবং তখনই সে দেবতা উহাতে প্রতিবিম্বিত হইবেন। যতক্ষণ বহু প্রকারে তোমার ঐ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি পরিচালিত থাকিবে, ততক্ষণ মাকে পাওয়া দুরূহ। তাঁহাকে চাই, এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি প্রাণের উপর আধিপত্য করা চাই। ঐরূপ আধিপত্য করাইবার জন্য প্রত্যেক চিত্তবৃত্তির ভিতর চক্ষু বাড়াইয়া দেওয়া চাই, এবং ঐরূপ চক্ষু বাড়াইয়া দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হওয়া চাই।

চিত্তবৃত্তিসকলের কার্য্য যাহাই হউক না, তাহাদিগের উদ্বোধনে তোমাদিগের প্রাণ যেরূপ ফলই প্রাপ্ত হউক না, তাহাদিগের সাময়িক মূর্ত্তি যেরূপ ভাবই ধারণ করুক না, তোমরা সে দিকে চাহিয়া থাকিও না। সে দিক্ হইতে যত শীঘ্র সম্ভব, চক্ষু ফিরাইয়া শুধু তাহার অন্তর্গত মহাশক্তি দর্শন কর—সেই শক্তির চরণে নমস্কার কর—সেই শক্তিকে আরাধনা কর—সেই শক্তিকে মা বলিয়া চিনিতে অভ্যাস কর।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিম্প্রতি॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥৪৪

পার্থ! অবিপশ্চিতঃ মূঢ়াঃ বেদবাদরতা বেদে যে বাদ' অর্থবাদাঃ বাদফল-সাধনপ্রকাশকেষু বেদবাক্যেষু রতাঃ প্রীতাঃ অন্যৎ ঈশ্বরো বা মোক্ষঃ বা নাস্তি, স্বর্গধনাদিফলসাধনেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ নান্যৎ অস্তি ইতি বাদিনঃ কামাত্মানঃ বাসনা-কলুষিতচিত্তাঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিম্প্রতি ক্রিয়াবিশেষ-বহুলাং যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি, তয়া অপহৃতচেতসাং ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং তেষাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।

ব্যবহারিক অর্থ।—পার্থ! যাহারা বেদের খণ্ড কর্ম্মফলবাদে পরিতুষ্ট, অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মসকল স্বর্গ, ধন, সিদ্ধি আদি প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ, ঐরূপ প্রাপ্তি ব্যতীত ঈশ্বরতত্ত্ব বা মোক্ষতত্ত্ব কিছু নাই,—জন্মকর্ম্মফলপ্রদ ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্বন্ধে কামাত্মা স্বর্গপরায়ণ যে মূঢ়গণ এইরূপ পুষ্পিত বাক্য কহিয়া থাকে, অপহৃতচিত্ত এবং ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত তাহাদিগের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধির যোগ্য নহে।

যৌগিক অর্থ।—প্রত্যেক কর্ম্ম হইতে আমরা দুইরূপ ফল প্রাপ্ত হই। একটী মুখ্য বা আপাতলক্ষ্য ফল এবং অন্যটী উহার সংস্কারাত্মক গৌণ ফল। প্রত্যেক কর্ম্মের ভিতর এই গৌণ ফলটী এক অর্থাৎ আমাদিগের মোক্ষসাধক। কর্ম্মমাত্রেরই গৌণ ফল ক্রমশঃ আমাদিগকে মাতৃরাজ্যের সমীপবর্ত্তী করিতেছে। প্রতি কর্ম্মের ভিতর দিয়া একটী স্নেহের আকর্ষণ অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত প্রবাহিত হইয়া আমাদিগকে মাতৃমুখী করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু এই ফলটি গৌণ; কর্ম্মমাত্রেরই এইটুকু প্রধান লক্ষ্য হইলেও আমবা সাধারণতঃ কর্ম্মের এই ফলের দিকে—এই স্রোতের দিকে চাহিয়া থাকি না। আমরা কর্ম্মের অন্যতম ফলটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাধারণতঃ কর্ম্ম করিয়া থাকি, আপাতভোগ্য ফলটি সাধারণতঃ আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি, এবং উহাই আমাদিগের নিকট প্রধান ফল বলিয়া পরিগণিত হয়। আমাদিগের এই অন্ধ দৃষ্টি ফিরাইবার জন্য আপাতভোগ্য ফলটীকে উপেক্ষা করিয়া, উহার অভ্যন্তরস্থ মোক্ষপথ অনুবর্ত্তক ফলটীতে আমাদিগের লক্ষ্য স্থাপিত করাইবার জন্য বেদে কর্ম্মকাণ্ডের উল্লেখ হইয়াছে। সাধারণ কর্ম্ম-সকলের ভিতর দিয়া ঈশ্বরাভিমুখে আমরা ধাবিত হইলেও উহার বাহ্যিক বা আপাতভোগ্য ফলগুলি আমাদিগের আশা সম্যক্‌রূপে পরিপূর্ণ করিতে পারে না। অভাবের যন্ত্রণা আমাদিগের বুকের ভিতর ফুটাইয়া তুলে, এবং দুঃখময় কর্ম্মবন্ধনের নিগড় নির্ম্মাণ করে। এই জন্য বেদ

এমন কতকগুলি কর্ম্ম উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, যেগুলি সম্পাদন করিলে আমাদিগের দৃষ্টি কর্ম্মমাত্রেরই অভ্যন্তরস্থ ঐ ভগবৎমুখী গতির দিকে স্থাপিত হয়, এবং উহাদিগের বাহ্য ফল কর্ম্মবন্ধনকে কতকটা সুখময় করিয়া ফুটাইয়া তুলে। সাধারণ কর্ম্মের বাহ্য ফল-সকল আমাদিগকে সকল সময় মাতৃমুখে আকর্ষণ করিতে পারে না বলিয়া—ঔষধের তিক্ততা যেমন সময়ে সময়ে রোগীকে বিরক্ত করিয়া তুলে, তেমনি ভাবে সাধারণ কর্ম্মসকল আমাদিগের বিরক্তিকর হইয়া উঠে বলিয়া—সেই কর্ম্মসকলকে মধুময় করিয়া তুলিবার জন্য বেদ কতকগুলি কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যেমন তিক্ত ঔষধ মধু সহযোগে পাইলে বালক সে ঔষধ পানে আর অনিচ্ছা প্রকাশ করে না, বরং সাগ্রহে পান করিতে থাকে তদ্রূপ বৈদিক কর্ম্মসকল স্বর্গ, সিদ্ধি আদি মধুময় ভোগ-সংযুক্ত হওয়ায় সাধারণ শিশুবৎ জীবমণ্ডলী কর্ম্ম অবলম্বন করিবে, এবং প্রধানতঃ সেই কর্ম্মের ভিতর দিয়া ভগবৎলোকাভিমুখে ধাবিত হইবে, এই উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি কর্ম্মসকলের অবতরণিকা। কিন্তু মধুপান মুখ্য উদ্দেশ্য নহে—ঔষধ সেবনই উদ্দেশ্য। কর্ম্মের প্রধান লক্ষ্যটুকু বিস্মৃত হইলে চলিবে না ; কর্ম্মের মূল লক্ষ্য—আমাদিগকে মাতৃ-সান্নিধ্যে নিয়স্থিত করা। এ লক্ষ্যের ব্যতিক্রম ঘটিলে হৃদয়ে বিপর্য্যয় ভাব-সকলের প্রবলতা আসিবে। অনেকে এমন আছেন, যাঁহারা বৈদিক কর্ম্ম-সকলের অভ্যন্তরস্থ এই মহালক্ষ্য ভুলিয়া, উহাদিগের সিদ্ধি আদি বাহ্য ফলের দিকে সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করেন, এবং বৈদিক কর্ম্মের ভিতর ঐরূপ স্বর্গাদি লাভ ছাড়া আর কোন ফল নাই, ঐরূপ স্বর্গাদি লাভই বেদের লক্ষ্য, সুতরাং স্বর্গাদি লাভই আমাদিগের লক্ষ্য হওয়া উচিত, এইরূপ ধারণায় আসিয়া পড়েন। বেদ বলিয়াছেন, যজ্ঞ করিলে তাহার ফলরূপে কোন অমানুষিক ভোগলাভ হইবে, সুতরাং ঐ অমানুষিক ভোগই আমাদিগের লক্ষ্য হওয়া উচিত, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও পর্য্যন্ত করিতেছেন। ইহাঁদিগকেই ভগবান্ বেদবাদরতা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ; ইহাঁদিগকেই আমি খণ্ড কর্ম্মফলবাদী বলি।

বেদের কর্ম্মকাণ্ডবাদের উপর এইরূপে সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগের কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর বা মোক্ষ বলিয়া কিছু নাই। কর্ম্মই যখন সমস্ত ফল বহন করে, তখন ঈশ্বর থাকিলেও ঈশ্বরের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব কোথায় এবং সেই কর্ত্তৃত্বের অভাববশতঃ কর্ম্ম-সকলের এই আপাতলক্ষ্য ফলেরই উপাসক

হওয়া আমাদিগের উচিত। কিন্তু কর্ম্ম কি প্রকারে ফলরূপে পরিণত হয় বা আমরা কর্ম্মফল বলিয়া কোন্ জিনিষটী উপলব্ধি করি, সে কথা বুঝিলে এরূপ খণ্ড কর্ম্মফলবাদ অবলম্বন করিতে হয় না; কর্ম্ম-রহস্য সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। এখন শুধু মূল গতি বা মূল লক্ষ্যের কথা বলি।

বিদ্ ধাতু হইতে বেদ শব্দের উৎপত্তি, এবং বিদ্ ধাতু হইতে বেদন শব্দের উৎপত্তি। সুতরাং জানা ও বেদন বা অনুভব করা, একই বিদ্ ধাতুর অন্তর্গত। জানা অর্থে বেদনা, অনুভব করা। যাহা আমাদিগের বেদনা বা অনুভূতির ভিতর আসিয়া পৌঁছায়, তাহাকেই আমরা জ্ঞান বলি। ভগবদ্‌জ্ঞান অর্থে ভগবান্ সম্বন্ধে অনুভূতি। যে জ্ঞান হৃদয়ের ভিতর সম্যক্ অনুভূতি জন্মাইতে অক্ষম, তাহা জ্ঞান-পদবাচ্য নহে। জ্ঞান ও অনুভূতি একই জিনিষ, সুতরাং ভগবদ্‌জ্ঞান ও ভগবদনুভূতি একই জিনিষ। এই জন্য যে জ্ঞান বুকের ভিতর স্পন্দন জন্মাইতে অক্ষম, যে জ্ঞানের বেদনা নাই, তাহাকে জ্ঞান বলা যায় না। পক্ষীর মত কণ্ঠস্থ করিয়া—যে জ্ঞান লইয়া সাধারণ লোকসকল জ্ঞানী বলিয়া আপনাদিগের আত্মপরিচয় প্রদান করে, তাহা জ্ঞান নহে, শব্দভঙ্গি-মাত্র। ঐ বেদন বা অনুভূতি বেদপদবাচ্য, জ্ঞান উহার আন্তরিক বিকাশ, কর্ম্ম বাহ্য বিকাশ। ভগবান্‌কে জানিয়াছি বলিলে এই বুঝায়, ভগবান্‌কে অনুভব করিয়াছি, এবং ঐ অনুভূতি হইতে যে আসক্তি জন্মায়, তাহারই নাম ভক্তি। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম একই জিনিষ, বেদনার ত্রিমূর্ত্তি মাত্র বা বেদের বিভাগত্রয়। সময়ে সময়ে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, এই শব্দগুলি লইয়া তোমরা বিষম গণ্ডগোলে পড়িয়া যাও। কেহ বল, জ্ঞান না হইলে হইবে না, কেহ বল, ভক্তি না হইলে হইবে না, কেহ বল, কর্ম্ম না হইলে হইবে না। কিন্তু ঐ তিনই যে একই জিনিষ হইতে জন্মায়, তাহা তোমরা ভুলিয়া যাও। যেমন অগ্নিশিখা—উহার উত্তাপ, উহার রূপ ও উহার ব্যাপকতা, এ তিন লইয়া তবে শিখা-পদবাচ্য অথবা যেমন শিখা বলিলে ঐ তিন জিনিষই আমরা বুঝিতে পারি, এ তিনের একটিকেও বাদ দিলে যেমন শিখা বলিয়া কোন জিনিষ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তেমনই ভগবদ্‌বেদনা বলিতে গেলে ঐ তিন সম্বলিত একটি জিনিষ বুঝিতে হয়। ঐ বেদ বা ভগবদনুভূতি অন্তঃকরণে ভক্তিরূপে, মনে জ্ঞানরূপে এবং দেহে কর্ম্মরূপে বিম্বিত হয়।

যাহা হউক, এই বেদন মাতৃ-আলিঙ্গনের সুখ মাত্র। যেমন একটী জলকণা

অনন্ত জলকণার দ্বারা ওতপ্রোতভাবে আলিঙ্গিত হইয়া থাকে, তেমনই আমরা মাতৃ-আলিঙ্গনে আবদ্ধ। সেই আলিঙ্গনেব স্নেহময় পীড়ন আমাদিগের অন্তঃকরণে ভাবরূপে ফুটিয়া উঠে। সেই আলিঙ্গন ক্রমশঃ আমাদিগকে পূর্ণত্বে মিশাইয়া লইবার জন্য অহর্নিশ সচেষ্ট। এখন উহা ইচ্ছারূপে আমাদিগের উপর ক্রিয়াশীল থাকিয়া আমাদিগকে উদ্বোধিত করিয়া রাখিতেছে। এক এক প্রকারের ইচ্ছা যখন ঘনীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহা আমার অধীনে আসিয়া পড়ে—তখন উহাতে আর ইচ্ছাশক্তির অনুপ্রেরণা না থাকিলেও উহা স্বতঃ কর্ম্মরূপে বিকশিত হইতে থাকে। যখন যে ইচ্ছাশক্তির যে শাখাটী ঘনীভূত বা জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়, তখনই উহা আমার সম্পূর্ণ করায়ত্ত হইয়া পড়ে। যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ উহা ঘনীভূত হইবার জন্য বার বার হৃদয়ে উদ্বোধিত হইতে থাকে। শুধু এইরূপেই আমরা দেহাদি ও ইন্দ্রিয়বর্গ লাভ করি। এইরূপে ক্রমশঃ আমরা ইচ্ছাময় হইয়া উঠিতেছি। এখন যেমন দেহের কতকগুলি অংশের উপর আমাদিগের আধিপত্য আসিয়াছে, কতকগুলি মানসিক ও শারীরিক কর্ম্ম যেমন ইচ্ছাশক্তির চালনা না থাকিলেও এখন আপনা হইতে কার্য্যকারী, তদ্রূপ কালে আমাদিগের সমস্ত দেহের উপর এইরূপ আধিপত্য আসিবে। এখন আমি এই ক্ষুদ্র মনুষ্য-দেহটী সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে আনিতে পারি না, কালে আমার বিরাট্ দেহ আমারই আয়ত্তাধীনে আসিয়া পড়িবে। আমাদিগের এই মনুষ্য-দেহটী বিরাটের আদর্শে গঠিত। এই দেহটী হইতে ক্রমশঃ আমরা আধিপত্যবিস্তার শিক্ষা করিতেছি। যত এইরূপে ইচ্ছাশক্তি আমাদিগের অধীনে আসিয়া পড়িবে, তত আমরা বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডকে আমাদিগের দেহ বলিয়া ধারণা করিতে সক্ষম হইব। তখন আমি পূর্ণ ইচ্ছাময় হইব এবং আমি বুঝিতে পারিব, অগ্নি আমারই ইচ্ছায় প্রদীপ্ত—বায়ু আমারই ইচ্ছায় প্রবাহিত—আকাশ আমারই ইচ্ছায় ব্যাপ্ত। মাতৃ-আলিঙ্গন এই প্রকারে ইচ্ছারূপে আমাদিগের ভিতর ফুটিয়া, ক্রমশঃ ঘনীভূত অবস্থা লাভ করিয়া, আমাদিগের কর্ত্তৃত্তাধীনে আসিয়া পড়িয়া আমাদিগকে পূর্ণত্বের দিকে লইয়া চলিয়াছে।

শুন! এ আলিঙ্গন তোমরা অনুভব করিতে শিক্ষা কর। জ্ঞানকে শুধু মনের একটা সিদ্ধান্ত না বুঝিয়া, অন্তরের একটা অনুভূতি বলিয়া, একটা বেদন বলিয়া বুঝ—কর্ম্মকে একটা আপাতসুখদুঃখাদি-ফলবাহী মাত্র না বুঝিয়া, মাতৃ-আলিঙ্গনের বেদন বলিয়া হৃদয়ে অনুভব কর। মা আমার তোমায় দেহের

একটী দ্বার দিয়া আপন অঙ্গে টানিয়া লইতেছেন ; এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদনারূপ আলিঙ্গনের একটী সুখ, একটী পীড়ন তোমায় অনুভব করাইতেছেন। তুমি যখন মাতৃ-গর্ভে ছিলে, তোমার দেহটী তখন একটী উল্বনের দ্বারা আবৃত ছিল। সেই উল্বন বা ফুল মাতৃ-শরীরে সংযুক্ত থাকিয়া, মাতৃ-শরীরস্থ প্রাণাদি শক্তি বহন করিয়া তোমার নাভিদেশ দিয়া তোমার শরীরে প্রবেশ করাইয়া তোমায় রক্ষা করিত। তোমার নাভিস্থলটী, মাতৃ-শরীরস্থ শক্তি তোমার দেহে প্রবিষ্ট করাইবার একমাত্র দ্বার। তুমি সর্ব্বাঙ্গীনরূপে সেই ফুলটী বা উল্বনটিতে পরিব্যাপ্ত থাকিতে। যেমন কুসুম-কোরকের ভিতর বীজকোষ বা যেমন ফলের মধ্যে বীজ থাকে, তেমনই ভাবে তুমি ঐ উল্বনটির দ্বারা আবৃত থাকিয়া তাহার দ্বারা পরিপুষ্ট হইতে। তার পর যখন তুমি পুষ্ট হইলে অর্থাৎ তোমার নাভিদ্বার এমন পরিপুষ্ট হইল যে, বিরাট্ জগৎ হইতে প্রাণশক্তি আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে, তখন তুমি মাতৃ-গর্ভ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে। জীবের নাভিদ্বার যত দিন এ বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড হইতে প্রাণশক্তি টানিয়া লইবার উপযুক্ত না হয়, তত দিন জীব মাতৃ-গর্ভে থাকিতে বাধ্য থাকে এবং নাভিদ্বার ঐরূপ শক্তিশালী হইলে তবে ভূমিষ্ঠ হয়। প্রাণ প্রবেশের এই একটী মাত্র দ্বার।

যাহা হউক, যখন আমরা ভূমিষ্ঠ হই, তখন বুঝিতে হইবে, আমাদিগের নাভিদ্বার মায়ের বিরাট্ দেহ হইতে শক্তি আকর্ষণ করিবার উপযুক্তরূপে উন্মুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ আমরা তখন ক্ষুদ্র মাতৃ-গর্ভস্থ উল্বন বা ফুলটী হইতে বহির্গত হইয়া, বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডরূপ উল্বন বা ফুলটীর মধ্যে আসিয়া পড়ি। বিরাট্ মাতৃ-গর্ভস্থ ব্রহ্মাণ্ডরূপ এই ফুলটীর ভিতর পড়িয়া আমি আমার নাভিদ্বার দিয়া পূর্ব্ববৎ প্রাণশক্তি আকর্ষণ করিয়া লইতেছি। নাভিরূপ দ্বার দিয়া ক্রমাগত মা আমার প্রাণশক্তি আমাদিগের ভিতর প্রবিষ্ট করাইয়া দিতেছেন। তুমি বিশ্বেশ্বরী মায়ের গর্ভে থাকিয়া এমনই ভাবে পুষ্ট হইতেছ। তুমি বিশ্বজননী মায়ের আমার ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভে এইরূপে অমৃত সংগ্রহ করিতেছ, তাই তুমি সজীব— তাই তুমি শক্তিচেতনাশীল। মূর্খ শিশু! কিছু দেখিও না, এই মাতাপুত্র ভাব উদ্বোধিত কর, তুমি অমর হইবে।

এই জন্য হিন্দুর নিত্যক্রিয়ায় নাভিস্থলে ধ্যান ধারণা করিতে হয়। এই জন্য যোগিমাত্রকেই নাভিস্থলের ক্রিয়া করিতে হয়। করেন সত্য, কিন্তু তাঁহা-

দিগের মধ্যে অনেকেই জানেন না, নাভিস্থলের ক্রিয়া কিসের নিমিত্ত করণীয়। ইহা অপ্রকাশ্য হইলেও আমি খুলিয়া লিখিলাম। যদি ইহা হইতে মাতাপুত্র সম্বন্ধ দুই দশ জনেরও ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আকুলতা আসে—মাকে আমার মা বলিয়া চিনিবার জন্য ব্যগ্রতা যদি পাঠকবর্গের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে আমার এ অপ্রকাশ্য জিনিষ প্রকাশ করার ক্ষোভ হৃদয় হইতে বিদূরিত হইবে। তোমরা নাভিস্থলে ঈশ্বরের ধ্যান আরাধনা কর—তোমরা নাভিক্রিয়া * করিয়া যোগী সাজ, কিন্তু তাহার সঙ্গে এই ভাবটী সংযুক্ত করিয়া লইও, তোমাদিগের ক্রিয়া অমৃতময়ী হইবে। শুধু অন্ধের মত ক্রিয়া করিলে সম্যক্ ফল লাভ করিতে পারিবে না। এ ভাব সংযুক্ত করিবার উপায় আছে।

যাহা হউক, নাভিস্থল দিয়া যেমন মা আমার প্রাণশক্তিরূপে প্রবিষ্টা হন, তদ্রূপ একাদশ ইন্দ্রিয়পথ দিয়া মায়ের ঐ শক্তি মায়ের অঙ্কে চলিয়া যায়। আমরা ইন্দ্রিয়পথে যখন কার্য্য করি অর্থাৎ দেখি, শুনি, আস্বাদন করি, স্পর্শ করি, চিন্তা করি, আঘ্রাণ করি, কিম্বা কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলকে পরিচালিত করি, তখন ঐ সকল ইন্দ্রিয়পথে উক্ত প্রাণশক্তি ব্যয়িত হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে একটী একটী অনুভূতি বা বেদন বা মায়ের আলিঙ্গনের স্নেহময় পীড়ন লাভ করি। প্রাণ-শক্তির এইরূপ প্রবেশ ও বহির্গমনের ভিতর দিয়া আমাদিগের অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিতে থাকে। অতিরিক্ত ভাবে ইন্দ্রিয়দ্বার-সকলকে তোমরা পরিচালিত কর বলিয়া ঐ দ্বারসকল অপরিমিত ভাবে উন্মুক্ত বা প্রসারিত হইয়া পড়ে অর্থাৎ যে পরিমাণে ব্যয় করিলে প্রবেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা হইত, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যয় হইয়া যায়। প্রবেশের পথে বা নাভিস্থলে সম্যক্ কার্য্য না করাবশতঃ প্রবেশের দ্বার সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়রূপ ব্যয়ের দ্বার অধিক চালনা করা নিবন্ধন খরচের মাত্রা বাড়িয়া যায়, তাই আমরা ক্রমশঃ বার্দ্ধক্যে ও জরায় উপনীত হই। এইরূপে আমাদিগের মৃত্যু আসে বা দেহ-পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে। দেহরূপ যন্ত্রটীর আয়দ্বার অপেক্ষা ব্যয়ের দ্বার প্রসারিত হইয়া পড়িয়া যন্ত্রটীকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে ও ইহার পরিত্যাগ আবশ্যক হইয়া উঠে। তাই আমরা মরি।

---

* নাভিক্রিয়া বলিয়া সাধারণ যোগীরা যাহা করে—তাহা অসম্পূর্ণ; ক্রিয়ার বাহ্য অঙ্গ মাত্র। উহার অন্তরঙ্গ কাহার কাহার আপনা হইতে সাধিত হইয়া যায় বলিয়া তাহারা ফল পায়—সকলে পায় না।

এখন এ অবধি যাহা পাইলাম, তাহাতে এই বুঝা গেল, যদি এই আয়ের দ্বার বা নাভিস্থল, প্রক্রিয়া দ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রসারিত করিতে পারি এবং ব্যয়ের মাত্রা কমাইতে পারি, তাহা হইলে আমরা মাতৃদত্ত প্রাণশক্তিকে ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইতে পারি। এই আয়ের দ্বার প্রসারিত করিবার পন্থা একান্ত অপ্রকাশ্য—ইহা লিখিয়া বলা চলে না। মাতৃভাবে সম্যক্ বিভোর না হইলে ইহা অদেয়।

যাহা হউক, ব্যয়ের কথা বলি। আমরা ইন্দ্রিয়পথে প্রাণশক্তির যে ব্যয় করি, উহা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের তত্তৎকার্য্যজনিত অনুভূতিটুকুকে লক্ষ্য করিয়াই করিয়া থাকি। সুতরাং আমাদিগের ঐ প্রাণশক্তির বহির্গমনরূপ তাড়নাটুকু সুখদুঃখাদি-রূপ অনুভূতি-তরঙ্গই ফুটাইয়া তুলে। কিন্তু যদি ঐ অনুভূতিগুলির আভ্যন্তরীণ মর্ম্মটুকু গ্রহণ করিতাম অর্থাৎ ঐ অনুভূতিগুলিকে যদি মাতৃস্নেহের পীড়ন বলিয়া বুঝিতাম—মায়ের আদর বলিয়া যদি ধারণা করিতাম, তাহা হইলে ঐ অনুভূতিসকল সুখদুঃখাদিরূপে তরঙ্গ উৎপন্ন না করিয়া স্নেহ-আদরের অমৃততরঙ্গে পরিণত হইত। কার্য্যতঃ যে প্রাণশক্তি আমাদিগের আয়ের দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে, আমাদিগের ঐ ইন্দ্রিয়প্রবাহরূপ তরঙ্গগুলি সেই প্রাণশক্তির সমুদ্রেই তরঙ্গ উৎপাদন করিত, তাহা হইলে তাহাতে ঐ প্রাণশক্তি-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া প্রবেশের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইত। যেমন স্থলচর জীব জলনিমগ্ন হইলে সে সেই জলাভ্যন্তরে থাকিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার পরিচালন করিতে পারে না, তাহার শ্বাসে বায়ু প্রবিষ্ট না হইয়া জলমাত্র প্রবিষ্ট হইতে থাকে, কিন্তু জলচর মৎস্য সেই জলের অভ্যন্তর হইতেই যেমন বায়ু গ্রহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনকার্য্য সম্পন্ন করে, তদ্রূপ আমরা এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডস্পন্দনে ডুবিয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধরূপ জলমাত্র যেন শ্বাসে শ্বাসে পাইতেছি, কিন্তু যদি ব্রহ্মাণ্ড-স্পন্দন-সমুদ্রের ভিতর মাতৃস্নেহরূপ বায়ু অনুভব করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ইহা অপূর্ব্ব সুখের হইত। জগতের যে কোন অবস্থার ভিতর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারিতাম।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস আদি ভোগ-সকলকে মাতৃস্নেহের কোমল পীড়ন বলিয়া ধারণা কর; ওই সকল অনুভূতির অভ্যন্তরস্থ সেই মূলা শক্তি বা বেদনই বেদ। সমস্তের মধ্যে এক অপূর্ব্ব স্নেহসত্তার যে উপলব্ধি, তাহার বিজ্ঞানই বেদ। মা যখন সন্তানকে আদর করিয়া ডাকেন, মায়ের সেই আহ্বানের ভিতর

ওতপ্রোত ভাবে যেমন স্নেহতরঙ্গ বর্ত্তমান থাকে, তেমনই ব্রহ্মময়ী মায়ের আমার প্রণবরূপ স্নেহময় আহ্বানের ভিতর এই বেদন বা বেদরূপ স্নেহতরঙ্গ প্রবাহিত। প্রণবের মধ্যেই বেদ বিরাজিত। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই উত্তমপুরুষ বা মা অবিরাম প্রণবরূপ স্নেহের আহ্বানে আমাদিগকে ডাকিতেছেন। জগতের মা যেমন ক্ষুদ্র শিশুটীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে "মা মা" বলিয়া ডাকে ও শিশু সেই আহ্বান শিক্ষা করিয়া যেমন সেই ভাবের প্রত্যর্পণস্বরূপ মাকে মা বলে, তদ্রূপ জীবসঙ্ঘ বিশ্বেশ্বরীর ওই আহ্বান শুনিয়া তাঁহাকে ডাকে। তাঁহার সে অনন্তদিগ্‌বিস্তৃত সৃষ্টিস্থিতি-লয়াত্মক আহ্বান ত্রিগুণাত্মক জীবের উপর তিন প্রকারে প্রতিঘাত করে—জীব তিন প্রকারে মা মা করিয়া আকুল হয়। ঐ তিন প্রকার প্রতিঘাতের নাম জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম। ইহারা যেন মাতৃ-আহ্বানের বা প্রণবের তিন মাত্রা। ইহাই ব্রাহ্মণের ত্রিবর্গা গায়ত্রী। ইহা হইতে শত ধারায় সে আহ্বান ফুটিয়া উঠে। সহস্র সহস্র প্রকারে সে স্নেহবিকাশ জীবের চারি ধারে বেদন বা বেদ মুখরিত করে, এই জন্য গায়ত্রী বেদমাতা নামে অভিহিতা।

যাহা হউক, এই বেদন বা এই অপরিচ্ছিন্ন বেদ হইতে আমাদিগের ইচ্ছাশক্তি উদ্বুদ্ধা হয়েন, অর্থাৎ ওই বেদন হইতে আমাদের প্রাণে একটা স্পন্দন সঞ্জাত হয়; সেই স্পন্দনই অভাব, সেই স্পন্দনই ইচ্ছা, সেই স্পন্দনই জগৎরচনা। বেদনা হইতে অভাববোধ, অভাব বোধ হইতে আকাঙ্ক্ষা—অনুসন্ধান—জ্ঞান, জ্ঞান হইতে ভাব এবং ভাব হইতে ক্রিয়া বা সৃষ্টি। এইরূপ চলিয়াছে ; এইরূপে অহর্নিশ সেই নিত্য সনাতন বেদ হইতে আমরা আমাদিগকে পরিণমিত করিতেছি। এই অপূর্ব্ব অসীম বেদনা আমাদিগকে কেন্দ্রের দিকে, পূর্ণত্বের দিকে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে। আমরা এই বেদনের তাড়নায় জন্মের পর জন্ম, অবস্থার পর অবস্থা, সোপানের পর সোপান অতিক্রম করিতেছি। এই বেদন যখন যেরূপ ইচ্ছায় পরিণত হইতেছে, তখনই সেইরূপ অবস্থা, সেইরূপ কর্ম্মক্ষেত্র, সেইরূপ ভোগ-দেহ রচনা করিয়া লইতেছি; আমরা তাই ইচ্ছাময়। আমারই ইচ্ছায় আমি আপনাকে গড়িতেছি। যেখানে ইচ্ছা ঘনীভূত অবস্থা লাভ করিতেছে, সেইখানেই উহা জড়দেহ বা দেহাংশরূপে প্রকটিত হইয়া পড়িতেছে। আবার যেখানে সেই ইচ্ছা পূর্ণ ঘনীভূত অবস্থা পাইতেছে, সেইখানে উহা আর আমার ইচ্ছার তাড়না না পাইলেও স্বতঃ ক্রিয়াশীল। মনে কর, আমার এই স্থূল দেহ। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, স্নায়ু, অনৈচ্ছিক পেশী, এ সকল ইচ্ছা না করিলেও

আপনা আপনি কার্য্যে নিরত থাকিয়া শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু হস্তপদাদি অপর কতকগুলি অংশ যখন ইচ্ছা করি, তখনই সঞ্চালিত হয়, অন্য সময়ে কার্য্য করে না। আবার আমি অহর্নিশ যেরূপ চিন্তায় নিযুক্ত থাকি, যেরূপ কার্য্যে রত থাকি, আমার দেহের গঠনাদি তৎকার্য্যোপযোগিরূপে গঠিত হইয়া যাইতেছে। এই তিনটি অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে আমরা ইচ্ছাশক্তির তিনটি স্তর দেখিতে পাই। মানুষের মুখ দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, কিরূপ চিন্তায়, কিরূপ ইচ্ছায় তাহার প্রাণ চালিত; অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি ঐরূপে মুখাদির উপর নিজ মূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিয়া তাহাকে আপনার প্রতিমূর্ত্তি করিয়া গড়িতেছে। এইটি ইচ্ছাশক্তির প্রথম বিকাশ। এইরূপে কার্য্য করিতে করিতে দেহকে গঠন করিয়া তুলিয়া ও তাহার উপর অহর্নিশ গতি চালাইয়া, দেহকে ইচ্ছাশক্তি এমন করিয়া তোলে যে, ইচ্ছামাত্রেই উহা তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। ইহা ইচ্ছাশক্তির দ্বিতীয় অবস্থা। এবং ঐরূপ ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করিতে করিতে এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, ইচ্ছা না করিলেও বা স্বতন্ত্র ইচ্ছা চালনা না করিলেও উহা কার্য্য করিতে থাকে, আর ইচ্ছার দ্বারা উহাদিগকে চালিত করিতে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ হৃৎপিণ্ডাদির কথা বলিয়াছি। ইহা তৃতীয় অবস্থা।

তবে কার্য্যতঃ হইতেছে কি? ঐ হৃৎপিণ্ডাদির কার্য্যের দিকে চাহিলে মনে হয় যে, আমার ঐ অংশে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। শক্তির নব প্রয়োগ না করিলেও উহারা আমার কার্য্যে নিযুক্ত। আমি যেন ইচ্ছাময়, আর ঐ সকল অংশ আমার এত অনুগত যে, আমার ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়াই আপনা আপনি কার্য্যকারী। তাই ওই অংশে যেন আমি পূর্ণ স্বাধীন, নিশ্চিন্ত; ইচ্ছার মুখাপেক্ষী নহি।

এইরূপে অসীম ইচ্ছাশক্তি আমায় ক্রমশঃ আপনার উপর কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিতেছে। আজ যেমন হৃৎপিণ্ডাদি আমার ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়াই কার্য্যে নিযুক্ত, তেমনি আমার ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়াই একদিন অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভোগ আমার ভোগরূপে ফুটিয়া উঠিবে, বিরাজ করিবে, লয় হইবে। অর্থাৎ তখন আমি পূর্ণ ইচ্ছাময়ত্ব লাভ করিব। আমি স্বাধীন হইব।

স্বাধীন হইব সত্য; কিন্তু এখন বস্তুতঃ আমি হৃৎপিণ্ডাদির উপর পূর্ণ ইচ্ছাময়ত্ব লাভ করিতে পারি নাই। এখন অমি ইচ্ছামাত্রে উহাদিগকে বা

উহাদিগের কার্য্যকে বন্ধ করিতে পারি না। ইচ্ছামাত্রে উহাদের গতি, কমাইতে বাড়াইতে আমি অক্ষম। আমার দেহের যে সকল অংশ স্বতঃক্রিয়াশীল, সে সকল কার্য্যতঃ আমার ইচ্ছার ঘনীভূত অবস্থা হইতে রচিত হইলেও এখন যেন আমার অধীন নহে, যেন তাহারা স্বাধীন। সেনাপতি দেশ জয় করিতে রাজ-সৈন্য লইয়া বিদেশে গিয়া দেশ জয় করিয়া, সেখানে যেমন সে নিজে রাজা হইয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে, সেইরূপ যেন আমার ইচ্ছাশক্তি ঐ হৃৎপিণ্ডাদি রাজ্য স্থাপিত করিয়া, আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে; যেন উহাদের উপর আমার কোন কর্তৃত্ব নাই। অথবা যেন উহা স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিয়া নামে মাত্র আমার অধীন। সুতরাং এখন আমি ঐ সকল অংশেও পূর্ণ ইচ্ছাময় নহি। ইহার কারণ, আমি আমার স্বরূপ জানি না। আমি জানি না, "মা-ই" আমিরূপে আবির্ভূতা। খণ্ডবোধ আছে বলিয়াই আমার ইচ্ছার দ্বারা আমি পরাভূত।

এই সকল অংশকে নিজ কর্তৃত্বের অধীনে লইয়া আসাই যোগমার্গের বিভূতি-বিশেষ। এই সকল অংশের উপর আমার ইচ্ছার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, অর্থাৎ ইহারা যেমন কার্য্য করিতেছে, তেমনি স্বতঃ কার্য্য করিবে, কিন্তু আমার ইচ্ছামাত্রে ইহাদিগের কার্য্য হ্রাস বৃদ্ধি অথবা এককালীন রোধ প্রাপ্ত হইবে। ইচ্ছামাত্রে ইহাদিগের অস্তিত্ব অবধি লোপ হইবে। যখন এইরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারিব, তখন যথার্থ আমি ইচ্ছাময় হইব।

এইরূপে স্বায়ত্তশাসন ভারপ্রাপ্ত ইচ্ছাশক্তি-সকলকে পুনঃ অধীনে লইয়া আসা ও যে সকল বিষয় আমার কার্য্যকরী শক্তির অধীনে এখনও আসে নাই, সেই সকলকে ক্রমশঃ করতলগত করা—এই দুই দিক্ লক্ষ্য করিয়া ইচ্ছাশক্তির প্রেরণাই হঠযোগ। যোগীরা ইচ্ছামাত্রে কোন স্থানে অদৃশ্য ও অন্য স্থানে দৃষ্ট হয়েন, ইহা এইরূপ ইচ্ছাশক্তি চালনার ফল মাত্র। এ বিষয় বিভূতি-যোগ বলিবার সময় বিশেষ করিয়া বলিব। এখন স্থূলতঃ এই মাত্র বলিতেছি যে, অসীম অনন্ত বেদন বা বেদ ইচ্ছারূপে আমাদের প্রাণে ফুটিয়া আমাদিগকে ইচ্ছাময় করিয়া তুলিতেছে।

তাই বেদ অপৌরুষেয়। বেদ কতকগুলি জ্ঞানসমষ্টি নহে। বেদ কতকগুলি কর্ম্মবিধান মাত্র নহে বা বেদ সরল ভক্তির অভিব্যক্তি মাত্র নহে। ঐ সমস্তের

ভিতর দিয়া যে মাতৃবেদন বা মাতৃ উপলব্ধি প্রবাহিত, তাহাই বেদ। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ইহার তিন প্রকার অভিব্যক্তি।

এইবার আমরা আমাদের মূল কথা বলিব। সাধারণ লোকে বেদের এই আভ্যন্তরীণ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করে না। তাহারা বেদের বাহ্য ফল বা কর্ম্ম সকলের উপস্থিত ইন্দ্রিয়ভোগ্য ফল লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মযজ্ঞ সম্পাদন করে। তাহারা কর্ম্মের আংশিক ফলমাত্র লক্ষ্য করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হয়। তোমাদের প্রাণে যখন কোন জ্ঞান আধিপত্য বিস্তার করে অর্থাৎ কোন জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য কর বা বাচনিক বিচার কর, তখন সেই স্থূল জ্ঞানটুকুরই কর্ত্তৃত্ব তোমাদের হৃদয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই জ্ঞানের সূক্ষ্মশরীর বা আত্মা কি—সে দিকে তোমাদের লক্ষ্য বড় পড়ে না। অর্থাৎ তখন তোমরা ভাবিয়া দেখ না, কেন ওই জ্ঞান তোমার হৃদয়ের উপরে আধিপত্য করিতেছে; কেন তুমি ওইরূপ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইতেছ, ওই জ্ঞানের আভ্যন্তরীণ মর্ম্ম কি? তোমার হৃদয়ের অবস্থা তখন ওইরূপ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইবার উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই জ্ঞান ওইরূপে কার্য্যকারী; তোমার ওইরূপ জ্ঞানপথ্যের আবশ্যক হইয়াছে বুঝিয়া, স্নেহময়ী মা আমার ওইরূপ জ্ঞানপথ্যের ব্যবস্থা করিতেছেন, এ কথা তোমরা ভাবিয়া দেখ না। আমরা আহার করি, কিন্তু রসনেন্দ্রিয়ের সুখ সম্পাদনের জন্য নহে, আমাদিগের শরীর-বিধানের সম্যক্ পোষণের জন্য আমরা আহার করি; সেই পোষণটুকু লক্ষ্য করিয়াই স্নেহময়ী মা আমার ক্ষুধারূপে "দে অন্ন, দে অন্ন" বলিয়া চীৎকার করেন। জগতের মা যেমন শিশু পুত্রকে কোলে লইয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দেয়, তেমনই মা আমার, তোমার মুখের দিকে চাহিয়া, ক্ষুধারূপিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া, ক্ষুধারূপিণী মূর্ত্তিতে তোমায় ক্রোড়ে ধরিয়া, তোমার জন্য অন্ন প্রার্থনা করিতেছেন। তুমি যখন ক্ষুধায় অভিভূত হও, বুঝিও—মা আমার ক্ষুধারূপিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া তোমায় ক্রোড়ে করিয়াছেন।

এই আহারজাত রসনেন্দ্রিয়েরসুখটুকু প্রধান লক্ষ্য নহে, প্রধান লক্ষ্য আমার শরীরবিধান; পোষণ না হইলে দেহরূপ কার্য্যক্ষেত্র ধ্বংস হইবে, মাতৃআহ্বান-রূপ মহাকার্য্য সম্পাদন করিতে পারিব না, সেইটুকু লক্ষ্য করিয়াই মা আমাকে আহারে নিযুক্ত করিতেছেন। রসনার সুখটুকু অবান্তর বা অপ্রধান লক্ষ্য। তদ্রূপ সমস্ত বিষয়ে বুঝিও;—সমস্ত বৃত্তি, সমস্ত শারীরিক, মানসিক ভাব সম্বন্ধে

এইরূপ উপলব্ধি করিও। আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, অধ্যাত্মিক সমস্ত পরিবর্ত্তনেই এইরূপ দৃষ্টি স্থাপিত কর। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ওইরূপ বুঝিও। বৈদিক যাগযজ্ঞাদি কার্য্য সম্বন্ধেও ওইরূপ বুঝিও। প্রধান লক্ষ্য, ওই মাতৃ-আহ্বান, অনুপান —সুখ দুঃখ সিদ্ধি ইত্যাদি।

যাহারা কিন্তু এই মূল লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কার্য্য করে, তাহাদিগকেই ভগবান্ বেদবাদরতা বলিয়াছেন। বেদের বাক্যাংশগত স্থূল যে অর্থ বা ভাব, শুধু সেইটুকু মাত্র যাঁহারা লক্ষ্য করেন, তাঁহারাই বেদবাদরত। কিন্তু প্রকৃত বেদ সেইটুকু, যেটুকুর সত্তা প্রাণকে স্পন্দিত করিয়া, উক্ত বাক্যসকল স্ফুরিত করাইয়াছে। প্রকৃত জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান সেইটুকু, যেটুকু আপনার এই সত্তা উপলব্ধি করায়। তাই আত্মজ্ঞান ও বেদ অভিন্ন। বেদরত ও বেদবাদরত, এই দুইয়ে অনেক প্রভেদ। মূল ধরিতে পারিলে বস্তুতঃ উভয়ই এক—অভিন্ন ; কিন্তু সাধারণতঃ তাহা হয় না। সাধারণতঃ কতকগুলি জ্ঞান কর্ম্মাদিতেই অনেকের বেদ পর্য্যবসিত হয়। সেই জন্য ভগবান্ "বেদবাদরতদিগকে" "বেদরত" হইতে পৃথক্ করিয়া দেখাইয়া দিলেন।

আরও খুলিয়া বলি। অনেকের মধ্যে আত্মজ্ঞান ও উপাসনা লইয়া মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে জ্ঞানমার্গী সাজিয়া উপাসনা প্রভৃতির নিষ্প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে চেষ্টা করেন। উপাসনা পূজা প্রভৃতি শুধু চিত্তশুদ্ধির উপায়স্বরূপ, চিত্তকে জ্ঞানধারণোপযোগী করিবার কৌশল মাত্র, সুতরাং জ্ঞান হইলে আর পূজাদির আবশ্যকতা নাই—এইরূপ বলিতে অনেককে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞান ও উপাসনা পূজাদি যে একই জিনিষ, এ কথা তাঁহারা বুঝিয়া দেখেন না। পূজা উপাসনা, এ সমস্ত কি ? ভগবদ্ভাবাদিকে উপলক্ষ্য করিয়া, তাহাতে আপনার চিত্তবৃত্তি বা আপনাকে অর্পণের নাম—উপাসনা। আমাদিগের প্রাণ অহর্নিশ যেন কি একটা আশ্রয় পাইবার জন্য লালায়িত ; কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত যেন কাহারও উপর কোথাও গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহে। যেন কাহারও অঙ্কে স্থান পাইবার জন্য, কোথাও নিত্য অবস্থানোপযোগী আসন পাইবার জন্য দিশাহারার মত এ দিক্ ও দিক্ চাহিতে চাহিতে ছুটিতে থাকে। প্রাণের এই যে গতি, এই যে নিত্য-আসন পাইবার স্বতঃসিদ্ধ আকুলতা, ইহাই জীবসঙ্ঘকে চারি ধারে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়, জীব যেন পদার্থ-সকলের—রূপ রসশব্দাদির দ্বারে দ্বারে এইরূপ একটা নিত্য আসন পাইবার জন্য ঘুরিয়া

বেড়ায়। কিন্তু কোথাও সে নিত্য আসনের সন্ধান পায় না; নিত্য কোথাও বসিয়া থাকিতে পায় না; নিত্য কোন পদার্থকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে পারে না। ক্ষণকাল রাখিবার পরই তাহাতে যন্ত্রণা আসে, বিরক্তি আসে। বিরক্তি, ঘর্ষণ-জনিত ফল। দুই পদার্থ ঘর্ষণ করিলে যেমন তাহাতে উত্তাপ জন্মায়, এও যেন তদ্রূপ; বুকে আবেগে কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিলেই প্রতি পদার্থ হইতে তাপ বহির্গত হয়—প্রাণ অমনি সে জিনিষ ফেলিয়া অন্য দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে। এইরূপে নিত্য-আসনের, নিত্য অঙ্কের সন্ধান করিতে না পারিয়া, জীবের প্রাণে নিত্য-আসন সম্বন্ধে কল্পনা পরিস্ফুট হইতে থাকে। প্রাণ যেন ক্রমশঃ বুঝিতে থাকে, কোন এক নিত্য-আসনের আশায় তার প্রাণ এরূপ জ্বলিতেছে—আকুল হইতেছে। তখন কল্পনায়—সে সেই নিত্য-আসন আঁকিতে থাকে, প্রাণ সেই নিত্য-আসনের স্বপ্নে বিভোর হইতে থাকে। তখন সেই নিত্য-আসন কিরূপ—তাহাই যেন দেখিতে, যেন তাহার সুখ সম্ভোগ করিতে একটী উপ-আসন রচনা করে; করিয়া তাহাতে বিশ্রাম, তাহাতে নিশ্চিন্ততা, তাহাতে নিত্য-সত্তার স্ফুরণ ভোগ করে। এই উপ-আসন স্থাপনের নাম উপাসনা। সেই আসনের চরণতলে সমস্ত—তার সমস্ত স্মৃতি, তার সমস্ত ভালবাসা আনিয়া ঢালে। যেখানে যেখানে তার প্রাণের ভালবাসা একটু আধটু জড়াইয়া আছে, পত্র পুষ্প ফলই হউক, স্ত্রী পুত্রাদি হউক, জ্ঞানাদি হউক—ভালবাসাটুকু পাছে অন্যত্র অপব্যয়িত হয়, এই সাধে, যেন সেই পদার্থগুলি শুদ্ধ আনিয়া সেই আসনের তলে অর্পণ করে। অর্থাৎ তার সমস্ত ভাব সে সেই আসনের তলে নিবেদন করে। ইহারই নাম উপাসনা। পদার্থগুলি ভাবরাশি মাত্র, এ কথা যেন স্মরণ থাকে।

আত্মজ্ঞানীও তাহাই করে। সেও জ্ঞান-স্বপ্নে সেই নিত্য আসন কল্পনা করিয়া, সেই নিত্যত্বের একটী কল্পিত বা উপ-আসন রচনা করিয়া, তাহাতে তার সমস্ত বৃত্তি অর্পণ করে। আত্মজ্ঞানী যখন বলে "সোঽহং", তখন "সঃ"এর একটী উপ-আসন তৈয়ারী করিয়া লয়; এবং তাহারই উপর বেগে ঝাঁপাইয়া পড়িতে থাকে। কর্ম্মী যখন কাতর হইয়া "কই" "কই" করিয়া ভাব সকলকে কর্ম্মের আকারে ফুটাইয়া তুলে, তখনও সেই নিত্য-আসনের একটী উপ-আসন রচনা করিয়া লয়। বাক্যে, কার্য্যে, ভাবে, যাহাই হউক, আসলে ওই একখানি উপ-আসন রচনা করিয়া লওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। জ্ঞানীও উপাসক

মাত্র—কর্ম্মীও উপাসক মাত্র—প্রভেদ কিছু আসলে নাই। প্রতিচিত্রে পিতৃ-পূজার মত উপ-আসনে নিত্য আসনের বেদন।

এ উভয়ই নিবেদন মাত্র। বেদন হইলেই নিবেদন হইবে। নিবেদন অর্থে "জানান।" তাহা হইতে অর্পণ করায় দাঁড়াইয়াছে। জ্ঞাপন করা ও অর্পণ করা যে একই জিনিষ, ইহা আমাদের ভাষার চরমোন্নতির পরিচায়ক। আমরা যখন কাহারও সম্মুখে যাই, শুধু হাতে যাই না—কিছু না কিছু লইয়া যাই। অন্ততঃ প্রাণের কিছু ভাব লইয়া গিয়া তাহাতে ঢালিয়া দিই। ইচ্ছা করিয়া কোন জিনিষ বা মনুষ্যাদির সমীপে উপস্থিত হইলে, সেখানে ভাব ত লইয়াই যাই—অকস্মাৎ কোন মনুষ্য বা পদার্থের সমীপস্থ হইলেও অমনি কোন না কোন ভাব ফুটিয়া উঠে; সেই ভাব দিয়া যেন তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করি। সেই ভাব যেন সেই পদার্থে দিয়া, যেন তাহার সহিত আলাপ করি। ইহা হইতে নিবেদন অর্থে অর্পণ হইয়াছে। আমি যখন কোন জিনিষ জানিতে চেষ্টা করি, তখন কার্য্যতঃ আমি আপনাকে জানাইয়া ফেলি। কেন না, আমি আমারই ভাবের সাহায্যে তাহাকে দেখি মাত্র—আমি আপনারই কতকগুলি ভাব ফুটাইয়া ফেলি মাত্র। আমি জানিতে গিয়া, আপনি জানান দিয়া বসি। তাই বলিতেছি,—বেদন ও নিবেদন একই। জানা ও জানান একত্র সম্বদ্ধ।

এইবার উপাসনার কথা ভাবিয়া দেখ। তুমি যখন উপাসনা কর, সাকার অথবা নিরাকার, যাহাই হউক না কেন, অদ্বৈত অথবা দ্বৈত, যে জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হও না কেন, কার্য্যতঃ তুমি আপনারই স্বরূপ পরিদর্শন করিতেছ। অদ্বৈত জ্ঞানে বিভোর হইয়া যখন স্বরূপে অবস্থান করিতে প্রয়াস পাও, তখনও তুমি আপনাকে এক চিন্ময় আদর্শে নিবেদন করিয়া, আপনি বেদন পাইতেছ, দ্বৈত-জ্ঞানে যখন বিভোর থাক, তখনও তুমি এক চিন্ময় আদর্শে আপনাকে নিবেদন করিয়া বেদন অনুভব করিতেছ। মনে করিতে পার, দ্বৈতজ্ঞানে সাধনায় যেন চিন্ময় হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিবেদন আপনারই বেদনমাত্র। তুমি দ্বৈতভাবে ভাবিলেও তোমার আদর্শকে ত সমস্ত চিন্ময় ভাব দিয়া সাজাও;—কার্য্যতঃ হয় কি? যেমন দর্পণস্থ স্বীয় *প্রতিবিম্বে তিলক পরাইতে গেলে, সে তিলক আপনারই নাসাগ্রে অঙ্কিত হয়,* তদ্রূপ তোমার ওই আদর্শতে চিন্ময় ভাব ঢালিতে বা নিবেদন করিতে গেলে কার্য্যতঃ আপনিই সেই চিন্ময় হইয়া পড়—আপনিই সে বেদন অনুভব কর।

পূর্ণভাবে চিত্তবৃত্তি যখন অর্পিত হয়, তখন উপাস্য ও উপাসক এক হয়; সোঽহং চিন্তাও অসম্পূর্ণ ভাবে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ দ্বৈতভাবই কার্য্যকারী থাকে। সুতরাং কি অদ্বৈত-জ্ঞানে, কি দ্বৈতজ্ঞানে কার্য্য একই হয়—নিবেদন ও বেদন—অর্পণ ও গ্রহণ।

ভগবদুদ্দেশে যাহাই দাও—তাহাই তোমার প্রাপ্তি হয়। একগুণ দিলে সহস্রগুণ হয়। স্থূল দ্রব্যাদি অবধি, যাহাই মাকে আমার ঢালিয়া দাও, মা আমার সহস্র গুণে তাহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া তোমার জন্য রাখিয়া দেন। বলিতে পার, তবে মায়ে কর্ম্মফল অর্পণ করিলে কি প্রকারে কর্ম্ম-সকলের বন্ধনরূপ সাধারণ ফল হইতে নিস্তার পাওয়া যায়? অগ্নিতে যাহাই অর্পণ কর না কেন, তাহা যেমন অগ্নির স্বরূপ পরিগ্রহণ করে, তাহার নিজত্ব যেমন অগ্নিতে মিলাইয়া যায়, তদ্রূপ মায়ে আমার যে ভাবই অর্পণ কর না কেন, তাহা বাহ্য বস্তু সহ হউক অথবা বাহ্যবস্তুবিহীন হউক, তাহা তাহার নিজত্ব ছাড়িয়া মাতৃস্নেহে পরিণত হয়; মায়ের হৃদয়ে স্নেহ-সমুদ্রমাত্র উদ্বেলিত হয়; মাতৃ-প্রাণের বেদনমাত্র ছুটিয়া তোমার প্রাণের উপর ঝরিতে থাকে, বস্তু অথবা ভাব, সকলেরই মূল উপাদান মাতৃ-স্নেহ—মাতৃ-বেদন; এ ব্রহ্মাণ্ড মায়ের আমার স্নেহানুভূতি ব্যতীত অন্য কিছু নহে; স্নেহের স্পন্দন—স্নেহের বেদন, এত বিভিন্ন রূপে প্রতিফলিত হইতেছে মাত্র। সুতরাং যাহাই মায়ে অর্পণ কর, উহা বেদনরূপ মূল স্বরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। উহা উহার বিশিষ্ট ভৌতিক অবস্থারূপ স্পন্দন হারাইয়া, মহাসমুদ্রের মহাস্পন্দনের সঙ্গে মিলাইয়া যায়। সুতরাং বন্ধনরূপ সংকীর্ণতা উহাতে থাকে না। উহা বেদে উৎপত্তি-লাভ করিয়াছিল, বেদেই পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু তোমার প্রিয় বস্তুগুলি বা ভাবগুলি যদি প্রিয়বোধে তাঁহাকে দিয়া থাক, তবে তিনিও সেই প্রিয়বোধ অবলম্বনে তাহা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া প্রত্যর্পণ করেন। আর যদি নিবৃত্তির জন্য দিয়া থাক, তবে তাহাতে নিবৃত্তিরূপ ফলই দান করেন।

এ উপাসনা—এ অর্পণ ও গ্রহণ—এ নিবেদন ও বেদন অবিরাম চলিয়াছে। এই নিবেদন ও বেদনের ভিতর দিয়াই আমরা মাতৃ-অঙ্ক লাভ করিব। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আপনার অনুভূতির, আপনার বেদনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইব; আমিত্ব, মাতৃত্ব এক অনির্ব্বচনীয়ত্বে পরিণত হইবে। ভোগমাত্রেই উপাসনা—অর্থাৎ যখন যেরূপে যে বিষয়ে উপ-আসন রচনা করিয়া লই, তখন তাহাতে

সেইরূপে ভোগ প্রাপ্ত হই। গাভীর সর্ব্বশরীরে দুগ্ধ বিস্তৃত থাকিলেও, তাহার অঙ্গস্থ ক্ষত আরোগ্য করিতে যেমন তাহার দুগ্ধের দোহন ও মন্থন আবশ্যক হয়, দোহন ও মন্থনের দ্বারা নবনী সঞ্জাত হইলে, তবে যেমন উহা তাহার ক্ষতে অনুলিপ্ত হইয়া ক্ষত আরোগ্য করিতে সমর্থ হয়, শরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া যেমন উহা ক্ষত আরোগ্য করিতে অক্ষম, আমাদের শাস্ত্র বলেন, তদ্রূপ ব্রহ্মময়ী মা আমার আমাতে ওতপ্রোত ভাবে আছেন সত্য; কিন্তু যতক্ষণ না উপাসনারূপ দোহন ও মন্থন সম্পন্ন হয়, ততক্ষণ আমার অঙ্গস্থ ত্রিতাপরূপ ক্ষত আরোগ্য হয় না। যখন যেরূপ তাপ কল্পনা করি, তখনই সেই তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তদ্ভাবীয় উপ-আসন রচনা করি ও ক্ষণিক ভোগের দ্বারা সে তাপ হইতে আপনাকে রক্ষা করি। এইরূপে উপ-আসন ও তাহা হইতে উপভোগ অবিরাম চলিয়াছে। আসনের উপত্ব যখন ঘুচিবে, ভোগেরও উপত্ব তখন দূর হইয়া যাইবে। অর্থাৎ এইরূপ উপ-আসন করিতে করিতে যখন নিত্য-আসনের সন্ধান লাভ করিব, তখন উপভোগ ফেলিয়া যথার্থ সম্ভোগ প্রাপ্ত হইব।

তবে কি সেই ভোগই আমাদিগের লক্ষ্য? ভোগের জন্যই আমরা কি মাতৃ-অনুসন্ধানে ছুটিয়াছি? ভোগের আশাতেই কি আমরা "মা মা" করিয়া কাঁদিতেছি? এখন তাই—বস্তুতঃই ভোগেচ্ছা-প্রণোদনেই জীবসঙ্ঘ মাতৃমুখে ধাবিত। মাতৃ-ভোগ, মাতৃ-মিলন-আনন্দ আমাদিগকে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে। শিশু মাতৃস্তন লক্ষ্য করিয়াই মা মা রবে কাঁদে। তার পর মাতৃচক্ষে চক্ষু স্থাপিত করিয়া যখন সে আত্মহারা হইতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তখন কেন সে মাকে চাহে, জানে না অথচ মাকে না পাইলে থাকিতে পারে না। মাতৃ-চক্ষু হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষু ফিরাইতে চাহে না। ভোগের ভিতর দিয়া, স্তন পানের ভিতর দিয়া, স্নেহের বাঁধন, ভোগাপেক্ষা সুমিষ্ট, স্তন্য অপেক্ষা সুধাময় মায়ের স্নেহধারার আস্বাদ তাহাকে এইরূপে মাতৃ-মুখী করিয়া তুলে। তাই বলি, ভোগই এখন লক্ষ্য, ভোগের ভিতর দিয়া স্নেহের আস্বাদ যত দিন না পাই, তত দিন ভোগই জীবকে মাতৃ-মুখে লইয়া চলিয়াছে। ভোগের ভিতর দিয়া স্নেহের পূর্ণ আস্বাদ যত দিন না পাইবে, তত দিন জীবের গতি রোধ হইবে না। পূর্ণ আস্বাদ পাইবামাত্র গতি রোধ হইবে—জীব আপনাকে হারাইবে—মাতৃত্ব লাভ করিবে।

তবে যত দিন ভোগের ভিতর ঐ স্নেহের সন্ধান না পাইব, যত দিন না

ভোগৈশ্বর্য্যের ভিতর দিয়া মাতৃ-হৃদয়ে দৃষ্টি স্থাপিত হইবে—মায়ের প্রাণ যত দিন না আমাদের লক্ষ্য হইবে, তত দিন ঐ উপ-আসনে উপ-আসনেই ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে—তত দিন জীবের বুদ্ধি মাতৃ-যুক্ত হইতে পারিবে না—জীব মায়ে আত্ম-হারা হইতে শিখিবে না—তত দিন জীব সাযুজ্য লাভ করিবে না। তাই ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্ত—ভোগৈশ্বর্য্যের দ্বারা অপহৃত-চিত্ত ব্যক্তির মাতৃযোগে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ঘটে না ; মূল শ্লোকে এইরূপ বলা হইয়াছে।

যাহা হউক, যাহারা বেদের এইরূপ পরিচয় এখনও পায় নাই, যাহাদিগের হৃদয়ে এখনও বেদন অনুভূতি হয় নাই, তাহারা শুধু বেদবাদী মাত্র। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম আদি বেদের অর্থের বিশ্লেষণ ও কর্ম্মাদির আপাতভোগ্য ফল লইয়াই তাহারা ব্যস্ত। সেই বেদবাদরত হইতে সূচনা করিয়া নাস্তিকতা অবধি কেবল সাধারণ জীবসকলের অবস্থাবিভাগ মাত্র। সাধারণ জীবশ্রেণী কর্ম্মসকলের স্থূল ফলেই অহর্নিশ আসক্ত। যেন আর কিছু নাই, এইরূপ ভাবেই তাহারা জীবন যাপন করে। স্থূল জগতে স্থূল ভোগ ছাড়া আর কিছু তাহাদের চক্ষে প্রতিফলিত হয় না, তাহাদিগের প্রাণ যেন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তাহারা প্রায় সকলেই 'নান্যদস্তীতিবাদী' ; ইহাদিগের ভিতর যাঁহারা ঈশ্বর-পরায়ণ, ভোগৈশ্বর্য্য স্বর্গাদি লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা ঈশ্বর অন্বেষণ করেন ; আপনার বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য ঈশ্বরের শরণাগত হন। তাঁহাদিগের চিত্তের গতি ভোগৈশ্বর্য্যের দিকেই স্থাপিত। এই সাধারণ জীবশ্রেণীর নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধির যোগ্য নহে। এখনও ভগবদ্‌যোগ প্রাপ্তির অবস্থা তাঁহাদিগের হয় নাই।

ভগবান্ এইখানে জীবশ্রেণীকে যেন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইলেন। বেদরত অর্থাৎ যাঁহারা ভগবদ্‌বেদনে অহর্নিশ স্পন্দিত, তাঁহারা এক শ্রেণী ; এবং বেদের অর্থবাদী, কর্ম্মকাণ্ডবাদী, যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, উহা হইতে সূচনা করিয়া নাস্তিক অবধি এই এক শ্রেণী। বেদরত এক শ্রেণী এবং "বেদবাদরত" হইতে "নান্যদস্তীতিবাদী" এই পর্য্যন্ত এক শ্রেণী। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ভিতর মলিন ভাবে যে সামান্য ঈশ্বরানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কামনা-প্রণোদনে সঞ্জাত। ইহাদিগের ভিতর যাগযজ্ঞ পূজাদি কর্ম্মরত যাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সিদ্ধির তাড়নাতেই ঈশ্বরারাধনায় নিবিষ্ট। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর জীবের ভিতর যে যাগযজ্ঞ আদি ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়,

তাহা কামনা-প্রণোদনে নহে, তাহা বেদনের স্ফুটনে। প্রথম শ্রেণীর জীব অহর্নিশ ভগবদ্‌যুক্ত, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জীব ভগবদ্‌যুক্ত হইবার বুদ্ধি এখনও পায় নাই, কালে পাইবে। সর্ব্বনিকৃষ্ট নান্যদস্তীতিবাদী বা অন্য কথায় নাস্তিক জীব ক্রমশঃ তাহাদিগেরই কামনার তাড়নায় বেদবাদরত হইয়া পড়িবে। কর্ম্মের আপাতভোগ্য ফল লক্ষ্য করিয়া বৈদিক কর্ম্মাদিতে রত হইবে—বেদের অর্থবাদ পরিগ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইবে। ক্রমশঃ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম আদি বেদন-বিভাগত্রয় অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরাভিমুখী হইবে; এবং পরে যথার্থ বেদরতপদবাচ্য হইবে।

মূল শ্লোকে "বেদবাদরতাঃ" ও "নান্যদস্তীতিবাদিনঃ" ইহা যেন একই শ্রেণীর লোক বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ একই শ্রেণীর হইলেও সেই শ্রেণীর মূল ও শেষ দুই প্রান্ত ধরিয়া আমি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। বেদের কর্ম্মকাণ্ডই বা কর্ম্মের স্থূল আবরণই যাহাদের লক্ষ্য, কর্ম্মের ঐ স্থূল আবরণ ছাড়া যাহারা অন্য কিছু ঐশ্বরিক সত্তা উহাতে উপলব্ধি করে না, তাহাদিগকেই মূল শ্লোকে নান্যদস্তি ইতি বাদিনঃ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ অর্থ যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু আমি যে ভাবে পূর্ব্বে বিভাগ করিয়া দেখাইলাম, উহাও যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। স্থূল জগৎ, স্থূল ভোগ ব্যতীত আর কিছু নাই এবং বেদের কর্ম্মকাণ্ড ব্যতীত বা তত্তৎকর্ম্মজনিত ফল ব্যতীত অন্য কিছু নাই, এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যাহা হউক, আমরা এই মূল শ্লোকগুলি হইতে এই মর্ম্মটুকু পাইলাম যে, জীবের লক্ষ্য সাধারণ কর্ম্মসকলেই হউক অথবা বেদের কর্ম্মবাদেই হউক, স্থূলটুকুর উপর যতক্ষণ থাকে, যতক্ষণ না তাহারা প্রত্যেক কর্ম্মের ভিতর, জগতের প্রত্যেক স্থূল আবর্ত্তনের ভিতর ঐশ্বরিক বেদনের দিকে লক্ষ্য করে, ততক্ষণ ভগবদ্‌যুক্ত হইবার সম্বন্ধে তাহাদিগের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আসে না। সেই জন্যই পূর্ব্বশ্লোকে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিযোগের কথা বলিয়া, তার পর এই শ্লোক কয়টী বলা হইল। স্থূল জগতের ভিতর ভগবদ্‌বেদন লক্ষ্য করিতে না পারিলে বুদ্ধিযোগ হইবে না; ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযোগ পাইতে হইলে ভোগাদির ভিতর দিয়া মায়ের সহিত সম্বন্ধ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। ইহাই স্থূল তাৎপর্য্য।

বেদের কর্ম্মকাণ্ড সম্যক্‌রূপে প্রতিপালন করিলেও ভাবিও না, তোমার সমস্ত কার্য্য সুচারু সংসিদ্ধ হইতেছে—ভাবিও না, ঐ কর্ম্মসকল হইতে তুমি

ভগবৎলাভে সমর্থ হইবে—ভাবিও না, কর্ম্মসকলের এমন্ প্রভাব আছে, যাহা তোমার বুকে মাতৃ-অনুভূতি বা বেদন ফুটাইয়া না দিয়াই তোমায় মাতৃ-অঙ্কে যুক্ত করিবে। তুমি যোগী অথবা যাগযজ্ঞশীল হও—তুমি ব্রহ্মবাদী অথবা ব্রহ্মচারী হও—তুমি দ্বৈতবাদী অথবা অদ্বৈতবাদী হও—বুঝিও, যে পরিমাণে বেদন বা মাতৃভাবের স্পন্দন বা ভগবদনুভূতি তোমার কর্ম্মে থাকিবে, শুধু সেই পরিমাণেই তুমি ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিবে; তোমার স্থূল ভাব বা স্থূল কার্য্যসকল যে পরিমাণে ঈশ্বরবেদন ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইবে, শুধু সেই পরিমাণেই তুমি মাতৃঅঞ্চল ধরিতে সমর্থ হইবে।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫

ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ—ত্রৈগুণ্যং সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যো যেষাং তে বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ; অর্জ্জুন! ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব নিষ্কামো ভব ইত্যর্থঃ। নির্দ্বন্দ্বঃ—সুখদুঃখহেতুঃ স্বপ্রতিপক্ষঃ পদার্থৌ দ্বন্দ্বশব্দবাচ্যো ভবতি, নির্গতো দ্বন্দ্বো যতঃ তথাবিধো নির্দ্বন্দ্বো ভব, ত্বং নিত্যসত্ত্বস্থঃ সদা সত্ত্বগুণাশ্রিতো ভব, তথা নির্যোগক্ষেমঃ—অনুপাত্তস্য উপার্জ্জনং যোগঃ, উপাত্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ, যোগক্ষেমপ্রধানস্য শ্রেয়সি প্রবৃত্তির্দুষ্করা ইত্যতো নির্যোগক্ষেমো ভব, আত্মবানপ্রমত্তশ্চ ভব, এষ তব উপদেশঃ স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতঃ।

ব্যবহারিক অর্থ।—বেদবাদ সকাম ব্যক্তিদিগের কর্ম্মফলপ্রতিপাদক। অর্জ্জুন! তুমি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও যোগক্ষেমশূন্য এবং অপ্রমাদী হইয়া নিষ্কাম হও—আত্মবান্ হও।

যৌগিক অর্থ।—ত্রিগুণই বেদের বিষয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ বেদের বৈভব মাত্র। এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ বৈভব বিভাগ করিয়া দেখিতে গিয়া বেদ বিভক্ত হইয়াছে। বেদ বা বেদন গুণিত হইয়া সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। একগুণে সত্ত্ব, দুই গুণে রজঃ ও তিন গুণে তমঃ। অর্থাৎ বেদনের প্রথম তরঙ্গ সৎ বা অস্তিত্বজ্ঞাপক, দ্বিতীয় তরঙ্গ চিৎ এবং তৃতীয় তরঙ্গ আনন্দ। বেদনের প্রথম বা এক গুণ ভক্তি, দ্বিগুণ হইলে কর্ম্ম, ত্রিগুণ হইলে জ্ঞান। এই ত্রিগুণ, পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতে ও সংমিশ্রণে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি বিষয়সকল রচনা করিয়াছে। এই ত্রিগুণ হইতেই ব্রহ্মাণ্ড-বৈচিত্র্য সমুৎপন্ন।

ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুতে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়রূপে এই তিন গুণ প্রকটিত। মাতৃবেদনের প্রথম প্রতিঘাতে আসক্তি, দ্বিতীয় প্রতিঘাতে কর্ম্ম ও তৃতীয় প্রতিঘাতে আনন্দ, লয় বা তন্ময় ভাব প্রাণে ফুটিয়া উঠে।

আমরা জীবমণ্ডলী এই ত্রিগুণের ঐকান্তিক সংমিশ্রণে উৎপন্ন বিষয়-সকলের অভ্যন্তরে থাকিয়া ত্রিগুণাত্মক হইয়া পড়িয়াছি। বেদ সেই জন্য জগৎসকলকে মথিত করিয়া, জগতের অসংখ্য বৈচিত্র্যরূপ জঞ্জাল সরাইয়া, প্রধানতঃ তাহার অভ্যন্তরস্থ তিনটী মৌলিক গুণ বিশ্লেষিত করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু বেদের আভ্যন্তরীণ মর্ম্ম অর্থাৎ যথার্থ বেদ গ্রহণ করিতে যতক্ষণ জীব না পারে, যতক্ষণ জীব বেদবাদরত মাত্র থাকে, ততক্ষণ বেদসকল ত্রিগুণোৎপাদক বা কর্ম্মফল-প্রতিপাদক, এবং ততক্ষণ আমরা বৈদিক কার্য্যাদিতে রত থাকিতেও ত্রিগুণত্বই লাভ করিয়া থাকি। ততক্ষণ আমরা ত্রিগুণের দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকিয়া ঘাত-প্রতিঘাত প্রাপ্ত হই—ততক্ষণ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বা জন্ম, অবস্থান ও মৃত্যু, এই তিন প্রকার সংঘাতে জর্জ্জরিত থাকি।

সাধারণ জীব, জগতের এই অনন্তমুখী ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর বিরক্ত হইয়া যখন অন্তর্মুখী হইতে আরম্ভ করে, তখন সে সমস্ত জাগতিক পদার্থের ভিতর শুধু এই তিনটী গুণেরই অবস্থান দেখে। এবং এই ত্রিগুণের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সচেষ্ট হয়। মাতৃ-বেদন বহির্ম্মুখে ত্রিগুণিত হইয়া যেমন জগৎ রচনা করিয়াছে বা জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনই আবার অন্তর্মুখে মাতৃ-সন্নিধানে যাইতে হইলেও ত্রিগুণিত করিয়া লইতে হইবে। ত্রিগুণিত একবারে হয় না। অনন্ত তরঙ্গপরম্পরা মুছিয়া ফেলিয়া এক তরঙ্গ রচনা করিতে হয়; তার পর তাহাকে দ্বিগুণিত ও তার পর তাহাকে ত্রিগুণিত করিতে হয়। অর্থাৎ জগতের সমস্ত ভোগের ভিতর আগে মাতৃ-বেদনরূপ প্রথম তরঙ্গ বুকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়, তার পর মাতৃ-অনুভূতিরূপ কর্ম্ম লাভ হয়—তার পর জীব মায়ে আত্মহারা হইয়া পড়ে। মাতৃ-আকর্ষণী শক্তির প্রতিলোম গতিতে জগৎ রচিত হইয়াছিল, অনুলোম গতিতে জীবের মাতৃলাভ সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রতিলোম গতির পূর্ণ আত্মহারা ভাব ত্রিগুণাত্মক জড় জগৎ, অনুলোম গতি ত্রিগুণিত হইলে মাতৃমিলন।

সেই জন্য ভগবান্ এই শ্লোকে নিস্ত্রৈগুণ্য হইবার জন্য বলিতেছেন, অর্থাৎ প্রতিলোম গতির বা বহির্ম্মুখী গতির ত্রিগুণত্ব ছাড়িতে উপদেশ দিতেছেন।

ত্রিগুণত্ব ছাড়িয়া, নির্দ্বন্দ্ব হইয়া একগুণী হইতে উপদেশ দিতেছেন। নিস্ত্রৈগুণ্য হইয়া নিত্যসত্ত্বস্থ হও, ইহাই ভগবানের আদেশ। নিস্ত্রৈগুণ্য অর্থে ত্রিগুণের অতীত নহে; ত্রিগুণের অতীতই যদি হইবে তবে আবার সত্ত্বস্থ হইতে বলিবেন কেন? নিস্ত্রৈগুণ্য অর্থে নিষ্কাম হইতে পারে না, নিষ্কাম কথাটীর সাধারণ অর্থ লইলে হইতে পারে বটে, কিন্তু নিষ্কাম শব্দটীর যথাযথ অর্থ ব্যবহৃত হইলে উহা জীবত্ব থাকিতে হইতে পারে না। আত্মকামনাশূন্য হইয়া ভগবৎকামনায় পূর্ণ হওয়াকে যদি নিষ্কাম বল, তাহা হইলে সঙ্গত হইতে পারে; নতুবা কামনার একান্ত বিলোপ মায়ে না মিশাইলে হইতে পারে না। নিস্ত্রৈগুণ্য অর্থে ত্রিগুণ-ত্বের রোধ। নিত্যসত্ত্বস্থ হইতে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ত্রিগুণ ভুলিয়া একগুণী হও—সত্ত্বগুণে অবস্থান কর। সৎ বা অস্তিত্ব, এইটুকুর উপর নির্ভর কর। মাতৃবেদনের প্রথম তরঙ্গ মাতৃ-অস্তিত্ব পূর্ণভাবে স্বীকার ও অনুভব কর, তাঁহার স্নেহের অবিরাম ধারা ব্রহ্মাণ্ডের পদার্থ-নিচয়ের ভিতর দিয়া যে ওতপ্রোত ভাবে প্রবাহিত, সেই নিত্যপ্রবাহে অবস্থান করিতে অভ্যাস কর। নিস্ত্রৈগুণ্য অর্থে নির্গুণত্ব বুঝিলে ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিবে, তাহা হইলে এইরূপ বুঝাইবে,—ভগবান্ একবার বলিতেছেন, ত্রিগুণের অতীত হও, আবার বলিতেছেন—সত্ত্বগুণে অবস্থান কর। এইরূপ অর্থবিপর্য্যয় ঘটিয়া যায়। শ্লোকের উদ্দেশ্য উহা নহে। এক-গুণিত্ব প্রাপ্তি না হইলে নির্দ্বন্দ্ব হইতে পারা যায় না। তুমি যতক্ষণ ত্রিগুণের মধ্যে থাকিবে, মাতৃবেদন বা বেদ ততক্ষণ ত্রিমূর্ত্তি ধরিয়া বা তিন গুণের বিষয়ীভূত হইয়া তোমার ধারণায় আসিবে, এবং ঋক্ আদি বেদসকলের ত্রিগুণাত্মক স্থূল মর্ম্মমাত্রই তোমার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবে।

ত্রিগুণ হইতে একগুণিত্ব লাভ করা অর্থে দুই গুণের অপলোপ ও একগুণের সংরক্ষণ নহে, তবে দুইটী গুণের প্রতিপত্তির রোধ ও একটী গুণের প্রবলতা। রজ ও তমোগুণের দমন ও সত্ত্বগুণের পোষণই এ স্থলে লক্ষ্য। বেদের স্থূল আবরণস্বরূপ ফলপ্রতিপাদক কর্ম্মাদি ত্রিগুণাত্মক। সেই ত্রিগুণাত্মক কর্ম্মসকলের ভিতর দিয়া নিত্য মহাসত্তার দিকে লক্ষ্য স্থাপন করাই উক্ত কর্ম্মের লক্ষ্য। ভাব বা বেদনই কর্ম্মসকলের আত্মা। শব্দ, নাম, মন্ত্র ইত্যাদি উহার সূক্ষ্ম দেহ, এবং বাহ্য কর্ম্মাদিই উহার স্থূল শরীর বা বিকাশ। সূক্ষ্ম সনাতন ভগবৎসত্তা, শব্দে বা মন্ত্রে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মাদির দ্বারা সে বিকাশ গাঢ়তর হয়। কর্ম্মাদির মূল লক্ষ্য—ঐ ভাব বা বেদনপ্রকাশ মাত্র। কর্ম্মী যদি কর্ম্মের

ভিতর ঐ বেদন অনুভব করিতে না পারে, শব্দ বা মন্ত্রাদির ভিতর যদি ভগবৎ-সত্তার উপলব্ধি করিতে না পারে, তাহা হইলে মৃত দেহের সেবা করা হয় মাত্র। বেদানুমোদিত কর্ম্ম-সকলের ভিতর দিয়া ভগবৎসত্তার উপলব্ধিটুকু পাইবার জন্যই ভগবান্ অর্জ্জুনকে নিস্ত্রৈগুণ্য হইয়া সত্ত্বস্থ হইতে বলিতেছেন। আলোক-পরমাণু যেমন সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে সঞ্চারিত, গভীরতর অন্ধকারের ভিতরেও আলো-কের তরঙ্গ যেমন স্ফুরিত, মায়ের আমার অক্ষর সত্তাও তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বিকাশ, সমস্ত কর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। তাঁহারই বিকাশ সমস্তকে অনু-প্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে। সূর্য্যের আলোকের দ্বারা যেমন সূর্য্য প্রত্যক্ষীভূত হন,সূর্য্যপ্রকাশের জন্য যেমন অন্য আলোকের প্রয়োজন হয় না,তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডাদি-রূপ মাতৃশক্তি বিকাশের দ্বারাই মা আমার প্রকাশিতা। মাকে দেখিতে অন্য আলোকের প্রয়োজন হয় না। অন্ধকারের ভিতর আলো আমরা দেখিতে পাই না সত্য, কিন্তু জীববিশেষের চক্ষু উহা ধরিতে সক্ষম হয়। জলের ভিতর সমীরণ আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারি না সত্য, কিন্তু জলমধ্যস্থ মৎস্যাদি জলচর জীবসকল উহাতে স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকে। তদ্রূপ আমরা স্ব স্ব গুণানুযায়ী স্ব স্ব সংস্কারের অনুকূল ক্ষেত্রে অবস্থান করি-তেছি, এবং সেই ক্ষেত্রের ভিতর মাতৃ-অনুভূতি স্বচ্ছন্দে লাভ করিতে পারি। এই স্ব স্ব ক্ষেত্রটুকুই আমাদিগের প্রত্যেকের নিজ ধর্ম্ম পালনোপযোগী আধার। জীবমাত্রেরই প্রকৃতি বা সংস্কার বিভিন্ন, সুতরাং প্রত্যেকেরই ভগবদনুভূতির প্রকারও স্বতন্ত্র। সেই জন্য স্ব স্ব ইষ্টদেবতার সন্ধান করিয়া লইতে হয়। আমার ব্যক্তিগত ভাব, আমার নিজস্ব অবস্থা যে ধরণের, ঠিক সেই ভাব, সেই অবস্থার ভিতর মাকে আমার ফুটিয়া উঠিতে হইলে যে রূপে, যে গুণে ফুটিয়া উঠিতে হয়, তাহাই আমার ইষ্টদেবতার রূপ গুণ। ইষ্টদেবতা অর্থে ঈপ্সিত দেবতা। আমি যে ক্ষেত্রে থাকি, যেমন সংস্কারের মধ্যে থাকি, যেমন গুণ ও আধারে অবস্থিত, আমার ইচ্ছাও তদনুযায়ী হয়। অথবা আমার ইচ্ছা, আমার অবস্থা, আমার সংস্কার যেরূপ—আমার কর্ম্মক্ষেত্র ঠিক তদনুরূপ। সুতরাং সেই ইচ্ছা-সঞ্জাত ক্ষেত্রে আবির্ভূতা হইতে হইলে মাকে আমার ঈপ্সিত মূর্ত্তিই ধারণ করিতে হইবে। ইচ্ছাময়ীকে আমার ইচ্ছামত, আমার সংস্কারমত রূপে গুণে ভূষিতা বা সাকারা হইয়া, তবে আমার নিকট আসিতে হইবে, নতুবা উহা আমার উপলব্ধিতে আসিবে না। এ জন্য মা আমার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া

আমাদিগের জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করেন এবং সেই জন্যই উহা ইষ্টদেবতা নামে বিখ্যাত। ইষ্টদেবতা অর্থে ঈপ্সিত দেবতা।

কিন্তু অনেক সময়ে আমরা আমাদের ইচ্ছা যে কি, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের প্রাণের লক্ষ্য কিরূপ, তাহা আমরা অবধারণ করিতে সক্ষম হই না। আমাদের প্রাণ কি চায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অনেক ক্ষেত্রে ভগবৎলাভের ইচ্ছার অস্তিত্বমাত্রও উপলব্ধি হয় না। আমরা স্থূল কর্ম্ম ও ভাবাদি দেখিয়া সময়ে সময়ে এমন কাহাকে কাহাকে মনে করিতে বাধ্য হই, যেন তাহার প্রাণের গভীরতম অন্তঃস্থলেও ভগবৎসন্ধান নাই। কিন্তু তাহা নহে—ভগবৎসন্ধান—ভগবৎলাভেচ্ছা-শূন্য জীব হইতে পারে না। মায়ের জন্য আকুলতা নাই, এমন প্রাণ নাই। কেন না, আকুলতার দ্বারাই এ ব্রহ্মাণ্ড রচিত। মা—তাঁর প্রত্যেক পরমাণুকে মাতৃভাবে আকুল হইয়া আলিঙ্গন করিতে গিয়াই স্থূল জগৎরূপে রচিত হইয়া পড়িয়াছেন। বৎসহারা গাভী যেমন বৎসের উদ্দেশে ধাবিতা হয়, এ ব্রহ্মাণ্ডও তদ্রূপ মহামায়ার ধাবিত অবস্থা মাত্র। এই ধাবনই মায়া বা মায়ার বিকাশ। এক দিকে মহামায়া মা "মা মা" করিয়া ধাবিতা, অন্য দিকে সেই মহামায়ার পরমাণু ক্ষুদ্র মায়ারূপী আমরাও "মা মা" করিয়া মাতৃ-মুখে অগ্রসর। এই উভয়ে যেখানে যখন মিলন হইবে, বিরাট্ যখন ক্ষুদ্রের ভিতর ঢুকিয়া পড়িবে, ক্ষুদ্র যখন বিরাটের অঙ্গে লীন হইবে, তখন 'মা মা' রব রোধ হইবে, তখন শব্দ বন্ধ হইবে, তখন শব্দব্রহ্মাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব সেই-খানে বিলুপ্ত হইবে, তখন সেখানে থাকিবে শুধু—যাহাকে তোমরা পরমাত্মা—পুরুষোত্তমাদি নামে প্রকাশ করিতে বিফল প্রয়াস পাও।

তাই বলিতেছিলাম, প্রত্যেক প্রাণেই মাতৃ-অনুসন্ধানেচ্ছা আছে। কিন্তু ইচ্ছাটীর প্রকার বা অবস্থা আমরা জানি না, সেই জন্য গুরুর শরণাগত হই, সেই জন্য গুরুর প্রয়োজন। গুরু আমার সেই আধ্যাত্মিক ইচ্ছার অবস্থাটুকু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, আমাকে তদনুযায়ী ক্রিয়াদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, আমার ইচ্ছা পূরণের পথ প্রসারিত করিয়া দেন। আমার অজানা, আমার জ্ঞান-চক্ষের অগচোরে আমারই যে ইচ্ছা ছিল, তাহাতেই তিনি প্রতিমা গড়িয়া আমার চক্ষের সম্মুখে ধরেন। অথবা গুরু প্রত্যেক হৃদয়ের অবস্থা পর্য্যালোচনা না করিয়াই স্বীয় শক্তিপ্রভাবে সঞ্জীবিত মন্ত্রাদি প্রদান করিয়া, তাহার দ্বারাই তাহার সে অন্ধকার ঘুচাইয়া দেন। শিষ্য আপনার হৃদয়ে আপনার ইচ্ছার

প্রতিমা দেখিয়া কৃতার্থ হয় ও সাধনার দ্বারা সে প্রতিমাকে সজীব করিয়া তুলে।

যাহা হউক, প্রত্যেক জীবের ইচ্ছার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইলেও তাহার অভ্যন্তরে মাতৃবেদন যে প্রবাহিত, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। সেই বেদনকে সাবয়বত্ব দিতে গিয়া বেদ হইয়াছে। বেদে সেই বেদন সাকারত্ব লাভ করিয়াছে। বৈদিক জ্ঞান ও কর্ম্মাদিতে সেই বেদন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় শরীর লাভ করিয়াছে। সেই বেদন ত্রিগুণাত্মক হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, বৈদিক কর্ম্ম-সকলের বা বেদসকলের স্থূল অবয়বের সেবা ও পরিপোষণ যদি উহার অভ্য-ন্তরস্থ ঐ বেদনকে লক্ষ্য করিয়া না হয়, তাহা হইলে ত্রিগুণাত্মক ফর্ম্মফল মাত্র লাভ হইতে থাকে। সেই জন্য ভগবান্ ঐ ত্রিগুণাত্মক বৈদিক কর্ম্মসকলের দেহের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, উহার আত্মস্বরূপ সেই বেদনটুকুর দিকে লক্ষ্য স্থাপন করিতে বলিতেছেন। ইহারই নাম নিত্যসত্ত্বস্থ হওয়া।

আমরা দেখিতে পাই, মাতৃ-মন্দিরের সম্মুখে পশুবলি। অগণিত মনুষ্য একত্রে দলবদ্ধ হইয়া মা মা শব্দ করিতে করিতে একটী নিরীহ পশুকে মাতৃনামে উৎ-সর্গীকৃত করিয়া যূপকাষ্ঠে তাহাকে আবদ্ধ করে, ঘাতকের শাণিত খড়্গ উত্তোলিত হয়; চারি ধারে বেষ্টন করিয়া মনুষ্যসঙ্ঘ মা মা শব্দে চীৎকার করিতে থাকে—আর তাহাদিগের শত কণ্ঠের সে মা মা চীৎকারকেও অতিক্রম করিয়া সেই নিরীহ ক্ষুদ্র মাতৃসন্তানটীর মা মা শব্দ দিঙ্মণ্ডলে ধাবিত হয়। শত শত মনুষ্য মা মা করিয়া চীৎকার করে, সে পশুও মা মা করিয়া চীৎকার করে—সে ঘাতকও মা মা করিয়া চীৎকার করিতে থাকে। আর বুঝি, আর একজন—যার চক্ষু সর্ব্বত্র বিস্তৃত,—যাহার হৃদয়ের উত্তাল স্নেহ সর্ব্বত্র সঞ্চারিত, মা নামের ঐ বিরাট্ তরঙ্গ একমাত্র যাহার প্রতি প্রযোজ্য, যে সেই মা, বুঝি সেও সেইখানে অন্তরালে থাকিয়া প্রদীপ্ত চক্ষে আকুলহৃদয়ে কর প্রসারণ করিয়া "মা মা" শব্দ করিতে থাকে। শত পুত্র মিলিত হইয়া একটী পুত্রকে ধরিয়া যূপবদ্ধ করিতেছে—মা সেইখানে দাঁড়াইয়া! বুঝ মায়ের প্রাণ! বুঝ মায়ের সেই সময়ের ভাবের সংঘাত—বুঝ, মাতৃ-প্রাণের তৎসাময়িক আন্দোলন! মনুষ্য ডাকে—মা—মা। পশু ডাকে মা—মা। পশুও ছেদিত হয়। মাকে পায় কে? মনে হয়, মাকে বুঝি ওই ছাগশিশুই পায়—মনুষ্য মাংস লইয়া গৃহে যায়।

তাহা নহে। বলির সময়ে সেই পশুকে যদি শিবস্বরূপ অনুভব করা হইয়া থাকে, যদি যজ্ঞকারী শিব ও শক্তির সমন্বয় করিতে সক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে বলি সার্থকতা লাভ করিয়াছে। মাতৃলাভ মনুষ্যেরই হয়, পশুর স্বর্গলাভ বা উর্দ্ধস্তরীয় জীবন লাভ সম্ভবপর। কিন্তু তাহা হয় না। পশু, প্রাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মা মা করে। মনুষ্য মাতৃকৃপার দিকে—আপন সিদ্ধি পূরণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মা মা করে। সুতরাং পশু প্রাণ মাত্র পায়, মনুষ্য সিদ্ধিমাত্র পায়। বৈদিক কার্য্যাদি ও জগতের সমস্ত ভোগ সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে হইবে। ভোগমাত্রেই বলি—কর্ম্মমাত্রেই বলিদান। কর্ম্মরূপ বলিদান দিয়া উদ্দেশ্যসফলতারূপ সিদ্ধি লাভ করি। ভৌতিক সাহায্য ব্যতীত কোন কার্য্যই সংসাধিত হয় না। একটী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই কতকগুলি সমষ্টির পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিতে হয়। যখন আমি আহাররূপ কার্য্যটী সম্পাদন করি, তখন অন্নরূপ ভূত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অর্থাৎ অন্নের অন্নত্ব ঘুচিয়া আমার শরীরপোষণকারী অন্যরূপ ভৌতিক দেহ ধারণ করিতে সেগুলি বাধ্য হয়। যখন আমি চিন্তা করি, আমার মস্তিষ্ক-পরমাণু ধ্বংসিত হয়। এইরূপ স্থূল কর্ম্ম হইতে সূক্ষ্ম চিন্তা অবধি পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা ভৌতিক বলিদান মাত্র দেখিতে পাই। সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বসময়ে এ ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ বলিদান চলিতেছে। এ বলিদানের সময় সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে কর্ম্মী ও কর্ম্ম উভয়ই মা-মা শব্দ করিতেছে। কর্ম্মী স্বীয় অভীষ্ট পূরণের জন্য স্বীয় ইচ্ছারূপ জননীর মুখ চাহিয়া কর্ম্মরূপ বলি অর্পণ করিতেছে; এবং কর্ম্ম আত্মরক্ষার্থ তাহার ইচ্ছারূপ জননীর মুখ চাহিয়া চীৎকার করিতেছে। যদি কর্ম্মী কর্ম্ম করিবার সময় সেই কর্ম্মকে শিবময় করিয়া লইতে পারে, অর্থাৎ সেই কর্ম্মের অভ্যন্তরে নিত্য-মঙ্গলময়, নিত্য সত্য, নিত্যসত্তার উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে কর্ম্ম ও কর্ম্মী উভয়ে শিবত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। নতুবা ইচ্ছারূপ জননীকে উদ্বেলিতা করিয়া মাত্র আমাদিগের কর্ম্মসকল পর্য্যবসিত হয়—কর্ম্ম স্বীয় বাহ্যাঙ্গ অনুযায়ী ফল মাত্র অর্পণ করে। কর্ম্মী ত্রিগুণাত্মক ফলের দিকে লক্ষ্য করিয়া সে কর্ম্ম সাধনা করে বলিয়া সৃষ্টি ও লয়যুক্ত বা জন্ম ও মৃত্যুযুক্ত ফলসকল পাইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রতিলোমক্রমে আমরা জড় জগতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। অর্থাৎ মায়ের আমার সম্পূর্ণ বহির্ম্মুখী আত্মহারা ভাবের দ্বারা

এখন আমরা পরিধৃত। জড় জগৎ যে মাতৃস্নেহের বহির্মুখী অনুভূতির অবস্থা, ইহা যেন মনে থাকে। এইরূপ জড়ত্ব পাইতে মা যে তিন গুণের বা ত্রিশক্তির স্ফুরণ করিয়াছেন, আমাদিগকে মায়ের স্বরূপে গিয়া এখান হইতে মিলিত হইতে হইলে, সেই তিন প্রকার শক্তি স্ফুরিত করিতে হইবে। এবং সেই তিন শক্তি বিলোমক্রমে একগুণ, দুইগুণ, তিনগুণ প্রাপ্ত হইলে, তবে স্বরূপে আত্ম-হারা ভাব বা মাধুর্য্য বা তন্ময়তা লাভ হইবে। মাতৃস্নেহের প্রথম বহির্মুখী স্ফুরণে অর্থাৎ সত্ত্বগুণ বিকাশে যেমন মা স্নেহময়ীরূপে নিজ অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আমাদেরও প্রথম অন্তর্ম্মুখী স্ফুরণে তদ্রূপ সত্ত্বস্থ হইতে হইবে। অর্থাৎ অহর্নিশ আমি যে মাতৃস্নেহের সমুদ্রে নিমজ্জিত, নিত্যজননীর নিত্য ক্রোড়ে আমি যে অবস্থিত, ইহা ধারণা করিতে হইবে। আমি নিশ্চিন্ত, উদ্বেগশূন্য হইব, প্রাণ এক প্রকার অননুভূতপূর্ব্ব স্বাধীনতার ভাবে মগ্ন হইবে। তখন তাহা হইতে সেই ভাব দ্বিগুণিত অর্থাৎ রজত্ব প্রাপ্ত হইবে। সৃষ্টিকালে মায়ের বহির্মুখী স্ফুরণের দ্বিতীয় অবস্থায় মা যেমন রজত্ব প্রাপ্ত হয়েন, মাতৃস্নেহ যেমন দ্বিগুণিত হইয়া ক্রিয়ারূপ পরিগ্রহণ করেন, তদ্রূপ আমাদেরও অনুলোম গতির দ্বিগুণিত অবস্থায় আমরা কার্য্যময় হইয়া পড়ি। আমরা আমাদের প্রত্যেক কার্য্যকে মাতৃ-চরণে নিবেদন করিয়া দিতে ব্যগ্র হইয়া পড়ি। আমরা আহার, নিদ্রা, চিত্তবৃত্তির বৈচিত্র্যময় অভিব্যক্তি-সকল মায়ে অর্পণ করিতে থাকি। দুটি ফুল পাইলে মায়ের চরণ উদ্দেশে নিক্ষেপ করি। একটু জল দেখিলে মাতৃচরণ প্রক্ষালনের জন্য উহা নিবেদন করি। আহার্য্য পাইলে মাকে অর্পণ করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করি। চিত্তে যখন যে ভাব জাগে, তখন তাহা মায়েরই বিকাশ ভাবিয়া, মায়ে মিশাইয়া দিতে প্রয়াস পাই। তখন কার্য্যতঃ নির্যোগ-ক্ষেম হইয়া পড়ি। তখন প্রাপ্ত বস্তুর উপর আর অভিলাষ থাকে না। কি আছে, দেখিবার অবসর প্রাণ পায় না। কি নাই, কি প্রয়োজন, এ সকলের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় না। লব্ধ বস্তুর রক্ষণে ও অপ্রাপ্ত বস্তুর সংগ্রহে প্রাণ বিব্রত থাকে না। যাহা সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহা কিছু স্বাধিকারের মধ্যে দেখিতে পায়, তাহাই, মাতৃ-চরণে ঢালিয়া শান্তি লাভ করে। গ্রাসাচ্ছাদন পর্য্যন্ত যথালব্ধভাবে সম্পন্ন হইতে থাকে। ইহাই অন্তর্ম্মুখী রজত্ব।

তার পর তৃতীয় অবস্থা। সৃষ্টির সময় মাতৃস্নেহ ত্রিগুণিত হইয়া যেমন তমঃ আখ্যা প্রাপ্ত হয়—মা যেমন স্বীয় কার্য্যের উপর আত্মহারা হইয়া পড়েন,

আত্মাহারা হইয়া মা যেমন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তদ্রূপ ভাবে কার্য্য-সকলকে মাতৃচরণাভিমুখে প্রেরণ করিতে করিতে যেন মায়ের চক্ষে আমাদের চক্ষু সংযুক্ত হইয়া পড়ে। মায়ের আমার স্বরূপ লক্ষ্যে আসিয়া পড়ে। মায়ের দর্শন পাই। হাতের ফুল হাতে থাকে—চক্ষে আর পলক পড়ে না, নাসিকায় আর শ্বাস বহে না, হৃৎপিণ্ড আর স্পন্দিত হয় না, প্রাণে আর ভাবপ্রবাহ থাকে না; মায়ে আমার আমিত্ব মিলাইয়া যায়। তখন শুধু আমার মা থাকে। ইহার নাম আত্মবান্ হওয়া। ইহার নাম অন্তর্ম্মুখে তমোগুণপ্রাপ্তি বা ত্রিগুণিত হওয়া। ইহাই শিবত্বের লক্ষণ। মহেশ্বর তমোগুণের দেবতা, প্রতিলোমক্রমে বহির্মুখী বিকাশের সময় তমোগুণ ভূতনাথ বা পঞ্চভূতাত্মক পঞ্চানন। অন্তর্মুখ বিকাশের সময়—শম্ভু।

রজঃপ্রধান ত্রিগুণাত্মক ভাবে কর্ম্মসকল সম্পাদন করিলে ত্রিগুণাত্মক ফলই লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ সে কর্ম্মসকল জন্ম ও মৃত্যু বহন করে। একের ধ্বংস ও অন্যের সৃষ্টি। এক কর্ম্মের বিলোপ ও অন্য কর্ম্মের আরম্ভ—এই ভাবে কর্ম্মসকল চলে। সুতরাং সে সকল কর্ম্মের ভিতর দিয়া আমরাও জন্ম ও মৃত্যু পাইয়া থাকি। মাতৃশক্তি দুই ভাবে কার্য্য করে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী—বিপ্রকর্ষণী ও আকর্ষণী। বহির্মুখে যখন কার্য্য করে, অর্থাৎ যখন বিপ্রকর্ষণী শক্তি ক্রিয়াশীলা থাকে, তখন উহা রজঃপ্রধান এবং অন্তর্মুখে যখন কার্য্য করে, অর্থাৎ যখন আকর্ষণী শক্তিরূপে ক্রিয়াশীলা হয় বা অন্তর্ম্মুখী হয়, তখন উহা সত্ত্বপ্রধান। রজঃপ্রধান অবস্থায় কর্ম্মই প্রধান পরিণাম। রজোগুণ কর্ম্মরূপেই প্রকটিত হয়। এক কর্ম্মের সংসাধন করিতে হইলে অন্য কর্ম্মের ধ্বংস প্রয়োজন। সুতরাং এই রজঃপ্রধান অবস্থায় অর্থাৎ বহির্ম্মুখী অবস্থায় আরম্ভ ও নাশযুক্ত কর্ম্মসকল অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। সেই সকল কর্ম্মের অহর্নিশ সংসাধনে যত্নবান্ থাকিয়া আমরা রজঃপ্রধান কর্ম্মী বলিয়া আরম্ভ ও নাশ বা জন্ম-মৃত্যুরূপ উপাধি বার বার পাইতে থাকি। অন্তর্ম্মুখী হইলে অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান হইলে এই জন্ম-মৃত্যু-বিপর্য্যয় কমিতে থাকে। সত্ত্বগুণ অস্তিত্ব-প্রধান। অন্তর্ম্মুখী অবস্থায় নিজ সত্ত্বা বা ভগবৎসত্ত্বা মূল লক্ষ্য। সুতরাং সত্ত্বপ্রধান হইয়া তাহার উপর রজোগুণাত্মক কর্ম্মসকল অনুষ্ঠিত হইলেও উহা ভগবৎসত্তারই পোষকতা করে। তাই অন্তর্মুখী গতিতে অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান অবস্থায় জন্ম-মৃত্যুর বেগ হ্রাস হয়। সেই জন্যই ভগবান্ নিত্যসত্ত্বস্থ হইতে বলিতেছেন।

তমোগুণ উভয় অবস্থারই চরম। রজঃপ্রধান অবস্থাও তমে গিয়া শেষ হয়, সত্ত্বপ্রধান অবস্থাও তমে গিয়া লয় হয়।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬

সর্ব্বেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যান্যুক্তান্যনন্তানি ফলানি, তানি নাপেক্ষন্তে চেৎ, কিমর্থং তানি ঈশ্বরায়েত্যনুষ্ঠিয়ন্ত ইত্যুচ্যতে। যথা লোকে কূপতড়াগাদ্যনেকস্মিন্ উদপানে পরিচ্ছিন্নোদকে যাবান্ যাবৎপরিমাণঃ স্নানপানাদিরর্থঃ ফলং প্রয়োজনং, স সর্ব্বোঽর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে অপি যোঽর্থঃ, তাবান্ এব সম্পদ্যতে তত্রান্তর্ভবতি ইত্যর্থঃ। এবং তাবান্ তাবৎপরিমাণ এব সম্পদ্যতে সর্ব্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যৎ কর্ম্মফলং সোঽর্থঃ ব্রাহ্মণস্য সন্ন্যাসিনঃ পরমার্থতত্ত্বং বিজানতো যঃ অর্থো যৎ বিজ্ঞানফলং সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ং তস্মিংস্তাবানেব সম্পদ্যতে তত্রৈবান্তর্ভবতি ইত্যর্থঃ।

ব্যবহারিক অর্থ।—সমস্ত স্থান জলপ্লাবিত হইয়া গেলে কূপতড়াগাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে পরিমাণে প্রয়োজন থাকে, ব্রাহ্মণের সমস্ত বেদে ততটুকু মাত্র প্রয়োজন।

যৌগিক অর্থ।—যিনি বেদ জানেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলে। পূর্ব্বোক্ত বেদ যিনি অনুভব করিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। সমস্ত কর্ম্মের ভিতর, সমস্ত পদার্থের ভিতর, সমস্ত স্পন্দনের ভিতর যিনি এই এক স্পন্দন—এই এক বেদ অনুভব করিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য। মাতৃস্নেহের অবিরাম স্ফুরণ যিনি চারি ধার হইতে অবিশ্রান্ত উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি আপনাকে নিত্য মাতৃ-ক্রোড়ে সমুপবিষ্ট বলিয়া ভাবিতে পারেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ভূদেবতা, ব্রাহ্মণ সর্ব্বলোকপূজ্য, ব্রাহ্মণ দেবতা অপেক্ষাও মাতৃ-প্রিয়। মাতৃ-স্নেহের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা একমাত্র ব্রাহ্মণেই দেদীপ্যমান। বুঝি, ব্রাহ্মণরূপ অপূর্ব্ব সন্তান প্রদর্শনই মায়ের এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড রচনার হেতু। ব্রাহ্মণ মাতৃ-অঙ্ক-সংযুক্ত শিশু—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলিপ্ত—ব্রহ্মজ্ঞ। তাই বিষ্ণুবক্ষে ব্রাহ্মণের চরণ চিহ্নিত। সন্তানের কদর একমাত্র মা যেমন অনুভব করেন, তেমন আর কেহই পারে না। ব্রাহ্মণকে চিনিতে মনুষ্যের শক্তি নাই; দেবতারা ব্রাহ্মণের গৌরব আংশিক বুঝেন। ব্রহ্মই ব্রাহ্মণের গৌরব জানেন, ব্রাহ্মণই ব্রহ্মের গৌরব

জানেন। মা যেমন ছেলে জানে, ছেলে যেমন মাকে জানে, এইরূপ মাতা-পুত্রে জানাজানি আর কোথাও প্রতিফলিত হয় না। ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মে তদ্রূপ সম্বন্ধ।

এই ব্রাহ্মণত্ব জীব যত দিন না পায়, যত দিন না জীব, জগতের প্রত্যেক পদার্থে মাতৃ-সত্তা উপলব্ধি করিতে পারে, তত দিন সেই সত্তা উপলব্ধি করিবার জন্য বিশিষ্ট কর্ম্ম তাহাকে অবলম্বন করিতে হয়—বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রকার জ্ঞান, বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রকার ভাবের দ্বারা তাহাকে চালিত হইতে হয়। সেই ভাব, সেই জ্ঞান, সেই কর্ম্মসকল বেদরূপে জগতে প্রচলিত। ভূমণ্ডলের অভ্যন্তরস্থ সর্ব্বত্র সঞ্চারিণী জলধারা পাইতে হইলে ভূপৃষ্ঠস্থ জীবকে যেমন কূপ তড়াগাদি খনন করিতে হয়, কূপাদি কাটিয়া যেমন ভূগর্ভস্থ বারিপানে জীব কৃতার্থ হয়, তদ্রূপ সাধারণ জীবকে এ জগতে ঐ সকল বৈদিক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়া তবে মাতৃ-স্নেহের আভাস পাইতে হয়। মাতৃস্নেহ ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়া ওতপ্রোতভাবে প্রবাহিত সত্ত্বেও যাহারা উহা উপলব্ধি করিতে এখনও পারে নাই, তাহাদিগকে এইরূপে কর্ম্মাদিরূপ কূপ তড়াগাদির সাহায্য লইতে হয়। কিন্তু যে সর্ব্বত্র এ স্নেহের সন্ধান পাইয়াছে, সর্ব্বকর্ম্মে মাতৃ-সত্তা যে উপলব্ধি করিয়াছে, তাহার পক্ষে ঐ বিশিষ্ট বিশিষ্ট কূপ তড়াগাদির প্রয়োজনীয়তা অতি অল্প। সমস্ত ভূমণ্ডল সলিলাপ্লুত হইলে কূপ তড়াগাদির অন্বেষণ যেমন নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে—কূপ তড়াগাদির বিশিষ্টতা যেমন ঘুচিয়া যায়, তদ্রূপ মাতৃ-স্নেহ-সলিলের পরিপ্লাবন সর্ব্বত্র অনুভূত হইলে ঐ সকল বৈদিক কর্ম্ম ভাবাদিও নিষ্প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে, উহাদিগের বিশিষ্টতা তেমনই ঘুচিয়া যায়। স্নেহের কূলপরিপ্লাবি স্রোতে তাহার বিষয়াদি সমস্ত জ্ঞান নিমগ্ন হইয়া যায়; সে প্রবাহে প্রবাহে, স্পন্দনে স্পন্দনে, ভাবে ভাবে একমাত্র মাতৃ-স্নেহ উপলব্ধি করে। তখন তাহার নাম ব্রাহ্মণ হয়।

পূর্ব্বে যে প্রজ্ঞার কথা বলিয়াছি, সেই প্রজ্ঞার সম্যক্ অনুশীলনে জীব ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। এইরূপ ব্রাহ্মণত্ব লাভই জীবের উদ্দেশ্য—এইরূপ ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্যই ব্রহ্মাণ্ডে গতি নিয়ন্ত্রিত। ইহাই প্রত্যেক পরমাণুর লক্ষ্য, ইহা প্রত্যেক জীবাণুর আদর্শ, ইহাই জীবের চরম গতি। ইহা পাইতে হইলে পূর্ব্ব-শ্লোকপ্রতিপাদিত নিত্যসত্ত্বস্থ ভাব, নির্যোগক্ষেম ভাব অবলম্বনীয়। যতক্ষণ জীব ব্রাহ্মণ না হয়, ততক্ষণ মন্ত্র, যাগ-যজ্ঞ, সাধনা, সিদ্ধি ইত্যাদির আবশ্যকত

থাকিতে পারে; কিন্তু জীব ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া পড়িলে একমাত্র ব্রহ্মেই, একমাত্র মায়েই সে সব পায়। তাহার সমস্ত আশার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী ঐ বিরাট্ প্রাপ্তিতে লীন হইয়া পড়ে।

বুদ্ধিযোগ বা প্রজ্ঞার কথা হইতে সূচনা করিয়া এই অবধি ভগবান্ যাহা বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই,—

তুমি সমস্ত ভাবের ভিতর প্রজ্ঞা অবলম্বন কর। অর্থাৎ সমস্ত ভাবের ভিতর মাতৃ-স্নেহ দর্শনের জন্য হৃদয় বাড়াইয়া দাও। এই ধর্ম্ম অল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও ইহা মহাভয় হইতে তোমায় রক্ষা করিবে। মাতৃ-স্নেহ সর্ব্বত্র যে প্রসৃত, এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অবলম্বন কর, তোমার অনন্ত শাখাযুক্ত অনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে এই প্রজ্ঞাভিমুখী কর; করিলে তবে তুমি মাতৃযুক্ত হইতে সক্ষম হইতে পারিবে। যে সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্মাদির অনুশীলনের বিধি আছে, সেই সকল অনুশীলনের ফলগুলিতে যত দিন তোমার কামনা থাকিবে, তত দিন তোমার জন্ম মৃত্যু লাভ করিতে হইবে—তত দিন তুমি মাতৃস্থ হইতে সক্ষম হইবে না। এ সকল অনুশীলন বিধিযুক্ত হইলেও উহারা ত্রিগুণাত্মক। তুমি উহাদিগের আরম্ভ ও ফল বা রজঃ ও তমঃ, এই দুইটি অংশ যেন বাদ দিয়া, উহার অভ্যন্তরস্থ সত্ত্বগুণটুকুতে মাত্র লক্ষ্য স্থাপিত কর। অর্থাৎ যে কর্ম্ম সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তাহার ফলের দিকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মের আবাহন করিও না বা এই কর্ম্ম হইতে এই লাভ করিব, এইরূপ ভাবিও না। তবে আগত কর্ম্মের ভিতর নিত্যসত্ত্বস্থ ভাব অর্থাৎ সকল কর্ম্মের ভিতর মাতৃ-সত্তা বা মাতৃ-অস্তিত্ব অথবা নিজ সত্ত্বা বা নিজ অস্তিত্ব, এইটুকু মাত্র অনুভব কর। নির্যোগ-ক্ষেম হও অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণে যত্নবান্ হইও না—অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্তির জন্য উদ্‌গ্রীব হইও না। আত্মবান্ হও।

নিত্যসত্ত্বস্থ হইলেই নির্যোগক্ষেমত্ব আসিয়া পড়ে। কর্ম্মের মধ্যে শুধু নিত্য-সত্ত্বস্থ হইতে হইলে, এক মহাসত্তার অনুসন্ধানতৎপর হইলে, তখন কর্ম্মফল-স্বরূপ প্রাপ্ত বস্তুসকলের উপর আর লক্ষ্য থাকে না। ভগবৎসত্তার বিকাশ প্রাণের উপর নিত্য আধিপত্য লাভ করিলে, তখন আর স্থূল ভৌতিক অস্তিত্ব ও তাহার সংরক্ষণের উপর চিত্ত অনুলিপ্ত থাকে না; প্রাপ্ত বিষয়াদির রক্ষণ ও অপ্রাপ্ত বিষয়াদির অর্জ্জনের জন্য প্রাণ চিন্তিত থাকে না; অর্থাৎ তখন নির্যোগ-ক্ষেম হইয়া পড়ে। তার পর ক্রমশঃ সাধক আত্মবান্ হয়—আত্মার স্বরূপ

উপলব্ধি করিতে পারে। এই জন্য মূলশ্লোকে অগ্রে নিত্যসত্ত্বস্থ, তার পর নির্যোগক্ষেম, তার পর আত্মবান্, এইরূপে এই অবস্থাত্রয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বাহ্যিক স্থূল বিষয়াদিতেও যেরূপ, মানসিক ক্ষেত্রেও ঠিক তদ্রূপ অবস্থা পরিলক্ষিত। চিত্ত ভগবৎসত্তায় মিশিতে আরম্ভ হইলে তখন জ্ঞান, বুদ্ধি, সিদ্ধি ইত্যাদি কি আছে বা পাইয়াছি—কি থাকিবে বা প্রাপ্ত হইব, এ দিকে তাহার লক্ষ্য থাকে না। পক্ষী যেমন চঞ্চুদ্বারা আবর্জ্জনারাশির মধ্য হইতেও বাছিয়া বাছিয়া আহার্য্য উঠাইয়া লয়, তদ্রূপ সে তখন অন্যান্য মানসিক চিন্তা আবর্জ্জনাবৎ সরাইয়া, শুধু ভগবদন্বেষণে তৎপর থাকে ও ক্রমশঃ আত্মবান্ হইয়া উঠে।

যাহা হউক, এইরূপ দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ সমগ্র চিত্ত ভগবদ্‌ভাবাপ্লুত হইয়া যায়। মাতৃভাবে বাহ্য জগৎ ডুবিয়া যায়—মাতৃভাবে হৃদয় অহর্নিশ প্লাবিত হইয়া থাকে। জলপরিপ্লাবনে কূপ তড়াগাদির যেমন আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না, তদ্রূপ এক মাতৃভাব ছাড়া অন্য কোন চিন্তা তাহার হৃদয়-ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হয় না। স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত ক্ষেত্রে সে এক বিরাট্ স্নেহ-সমুদ্রের সত্তামাত্র অনুভব করে। অর্থাৎ পূর্ব্বশ্লোকে "আত্মবান্ হও" বলিয়া যে অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই যথার্থ প্রকটিত হয়। সেই আত্মবান্ অবস্থাটী বিশেষ ভাবে বুঝাইবার জন্যই যেন "যাবানর্থ উদপানে" ইত্যাদি শ্লোকটী বর্ণনা করা হইয়াছে।

এইরূপে প্রজ্ঞা হইতে সূচনা করিয়া জীব কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে, তাহাই দেখান হইল।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥৪৭

কর্ম্মণি এব অধিকারঃ, তে তব তত্রচ কর্ম্ম কুর্ব্বতো মা ফলে অধিকারঃ অস্তু কর্ম্মফলতৃষ্ণা মাভূৎ কদাচন কস্যাঞ্চিদপি অবস্থায়াং ইত্যর্থঃ। যদা কর্ম্মফলে তৃষ্ণা তে স্যাৎ, তদা কর্ম্মফলপ্রাপ্তের্হেতুঃ স্যাৎ এবং মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ, যদাহি কর্ম্মফলতৃষ্ণাপ্রযুক্তঃ কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে, তদা কর্ম্মফলস্যৈব জন্মনো হেতুর্ভবেৎ। যদি কর্ম্মফলং নেষ্যতে, কিং কর্ম্মণা দুঃখরূপেণেতি মা তে তব সঙ্গোঽস্তু। অকর্ম্মণি অকরণে প্রীতির্মাভূৎ। জ্ঞানাধিকারিণোঽপি কর্ম্মত্যাগপ্রসক্তিং

নিবারয়তি কর্ম্মণি এব তে অধিকারং আহ, ন ত্যাগে ইতি। নহি তত্র ব্রাহ্মণস্য অধিকারঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ।

ব্যবহারিক অর্থ।—কর্ম্মে তোমার অধিকার হউক, কর্ম্মফলে যেন না হয়—কর্ম্মফলে যেন তোমার আসক্তি না জন্মায়। তুমি কর্ম্মফলার্থী হইও না, ফল যেন তোমার কর্ম্মাসক্তির হেতু না হয় এবং কর্ম্ম করিব না—এরূপ আসক্তিও যেন তোমার না থাকে। অথবা ফলযুক্ত কর্ম্মে যেন তোমার সঙ্গ না হয়।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে কর্ম্মসকল ফলপ্রদ ও জন্মমৃত্যুবন্ধনযুক্ত বলায় কর্ম্মসকলে অনাস্থা আসিতে পারে। নির্যোগক্ষেম হইতে বলায়, সে আশঙ্কা আরও দৃঢ় হইয়াছে। ব্রাহ্মণের বেদে অথবা বেদবিহিত কর্ম্মে অতি সামান্য প্রয়োজন বলায়, আরও প্রবলভাবে আশঙ্কা উৎপাদন করা হইয়াছে। প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণে ও অপ্রাপ্ত বস্তুর আহরণে অনাসক্ত হইতে বলায়, সাধক মনে করিতে পারে, তবে কর্ম্মের আবশ্যকতা কি? ভোগ-সকল যখন জন্মমৃত্যুর কারণ—কর্ম্মমাত্রই যখন ভোগপ্রদ--চিন্তামাত্রই যখন ভোগপ্রদ এবং ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইলে যখন বস্তুতঃ কর্ম্মসকলের আবশ্যকতা নাই, তখন কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেও ত কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে? সেই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ ভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন, কর্ম্মে অধিকার হউক, ফলে অধিকার যেন না হয়।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির যথার্থ মর্ম্মার্থ সাধক যখন প্রাণের ভিতর গ্রহণ করে—যখন সাধক কর্ম্ম সম্বন্ধে ঐরূপ আশঙ্কায় ভীত হয়, তখন বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সাধক বুঝিতে পারে, কর্ম্ম-সকলের ফলটুকুর উপর মাত্র দোষ পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু কর্ম্মের উপর ত কোন দোষ আসে না? সাধক দেখে, কর্ম্মে তাহার অধিকার সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। যাহার উপর প্রাণ পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করে, তাহাই আমার অধিকারভূত। জীবমাত্রই এইরূপ কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমান। চিন্তা, বিষয়াদি গ্রহণ, এ সমস্ত জীবমাত্রের হৃদয়ে স্বতঃসঞ্জাত, উহার জন্য জীবকে সচেষ্ট হইতে হয় না। কর্ম্মসকল আপনা হইতে জীবহৃদয়ে উদ্ভূত হইতে থাকে। সুতরাং জীবের কর্ম্মে অধিকার আছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তবে জীবের ফলে অধিকার নাই। কর্ম্ম করিলেও আমরা তৎকর্ম্মের লক্ষ্যীভূত ফল সকল সময়ে পাই না। কর্ম্ম যত দিন না পূর্ণমাত্রায় ঘনীভূত হয়, তত দিন উহা ফল প্রসব করে না এবং কর্ম্ম এইরূপ ঘনীভূতি লাভ করিতে যেন আমার বাহিরে অন্য কোন শক্তির মুখ চাহিয়া অপেক্ষা করে। কর্ম্মে অধিকার আছে

সত্য, কিন্তু কখন্ কোন্ কর্ম্ম আমার দ্বারা কৃত হইবে, সে বিষয়ে আমি অনিশ্চিত। কর্ম্মসকল যেন কোন দুর্গম গুহা হইতে ফুটিয়া উঠে ও কালপূর্ণে আমাকে ফলে অভিষিক্ত করে। জীব কোন্ মুহূর্ত্তে কি কাজ করিয়া ফেলিবে, কোন্ মুহূর্ত্তে কিরূপ চিন্তায় নিযুক্ত হইয়া পড়িবে, তাহা তৎপূর্ব্বমুহূর্ত্তেও নির্দ্ধারিত করিয়া বলিতে পারে না। কর্ম্ম প্রতি মুহূর্ত্তে আসিতে পারে সত্য, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কর্ম্ম অসিয়া বিষয়-ভোগরূপ ফল আমার উপর ঢালিয়া দিতেছে সত্য; কিন্তু কোন্ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম কোন্ নির্দ্দিষ্ট ফল লইয়া আসিবে, তাহা জীবের বুদ্ধির অতীত। সাধারণ জীবের শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস, গন্ধাদি গ্রহণরূপ কর্ম্মগুলি ছাড়িয়া দিলেও বিশিষ্ট বিশিষ্ট কর্ম্মের ভিতরও ইহা সর্ব্বসময়ে প্রত্যক্ষ হয়। এই যাহাকে ঈশ্বর-চিন্তায় রত দেখিতেছি, পরমুহূর্ত্তেই তাহাকে পাপাসক্ত দেখিতে পাই—এই যাহাকে দুর্বৃত্ত বলিয়া পরিগণিত করিতেছি, পর মুহূর্ত্তে হয় ত তাহাকে "মা মা" করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত দেখিতে পারি—এই মুহূর্ত্তে যে সমাজের ঘোরতর বিপ্লবকারী নাস্তিকরূপে আমাদের চক্ষে প্রতিফলিত হইতেছে, পর মুহূর্ত্তে হয় ত সেই সমাজের শীর্ষাসন গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচারে কৃতসঙ্কল্প। কর্ম্মের এ গতি বুঝি দুর্জ্জের়।

এইরূপ চিন্তা প্রাণের ভিতর প্রবল হইলে ও স্থিরভাবে চিৎশক্তি উহার উপর চালিত করিলে, আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই—আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি, আমাদিগের শক্তি কর্ম্মরূপে অবিশ্রান্ত বিকশিত হইতেছে ও হইবে। কিন্তু কোন্‌রূপ অবস্থায় ফুটিবে—কি প্রকারে ঘনীভূত হইয়া কোন্‌রূপ ফলের মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া বা কোন্‌রূপে ফলবান্ হইয়া উহা আসিবে, তাহা যেন আমার অধিকারের বহির্ভূত। শক্তির বিকাশ অনিবার্য্য; কিন্তু বিকাশের ক্রম, মাত্রা, অবস্থা ও ধর্ম্ম, ইহা যেন জীবের অগোচর। কর্ম্মরূপে শক্তিরূপিণী মা আমার অহর্নিশ আমার চিত্তক্ষেত্র রঞ্জনা করিতেছেন—ইহা স্থির; কিন্তু সিদ্ধি, বর, আশীর্ব্বাদ অস্থির—ইহা মাতৃ-ইচ্ছান্তর্ভুক্ত, ইহা যেন আমার শক্তির বাহিরে। তবে প্রধানতঃ ইহা হইতে এই দেখিতে পাইলাম—কর্ম্মের কর্ম্মাংশে আমার অধিকার আছে সত্য, কিন্তু ফল আমার অধিকারের বাহিরে।

কর্ম্মের কর্ম্মাংশে দোষ নাই, ফলাংশে মাত্র দোষ। সুতরাং ভোগরূপ কর্ম্মফলের দিকে চাহিয়া কর্ম্ম না করিলে, বন্ধন আশঙ্কা তিরোহিত হয়। কিন্তু এমন মনে হইতে পারে, এত গোলমালে না গিয়া কর্ম্মরোধ হইয়া গেলেও ত

ক্ষতি ছিল না? কর্ম্মরোধ করিয়া দিলেই ত গণ্ডগোল চুকিয়া যায়? কিন্তু তাহা হয় না,—কর্ম্মের ভিতর ইহা একটী গূঢ় রহস্য। কর্ম্মের ফলের দিকে না চাহিলে, আপাতভোগ্য ভোগসকলের দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইলে কর্ম্মের শক্তি বর্দ্ধিত হয়। যেমন জলস্রোতের সম্মুখে শিলাখণ্ড থাকিলে, উহাতে স্রোত রোধ প্রাপ্ত হইয়া তরঙ্গরূপ ফল রচিত হয় ও স্রোতের গতি আংশিক ভাবে প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু সে প্রস্তরখণ্ড অপসারিত করিলে সে তরঙ্গ ঘুচিয়া যায় ও স্রোত প্রবলতর হয়, তদ্রূপ আমার শক্তির বিকাশরূপ কর্ম্মস্রোতের মুখে ফলাকাঙ্ক্ষারূপ শিলাখণ্ড-সকল সন্নিবেশিত থাকায় উহাতে জন্মমৃত্যুরূপ তরঙ্গ রচিত হইতেছে—বন্ধনরূপে আমার সে শক্তিস্রোত মন্দীভূত হইতেছে। যদি কর্ম্মের আপাতভোগ্য ফলরূপ ঐ শিলাখণ্ড-সকল আমার কর্ম্মস্রোতের মুখ হইতে অপসারিত করিয়া ফেলি, তাহা হইলে সে স্রোত দ্বিগুণ মাত্রায় পরিবর্দ্ধিত হইবে—কর্ম্মপ্রবাহ বর্দ্ধিত ব্যতীত হ্রাস প্রাপ্ত হইবে না। দিঙ্‌মণ্ডলের, ভাবমণ্ডলের, ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের কোন স্থানে বাধা প্রাপ্ত না হইয়া, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী, সর্ব্বদিক্‌প্রসারিণী, দিগ্বসনা, ভাবময়ী মায়ের আমার সর্ব্বাঙ্গ আমার কর্ম্ম প্লাবিত করিবে। তরঙ্গের দিক্ হইতে লক্ষ্য ফিরাইয়া মূল স্রোতের দিকে স্থাপিত করিলেই কর্ম্ম বা আমার বিকাশ বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। প্রাণ যেন উল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িবে, স্বাধীনতার অমৃতময় আস্বাদন প্রাণের ভিতর ফুটিয়া উঠিবে। মনে হইবে, আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে কোন মঙ্গলময়ী মহাশক্তি দাঁড়াইয়া, মঙ্গলময় কর প্রসারিত করিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছেন,—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥"

"তোমার কর্ম্মে অধিকার হউক, ফলাভিসন্ধি ঘুচিয়া যাউক, ফলের দিক্ হইতে লক্ষ্য অপসৃত হউক—কর্ম্মহীনতার সঙ্গ দূর হউক।"

যত দিন ফলের দিকে যে পরিমাণে লক্ষ্য থাকে, তত দিন সেই পরিমাণে আমরা কর্ম্মহীনতা প্রাপ্ত হই। যে পরিমাণে ভোগরূপ ফলের দিক্ হইতে লক্ষ্য ফিরাইয়া লইতে সক্ষম হই, সেই পরিমাণে কর্ম্মাধিকার পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহা কর্ম্মের একটী অপূর্ব্ব গুপ্তরহস্য।

"অকর্ম্মণি"—অকর্ম্ম অবস্থা বা কর্ম্মহীনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইলে, কর্ম্মহীনতা আসিয়া পড়িতে পারে। ফলই আমাদিগকে কর্ম্মের দিকে ছুটাইয়া লইয়া যায়। সুতরাং ফলে আসক্তি না থাকিলে কর্ম্মও রোধ হইবে—এইরূপ আশঙ্কা থাকিতে পারে। সেই আশঙ্কা তিরোহিত করিবার জন্যই ভগবান্ বলিতেছেন,—"তোমার যেন কর্ম্মহীনতার বা অকর্ম্ম অবস্থার সঙ্গ না হয়।" ফলের উপর লক্ষ্য থাকিবে অথচ কর্ম্মরোধ হইবে না, এইরূপ উভয় বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা হইবার একমাত্র উপায়, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিত্যসত্ত্বস্থ হওয়া। নিত্য অস্তিত্ব অনুভবের জন্য, নিত্য-আশ্রয়ের সন্ধানের জন্য প্রাণে প্রগাঢ় আসক্তি থাকিলেই, উহা কর্ম্মসকলের বাহ্য ফল হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া, কর্ম্মের মধ্যেই তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য লালায়িত হইবে। কর্ম্মসকল আর ক্ষুদ্র কূপবৎ মনুষ্য-হৃদয়ের তরঙ্গমাত্র বলিয়া না বুঝিয়া, বিরাট্ সমুদ্রের আনন্দলহরী বলিয়া তখন জীব বুঝিতে থাকিবে। তাহার স্বার্থের গণ্ডী কর্ম্মের সীমা নির্দ্দেশ করিবে না, অসীম উদার আকাশবৎ ব্রহ্মক্ষেত্র তাহার কর্ম্মক্ষেত্ররূপে প্রতিফলিত হইবে।

'অকর্ম্মণি' শব্দটি ব্যবহার করিবার আর একটী উদ্দেশ্য আছে। কর্ম্মমাত্রই যদি ভগবৎ-সন্ধানাভিমুখী হয়, তবেই উহা কর্ম্মপদবাচ্য; নতুবা অকর্ম্মরূপে পরিগণিত। আমাদিগের জীবন-যাত্রার প্রত্যেক কর্ম্ম—অনন্ত জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপই যদিও আমাদিগকে মাতৃসন্নিধানে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে, তত্রাচ যতক্ষণ ঠিক ওই চক্ষে কর্ম্ম-সকলকে উপলব্ধি না করি, যতক্ষণ না কর্ম্মরূপ প্রতি পদবিক্ষেপে, তীর্থযাত্রীর চক্ষের সুদূর তীর্থমন্দিরের চূড়ার মত মায়ের আমার হিরণ্ময় মন্দির ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া প্রতিভাত হইতে থাকে, ততক্ষণ ওই কর্ম্মসকল অকর্ম্ম-পদবাচ্য। তীর্থযাত্রী পথ-ধূলির দিকে যতক্ষণ লক্ষ্য রাখে, পথ-পর্য্যটনের সাময়িক ক্লান্তি শ্রম আদির দিকে যতক্ষণ চাহিয়া থাকে, ততক্ষণ যন্ত্রণা অনুভব করে, অবসাদ ভোগ করে, বিশ্রামের জন্য চঞ্চল হয়, পথ-কষ্টসকল অনুভবে আইসে। কিন্তু সুদূর তীর্থ-মন্দির যখন মনে পড়ে অথবা তাহার ঈষৎ অংশমাত্রও যখন প্রত্যক্ষ হয়, তখন পথপর্য্যটন-ক্লেশ, অবসাদ লক্ষ্যে আসে না। তখন চরণ দ্রুত হয়, তখন আনন্দে প্রাণ ফুলিয়া উঠিয়া তাহার পদক্ষেপের মাত্রা পরিবর্দ্ধিত করে। সেই জন্য আমাদিগকে আপাত-ভোগ্য ফলসকলের দিক্ হইতে লক্ষ্য তুলিয়া নিত্য-মঙ্গলময়ী মায়ের দিকে লক্ষ্য স্থাপিত করিতে বলা হইয়াছে।

ইহাকেই সাধারণতঃ নিষ্কাম অবস্থা বলে। কর্ম্মসকলের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ফলের দিকে যতক্ষণ দৃষ্টি থাকে, সাধারণ কথায় ততক্ষণ উহা সকাম এবং ঐরূপ ফলাভিসন্ধি ঘুচিলেই উহা সাধারণ নিষ্কামপদবাচ্য।

এখন আমরা বুঝিলাম, সকল কর্ম্মই অকর্ম্ম হইতে পারে, আবার সকল অকর্ম্মও কর্ম্ম হইতে পারে। সমাজে মহাপাপ বলিয়া যাহা পরিগণিত, তাহাও হয় ত অবস্থাবিশেষে কর্ম্ম বা সুকর্ম্মরূপে প্রতীয়মান হইয়া উঠে, আবার যে কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুণ্যময় ও ধর্ম্মযুক্ত বলিয়া জানি, অবস্থাবিশেষে তাহাও অকর্ম্মরূপে পরিগণিত হয়। যত নিকৃষ্ট কর্ম্মই হউক, মাতৃসন্ধান থাকিলেই তাহা কর্ম্ম—যত উৎকৃষ্ট কর্ম্মই হউক, মাতৃ-সন্ধান তাহাতে না থাকিলে তাহা অকর্ম্ম।

"মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি"—তোমার যেন অকর্ম্মের বা কর্ম্মহীনতার সঙ্গ না হয়, ইহা বলায় আমরা বুঝিলাম, মা পূর্ব্বে যে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে"—কর্ম্মে তোমার অধিকার হউক বলিয়াছেন, সেই কথাই বলবৎ করিয়াছেন। কর্ম্মে তোমার অধিকার বিস্তৃত হউক, কর্ম্মহীনতার কবল হইতে তুমি পরিত্রাণ পাও, তোমার সকল কর্ম্ম মাতৃভাবময় হউক, ইহাই মায়ের আশীর্ব্বাদ। এইরূপ হইবার উপায়—ফলের উপর অধিকার বিস্তারের দিকে লক্ষ্য না থাকা। ফলে তোমার অধিকার যেন না হয়, ফলসকল যেন তোমার কর্ম্মসকলের হেতু না হয়, তাহা হইলেই এ কর্ম্মাধিকার পরিবর্দ্ধিত হইবে, তাহা হইলেই অকর্ম্ম-সঙ্গ হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

পূর্ব্বে যে "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" ইত্যাদি শ্লোক আছে, এই শ্লোকটী তাহারই আরও বিস্তৃত মর্ম্ম বলা যাইতে পারে। "নিত্যসত্ত্বস্থ হও" এই কথাটি উক্ত শ্লোকে কথিত হইয়াছে এবং নিত্যসত্ত্বস্থ হইলেই কর্ম্মাধিকার সম্বন্ধে যেরূপ অবস্থা হইবে, তাহা বলাই এই শ্লোকের অভিপ্রায়।

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" এই আদিশ্লোকে আর একটী কথা আছে, "আত্মবান্ হও।" নিত্যসত্ত্বস্থ হইলে, কর্ম্মাধিকার এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপকতা পাইলে, তবে আত্মবান্ হইতে পারা যায়। আত্মবান্ হওয়ার ইহাই লক্ষণ। যখন এইরূপে আত্মবান্ হইবে, যখন সর্ব্বত্র এইরূপে আত্মাধিকার বিস্তৃত হইবে, সর্ব্বকর্ম্ম-ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে ফল্গুনদীর মত যে মাতৃঅন্বেষণ আছে, সেই সর্ব্বাবস্থার সাধারণ স্রোত যখন তুমি অবলম্বন করিতে পারিবে, তখন তুমি সর্ব্বব্যাপকতা

প্রাপ্ত হইবে, তখন সর্ব্বত্র মাতৃ-স্নেহোদকের যে পরিপ্লাবন আছে, তাহাতে অবগাহন করিতে সমর্থ হইবে—তখন তুমি ব্রাহ্মণ হইবে—তখন কর্ম্মরূপ তরঙ্গ আর তোমাতে থাকিবে না, অথবা সে তরঙ্গ তোমার উপলব্ধিতে আসিবে না। কিন্তু এখন যত দিন না সে ব্রাহ্মণত্ব তুমি লাভ কর—তত দিন এইরূপে কর্ম্মাধিকার বাড়াইতে হইবে। "যাবানর্থ উদপানে" আদিশ্লোকের সহিত এই শ্লোকের এইরূপ সমন্বয়। অর্থাৎ নিত্যসত্ত্বস্থ হওয়া—কর্ম্মাধিকার বিস্তৃত করা, ইত্যাদি মাতৃ-স্নেহ অনুভূতির জন্য সচেষ্ট হওয়া মাত্র। আত্মবান্ হওয়া, ব্রাহ্মণ হওয়া সেই মাতৃস্নেহ, সেই মাতৃ-বেদন লাভ করা। আত্মবান্ হইলে তবে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। এখন তুমি ত ব্রাহ্মণ হও নাই, এখন সাধনার সর্ব্বোচ্চ শিখরে তুমি ত আরোহণ করিতে সমর্থ হও নাই। এখন কর্ম্মেই তোমার অধিকার বিস্তারের প্রয়োজন।

তাহা হইলে 'অকর্ম্মণি' শব্দটির কর্ম্মহীনতা অর্থ পাইলাম। কর্ম্মহীনতা, সাধারণ কর্ম্মের অভাব হইলে হইতে পারে। আবার কর্ম্মের অভাব না হইলেও কর্ম্মহীনতা আসিতে পারে। কেন না, ভগবদ্‌বেদনশূন্য কর্ম্মও অকর্ম্ম। ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বক্ষণ অবধি কর্ম্মরক্ষার প্রয়োজন। কেন না, কর্ম্মরূপ ক্ষেত্রেই মাতৃবেদন ফুটিয়া উঠিয়া তবে প্রাণে অনুভূতি জন্মাইবে। সুতরাং সে কর্ম্ম রক্ষার জন্য পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা তিরোহিত করা আবশ্যক। উহার উপর নিত্যসত্ত্বস্থ হওয়া।

কর্ম্মে তোমার অধিকার হউক—এই কথা বলায় মনে হয়, কর্ম্মে বুঝি আমার অধিকার নাই। বস্তুতই এখন যেন কর্ম্মে আমার অধিকার নাই। এখন তুমি কর্ত্তা ভাবিও না। যত দিন মাকে মা বলিয়া না চিনিবে, তত দিন কর্ম্মেরই আমার উপর অধিকার বিদ্যমান। আমার দ্বারা কর্ম্ম এখন চালিত নহে—কর্ম্মের দ্বারা এখন যেন আমি চালিত। কর্ম্মের উপর আমার আধিপত্য নাই, আমার উপর কর্ম্মের আধিপত্য। কর্ম্ম তাহার মনোমুগ্ধকর ফলটি আমার চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া আমায় ভুলাইয়া ভুলাইয়া লইয়া চলিয়াছে। আমি সেই সৌন্দর্য্যরাগময় ফলটির দিকে চাহিয়া ছুটিয়াছি। লক্ষ লক্ষ কর্ম্ম, লক্ষ লক্ষ এইরূপ ফল ধরিয়া আমার সম্মুখে। আমি সে সৌন্দর্য্যচ্ছটায় বিভোর—আত্মহারা। চাহিয়া চাহিয়া চক্ষুঃ ঝলসিয়া যাইতেছে, যন্ত্রণায় চক্ষুঃ ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, তবু মুদিত চক্ষে একবার বিশ্রাম লাভ করি, এমন অবসর ত পাইতেছি না? তীব্র যন্ত্রণায়

তাড়নায় একবার একবার মা মা করিয়া কাঁদিয়া উঠি সত্য, কিন্তু সে চক্ষের যন্ত্রণায় নহে—সে ক্রন্দন, সে যন্ত্রণা—ফলপ্রাপ্তির অভাবে। হাত বাড়াইয়া কোন একটী ফল যখন করায়ত্ত করিতে না পারি, তখনই কাঁদি। কোন অজ্ঞেয় শক্তির সাহায্যের জন্য তখন একবার চারি ধারে চক্ষুঃ ফিরাই। আবার ফলের দিকে লক্ষ্য পড়ে—আবার ছুটি, আবার হাত বাড়াই। যে ফলগুলি পাই, তাহাই খাই—তাহাই আবার ছুটায়। ছুটিতে ছুটিতে ক্রমশঃ ক্লান্তি অবসাদ, গতি শ্লথ করিয়া দেয়; তখন এই ফলফুলময় কর্ম্মমণ্ডল মরীচিকা বলিয়া বোধ হয়—ভ্রান্তি, অসার যন্ত্রণারস্বপ্ন বলিয়া ধারণায় আসে। ফল মিথ্যা—কর্ম্ম মিথ্যা—জগৎ মিথ্যা—প্রাণ মিথ্যার ছবিতে পূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু গতি বন্ধ হয় না—ছোটা কমে না। তখন মিথ্যার বেষ্টনের ভিতর হইতে বাহির হইবার জন্য ছুটি। দূরে তখন সত্যফলযুক্ত কর্ম্ম যেন দেখিতে পাই—তখন সেই "সত্যফল" "সত্যফল" করিয়া প্রাণপণে ধাবিত হই। হায়! বুঝি না—তখনও কর্ম্মই আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমায় ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে। মিথ্যা ও সত্য, এই ভাবিতে ভাবিতে প্রাণের প্রদীপ-শিখা মলিন হইয়া যাইতেছে। কর্ম্মের প্রবল আধিপত্য আমার উপর পূর্ব্ববৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে"—গীতায় ভগবানের এই সর্ব্বপ্রথম বাণীটি বুকে তখন সুস্পষ্ট প্রতিফলিত—পণ্ডিতের মত কথা কহি সত্য, সত্য সম্বন্ধে আলোচনা করি সত্য, কিন্তু কার্য্যতঃ অশোচ্যের জন্য শোক করি; সমস্ত মিথ্যা বলিয়া, সে মিথ্যামণ্ডলের বাহিরে সত্য বলিয়া কল্পনা-মণ্ডল রচনা করিয়া, তৎপ্রাপ্তির জন্য শোকাভিভূত হই।

কিন্তু ভরসা আছে, চিরদিন এমন করিয়া কাটিবে না। একদিন—প্রাণ যে দিন দেখিবে—বিরাম বিরাম করিয়া যাইতেছি, কিন্তু আমার গতির বিরাম নাই, যে দিন দেখিবে, আমার কল্পিত মিথ্যার মধ্যে যখন ছুটাছুটি করিতাম, তখনও কর্ম্মগতির দ্বারা চালিত, এখন কল্পিত সত্যমুখে যে ছুটিতেছি, এখনও কর্ম্মগতির দ্বারা চালিত,—কর্ম্মের দ্বারা সর্ব্বসময়ে পরিচালিত হইতেছি; যে দিন প্রাণ বলিয়া উঠিবে, কে মা—কে মা তুমি, বাহিরে বন্ধন মুক্তি আদি নানাবিধ ফলরূপে প্রতিফলিত হইয়া আমায় ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছ কে মা তুমি? কখনও ফলরূপে আদর্শ সাজিয়া, আকাঙ্ক্ষারূপ গতি হইয়া, কখনও ফলশূন্যতা বা মুক্তিরূপে আদর্শ সাজিয়া, নিরাকাঙ্ক্ষ হইবার আকাঙ্ক্ষারূপে

গতি হইয়া কে মা তুমি আমার বুকের উপর নৃত্য করিতেছ? আশারূপে মনোমোহিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিতেছ, আবার হতাশে দীর্ঘশ্বাস-সংক্ষুব্ধা হইয়া ম্লানমুখে শোকাকুলা দীনা লুণ্ঠিতার মত, ভিখারিণীর মত ছল ছল আঁখিতে আমার বুকে শোকের প্রতিমা ধরিতেছ কে মা তুমি? দূরে হরিহরবিরিঞ্চি-সেবিতচরণা, জ্যোতির্জ্বালাময়ী, আনন্দোল্লাসময়ী, রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিতেছ কে মা তুমি? বাহিরে ভোগরূপে, অন্তরে লালসারূপে, মনে আদর্শরূপে, প্রাণে তৃষ্ণারূপে, আবার মনে স্বাধীনতার কল্পনা মুক্তির ছবিরূপে, প্রাণে তৎপ্রাপ্তির আকুলতারূপে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছ, কর্ম্মরূপে আমায় ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছ—আমায় ছুটাইতেছ, কি আপনি ছুটিতেছে, বুঝিতে পারি না, কিন্তু ছোটাছুটি দেখিতে পাইতেছি—গতিরূপিণী—শক্তিরূপিণী কে মা তুমি? সেই দিন শুনিবে যাহাকে মিথ্যা বলিতেছিলে, তাহাও সত্য—যাহাকে সত্য বলিতেছিলে, তাহাও সত্য—আর সে সত্য-মিথ্যার অতীত দেশেও মহাসত্য বিরাজিত। আমার হৃৎপিণ্ডের সঞ্চালন—আমার শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ কর্ম্ম হইতে সূচনা করিয়া সমস্ত কর্ম্মই ব্রহ্মযজ্ঞ, সমস্ত কর্ম্মই এক মহালক্ষ্যে সংসাধিত হইতেছে। সে লক্ষ্য মাতৃ-যজ্ঞ—ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মযজ্ঞ। সমস্ত কর্ম্ম—সমস্ত গতি মা! সমস্ত কর্ম্ম সেই মহাযজ্ঞের দিকে আমার লক্ষ্য করাইবার জন্য, মাতৃ-বিকাশ দেখিয়া মাতৃ-বেদন পাইবার জন্যই অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই লক্ষ্য স্থাপিত হইলেই তখন কর্ম্মসকল আমার অধিকারে আসিবে—কর্ম্মসকল আমার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বুঝিতে পারিবে। আমার আমিত্ব—সে মহা-শক্তিময়ী মায়ের আমিত্বে একীভূত হইবে।

শুন—সমস্ত কর্ম্মের মধ্যেই সেই ব্রহ্মযজ্ঞ সংসাধিত হইতেছে। এই যজ্ঞই কর্ম্মসকলের প্রাণ, যজ্ঞই কর্ম্ম, কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ, কর্ম্মমাত্রই মহাসত্যের মহা-স্ফুরণ—বিকাশ। তুমি তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ ক্রিয়াটিতে অবধি এই যজ্ঞ দর্শন কর। শ্বাসে শ্বাসে মাতৃ-স্ফুরণ প্রাণে ফুটিয়া উঠুক। হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দনকে যান্ত্রিক পরিচালনা মাত্র না ভাবিয়া, ব্রহ্মযজ্ঞের আহুতি ভাব—তোমার উপর হইতে কর্ম্মের আধিপত্য বিদূরিত হইবে—তুমি যজ্ঞপতি হইবে, কর্ম্ম তোমার অধিকারে আসিবে। যে পরিমাণে তুমি মাতৃ-বেদন অনুভব করিবে, সেই পরিমাণে কর্ম্মসকলকে তোমারই অধীন বলিয়া চিনিতে সমর্থ হইবে।

দেখ, মহাশক্তিরূপিণী মা আমার, আমাদের শিরে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবার জন্য বরাভয় কর দুইখানি বাড়াইয়া, দাঁড়াইয়া ওই সম্মুখে বলিতেছেন,—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে বা ফলেষু কদাচন। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।" লও কুমার—কর্ম্মাধিকার গ্রহণ কর, প্রজাপতি হও, যজ্ঞপতি হও, ব্রহ্ম হও, মাতৃপদরজের রাজটীকা ললাটমণ্ডলে চিহ্নিত করিয়া, মা বলিয়া প্রাণের একটী বেদন শব্দাকারে রচিত কর—দেখিবে, সে শব্দ-ব্রহ্ম—ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিবে। সে মা নামে ব্রহ্মাণ্ডপুঞ্জ ঝলসিয়া উঠিবে। অনন্ত ফল সে মা নাম প্রসব করিবে।

কিন্তু ফলে তোমার অধিকার কদাচ যেন না হয়। এখন ত নাই; কর্ম্মেই যখন অধিকার নাই, তখন ফলে অধিকার কেমন করিয়া থাকিবে? বৃক্ষে অধিকার নাই, ফলে কেমন করিয়া থাকিবে? তুমি প্রতিমুহূর্ত্তে যেন কাহার তাড়নায় পড়িয়া নূতন নূতন কর্ম্ম সাধন করিতেছ, এক কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে তুমি এখন অক্ষম। সুতরাং কর্ম্ম ও কর্ম্মফল, দুই তোমার অধিকারের বাহিরে। কিন্তু কর্ম্মে যখন অধিকার আসিবে, তখনও ফলে যেন অধিকার না আসে; অর্থাৎ কর্ম্ম তোমার এখন আয়ত্তাধীন কার্য্যতঃ না হইলেও তাহাতে তোমার অধিকার আছে, এরূপ ভাবিতে পার ও ভাবিতে থাক এবং সেই অধিকার লাভের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কর্ম্মমধ্যে যজ্ঞ পরিদর্শন কর। কিন্তু ফলে অধিকার আছে, এরূপ কখনও ভাবিও না। এখনও নহে, যথার্থ কর্ম্মাধিকারী হইলেও নহে। "কদাচন" কথাটি ব্যবহার করিবার ইহাই অভিপ্রায়। কর্ম্মাধিপতি হইয়াও ফলের দিকে চাহিও না। সে কর্ম্ম বাহ্যে কিরূপ ভাবে পরিণত হইতেছে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিও না। প্রাণ, কর্ম্মে কর্ম্মে ব্রহ্মযজ্ঞ দর্শন করুক, কিন্তু মনে সে কর্ম্ম কিরূপে প্রতিফলিত হইতেছে, তাহা দেখিও না। এই জীবত্ব হইতে ব্রহ্মত্ব অবধি যত প্রকার অবস্থার মধ্যেই থাক না কেন, কখনও কর্ম্মফলের ফলত্বের দিকে সন্ধান রাখিও না। বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের বিশেষ বিশেষ ফলগুলিকেও কর্ম্মমাত্র বলিয়া বুঝিও এবং যজ্ঞ বলিয়া ধারণা করিও। কেন না, বস্তুতঃ ফল—কর্ম্মেরই ঘনীভূত অবস্থাবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নহে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ব্রহ্ম তাঁহার কর্ম্মের এ ব্রহ্মাণ্ডরূপ ফলকে যজ্ঞমাত্ররূপে দর্শন করেন—স্বসম্বেদন বলিয়া অনুভব করেন, ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া দর্শন করেন না। ইহাই তাঁহার ব্রহ্মত্বের প্রধান লক্ষণ। প্রতি কর্ম্মের বিশেষ বিশেষ ফলকে চিরদিন তাই তোমায় উপেক্ষা করিতে হইবে। মাতৃ-

বেদনকে যদি ফল বল, তবে একমাত্র সেই ফল তোমার সম্ভোগে আসিবে। শ্লোকে ফল কথাটি ওই বিশেষ বিশেষ ফলগুলিকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে।

তাহা হইলে প্রধানতঃ আমরা এই বুঝিলাম, তুমি কার্য্যতঃ কর্ম্মের অধিপতি না হইলেও—এখন তাহাতে তুমি বঞ্চিত হইলেও তোমার তাহাতেই ন্যায্য দাবী আছে ও তোমার সেই অধিকার উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে। তার পর সে সমস্ত তোমার অধিকারের মধ্যে আসিয়া পড়িলে, তখন তাহার জন্য তোমার সংগ্রামাদি করিতে হইবে না—নিশ্চিন্তে স্বতঃ ব্রহ্মযজ্ঞরূপ স্বসম্বেদন তুমি পাইতে থাকিবে। এখন তুমি কর্ম্মহীনতার সঙ্গ পাইলে, তুমি সে কর্ম্মরূপ যজ্ঞ বিষয়ে চিরবঞ্চিত থাকিয়া যাইবে।

ইহা হইতে উক্ত শ্লোকের এই প্রকার অর্থ আসিয়া পড়ে। তুমি এখন ব্রাহ্মণ নহ, কর্ম্মাধিকারী মাত্র। ব্রাহ্মণের বৈদিক কর্ম্মসকলে বা সাধারণ কর্ম্মসকলে সামান্যমাত্র প্রয়োজন হইলেও তুমি কর্ম্মসঙ্গী জীব। তুমি এখন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, কর্ম্মহীনতার সঙ্গ করিতে পার না। কর্ম্মের ফল—জ্ঞান। সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়। আমরা যে কর্ম্মই করি, সে কর্ম্ম যত দিন না তৎসম্বন্ধীয় সম্যক্ জ্ঞানটুকু ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হয়, তত দিন তাহা সংস্কারে থাকিয়া বার বার আমার আমিত্বরূপ ক্ষেত্রে স্ফুরিত হইয়া উঠিতে থাকে। অর্থাৎ যত দিন না জ্ঞানী হই, তত দিন কর্ম্মসকল স্বতঃ উদ্বোধিত হয়। তুমি এখন জ্ঞানী নহ, সম্যক্ জ্ঞান হইতে এখনও দূরে, সুতরাং কর্ম্ম ফুটিবেই এবং ফুটুক, তুমি কর্ম্মাধিকারী হও। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের কর্ম্মে প্রয়োজন নাই বলিয়াছি বলিয়া তোমার মত কর্ম্মসঙ্গী বা ক্ষত্রিয় জীবের প্রয়োজন নাই, এরূপ ভাবিও না। তুমি অকর্ম্মী হইও না। তবে সেই কর্ম্মসকলের ভিতর দিয়াই জ্ঞানের দিকে, সত্ত্বস্থ হইবার দিকে, ব্রাহ্মণত্বের দিকে লক্ষ্য ধরিয়া রাখ। ইহাই পূর্ব্ব-শ্লোকসকলের সহিত এই শ্লোকের সামঞ্জস্য।

কর্ম্মে তোমার অধিকার হউক অর্থে—সর্ব্বকর্ম্মের অভ্যন্তরস্থ মাতৃবেদন ভোগ করিয়া, তুমি মাতৃত্ব লাভ করিয়া, স্বীয় স্বাধীনতা সম্ভোগ কর। কিন্তু এ কোন্ কর্ম্ম? কোন্ কর্ম্মের উপর তোমার অধিকার বিস্তারের কথা বলিতেছেন? কর্ম্মে তোমার অধিকার আছে বা হউক অর্থে এমন নহে যে, তুমি যে ক্ষেত্রে, যে অবস্থায়, যে স্তরে থাক না কেন, তদপেক্ষা উচ্চ স্তরের কর্ম্মে তোমার এখনই অধিকার আছে, তুমি তাহা কর।

তুমি তোমার নিজ অবস্থা উপযোগী নিজ ক্ষেত্রবিহিত কর্ম্মে অধিকার লাভ কর। তুমি ক্ষত্রিয়স্তরীয় হও, অথবা বৈশ্যস্তরীয় হও, সে বিচার তোমার আবশ্যক নাই, তুমি ব্রাহ্মণস্তরীয় কর্ম্ম অবধি করিতে পার, উহাতে তোমার অধিকার আছে, ইহা শ্লোকের উদ্দেশ্য নহে, বরং তদ্বিপরীত ভাবই এই শ্লোকে সমর্থিত। তোমার কর্ম্মে অধিকার হউক, ফলে যেন না হয়। ইহার অর্থ, সর্ব্বদা তোমার নিজ ক্ষেত্র-বিহিত কর্ম্মে তোমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হউক। তৎকর্ম্ম-সাধনোপলব্ধ ফলস্বরূপ যে উচ্চস্তরীয় কর্ম্ম বা উচ্চ স্তর, তাহাতে যেন তোমার কর্ম্মাসক্তি না আসে। কদাচ তুমি অনুপযুক্ত অবস্থায় উচ্চাধিকার গ্রহণ করিও না—নিজ অবস্থা উচিত অধিকার অপেক্ষা উচ্চাধিকার লাভ করিতে প্রয়াস পাইও না। তোমার আজ যাহা কর্ম্মক্ষেত্র, সেই ক্ষেত্রের কর্ম্মসকলের ফলই উচ্চতর ক্ষেত্র বা স্তর। উপস্থিত অবস্থার কর্ম্ম যথোচিত সম্পাদন করিলে, তবে সেই কর্ম্মের ফল বা উর্দ্ধতর অবস্থা লাভ হয়। সুতরাং তুমি যখন যে অবস্থায় থাক, শুধু সেই অবস্থার কর্ম্মে অধিকার বিস্তার কর, কিন্তু কদাচ তুমি তাহার ফলের উপর বা উচ্চাবস্থার উপর অধিকার বিস্তার করিতে যাইও না। তুমি কদাচ "কর্ম্মফলহেতু" হইও না, তোমার কর্ম্মসকল যেন তোমার বর্ত্তমান অবস্থার ফলস্বরূপ যে উচ্চাবস্থা, সেই অবস্থার কর্ম্মকে কারণস্বরূপ করিয়া অনুষ্ঠিত হয় না; তাহা হইলেই উহা অকর্ম্ম হইবে। আজ যে ক্ষেত্রে আমি আছি, সেই ক্ষেত্রোচিত কর্ম্মসকল যথারীতি সম্পাদন করিলে, তবে পরবর্ত্তী উচ্চ অবস্থা লাভ হইবে। কেন না, পূর্ব্বে বলিয়াছি, কর্ম্মই ফলরূপে বা অবস্থারূপে ঘনীভূত হয়। তুমি সাধনার নিম্নাধিকারে থাকিয়া উচ্চতর অবস্থার কর্ম্ম অবলম্বন করিতে পার না। তোমার উপস্থিত অবস্থা সে কর্ম্মের ভাব ধারণ করিতে সক্ষম নহে। নিম্নতলে থাকিয়া কর প্রসারণ করিলে দ্বিতলের দ্রব্যাদি লাভ হয় না, দ্বিতলের দ্রব্যাদি পাইতে হইলে দ্বিতলে আরোহণ করিয়া, তবে কর প্রসারণ করিতে হয়।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রত্যেক কর্ম্ম দুই প্রকারের ফল বহন করে। এক, বিশিষ্ট বিশিষ্ট কর্ম্মের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ফল এবং দ্বিতীয়, ভগবদ্‌বেদন বা আত্ম-বেদনরূপ সমস্ত কর্ম্মের সাধারণ ফল। মূল শ্লোকে যে ফল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই ফল শব্দের মর্ম্ম ওই প্রথম অর্থটি হইলে, অর্থাৎ বিশিষ্ট বিশিষ্ট ফলকে লক্ষ্য করিয়া "ফল" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে বলিলে, এ পর্য্যন্ত যেরূপ অর্থ করিলাম, তাহা সঙ্গত। কিন্তু ফল শব্দটীকে যদি মাতৃবেদনরূপ সর্ব্বকর্ম্মের

সাধারণ ফল অর্থে লই, তাহা হইলে অর্থ অন্যরূপ হইবে। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে"—কর্ম্মে ত তোমার অধিকার আছে, কিন্তু 'মা ফলেষু কদাচন'—ফলেও যেন তোমার "কদাচ" মাত্র অধিকার না হয়; অর্থাৎ সর্ব্বদা অধিকার হয়। কর্ম্মে যেমন তোমার অধিকার, সেই সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে মাতৃ-বেদনরূপ ফলেও তোমার অধিকার হউক, তুমি সর্ব্বদা উহা প্রাপ্ত হও—উহা যেন কদাচিৎ মাত্র প্রাপ্ত না হও।

"মা কর্ম্মফল-হেতুর্ভূঃ"—কিন্তু তাই বলিয়া মাতৃ-বেদন পাইব—তাই এই কাজ করিতেছি, এরূপ ভাব যেন না হয়; কেন না, তাহা হইলে অতি সামান্য মাত্রাতে হইলেও ফলাকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে বলিয়া, উহা অকর্ম্মে পরিণত হইবে—তোমার অকর্ম্মের সঙ্গ করা হইবে। দুষ্ট ক্ষুধা আর যথার্থ ক্ষুধা, এ দুই অবস্থার আহারে যথেষ্ট প্রভেদ। ক্ষুধার তাড়নায় খাওয়া, আর খাইতে বেশ, সুতরাং ক্ষুধা হউক, আমি খাই—এ উভয়ে স্বর্গ মর্ত্ত ভেদ। ক্ষুধাজনিত আহারে পোষণ ও লোভের আহারে রোগ লাভ হয়। ভগবদ্‌বেদনের তাড়নায় যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে এবং ভগবদ্‌বেদন পাইবার আশায় কর্ম্মে তদ্রূপ প্রভেদ। প্রথম প্রকারে স্বাধীন আনন্দমাত্র এবং দ্বিতীয় প্রকারে ঈষৎ মাত্রাতে হইলেও বন্ধন লাভ হইয়া থাকে। সূর্য্য—আলোক বিস্তারের জন্য উদিত হয়েন না, সূর্য্যোদয়ে কিরণ-মালা আপনা আপনি বিকীর্ণ হইতে থাকে। বিদ্যুৎপ্রভা মেঘ হইতে মেঘান্তরে ছুটিবার জন্য গতি প্রাপ্ত হয় না, আকর্ষণশক্তি প্রাপ্ত হয় বলিয়া ছুটাছুটি করে। আমাদিগের কর্ম্মসকল যেন সেই প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়; মাতৃ-বেদনে প্রাণ শক্তিপূর্ণ হইলে, উহা কর্ম্মরূপে স্ফুরিত হইয়া পড়িবে। সাধনারূপ কর্ম্মসকল বেদনের বিকাশরূপে সম্পাদিত হইবে। কর্ম্ম করিয়া বেদন লাভ করিব, এরূপ কর্ম্ম সাধারণ কর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম নহে, উহাও অকর্ম্ম পদবাচ্য। জ্ঞানচক্ষুর বিকাশ হইলে বেদন প্রাণে স্বতঃ জাগিবে এবং সেই বেদনে তোমার সমস্ত কর্ম্ম অভিষিক্ত হইবে। একমাত্র সেই বেদনই তোমার কর্ম্মরূপ বিকাশের কারণমাত্র হইবে। অবশ্য এরূপ অবস্থা সহসা হয় না, কিন্তু ভগবান্ সেই আদর্শ অবস্থার কথাই এ স্থলে উল্লেখ করিতেছেন। তুমি কর্ম্মে কর্ম্মে সেই বেদনরূপ ফল লাভ করিয়া, এইরূপ আদর্শ অবস্থা প্রাপ্ত হও—ইহাই শ্লোকের অভিপ্রায়। তোমার সর্ব্বদা সেই মহাফললাভ হউক, এবং তাহা হইতে তোমার উপস্থিত "কর্ম্ম-ফলহেতু" কর্ম্মরূপ অবস্থা দূরীভূত

হইয়া, অকর্ম্মসঙ্গ হইতে মুক্ত হইয়া—আদর্শ "বেদন-হেতু কর্ম্ম" অবস্থা লাভ হউক।

এই স্থলে আর একটী প্রশ্ন হইতে পারে। মূল শ্লোকে "ফলেষু" অর্থাৎ ফল শব্দ বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। কর্ম্মসকলের সাধারণ ফল—মাতৃ-বেদন; যদি তাহাই ধরা যায়, তবে একবচনান্তক ফল শব্দ ব্যবহৃত হইত। কিন্তু মাতৃ-বেদন একই জিনিষ হইলেও উহা ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন একই তড়িৎশক্তি টেলিগ্রাফ, টেলিফোন আদি যন্ত্রে, যন্ত্রের তারতম্যে কোথাও গতিরূপে, কোথাও আলোকরূপে, কোথাও বাক্যাকারে, কোথাও শব্দাকারে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ একই মাতৃ-বেদন ভিন্ন ভিন্ন জীব-হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকাশ পাইয়া থাকে। সেই সকল বিভিন্ন বিকাশকে লক্ষ্য করিয়াই বহুবচন ব্যবহৃত।

যেমন বাহ্য কর্ম্ম সম্বন্ধে, তদ্রূপ মনোময় ক্ষেত্র সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। মনে চিন্তা-তরঙ্গ-প্রবাহ অহর্নিশ আমাদিগকে নানা দিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়; কোন্ মুহূর্ত্তে কি ভাব উদ্বেলিত হইয়া, কোথায় কোন্ আবর্ত্তে আমায় নিক্ষেপ করিবে, তাহা আমি জানি না। হয় ত তুমি মাতৃ-সাধনায় উন্মুখী, হয় ত তুমি মায়ের প্রতিমাখানি নির্ম্মাণ করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, মাতৃ-সম্মুখে দাঁড়াইয়া, মনে মনে আপনাকে কৃতার্থ ভাবিতেছ, সহসা তোমার অজ্ঞাতসারে মুহূর্ত্ত পরে দেখিলে, তুমি মাতৃ-প্রতিমা ভাঙ্গিয়া, আপনার কন্যার ছবিখানি বুকে ধরিয়াছ—তোমার সাধনার সাধ ফুরাইয়াছে! কেন এমন হয়? তলদেশে লক্ষ্য নাই বলিয়া, সত্ত্বস্থ নহ বলিয়া—কর্ম্মাধিকার এখনও পাও নাই বলিয়া, আপনার কর্ম্ম আপনার অধিকারভুক্ত হয় নাই বলিয়া। বড় বড় অর্ণবযান স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু ক্ষুদ্র বয়া ঠিক থাকে। কারণ, তাহার তলদেশে লক্ষ্য আছে, তলার সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। স্রোত যে প্রকারের হউক, যত প্রবল হউক, তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে না, তাহার কর্ম্মাধিকার আসিয়াছে। সে স্রোতের তালে তালে নাচে সত্য, স্রোতের খরগতি তাহাকে একটু সঞ্চালিত করে সত্য, যখন যেমন তরঙ্গ, সেইরূপ ভাবে সে আলোড়িত হয় সত্য, কিন্তু ভাসিয়া চলিয়া যায় না। সে বড় বড় জাহাজ ধরিয়া রাখে। সেই জন্য ভগবান্ নিত্যসত্ত্বস্থ হইতে বলিয়া কর্ম্মাধিকার গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। তোমার মনঃক্ষেত্র হইতে লক্ষ্যরূপ একটী নোঙ্গর তলমুখী

করিয়া ঝুলাইয়া রাখ; তোমায় ভাব-তরঙ্গসকল ভাসাইয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে না, তুমি কর্ম্মাধিকার প্রাপ্ত হইবে, তুমি সাধনায় অধিকারী হইবে। কিন্তু এ অধিকার ততক্ষণ থাকিবে, যতক্ষণ ফলের দিকে লক্ষ্য না পড়ে। সাধনারূপ কর্ম্ম, ফলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিও না। সাধনা করিয়া কি হইল না হইল, তাহা দেখিও না। প্রাণের তাড়নায় ভগবান্‌কে ডাক, ডাকিলে এই ফল হইবে, এরূপ ভাবিয়া ডাকিও না। দুরন্ত রৌদ্রে বটচ্ছায়ায় গিয়া যেমন সুখানুভব করিয়া তোমার মুখ হইতে আরামসূচক "আ" শব্দ নির্গত হয়, সে শব্দে যেমন সুখানুভূতি প্রকাশ ব্যতীত অন্য ভাব থাকে না, তদ্রূপ তোমার প্রাণে সাধনারূপ কর্ম্ম ফুটুক, সাধনার সেই অপূর্ব্ব অনুভূতি কর্ম্মরূপে মনে বিকাশ প্রাপ্ত হউক।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিশিষ্ট বিশিষ্ট ফলে লক্ষ্য না থাকিলেই উহা কর্ম্মপদবাচ্য বা সাধারণ কথায় উহা নিষ্কাম কর্ম্ম। তবে তাহা হইতে আমরা এই বুঝিলাম, কর্ম্মে অধিকার হউক অর্থে—নিষ্কাম কর্ম্মে অধিকার হউক। এই প্রকারের কর্ম্মের মধ্যে প্রাণ-কর্ম্ম একটী নিষ্কাম কর্ম্ম বলিতে পারা যায়; সুতরাং নিষ্কাম কর্ম্মে অধিকার বলিলে প্রাণ কর্ম্মে অধিকার আসুক—ইহাও বুঝায়। পূর্ব্বে যে প্রাণশক্তির আয় ও ব্যয়ের কথা বলা হইয়াছে, সেই কার্য্যে তোমার অধিকার হউক, ইহাও বুঝা যায়। এখন তাহাতে অধিকার নাই। এখন ব্যয়ের উপর তোমার কর্ত্তৃত্ব নাই—তুমি উপার্জ্জন অপেক্ষা বর্জ্জনে সমধিক ব্যাপৃত। তাই মা আমার তোমায় সেই অধিকার প্রাপ্তির জন্য আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

সেই প্রাণ-কর্ম্মের একটী উদ্দীপক অংশ অমাদিগের শ্বাস প্রশ্বাস। শ্বাসে শ্বাসে, প্রশ্বাসে প্রশ্বাসে যদি মাতৃ-অনুভূতি না ফুটে তবে উহা কর্ম্মই নহে—অকর্ম্ম। নাভিকুণ্ডে সূর্য্য-বহ্নি তেজ স্থাপিত; সেই অগ্নিকুণ্ডে মহাহোম-ক্রিয়া সাধকরূপ জীবের কর্ম্ম। যদি প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ বায়ুর তাড়নায় সে কুণ্ড হইতে শিখা লক্ লক্ করিয়া জ্বলিয়া না উঠে, যদি সেই বায়ুর প্রতি হিল্লোলে সূর্য্য-কিরণের মত আলোকচ্ছটা স্বচ্ছন্দে বিকীর্ণ না হয়, তবে এ শ্বাস প্রশ্বাস অকর্ম্মরূপে পরিগণিত হইবে। তোমার প্রতি শ্বাস মাতৃ-নামরূপ আহুতিবাহী হইয়া, সেই অগ্নিতে অর্পিত হউক, প্রতি প্রশ্বাস—মাতৃনাম তোমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে বহন করুক, প্রতি আহুতি ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি গঠিত করিয়া, তোমার সে অগ্নিকুণ্ড শোভিত করুক; সেই দেবতা তোমায় কর্ম্মাধিকার অর্পণ করিবেন।

তোমার দেহের প্রত্যেক তন্ত্রী মা নামে বাজিয়া উঠিবে। তোমার দেহ কোটি সাধকের সাধনামণ্ডলে পরিণত হইবে।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮

যদি কর্ম্মফলপ্রযুক্তেন কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যং, কথং তর্হি কর্ত্তব্যমিত্যুচ্যতে। যোগস্থঃ সন্ কর্ম্মাণি কুরু, কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপীশ্বরো মে তুষ্যত্বিতি সঙ্গং ত্যক্ত্বা। ধনঞ্জয়, ফলতৃষ্ণাশূন্যেন ক্রিয়মাণে কর্ম্মণি সত্ত্বশুদ্ধিজা জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিঃ তদ্বিপর্য্যয়জা অসিদ্ধিস্তয়োঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরপি তুল্যো ভূত্বা কর্ম্মাণি কুরু। তৎ সমত্বং যোগ উচ্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—ধনঞ্জয়! তুমি কামনা-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হইয়া, যোগাবস্থিত হইয়া কর্ম্ম কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে এই সমভাবই—যোগ।

যৌগিক অর্থ।—ফলপ্রযুক্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে, তবে কর্ম্ম কি প্রকারে করিবে? সে কথার আভাস আমরা পূর্ব্ব-শ্লোকে পাইয়াছি। যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে। ভগবানে যুক্ত হইয়া থাকার নাম যোগস্থ হওয়া। তাহার বাহ্যিক লক্ষণ কি? সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমদর্শন। এ সমদর্শন, এ সমত্ব, এ সমভাবাপন্নতা কি প্রকার, কেমন করিয়া হইতে পারে?

বালক যখন আনন্দোল্লাসে মগ্ন হইয়া ধূলি আদি যাহা তাহার সম্মুখে পায়, তাহাই নিক্ষেপ করিতে থাকে, লোষ্ট্র কি কাঞ্চন, এ বিচার না করিয়া যাহা তাহার নয়নসম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাই সে যেমন নির্ব্বিকারে আপনার আনন্দ-তাড়নায় নিক্ষেপ করে—তাহার প্রাণের আনন্দস্ফুরণ যেমন তাহাকে ওইরূপ নিক্ষেপরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখে, বস্তুতঃ সে নিক্ষেপের কোন গূঢ়তর উদ্দেশ্য থাকে না, অথবা সে নিক্ষিপ্ত পদার্থসমূহের ইতরবিশেষ জ্ঞান যেমন তাহার প্রাণে প্রতিফলিত হয় না—তদ্রূপ ভগবদ্‌ভাবপ্রণোদিত হইলে সাধক সে আনন্দোল্লাসে মাত্র মগ্ন থাকে। যে কর্ম্ম সম্মুখে বা ইন্দ্রিয়পথে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাই আনন্দোল্লাসের তাড়নায় ফুটিয়া পড়ে। সে কর্ম্ম কি ফল বহন করিবে, সে কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে, কি অসিদ্ধ হইবে, তাহার

আনন্দের সহিত এ সকলের কোন সম্বন্ধ নাই; বালকের মত সে সংসার-খেলাঘরে আনন্দের স্ফুরণে অহর্নিশ মত্ত থাকিয়া ক্রীড়াস্বরূপ কার্য্যসকল সম্পাদন করিতে থাকে। জগতের কর্ম্মাকর্ম্ম-সকল, অবস্থান্তরসকল, স্ব স্ব বিশিষ্ট ভাবে তাহার প্রাণে প্রতিফলিত হয় না, লীলাময়ী মায়ের বিরাট এ ব্রহ্মাণ্ড ও ইহার প্রত্যেক পদার্থ বা ভাব ক্রীড়ণকবৎ তাহার চক্ষে প্রতিভাত হয়, সে সেই ক্রীড়াময়ীকে ক্রীড়া করিতে দেখে, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনি ক্রীড়ায় মত্ত হয়, ক্রীড়ার ছলে যে কর্ম্ম অবলম্বন করে, সে কর্ম্মে সিদ্ধি হইলেও তাহার যেমন আনন্দ, সে কর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হইলেও তাহার তদ্রূপ আনন্দ; নিত্যানন্দময়ীর নিত্যানন্দ সে সন্তান, আনন্দের অপলাপ কোথাও দেখিতে পায় না। খেলায় ব্রহ্মাণ্ড রচিত; সে দেখে, খেলায় সূর্য্য-সহস্র দপ্ করিয়া ক্রীড়াময়ীর অঙ্গ হইতে স্ফুরিত হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, খেলায় জীবসংঘ ব্রহ্মাণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া, ভেলায় চড়িয়া বালকেরা যেমন সন্তরণ দেয়, তেমনি ভাবে এ অসীম শক্তি-সমুদ্রে সন্তরণ করিতেছে, খেলায় এ জ্যোতিষ্ক-দল ছুটিতেছে, ঘুরিতেছে, উল্লম্ফন দিতেছে; আনন্দময়ী নিত্যা স্থিরা সনাতনী ফলভারনম্রা পল্লবময়ীর মত মধ্যস্থলে। ফল-পল্লব-মণ্ডিত শাখাসকল দুলিতেছে, উঠিতেছে—পড়িতেছে—বৃক্ষ স্থির! এই ক্রীড়ায় সে সাধক মত্ত থাকে। প্রাণে সঙ্কোচ নাই—আশঙ্কা নাই, স্বাধীন অসীম প্রাণ, অসীম খেলাঘর—অসীম আদর্শ। অসীম আনন্দের অসীম লীলা-নিকেতন। এই ছবি সে সাধকের প্রাণে স্ফুরিত। এ ছবি বুকে লইয়া সে মাতৃযুক্ত, সে যোগস্থ। এই ভাবে তার কর্ম্মসকল তাহার দ্বারা কৃত। ইহাই সমত্বের লক্ষণ।

ভগবান্ ধনঞ্জয় বলিয়া এইখানে সর্ব্বপ্রথম অর্জ্জুনকে সম্ভাষণ করিয়াছেন। ধনঞ্জয় শব্দটি এখানে ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য কি? মহাভারতে অর্জ্জুন, বিরাটপুত্র উত্তরকে যেখানে নিজ পরিচয় প্রদান করিতেছেন, সেইখানে তিনি বলিতেছেন,—"আমি সমস্ত জনপদ জয় করিয়া, ধনমাত্র গ্রহণ করিয়া অবস্থান করি, এই জন্য আমার নাম ধনঞ্জয়।" অর্জ্জুন সমস্ত দেশ জয় করিলেও সে সমস্ত পরিগ্রহণ করিতেন না—ধনমাত্র গ্রহণ করিতেন। তাঁহার সেই গুণকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ এ স্থলে অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিলেন। এ সম্বোধনের এ স্থলে উদ্দেশ্য, তিনি যেন বলিতেছেন,—'সখা! তুমি যেমন সমগ্র জনপদ জয় করিয়াও সে সমস্ত গ্রহণ কর না, ধনমাত্র গ্রহণ কর, তদ্রূপ জগতের সমস্ত কর্ম্মে

তোমার অধিকার বিস্তৃত হইলেও তুমি সে সমস্ত বিশিষ্ট বিশিষ্ট কর্ম্মফল গ্রহণ না করিয়া, সার ধনরূপ তাহার অভ্যন্তরস্থ ভগবদনুভূতিটুকু মাত্র পরিগ্রহণ কর। প্রতি কর্ম্মের অভ্যন্তরে আমাতে যুক্ত হওয়ারূপ ফলটির মাত্র সঙ্গ কর, আর কিছুর সঙ্গ করিও না। জনপদসকল জয় করিয়া যেমন তাহাদিগের ইতর-বিশেষ তোমায় প্রলুব্ধ বা বিরক্ত করিতে সমর্থ হয় নাই, তুমি যেমন সমভাবাপন্ন থাক, তদ্রূপ তুমি কর্ম্মসকলেরও সিদ্ধি অসিদ্ধিতে অনুরক্ত বা বিরক্ত না হইয়া সমভাবাপন্ন থাক—ভগবদ্‌বেদনযুক্ত থাক। এই সে সমত্ব, এই বেদনাযুক্ত অবস্থা—ইহাই যোগ। এইরূপে যোগস্থ হইয়া, এইরূপে বেদনযুক্ত হইয়া তুমি কর্ম্ম কর।" মা এই জন্যই অন্য কোন নামে অর্জ্জুনকে এখানে সম্বোধন না করিয়া, ধনঞ্জয় বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। এখানে অন্য কোন শব্দ এরূপ যুক্তি-সঙ্গত অর্থযুক্ত হইতে পারিত না।

পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে, যে কর্ম্মে ভগবদনুভূতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই কর্ম্ম এবং যাহাতে ভগবদনুভূতি নাই, তাহাই অকর্ম্ম এবং সেইরূপ কর্ম্মেই যেন তোমার অধিকার বিস্তৃত হয়—ওরূপ অকর্ম্মের সঙ্গ যেন না হয়। কিন্তু 'ভগবান্ সন্তুষ্ট হইবেন, তাঁর সন্তোষ বিধানের জন্য কর্ম্মসকল করিব, ইহাও ভগবদ্ভাবযুক্ত কর্ম্ম"—এইরূপ কেহ কেহ মনে করেন। সেইটুকু নিরাকরণ করিবার জন্যই পুনরায় এই শ্লোকটী বলিবার একটী মুখ্য অভিপ্রায়। ভগবান্ প্রীত হইবেন, এই উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতেছি, এ ভাব যোগস্থ ভাব নহে। সেখানেও ফলাভিসন্ধি রহিয়া যায়, সেখানেও ভগবদ্‌যুক্ত না হইয়া ফলাভিসন্ধিযুক্ত কর্ম্ম হইয়া যায়; সুতরাং তীক্ষ্ণ দর্শনে উহাও প্রায় অকর্ম্মপদবাচ্য হইয়া পড়ে। উহাও ঠিক কর্ম্ম নহে। সেই জন্য "যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর" এ কথাটী স্পষ্ট করিয়া এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে। ভগবদ্‌বেদনের লক্ষণ—স্বাধীন আনন্দরূপ প্রাণের এক প্রকার অফুরন্ত উদ্বেলন। সে অবস্থায় লক্ষ্য কোন দিকে থাকে না। কোন দিক্‌বিশেষে, কোন ভাব বা বিষয়বিশেষে তাহার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকে না। ভগবান্ সন্তুষ্ট হইলেন, কি অসন্তুষ্ট হইলেন, যুক্ত পুরুষের লক্ষ্যে তাহা পড়ে না। আনন্দে উৎফুল্ল বালক মাতৃক্রোড়ে কূর্দ্দন করে। মায়ের সন্তোষ বিধান হইতেছে, কি মা বিরক্তা হইতেছেন, বালক তাহা ভাবিয়া দেখে না। আমার যাহা ইচ্ছা করিব, আমি আমার মায়ের কোলে, আমি শঙ্কাশূন্য, নির্ভীক, নিত্য, অমর—ইহাই সাধকের ভাব।

তবে কি সাধক যথেচ্ছাচারী হইবে? জীব যদি যথেচ্ছাচারের স্বাধীনতা পায়, তাহা হইলে সে ত পশুত্ব লাভ করিবে। উদ্দাম ইন্দ্রিয়াদি যখন যে দিকে লইয়া যাইবে, মোহান্ধ হইয়া সেই দিকেই জীব ধাবিত হইলে উচ্ছৃঙ্খলতার বীভৎস দৃশ্যে জগৎ পরিপূর্ণ হইবে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পশুর আবাসস্থলে মনুষ্য-সমাজ পর্য্যবসিত হইবে। সাধারণ জীব স্বাধীনতা পাইলে এ আশঙ্কা অমূলক হইত না। কিন্তু সাধকের স্বাধীনতা লাভে জগতের এরূপ বিষময় পরিণাম হইতে পারে না। তাহার প্রাণ, তাহার ইন্দ্রিয়, একমাত্র মায়ে ছাড়া অন্য কোথাও কোন ভোগ্য বস্তুর আশা করে না। আনন্দের অফুরন্ত স্ফুরণ তাহার ইন্দ্রিয়াদিকে নিমজ্জিত করিয়া রাখে। সে মাতৃময় হইয়া যায়—তার সমস্ত শক্তি চারি ধার হইতে কেন্দ্রীভূত হইয়া, আনন্দের উদ্বেলনে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ত্ব হারাইয়া ফেলে, আনন্দময়ীর আনন্দময় সন্তান সর্ব্বত্র আনন্দের অফুরন্ত লহরী পরিদর্শন করে। কু সু বলিয়া যাহা কিছু, সে সমস্ত অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। একটী পৌরাণিক দৃষ্টান্ত দিই। দশানন, রামচন্দ্রের বধের জন্য অসময়ে যখন কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছিলেন, তখন কুম্ভকর্ণ সীতা-হরণ-সম্বলিত আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, রাবণকে ধিক্কার দিয়া এই মর্ম্মে বলিয়াছিলেন,—"দশানন, তুমি দশটী মস্তিষ্কশালী পুরুষ হইয়াও এমন মূর্খের মত কাজ কেন করিলে? তুমি মায়াবী, স্বীয় মায়ায় তুমি যদৃচ্ছা মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিতে পার; মায়ায় তুমি ভিক্ষু সন্ন্যাসিমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া, সীতাকে ছলে হরণ করিয়াছ—মায়ায় তুমি রামচন্দ্রের মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া সীতা-সমীপে কেন গেলে না? সীতা-সম্ভোগে যদি এতই ইচ্ছুক হইয়াছিলে, তবে মায়াবলে সন্ন্যাসী না সাজিয়া, রামচন্দ্র সাজিয়া, স্বচ্ছন্দে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিতে? সীতাকে এমন করিয়া হরণ করিয়া আনিয়া, সমগ্র লঙ্কা-পুরীকে বিপর্য্যস্ত করিবার কোন প্রয়োজনই হইত না।" তখন দশানন তাহার উত্তরে এক মহাসত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"ভাই, সে যুক্তি আমি জানিতাম; আমি অনায়াসে রামচন্দ্রের মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিতে পারিতাম। কিন্তু তুমি ত জান, যে মূর্ত্তি আমাদিগকে ধারণ করিতে হয়, সেই মূর্ত্তির চিন্তা করিলে, তবে সেইরূপে প্রকটিত হইতে পারি। রামনামের এমন গুণ, রামরূপের এমন মহিমা, রাম চিন্তনের এমন শক্তি যে, তাহা স্মরণমাত্রে প্রাণে আর কু অভিসন্ধি থাকে না, ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার আবিল মোহ কোথায়

দূর হইয়া যায়; রামমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিতে গেলে সীতা-সম্ভোগের ইচ্ছা প্রাণে থাকিত না। তাই রামমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করি নাই।"

বস্তুতই তাই। সাধক তাহার আরাধ্য দেবতার চিন্তনে অহর্নিশ নিযুক্ত থাকে বলিয়া, তাহার প্রাণ সর্ব্বত্র তার সে প্রাণের জিনিষের বিকাশ দেখিয়া, তাহাতেই উৎফুল্ল থাকে বলিয়া, সে স্বাধীনতা পাইলেও তাহার প্রাণে কু ইচ্ছা উদিত হয় না। তাহার যথেচ্ছা -–সদিচ্ছা মাত্র, তাহার কর্ম্ম যোগবিকাশ মাত্র, তাহার কর্ত্তৃত্ব শিশুর লীলাচাপল্য মাত্র।

কর্ম্মসঙ্গ কি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের দিকে বিশেষ বিশেষ প্রকারে লক্ষ্য থাকিলেই কর্ম্মসঙ্গ হয়। সুতরাং এই পর্য্যন্ত আমরা এই বুঝিলাম, কর্ম্মফল ভোগ করিব, এইরূপ যতক্ষণ লালসা থাকিবে, ততক্ষণ যোগস্থ হওয়া যায় না; এবং ততক্ষণ সকল কর্ম্মই অকর্ম্ম। কর্ম্ম যাহাই হউক না কেন, তোমার কুলধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম যাহাই হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না—ক্ষত্রিয়ই হও, ব্রাহ্মণই হও, যে ক্ষেত্রেই থাক না কেন, তাহাতে কিছু অন্তরায় ঘটে না, শুধু যোগস্থ হইয়া উপস্থিত কর্ম্মসকল করিতে পারিলেই হইল। যোগস্থ হইতে হইলে সত্ত্বস্থ হইতে হয়, অর্থাৎ মায়ের অস্তিত্ব সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র পরিদর্শন করিয়া সত্ত্বগুণের উদ্বোধন করিতে হয়; তাহা হইলেই কর্ম্মাধিকার লাভ হয় অর্থাৎ কর্ম্মসকল তখন ভগবদ্‌বেদন অহর্নিশ প্রাণে স্ফুরিত করিতে থাকে ও কার্য্যমাত্র তখন অকর্ম্ম না হইয়া, যথার্থ কর্ম্মে পরিণত হয়। এইরূপে কর্ম্ম করিতে করিতে যোগস্থ হইতে পারা যায়। সুতরাং তুমি সত্ত্বস্থ হইয়া উপস্থিত কর্ম্মসকল করিয়া যাও। যখন দেখিবে, কর্ম্মের সিদ্ধির বা অসিদ্ধির দিকে তোমার লক্ষ্য নাই, সিদ্ধি হইলেও আনন্দ, না হইলেও আনন্দ, তখন বুঝিবে, তুমি যোগস্থ হইয়াছ। ইহাই যোগের লক্ষণ বা ইহাকেই যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করা বলে।

সাধারণ কর্ম্ম-প্রবাহেও যেমন, ঈশ্বর-চিন্তা করিতে প্রয়াস করিবার কালে অর্থাৎ যখন নিত্য-ক্রিয়াদি করিতে বসিবে, তখনও ঠিক তদ্রূপ। শাস্ত্রসম্মত উপাসনাদি অথবা গুরুনির্দ্দিষ্ট বিশেষ কর্ম্মাদি করিবার সময়েও ঠিক এই ভাব অবলম্বন করিবে। কি ফল হইতেছে, কি না হইতেছে, সে বিষয়ে চিন্তা করিবে না। ওই কর্ম্মটুকুকেই সার্থকতা ভাবিবে। পূর্ণ সার্থকতার ভাবে বিভোর থাকিয়া কর্ম্ম করিতে থাকিবে। করিতে করিতে দেখিবে, এক অব্যক্ত সাম্যাবস্থায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছ—যেখানে ধ্যেয় বস্তুতে ও তোমাতে পার্থক্য

নাই, যেখানে ভাবের তরঙ্গ-সকল মিলাইয়া গিয়া, এক নিস্তরঙ্গ আনন্দসমুদ্রের নিত্য অস্তিত্ব দেদীপ্যমান—যেখানে মাতা ও পুত্রে এক—সেই হিরণ্ময় ক্ষেত্রে তুমি উপস্থিত হইবে। উহাই চিদাকাশের সমতল ক্ষেত্র—উহাই সাম্যাবস্থা।

চল, এইরূপে কর্ম্ম করিয়া চল। মায়ের ইহাই ইঙ্গিত। শুধু মায়ের দিকে চাহিয়া, শুধু আনন্দময়ীর অভয় কর উত্তোলিত দেখিয়া, শুধু তাহার আনন্দ-ক্রোড়ে তুমি অবস্থিত, এই উপলব্ধি প্রাণের ভিতর জাগাইয়া তুমি চলিতে থাক। অবসাদকে প্রাণে দাঁড়াইতে দিও না,—বিষাদকে আর হৃদয়ে আধিপত্য করিতে দিও না,—মলিনতাকে বুকে জড়াইয়া রাখিও না। যেখানে যখন যে অবস্থায় থাক—তুমি মাতৃচক্ষুর তলে, তুমি মাতৃ-অঙ্কে—এ ধারণাকে প্রাণে বদ্ধমূল কর। সহস্র প্রকার বাধা আসিতে পারে, পদে পদে বিঘ্ন আসিয়া তোমায় মোহে দিশাহারা করিতে পারে, লক্ষ লক্ষ ভাব—যাহাকে সাধারণতঃ আবিলতা বলে, আসিয়া মাকে ভুলাইয়া দিতে পারে। কিন্তু যখনই একবার মনে পড়িয়া যাইবে, যখনই মায়ের কথা একবারমাত্রও ফুটিয়া উঠিবে, তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত ভাবকে, সে সমস্ত মোহকে শববৎ হৃদয়ে শায়িত করিয়া, তাহার উপর দণ্ডায়মান হও; মা যেমন শবরূপী মহেশ্বরের হৃদয়ে উল্লাসভরে দাঁড়ায়, তেমনি করিয়া, মা যেমন পঞ্চাননের বক্ষ পদদলিত করে, তেমনি করিয়া তোমার পঞ্চ-ভূতাত্মক ভাবসকলের বক্ষ পদদলিত করিয়া দাঁড়াও—"মা ভৈঃ" শব্দ তোমার হৃদয়ের দিক্‌প্রান্তে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকুক, তুমি মাতৃময় হইয়া উঠ। একবারে হইবে না, বার বার অভ্যাস কর--বার বার এই ধারণা প্রাণে ফুটাও, অবসাদ কথাটা ভুলিয়া যাও, হতাশ কথাটা প্রাণ হইতে মুছিয়া ফেল,—ইহাই সত্ত্বস্থ হওয়া; ইহাই তোমায় ক্রমশঃ পূর্ণ সমত্বে পৌঁছিয়া দিবে।

বার বার এইরূপ -চল এই ভাবে ছুটি। আর নগণ্য, হেয়, দীন, আর্ত্ত জীব বলিয়া আপনাকে ভাবিব না, আর পীড়িত পতিত পাতকী জীব বলিয়া আপনাকে ধারণা করিব না, আর জগতের অবস্থা বা কর্ম্মের তাড়নায় আমার চরণ কম্পিত হইবে না। আমি মায়ের সন্ধান পাইয়াছি, আমি মায়ের বিশাল ক্রোড়ে আপনার অবস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, আমি সত্ত্বস্থ, ইহা বুঝিয়াছি,—জগৎ আনন্দময় আনন্দ-নিকেতনে পরিণত হইয়াছে—প্রাণের সাধারণ ভাব-সকল শবত্ব পাইয়া মাতৃচরণে লুণ্ঠিত হইয়াছে—সে শব শিবত্ব পাইয়াছে। যাহাকে জঞ্জালময় বলিতেছিলে, যে সকল ভাব বা অবস্থা বা কর্ম্মকে মোহ বলিতেছিলে,

এখন আর তাহা মোহ নহে, এখন তাহাই শিব; মাতৃচরণ পরশ মাত্রে শব শিবত্ব লাভ করিয়াছে; যেগুলিকে উপেক্ষা করিতে, পরিত্যাগ করিতে কত দিন প্রয়াস পাইতেছিলে, তাহাই মহেশ্বররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে—"শবরূপ-মহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতা" মাকে আমি কর্ম্মে কর্ম্মে দেখিতেছি, অভয় নাদের গম্ভীর সাগরগর্জ্জনে প্রাণ আমার পূর্ণ, শান্তির নিবিড় শ্যাম-জলদ-কান্তিতে হৃদয় আমার ভরা, মহাশক্তির রক্তচরণ আলিঙ্গনে আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তি মহেশ্বর। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাবর্গ চারি ধারে মাতৃস্তোত্র-গীতিতে বিভোর—এস এস মাতৃসন্তানগণ, এস—মাকে দেখ—চরণে পুষ্পাঞ্জলি দাও—শবকে শিব কর, শব-সাধনায় নিযুক্ত হও।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ৪৯

দূরেণাতিবিপ্রকর্ষেণ অত্যন্তমেব হি অবরং অধমং নিকৃষ্টং কর্ম্ম। বুদ্ধিযোগাৎ ফলার্থিনা ক্রিয়মাণং কর্ম্ম অত্যন্তং অপকৃষ্টং। হে ধনঞ্জয়, ততঃ বুদ্ধৌ সাংখ্য-বুদ্ধৌ শরণমাশ্রয়মভয়প্রাপ্তিকারণমন্বিচ্ছ প্রার্থয়স্ব, পরমার্থশরণো ভব। কৃপণাঃ দীনাঃ ফলহেতবঃ।

ব্যবহারিক অর্থ।—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভগবানে বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করা অপেক্ষা ফলার্থ কর্ম্মসকল অত্যন্ত অপকৃষ্ট। সেই জন্য ধনঞ্জয়, তুমি বুদ্ধি দ্বারা এইরূপে যুক্ত হও। ফলকামীরা অত্যন্ত দীন।

যৌগিক অর্থ।—ফলার্থ কর্ম্মসকলে, আর এইরূপ ভাবযুক্ত হইয়া অবস্থান করিয়া যে সকল কার্য্য স্বতঃ অনুষ্ঠিত হয়—এ উভয়ের মধ্যে বহু প্রভেদ। পিঞ্জরের মধ্যে পক্ষীর সঞ্চলন ও নীলকান্তি বিশাল গগনে তাহার ক্রীড়া—এ উভয়ে যেমন প্রভেদ, পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মপ্রণালীমধ্যেও তদ্রূপ প্রভেদ। কেন কাম্য কর্ম্মসকল এত নিকৃষ্ট? আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি,—দুই প্রকারের শক্তি এ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র ক্রিয়াশীলা—বিপ্রকর্ষণ ও আকর্ষণ। এক শক্তির দ্বারা আমাদিগকে মাতৃ-অঙ্কে যুক্ত করিয়া রাখে, আর এক শক্তি সে দিক্ হইতে বিতাড়িত করিয়া, ভোগের দিকে আমাদিগের গতি নির্দ্দিষ্ট করে। যতক্ষণ ভোগের দিকে আমাদিগের লক্ষ্য থাকে, ততক্ষণ আমাদের হৃদয়, প্রাণ মন

সঙ্কুচিত হয়; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আপনাদের সীমা আমরা নির্দ্দেশ করিয়া লই। যখন প্রাণ কোন ভোগ—কোন ফলপ্রাপ্তির দিকে চাহে, তখন প্রাণের গতি অন্য সমস্ত দিক্‌ হইতে সঙ্কুচিত হইয়া, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে যেন উপেক্ষা করিয়া, সেইটির দিকে চাহিয়া থাকে। যেমন কোন ক্ষুদ্র বস্তু সন্দর্শন করিতে হইলে, আমরা আমাদিগের চক্ষু অত্যন্ত সঙ্কুচিত করিয়া উহা পরিদর্শন করি, তদ্রূপ ভোগ্য ফলের দিকে যখন আমরা চাহি, তখন আমাদিগের প্রাণের গতি, প্রাণের চক্ষু সঙ্কুচিত হইয়া যায়। আর সাগর, ভূধর, আকাশ ইত্যাদি কোন বিশাল পদার্থ দেখিতে গেলে যেমন চক্ষু বিস্তৃত—বিস্ফারিত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর-ভাব যখন প্রাণে আবির্ভূত হয়, তখন প্রাণ যেন বিস্তৃত হয়, হৃদয় যেন বিকাশযুক্ত হইতে থাকে, প্রাণশক্তি যেন প্রস্ফুরিত হইয়া উঠে—ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। লক্ষ্য যত ক্ষুদ্র হয়, ফল যত নিকৃষ্ট হয়, আমাদিগের শক্তিও তত ক্ষুদ্রত্ব লাভ করে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগতে যত প্রকার শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, উহা মাতৃশক্তি– উহা মা। হৃদয়ে - অন্তঃকরণে যত প্রকার শক্তি উপলব্ধি করিতে পারা যায়, উহা মা। করুণাময়ী মা সর্ব্বত্র, প্রত্যেক শক্তিকণাটি পর্য্যন্ত—মা। সুতরাং প্রত্যেক শক্তিকণাটি অনন্ত অপরিমেয়। আমার ইচ্ছানুযায়ী সেই মহাশক্তি কখনও ক্ষুদ্র, কখনও বিরাট্ ভাবে আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়েন। আমার সংস্কারানুযায়ী তিনি মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করেন; যখন চিন্তা ক্ষুদ্র, নিকৃষ্ট, সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ, তখন প্রাণশক্তি ক্ষুদ্র, কুঞ্চিত, স্ফুরণহীন হইয়া পড়ে, আমাদিগের স্থূল সূক্ষ্মাদি শরীরের প্রত্যেক পরমাণুও সঙ্কুচিত, অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহাদিগের অভ্যন্তরে প্রাণপ্রবাহ প্রবাহিত হইতে পায় না। দেহত্রয়ের প্রত্যেক অংশ এইরূপ জ্যোতিহীন, প্রবাহ-শূন্য শুষ্ক স্রোতস্বতীবৎ হইয়া তমত্ব বা জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়; ভাবের আঘাতে আর ঝঙ্কার করিতে পারে না, প্রাণ-প্রবাহের অমৃতধারায় আর নিষিক্ত হইতে পায় না; সুতরাং তরঙ্গহীন, উন্মেষণহীন, বদ্ধত্ব পায়। এইরূপে প্রত্যেক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র চিন্তা আমাদিগের দেহত্রয়কে ক্রমশঃ আবদ্ধ, জড়ীভূত ও বশীভূত করে। ইহারই সাধারণ নাম বন্ধন। এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতেই এত হাঙ্গামা। চিন্তা যত উদার হয়, যত বিস্তৃত হয়, কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল আদি দেহত্রয়ের পরমাণুসকলও তত উদারভাবে, বিস্তৃতভাবে, প্রসারিত সীমার মধ্যে কার্য্য করিবার অবসর, স্থান ও সুবিধা পায়। সে পরমাণুসকলের অভ্যন্তরে ভাব বা প্রাণশক্তি প্রবিষ্ট হইয়া,

তাহাদিগকে তরঙ্গিত, অনুপ্রাণিত করিতে যেন তত সক্ষম হয়; পরমাণুসকলও তত কাঠিন্য লাভ না করিয়া তরলভাবে থাকে, সুতরাং বন্ধনও শ্লথ থাকে, অল্পায়াসে মোচন করিতে পারা যায়। ভগবচ্চিন্তায়, ভগবদ্‌ভাবে এ বদ্ধতা—এ জড়তা—এ নিস্তরঙ্গতা মোটেই থাকিতে পারে না—কেন না, মা অনন্তা, মাতৃ-চিন্তা আমাদিগের সূক্ষ্মাদি দেহপরমাণুসকলকে অনন্ত মুখে, অনন্ত দিকে স্ফুরিত করে; দেহের প্রত্যেক পরমাণুকে প্রসারিত করে, প্রত্যেক পরমাণু কার্য্যশীল, শক্তিমান্ হয়। অনন্তে বায়ু যেমন বিস্তার-ধর্ম্মী, আকাশ যেমন প্রসারশালী, সে পরমাণুসকলও তদ্রূপ ব্যাপকতামুখী হয়। অর্থাৎ বন্ধনের দিক্ হইতে মুক্তাবস্থার দিকে প্রত্যেক পরমাণু ছুটিতে থাকে। ঈশ্বরচিন্তায় যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহাদিগের দেহ নীরোগ হইবার ইহা একটী কারণ। •

যাহা হউক, আমাদিগের পরমাণুসকল ভগবচ্চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তার সময় এই যে বন্ধনরূপ ক্ষুদ্রত্ব পায়, সেই ক্ষুদ্রত্ব ঘটে বলিয়া উহা যে আমাদিগের দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া মাতৃযুক্ত হইবার সমধিক অবসর পায়, এমন নহে। পরমাণু-সকল সঙ্কুচিত, স্ফুরণহীন, ক্ষুদ্র হয় বলিয়া বিরাট্ মাতৃশক্তির আকর্ষণ সেই অনুপাতে অধিক পায়, এমন নহে। বিরাট্ স্নেহাকর্ষণ-শক্তি পরমাণুসকলের উপর সম্যক্ কার্য্য করিতে পায় না। পৃথিবী সূর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকা সত্ত্বেও পৃথিবী-বক্ষস্থ ধূলিকণাদি যেমন সে পৃথিবীর উপরই অবস্থিত থাকে, সূর্য্যে গিয়া যুক্ত হয় না, ইহাও তদ্রূপ। সূর্য্য হইতে আকর্ষণশক্তি প্রসৃত হইয়া পৃথিবীকে অহর্নিশ আকর্ষণ করিতেছে। সুতরাং সে হিসাবে পৃথিবী-বক্ষস্থ ধূলিকণা-সকল স্ব স্ব ক্ষুদ্রতানিবন্ধন আকৃষ্ট হইয়া সূর্য্যে গিয়া সংযুক্ত হওয়া সম্ভবপর হইত। কিন্তু পৃথিবীর স্বীয় আকর্ষণ সে ধূলির উপর যে পরিমাণে কার্য্যকারী, সূর্য্যের বিরাট্ শক্তি তাহার উপর সে পরিমাণে কার্য্য করিতে পায় না বলিয়া, যেমন উহা পৃথিবীবক্ষেই সংশ্লিষ্ট থাকে, সূর্য্যে যুক্ত হইবার অবসর পায় না, তদ্রূপ আমাদিগের ওই সকল পরমাণু ক্ষুদ্রত্ব পাইলেও উহাদের উপর আমাদিগের বিপ্রকর্ষণশক্তির দ্বারা রচিত দেহের শক্তি সমধিকভাবে প্রবল থাকে বলিয়া ক্ষুদ্রত্ব পাইয়াও উহারা মাতৃঅঙ্কে গিয়া সংযুক্ত হইতে পায় না; ক্ষুদ্রত্বের সুবিধাটুকু পায় না।

এই সকল কারণে সাধারণ কর্ম্মসকল অবর—নিকৃষ্ট। বুদ্ধি দ্বারা ভগবদ্‌যুক্ত হইয়া যে কার্য্য করা যায়, তাহাতে ও ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়া যে কর্ম্ম করা যায়,

তাহাতে—এই প্রভেদ। তুমি যদি ভগবৎসাধনা করিতে গিয়াও ফলাভিমুখী হইয়া থাক, তাহা হইলেও তোমার দেহত্রয় ঐরূপ সঙ্কুচিত হইবে, প্রাণশক্তি স্বচ্ছন্দে পরমাণুসকলে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না—বিপ্রকর্ষণশক্তির বশে থাকিয়া ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য ও জড়তা প্রাপ্ত হইবে। তোমার উদার স্ফুরণ-শক্তি অবরুদ্ধ হইবে; যাহাকে বন্ধন কহে, তুমি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এই জন্য এ প্রকার কর্ম্ম অবর—নিকৃষ্ট। আর এই জন্য বুদ্ধির দ্বারা ভগবানে যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ফলহেতু কর্ম্মসকল এই জন্য দীনতার পরিচায়ক।

সাধারণতঃ আমরা যাহাকে ভাল কর্ম্ম বলিয়া বুঝি, অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্তোষ-বিধান আদি ধর্ম্ম-কর্ম্মসকল—তাহাও বন্ধনের কারণ। কর্ম্মমাত্রই যতক্ষণ না উহা শুধু ভগবদ্‌বেদনের তাড়নায় কৃত হয়, ততক্ষণ সু-ই হউক বা কু-ই হউক, আমা-দিগকে সঙ্কুচিত ও আবদ্ধ করে। বন্ধনের তারতম্য অবশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু বন্ধন ছাড়া অন্য কিছু নহে। সাধক, কর্ম্মের এ বাহ্য অবস্থা লক্ষ্য করিবে না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, শাস্ত্রসমূহ কু ও সু রীতিমত বিচার করিয়া, কু হইতে দূরে যাইতে আদেশ করিয়াছেন, গীতা এই কুকেও সু করিয়া লইতে বলিয়াছেন, অথবা কু ও সু বলিয়া যে পার্থক্য সে পার্থক্য মুছিয়া ফেলিয়াছেন—সে পার্থক্য মুছিবার একমাত্র উপায় ভগবদ্‌বেদন লাভ। ভগবদ্‌বেদন লাভ হইলে সর্ব্বত্র একমাত্র অমৃতপ্রবাহের সন্ধান পাওয়া যায়। সাধারণতঃ যে সকল ইন্দ্রিয়-বিষয়াদিকে অনিত্য বা কু বলিয়া উপলব্ধি করি, সাধক তাহাকে সে ভাবে দর্শন করে না। সাধক উহাতেও মায়ের অস্তিত্ব, মায়ের আনন্দ-ক্রীড়া প্রত্যক্ষ করে। মায়ের কাছে যে পৌঁছায়, মাতৃভাবে যথার্থ যার প্রাণ বিগলিত হয়, তাহার চক্ষে আর কোন অবস্থাই ঘৃণ্য, ত্যাজ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। আমরা যেমন সমাজে ব্যবহার করিবার সময় কু, দুর্ব্বলতা ইত্যাদিকে আচ্ছাদন করিয়া, সু-এর ছদ্মবেশ অহর্নিশ ধারণ করিয়া বিচরণ করি, কাহারও সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করিবার সময় আপনাকে বিশেষভাবে সংযত করিয়া, শুধু আপনার বাছা বাছা সদ্ভাবগুলিকে প্রকাশ করিতে সচেষ্ট থাকি অর্থাৎ যেমন জগতের সর্ব্বত্র আমরা সু সাজিতে যত্নশীল, মায়ের কাছে সেরূপ সু সাজিয়া যাইতে হয় না। বালক যেমন ধূলা কাদা মাখিয়াই মায়ের নিকট যায়, তাহাতে সে কুণ্ঠিত হয় না—সাধনা সম্বন্ধেও তদ্রূপ। তুমি মনে করিও না, ভগবৎসাধনা করিতে হইলে বা ভগবদ্‌বেদন পাইতে হইলে অগ্রে রীতিমত বৈরাগ্য আদি লাভ করিয়া, হৃদয়কে

সম্পূর্ণরূপে রীতি নীতির দ্বারা সংযমিত করিয়া, ইন্দ্রিয়াদিকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া লইলে তবে ভগবৎসাধনার উপযুক্ত হইতে পারিবে। সময়ে সময়ে আমরা মনে করি, শাস্ত্রীয় বিধানসকলের সম্যক্‌ভাবে যত দিন না অনুশীলন করিয়া হৃদয়কে মার্জ্জিত করিতে পারিব, তত দিন সাধনারূপ কর্ম্মের সূচনা হইতে পারিবে না বা সূচনা করা যুক্তিবিরুদ্ধ। উপমাস্বরূপ সময়ে সময়ে শুনিতে পাই, ক্ষেত্র তৈয়ারী না হইলে বীজ বপনে কোন ফল হয় না, এইরূপ কেহ কেহ বলেন। কিন্তু বস্তুতঃ সাধনারূপ কর্ম্মই যে ক্ষেত্রকে কর্ষণ করে, এ কথা আমরা বুঝিয়া দেখি না। ভগবান্‌ই বীজ এবং তাঁহার শরণই কর্ষণ। সাধনা সূচিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্র তৈয়ারী হইয়া যায়। ক্ষেত্র তৈয়ারীর জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে, ইহজন্মে ক্ষেত্রও তৈয়ারী হয় না, বীজ বপনও ঘটে না। তবে কি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসকলের অনুশীলনের আবশ্যকতা নাই? বিশেষ আবশ্যকতা আছে। বিদ্যাশিক্ষার্থীর পুস্তকের যেরূপ প্রয়োজন, ঈশ্বরার্থীর শাস্ত্রেও তদ্রূপ প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার্থী পুস্তকরাশির মধ্যস্থলে উপবিষ্ট থাকিলেই যেমন তাহার বিদ্যালাভ ঘটে না, তাহার স্বীয় সংস্কার-জনিত বিদ্যালাভের আগ্রহ না থাকিলে বা না জাগিলে যেমন সে পুস্তকসকল অকিঞ্চিৎকর, তেমনই ভগবদ্‌বেদন প্রাণে না ফুটিলে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধসকল অকিঞ্চিৎকররূপে পরিণত হয়। ভগবদ্‌বেদন প্রাণে থাকিলে তখন শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধসকল স্বতঃ তাহার কার্য্যে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। তাহার প্রাণের গতি শাস্ত্রমুখী হয়। শাস্ত্রসকল শুধু বুদ্ধি-পরিমার্জ্জিত যুক্তিপূর্ণ কল্পনার সাহায্যে প্রণয়ন করা হয় নাই। ভগবদ্‌বেদন পাইয়া ঋষিদিগের আচার ব্যবহার, বুদ্ধি জ্ঞান, চিন্তা বা সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ যে ভাবে, যে প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, সেই পরিবর্ত্তনসকল প্রত্যক্ষ করিয়া, তদ্রূপ ভাব অবলম্বন করিতে জনসমূহকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। পুস্তকাদি লইয়া থাকিলেই বিদ্যালাভ হয় না সত্য, কিন্তু যে কেহ অদ্যাবধি বিদ্যালাভ করিয়াছে, সকলকেই পুস্তকাদির সাহায্য লইতে হইয়াছে দেখিয়া যেমন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি যে, বিদ্যালাভের জন্য পুস্তকাদির প্রয়োজন ও সেই জন্য যেমন পুস্তকাদির প্রণয়ন আবশ্যক, তদ্রূপ শাস্ত্রবিহিত বিধিনিষেধপন্থা লইয়া থাকিলেই ভগবৎলাভ হয় না সত্য, কিন্তু যে কেহ ভগবৎলাভ করিয়াছে, তাহারই জীবনগতি শাস্ত্রীয় গতির অনুরূপ হইয়া উঠে দেখিয়া, শাস্ত্র উহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্থূলতঃ সকল সময়ে সকল

সাধকের লক্ষণ শাস্ত্রানুরূপ দেখিতে না পাইলেও, তাহার আভ্যন্তরিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, কার্য্যতঃ ওই প্রকারের পরিবর্ত্তন তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। যোগাদি ব্যাপারও ঠিক এইরূপ। ঈশ্বর চিন্তা করিতে বসিলে ও মন ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত হইতে থাকিলে তাহার স্থূল সূক্ষ্মাদি দেহে যে প্রকারের পরিবর্ত্তন, যে প্রকারের লক্ষণ-সকল প্রকটিত হইয়া পড়ে, যোগশাস্ত্রে সেইগুলিই যোগাঙ্গরূপে অনুষ্ঠেয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যোগাঙ্গগুলির সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেই যে যথার্থ যোগ নিশ্চয় হইবে, তাহা নহে, তবে যাঁহারা যুক্ত হইতে সমর্থ, তাঁহাদের লক্ষণসকল ওই প্রকারের হয়, সুতরাং এইগুলিতে নিবিষ্ট থাকিলে যোগ হইতে পারে। কিন্তু মূল কথা হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি।

আমি বলিতেছিলাম, আমাদিগের মূল লক্ষ্য যেন বাহ্যিক এই সকল শাস্ত্রানু-শীলনেই পর্য্যবসিত না হয়, আর আমার দুর্ব্বলতা-সকলকে ঘৃণা করিয়া, সে-গুলির কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই যেন আমাদের চেষ্টাশক্তি নিযুক্ত না থাকে; দুর্ব্বলতা-সকলকে দূর করিতে পারি না বলিয়া যেন আমি বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া জীবনকে অহর্নিশ পীড়নের আগার করিয়া না তুলি। মায়ের কাছে চল, মাতৃ-চক্ষের স্নেহধারা পড়িলেই সমস্ত দুর্ব্বলতা দূর হইয়া যাইবে; সমস্ত "কু" "সু" হইয়া যাইবে। মায়ের কাছে "সু" হইয়া যাইব বলিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে না।

লজ্জা আমাদিগের বসনের স্বরূপ। আমরা অহর্নিশ ঐ বস্ত্র সাহায্যে আমা-দিগের দুর্ব্বলতা-সকলকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া জগতে চলাফিরা করি। এই বস্ত্রের সাহায্যে আমরা সভ্য সাজি; এই বস্ত্রের আচ্ছাদনের ভিতর আমাদের সমস্ত দুর্ব্বলতাকে পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়া, আমাদিগের সুভাবগুলিকে অযথা বাড়াইয়া বা বাহির করিয়া রাখি। এমন কি, যেগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্রাহ্য "সু," সেগুলিকেও অভিব্যক্তি ও গুণকীর্ত্তন দ্বারা আমরা বৃহৎরূপে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাই। জগৎ দিন দিন যত অসভ্য হইতেছে, ততই তাহাতে এই দুই ভাব প্রবলতর ভাবে বিস্তৃত হইতে দেখিতে পাইতেছি। বাহ্যাঙ্গ আবরণের জন্য যত নূতন নূতন পদ্ধতি ও প্রয়াস দেখিতে পাই—আমি তত জগৎ অসভ্য হইয়া যাইতেছে বলিয়া বুঝি। অন্তরঙ্গ আবরণ করিবার জন্য যত "ভদ্রোচিত ব্যবহার" কথাটীর পরি-চালন শুনিতে পাই, আমি তত জগতে "অভদ্রতার" পরিচয় দেখিতে পাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "সু"গুলির যত অধিক সম্মান দেখিতে পাই, তত জগৎ "কু" মুখে

ধাবিত হইতেছে, ইহা আমি উপলব্ধি করি। আজ দেখিতে পাই, মুষ্টিভিক্ষা দেওয়াও একটী সুখ্যাতিকর কার্য্যে পরিণত। বিপন্নকে সাহায্য, পীড়িতকে ঔষধ দান, বিদ্যার্থীকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া, এ সমস্ত যেন এক একটী বিরাট্ অশ্বমেধ যজ্ঞরূপে আজকাল জগতে বিঘোষিত হইয়া পড়ে। চরিত্রবান্ হওয়া যেন আজ জগতে একটী প্রকাণ্ড কীর্ত্তিকাহিনী! যত আমরা অসভ্য বা আধ্যাত্মিক দুর্ব্বল হইতেছি, তত আমাদের লজ্জার আবরণ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে—তত আমাদের ব্যবহার সঙ্কোচযুক্ত, হৃদয়হীন, মৌখিক আদানপ্রদান মাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। এই পুঞ্জীভূত দুর্ব্বলতাসকল লজ্জার আবরণে আচ্ছাদন করিয়া মায়ের সমীপস্থ হইতে চেষ্টা করিলে চলিবে না; অর্থাৎ মাতৃভাব প্রাণের প্রত্যেক গতির উপর স্থাপিত করিতে হইবে। ভাবই মায়ের চরণ। মাতৃচরণ পরশে সমস্ত প্রাণ পুণ্যময় হইয়া উঠিবে। আর কতকগুলি বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভাব লইয়া, সেইগুলি দিয়া মায়ের সঙ্গে হৃদয়ের আদান-প্রদান করিলে, দুর্ব্বলতাগুলি আপাততঃ আচ্ছাদিতই থাকিয়া যাইবে। শুনিয়াছি, গান্ধারী দুর্য্যোধনের মৃত্যু-ভয় রোধ করিবার জন্য ব্রত করিয়াছিলেন। সে ব্রতের ফল এই যে, গান্ধারীর দৃষ্টি যাহার উপর পতিত হইবে, তাহাই লৌহময় হইয়া যাইবে। দুর্য্যোধন মাতৃসম্মুখে উলঙ্গ হইয়া না গিয়া, কটি ও উরুদেশ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া গিয়াছিল; ঐখানেই সাধারণ জীবের দুর্ব্বলতা, তাই বস্ত্রের ব্যবহার সমাজে প্রচলিত। দুর্য্যোধনের সর্ব্বাঙ্গ লৌহময় হইয়াছিল, শুধু ওই উরুদেশ—যে অংশের উপর গান্ধারীর দৃষ্টি পতিত হয় নাই, সেইটুকু দৃঢ় হয় নাই—সেইটুকুমাত্রই দুর্য্যোধনের পরাজয়ের হেতু হইয়াছিল। আমরাও তদ্রূপ যদি মায়ের দৃষ্টির সম্মুখে দুর্ব্বলতাগুলি না ধরি, তবে সেই দুর্ব্বলতাগুলি থাকিয়া যাইবে, আমাদের সে সমস্ত সংস্কার পরিশুদ্ধ, অমৃতময় হইবে না। সেইগুলি হইতে পুনরায় আমাদের পতন সংঘটন হয় ত সম্ভবপর থাকিয়া যাইবে। দুর্য্যোধন তাহার শরীরের যে অংশ লজ্জায় বস্ত্রাবৃত করিয়াছিল অর্থাৎ যে অংশ মাতৃসম্মুখে অনাবৃত করিতে সঙ্কুচিত হইয়া, লজ্জার স্থূল প্রতিনিধিরূপ বসনের ব্যবহার করিয়াছিল—সেই ভাব-দুর্ব্বল অংশ যেমন দুর্ব্বলই থাকিয়া গিয়াছিল, আমাদেরও অবস্থা তদ্রূপ হইবে। মায়ের নিকট উলঙ্গ শিশুটিবৎ যাইতে হইবে। মায়ের চক্ষুর তলে নগ্ন বালকের মত বিচরণ করিতে হইবে। মায়ের চক্ষের স্নেহ-কিরণ যাহাতে আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল অবধি পতিত হয়, সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইবে।

এই স্থলে দুইটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। ভোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন হইতে পারে,—সমস্তই যখন মা, তবে আমি যে ভাবেই বিচরণ করি না, আমার চিত্ত যে প্রকার ভোগ লইয়া মত্ত থাকুক না, সর্ব্বত্র কেন না মাতৃকরুণা প্রাপ্ত হইব, আমার সে সকল দুর্ব্বলতা কি মাতৃদৃষ্টির বাহিরে? তবে সমস্ত ভোগ হইতেই কেন অমৃত না পাইয়া, বিষ পাইব? তবে আমার চিত্তের দুর্ব্বলতাগুলি প্রকাশ না করিলেও কেন উহারা দুর্ব্বল থাকিবে? এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, যে ভাবগুলি আমরা সাধারণ মনুষ্যের নিকট প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত, সেইগুলি রাজরাজেশ্বরীর সম্মুখে বা মাতৃসম্মুখে কেমন করিয়া প্রকাশ করিব? এই জন্য এইখানে সাধারণ জগতের ভোগরাশি ও মন, এই দুইয়ে কি ভাবে কার্য্য হয়, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। বস্তুতঃ এ জগতে এমন কিছু নাই, যাহা মা হইতে ভিন্ন। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা জগৎকে যেন ভগবানের একটী ছলনার মন্দির বলিয়া বুঝি। যেন জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যাদি ভোগ শুধু আমাদিগকে ছলনা করিতেই রচিত হইয়াছে। রূপ, রস, গন্ধাদির মোহে মুগ্ধ করিয়া, আমাদিগকে ইহাদিগের অকিঞ্চিৎকরতা শিক্ষা দিবার জন্য এবং নিত্যত্বের দিকে লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য যেন পঞ্চ ভূতের রচনা। যেন ছলে ভুলাইয়া, আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া, তাহার ভিতর অনন্ত জ্ঞানাদি দিবার অভিপ্রায়ে সংসাররূপ রূপ-রস-গন্ধময় মায়াগৃহ রচিত,—এইরূপ চক্ষে কেহ কেহ জগৎকে দেখে—জগতের ভোগসকলকে এই ভাবে পরিদর্শন করে! বস্তুতঃ কি তাই? বস্তুতঃ কি জগতের সৌন্দর্য্যরাশি বুকের ভিতর গরল লইয়া আমাদিগকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য অগ্রসর? বস্তুতঃ কি স্নেহ, ভক্তি, প্রেম ইত্যাদি রসপ্রবাহ শুধু উপরে আনন্দের জ্যোৎস্না মাখিয়া, জল-প্রবাহের মত গর্ভে নিবিড় প্রাণঘাতী অন্ধকার লইয়া সংসারে প্রবাহিত? বস্তুতঃ কি সৌন্দর্য্য, সৌন্দর্য্য নহে—প্রবঞ্চনা? বস্তুতঃ কি রস রসহিল্লোল নহে—প্রবঞ্চনা? কুসুমের গন্ধ তৃপ্তিদায়ক ভোগ নহে—প্রবঞ্চনা? আত্মীয়ের প্রীতি-সম্ভাষণ, সমুদ্রের ও জলদের গভীর গর্জ্জন, পুত্রের মাতৃ-আহ্বান, পক্ষি-কূজন, এ সমস্ত রূপোল্লাসময়ী বিজলী মাত্র?—প্রবঞ্চনা? রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, এ সমস্তে কি কেবল প্রবঞ্চনা ভরা? ভগবানের অনন্ত বিজ্ঞান, জীব-সংঘের উন্নতির সংকল্পে প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না? প্রবঞ্চনা ছাড়া কি ব্রহ্মাণ্ডে কিছু নাই? ভগবান্ প্রবঞ্চক, আত্মা প্রবঞ্চক, আত্মা আত্মাকে বঞ্চনা দ্বারা শিক্ষা দিবে—গুরু শিষ্যকে প্রবঞ্চনার দ্বারা সৎপথে চালিত

করিবে ? প্রবঞ্চনা সৃষ্টির মূল-মন্ত্র ? প্রবঞ্চনা পরমাত্মার মূল অবলম্বন ? শিক্ষার অন্য উপায় নাই। পূর্ণানন্দে পৌঁছিবার অন্য পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ?

হায় ! হায় ! আমরা বঞ্চনা বঞ্চনা করিয়া আপনাদিগকে বঞ্চিত করিতেছি। সমাজের সঙ্কীর্ণ চক্ষে, ভোগমাত্রই বঞ্চনারূপে প্রতিফলিত হয়। যেমন সত্যই অনিত্যরূপে পরিদৃষ্ট, তেমনি মাতৃ-আকর্ষণ বঞ্চনারূপে প্রতিফলিত।

বহু কাল হইতে মনুষ্য-জগতে এই ধাঁধা চলিতেছে। বহু পূর্ব্বে যেন ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে এই বিরাট্ বঞ্চনার আবিষ্কার করিয়া মনুষ্য-সমাজ আপনাকে জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত করিয়া তুলিয়াছে ! বহু কাল ধরিয়া সেই জ্ঞান-গর্ব্বের মদে মত্ত হইয়া মানব অহর্নিশ চীৎকার করিতেছে, প্রবঞ্চনা—প্রবঞ্চনা—সাবধান। এ পথে যাইও না—সমুদ্রের এ ধারে তরণী লইয়া আসিও না—এখানে তলে পর্ব্বত অবস্থিত—তরণী বিচূর্ণ হইবে, পালাও পালাও—জ্ঞান-সমুদ্রের গর্ভে বিরাট্ পর্ব্বতশৃঙ্গ উচ্চশির করিয়া আছে, দূরে যাও—দূরে যাও ! এ চীৎকার জগতের জ্ঞানকেন্দ্রে জ্ঞানকেন্দ্রে মুখরিত !

সংকীর্ণ চক্ষে এইরূপই প্রতিফলিত হয় সত্য। একই মা আমার আমাদিগের চক্ষের তারতম্যে বিবিধরূপে বিম্বিত। জ্ঞানচক্ষু যখন যে প্রকারে থাকে, তখন সেই প্রকারে আমরা জগৎ ভোগ করি। মায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পরিদর্শন করিতে যত আমরা চক্ষুকে তদুপযুক্তরূপে সঙ্কুচিত করি, তত দৃষ্টি সেই অংশময় হইয়া উঠে ; সেই অংশ ছাড়া অন্য কিছু দেখিতে, অন্য কিছু ভোগ করিতে পাই না। প্রধানতঃ জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি একটী যে জীবন, সেইটুকুকে মাপকাঠি করিয়া, সেইটুকুর ভিতর দিয়া আমরা সমস্ত জগৎ বুঝিতে চাহি ; তাই এইরূপ ঘটে। অনন্তা মাকে দেখিতে হইলে আমার অসংখ্য জন্ম-মরণ-চিহ্নিত যে বিরাট্ জীবন, সেই জীবন দিয়া মাকে দেখিতে হইবে, নতুবা জল-বিম্বের সমুদ্র-দর্শনের মত মাকে দেখা হইবে। একটী বিম্ব উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে ; কখনও তরঙ্গময় ক্ষেত্রে, কখনও ঘূর্ণাবর্ত্তনের মধ্যে, কখনও প্রচণ্ড স্রোতের উপরিভাগে, কখনও অগভীর স্থানে, কখনও সুগভীর বারিবিস্তারে, কখনও ঘন অন্ধকারে, কখনও রবিকর-রঞ্জিত প্রদেশে, যখন যেখানে ফোটে, যখন যেখানে উদ্বেলিত হয়, যদি সে বিম্বের জ্ঞান-চক্ষু থাকিত, তবে সে যেমন বার বার জলধিবক্ষকে সেইরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারে পরিদর্শন করিত, আমরাও তদ্রূপ এক এক বার স্থূলে ফুটিয়া উঠিতেছি, যেরূপ জ্ঞানচক্ষু লইয়া ফুটিতেছি, সেই ভাবে চারি ধার দর্শন

করিতেছি—ব্রহ্মাণ্ডকে, ব্রহ্মাণ্ডময়ী মাকে সেই রকম বলিয়া বর্ণনা করিয়া, মাকে তদাকার বলিয়া বিঘোষিত করিয়া আবার ডুবিতেছি। যতক্ষণ এই সূক্ষ্মে ডুবিয়া যাওয়া ও স্থূলে ভাসিয়া উঠা বা মৃত্যু ও জন্মকে এক বলিয়া ধারণা করিতে না পারিব, ততক্ষণ মাতৃ-রহস্য বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। তাই বলিতে-ছিলাম, জন্ম-মরণের দ্বারা খণ্ডিত ক্ষুদ্র জীবনের মাপকাঠি হাতে ধরিয়া মাকে মাপিতে যাওয়া চলে না। অপরিচ্ছিন্না মাকে মাপিতে হইলে তদুপযুক্ত অবিচ্ছিন্ন নিজ জীবন হাতে লইতে হইবে। আগে নিজের যে একটি প্রকাণ্ড জীবনপ্রবাহ আছে—যাহাতে জন্ম-মৃত্যুরূপ গ্রন্থি সহস্র সহস্র বিদ্যমান, সেই মাপকাঠি বুঝিয়া লইতে হইবে। তবে বুঝিবে, এ জগৎ প্রধানতঃ কি প্রকার। ইহার পরমাণুতে পরমাণুতে 'যাহাই থাকুক, ইহার ক্ষুদ্র চরণ-নখরে, কিম্বা ইহার একটী লোমকূপে যে চিহ্নই থাকুক, ইনি প্রধানতঃ কি প্রকার, তবে বুঝিতে পারিব। একটী লোমকূপে যদি একটী চিহ্ন থাকে, তাহা দেখিয়া যেমন একটী মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গ কল্পনা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র, তদ্রূপ ক্ষুদ্র জ্ঞানের সাহায্যে মাতৃ-অঙ্গের ক্ষুদ্র একটী পরিণাম বা বিকার অনুভব করিয়া, মাকে তদ্রূপ বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা বৃথা হাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র।

যাহা হউক, এইরূপে মুখে আমরা ভোগকে দূর করিয়া দিতে চাহি সত্য, কিন্তু কার্য্যতঃ কেহ পারি না। কার্য্যতঃ ভোগের দিকেই আমরা ছুটি। জগতের সাধারণ মনুষ্য, সাধারণ জীবসংঘ মাত্র নহে—যাঁহারা জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন অর্থাৎ যোগী, তাঁহারাও তাই। সাধারণ জীবসংঘ না হয়, সাধারণ ভোগার্থে লালায়িত, যোগীরা এক অনির্ব্বচনীয় পরিতৃপ্তি বা শান্তি ভোগের জন্য সচেষ্ট; ভগবৎপ্রয়াসী ভগবান্‌কে ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত। ভোগই সৃষ্টির মূলমন্ত্র; মা পুত্রকে ভোগ করিতে চাহে, পুত্র মাকে ভোগ করিতে চাহে—ইহাই ব্রহ্মাণ্ড রচনার আদি কারণ, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভোগ—বঞ্চনা নহে, ভোগ যথার্থই ভোগ, ভোগ যথার্থই আনন্দ। ভোগে যদি আনন্দ না থাকিত, তবে আমরা জগতে থাকিতাম না বা থাকিতে পারিতাম না, আত্মঘাতী হইতাম। ভোগের গর্ভে কোন প্রবঞ্চনা লুক্কায়িত নাই। সৌন্দর্য্য বস্তুতঃ সৌন্দর্য্য ছাড়া অন্য কিছু নহে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বস্তুতঃ কোন বন্ধনে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কল্পিত নহে, উহা ভোগ উদ্দেশ্যেই কল্পিত, উহা আমাদিগের ভোগশক্তি পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্যই রচিত। শিশুকে যেমন মা

একটু একটু "মুখচার" খাওয়াইয়া অন্নাদি খাওয়াইতে শিখায়, শিশু যেমন ক্রমশঃ পাঁচ রকম দেখিয়া শুনিয়া তাহার ইন্দ্রিয়-সকলকে পরিপুষ্ট করিয়া লইয়া, জগৎ ভোগ করিবার উপযুক্তভাবে ইন্দ্রিয়-সকলকে রচিত করিয়া জগদ্‌ভোগে সক্ষম হয়, এ সমস্ত শব্দস্পর্শাদি ভোগও তদ্রূপ। ওই সমস্ত ভোগ করিতে করিতে ভোগস্পৃহা বলবতী হয় ও ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চাঙ্গের ভোগের দিকে আমরা ছুটি ও পাই। আমাদিগের বিরাট্‌ জীবনের চক্ষু দিয়া দেখিলে ইহাই আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। এই আমি, এই জগৎ কত দিনের? কিন্তু এই আমি এই জগতে কত বার কত প্রকারে আসিয়াছি, কত বার কত প্রকারে ইহাকে দেখিয়াছি, ভোগ করিয়াছি! এই একই জগৎ কত ভিন্ন ভিন্ন জন্মে, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে, ভিন্ন ভিন্ন জীবকুলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইতেছে, আমায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভোগ দিয়াছে। আমি যখন যেরূপ ভোগশক্তি লইয়া আসিয়াছি, তখন সেইরূপ ইন্দ্রিয়-সকল ফুটাইয়া সেইরূপে ইহাকে ভোগ করিয়াছি। তারতম্য জগতের বড় নহে, তারতম্য আমার শক্তির, আমার ভোগাধিকারের। যখন যেরূপ অধিকার পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তখন সেইরূপ উচ্চাঙ্গের ভোগ লাভ করিয়াছি।

এই অধিকার লইয়া যত গণ্ডগোল। মহাভোগ আমাদিগের লক্ষ্য বলিয়া, সেই মহাভোগে শীঘ্র শীঘ্র পৌঁছাইতে প্রাণ চাহে বলিয়া, আমরা শীঘ্র শীঘ্র ভোগাধিকার চাহি। আমার যেরূপ ভোগে অধিকার, আমি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, "তার পরের ভোগ", "তার পরের ভোগ" সদা সর্ব্বদা অপেক্ষা করি— আমার পার্শ্বের উচ্চতর ভোগাধিকারীর ভোগ পাইতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি, আপনার ভোগ্য 'ভাল নহে" ' ভাল নহে" বলিতে বলিতে ভোগ করি। আমার অধিকার, আমার শক্তির উপযুক্ত ভোগে আমি সন্তুষ্ট নহি। জগতে যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহাতে আমার অধিকার থাক বা না থাক, তাহার জন্য লালায়িত হইয়া পড়ি। আমরা ভোগ অপেক্ষা অধিকার পাইতেই অধিক ব্যস্ত। সাধারণ আচার ব্যবহারে দেখ, লোক অর্থভোগ অপেক্ষা অর্থ-সঞ্চয়ে অধিক নিবিষ্ট; জ্ঞান কার্য্যকারিরূপে ফুটাইয়া তোলা অপেক্ষা অধিক জ্ঞান লাভ করিবার জন্য লালায়িত। অধিকার পাইবার জন্য অহর্নিশ আমরা ব্যাকুল; সেই জন্য ভোগসকল অপ্রিয় হইয়া উঠে, সেই জন্য ভোগসকলকে আমরা ক্রমশঃ বিষময়, বন্ধন ইত্যাদিরূপে বুঝিতে থাকি। ক্রমশঃ আমরা এইরূপে জগৎকে

তিক্ত করিয়া তুলিয়াছি, আনন্দনিকেতনকে কারাগার ভাবিতেছি. শান্তি কুঞ্জকে সংগ্রামস্থলে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছি। আমি যদি নিজ অধিকারভুক্ত ভোগে সন্তুষ্ট থাকিতাম, তাহা হইলে, তাহা হইতেই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া, ভোগপ্রদায়িনী মাকে চিনিতে পারিতাম। আমাদিগের যতটুকু "অধিকার", ততটুকু "ভোগে" সন্তুষ্ট না হইয়া, আমাদিগের অধিকারের "বহির্ভূত" ভোগ অধিকারের জন্য আমরা লালায়িত বলিয়া, আমাদিগের কর্ম্মের লক্ষ্য অধিকারের দিকে থাকে না—শুধু অধিকার-বহির্ভূত ভোগের দিকে বা গৌণ ফলের দিকেই থাকে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, আজি যাহা অধিকার, তাহার সম্যক্ ভোগ হইলে, তবে তাহার ফলস্বরূপ উচ্চতর অধিকার প্রাপ্ত হই। সুতরাং আমাদিগের কর্ম্মসকল এখন উচ্চতর বা আমার অধিকারসীমার বহির্ভূত ফলের দিকে চাহিয়া সম্পাদিত হয়, উহারা "ফলহেতু কর্ম্ম"—"অধিকার-বিহিত" কর্ম্ম নহে; এবং সেই জন্য ওই সকল কর্ম্ম, ভোগকে নীরস করিয়া দেয়, ভোগশূন্য কৃপণ কর্ম্মমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। আমরা ভোগের মধ্যে থাকি, ভোগের জন্যই ছট্‌ফট্ করি, অথচ "ভোগ ভয়াবহ," "ভোগ বিষময়" বলিয়া চীৎকার করি। ব্রহ্মাণ্ডে ভোগার্থী সকলেই, অথচ ভোগী ত দেখিতে পাই না—সঞ্চয়ী মাত্র পরিদৃষ্ট হয়। সেই জন্য ভোগসকল অমৃতপ্রদ না হইয়া বিষপ্রদ হইয়া উঠে। আমরা ভোগে অমৃত না পাইয়া বিষ পাই; তৃপ্তি না পাইয়া অতৃপ্তি পাই; তৃষা না থামিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়।

তবে কি "ভোগ ভোগ" করিয়া ছুটিব? তাহা হইলে সমাজ ত পশুসমাজে পরিণত হইবে? না—বরং ঠিক বিপরীত। ভোগের জন্য আমি যাহা পাইয়াছি, আমার যাহাতে ন্যায্য অধিকার আছে, যতটুকু শক্তি আছে. ততটুকুমাত্র ভোগেই তৃপ্তি লাভ করিব; ভোগে পরিতৃপ্তি লাভ করিলেই সে ভোগ যাঁহার দ্বারা আমার অধিকারভুক্ত হইয়াছে, কৃতজ্ঞতায় হৃদয় তাঁহার দিকে ছুটিবে। তখন যদি আবশ্যকীয় কোন ভোগের অভাবও হয়, আহার্য্যাদির সংগ্রহ পর্য্যন্ত যদি না হইয়া উঠে, তবু প্রাণ কৃতজ্ঞতাতেই পূর্ণ থাকিবে, বিদ্রোহী হইবে না। বাহ্যপ্রকৃতির শোভা, তখন মাত্র শোভারূপে তোমার প্রাণে প্রতিফলিত হইবে না, তাহার ভিতর অন্নপূর্ণেশ্বরী স্মেরাননা মাকে দেখিতে পাইবে; বায়ু, জল, অনল, শুধু প্রয়োজনীয় জীবনস্বরূপ পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে না, মাতৃ-স্নেহের বিমল ধারা তাহার তরঙ্গে তরঙ্গে বুঝিতে পারিবে। বাহ্যপ্রকৃতি

চৈতন্যময়ী বলিয়া তোমার প্রাণ তখন অনুভব করিবে। আকাশে অথবা ধরণী-বক্ষে যে দিকে দৃষ্টি ফিরাইবে, স্নেহের উৎস, চৈতন্যের উৎস, হৃদয়ের আদান-প্রদান ছাড়া অন্য কিছু উপলব্ধিতে আসিবে না। তুমি বুঝিবে, যথার্থই মা কেমন করিয়া তোমায় ধারণ করিয়া আছেন। তোমার প্রাণের সকল কপাট আপনি উন্মোচিত হইয়া যাইবে, তুমি শিশুবৎ অকপটহৃদয় নগ্ন প্রাণের স্বাধীনতা পাইবে।

কিন্তু আমরা তাহা করি না। আমাদের মন আমাদের প্রাণকে সে ভাবে নিশ্চিন্তে তৃপ্তিতে ভোগ করিতে দেয় না। প্রাণের ধর্ম্ম—ভোগ ও তৃপ্তি এবং সেই তৃপ্তি হইতে ধর্ম্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা বা মাকে চেনা। মনের ধর্ম্ম—সংগ্রহ—অধিকার। ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যাহা পায়, মন তাই সঞ্চয় করে, সংগ্রহ করে, প্রাণের ভোগটুকু বিষময় করিয়া দেয়, প্রাণকে ভোগ করিবার অধিকার ও অবসর দেয় না, প্রাণের ন্যায্য অধিকার নষ্ট করে, আপনি ভোক্তা হইয়া পড়ে। প্রাণকে বিশুষ্ক, নির্জীবিত, উচ্ছেদিত, নির্ব্বাসিত করে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারি, আমরা প্রাণে ভোগ পাই না। মনেই ভোগ পর্য্যবসিত হয়। প্রাণতোষিণী তৃপ্তি আমরা কয়টী পদার্থ হইতে প্রাপ্ত হই? মনের জ্বালায় আমরা ভোগ পাই না। ভোগ ভোগ করিয়া মরি। মন আপনার ঐ দুর্ব্বলতা আচ্ছাদন করিয়া রাখে।

প্রত্যেক ভোগের নিকট হইতেই আমরা তৃপ্তি পাইতাম, এবং সেই তৃপ্তি আমাদিগকে সবল, দৃঢ়, পুষ্ট করিত; ভোগরূপিণী মা—আমাদিগের সকল দুর্ব্বলতা বিদূরিত করিতে সমর্থা হইতেন, কিন্তু প্রয়োজন না থাকিলেও আপন দুর্ব্বলতাবশতঃ মন যাহা দেখে, তাহাতেই আকৃষ্ট হয়, ভোগের মোহরূপ গান্ধা-রীর নিকট সে দুর্ব্বলতা ছলে চাপা দিয়া উপস্থিত হয়। আপনার সে দুর্ব্ব-লতা আবৃত করিয়া—যেন কত আবশ্যক আছে—যেন না হইলে চলিবে না, যেন ভোগ্য পদার্থ বা বিষয়াদি সংগ্রহ না করিলে কোন প্রকারে চলে না, এই ভাবে আমরা জগতে হুড়াহুড়ি করি; ভোগের মোহের দ্বারে এই ভাবে আপ-নাকে আপনি বঞ্চিত করিয়া গিয়া উপস্থিত হই। সুতরাং অপরিমিত ভোগ্য পদার্থ সংগ্রহ হইলেও সে দুর্ব্বলতা থাকিয়া যায়; ভোগের মোহ আমাদিগের দুর্ব্বলতা ঘুচাইতে পারে না, বরং আমাদিগকে সমধিক সংগ্রহ-কার্য্যোপযোগী দার্ঢ্য প্রদান করে।

তাই বলিতেছিলাম, দুর্ব্বলতা আবৃত করিও না; যাহা আছে, যেরূপ ভোগক্ষেত্র পাইয়াছ, তাহাতেই তৃপ্তি লাভ কর—"ফলহেতু" কর্ম্মী না হইয়া, তৃপ্তিদায়িনী মায়ে আকৃষ্ট হও; সর্ব্বত্র তৃপ্তির ভাবে প্রাণ নিমজ্জিত করিয়া মাকে পরিদর্শন করিতে যত্নবান্ হও। ফলহেতু কর্ম্মসকল কৃপণ, ভোগ দেয় না—সঞ্চয় মাত্র হয়। উহা নিকৃষ্ট অবর।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥৫০

বুদ্ধিযুক্তঃ—বুদ্ধ্যা যুক্তো বুদ্ধিযুক্তঃ ইহ অস্মিন্ লোকে ইহৈব জন্মনি উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে জহাতি পরিত্যজতি, তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব; যোগঃ হি কর্ম্মসু কৌশলম্। কর্ম্মণাং বন্ধস্বভাবত্বাৎ তদনুষ্ঠানে বদ্ধাবস্থা স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য কৌশলমেব বিশদয়তি।

ব্যবহারিক অর্থ।—বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হইলে, ইহ জন্মেই জীব সুকৃত দুষ্কৃত পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। অতএব তুমি এইরূপে যুক্ত হইয়া কর্ম্ম কর, অর্থাৎ কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর, বন্ধনধর্ম্মী কর্ম্মসকলই মোক্ষ সাধন করিবে,—ইহাই চাতুর্য্য।

যৌগিক অর্থ।—যে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ, তাহাই আবার সুকৌশলে করিতে পারিলে বন্ধন মোচন করিয়া দেয়। অস্ত্রের দ্বারা যেমন আত্মরক্ষা করা যায়, আবার আত্মঘাতীও হইতে পারা যায়, অগ্নির দ্বারা যেমন গৃহদাহ উপস্থিত করিতে পারা যায়, আবার ব্রহ্মযজ্ঞও সম্পাদন করিতে পারা যায়। বারি দ্বারা যেমন তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া জীবন রক্ষা করা যায়—আবার ইচ্ছা করিলে তাহাতেই আত্মবিসর্জ্জনও অসম্ভব নহে; কর্ম্মও তদ্রূপ। কর্ম্ম দ্বারা শুভাশুভ ফল লাভ হয় সত্য, কিন্তু সেই কর্ম্মের দ্বারাই আবার শুভাশুভের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। শুধু প্রয়োগকৌশলের উপর ফলাফল নির্ভর করে। সেই জন্য যোগ আর কিছুই নহে—কর্ম্মের প্রয়োগকৌশল মাত্র বলিয়া ভগবান্ উল্লেখ করিলেন।

বুদ্ধির দ্বারা ভগবানে যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে "সু" "কু" দূর হইয়া যায়—ইহা বুদ্ধিযোগের একটী প্রধান লক্ষণ। আমরা সাধারণতঃ কর্ম্মের বাহ্যাঙ্গ দেখিয়াই 'কু' 'সু' বিচার করি। কিন্তু বস্তুতঃ আমার কর্ম্মের বাহ্যাঙ্গে আমার 'কু' 'সু' স্থিরীকৃত হয় না। কিরূপ বুদ্ধির দ্বারা সে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে,

তাহারই উপর আমার ফলাফল বিশেষরূপে নির্ভর করে। একই কর্ম্ম সঙ্কল্পের তারতম্যে পুণ্য অথবা পাপজনক হইতে পারে। যে সকল মানসিক বৃত্তি আমরা সাধারণতঃ "কু" বলিয়া জানি এবং পরিত্যাগ করিতে প্রয়াস পাই, তাহাই যদি সুকৌশলে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে আমার সদ্‌গতির কারণ হইতে পারে। সুকৌশলে প্রয়োগ অর্থে ভগবানে লক্ষ্য করিয়া অনুষ্ঠিত হওয়া। ভাগবতে ইহা স্পষ্ট করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

"গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংসঃ দ্বেষাৎ চেদ্যাদয়ো নৃপাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে কামবৃত্তি ভগবানে অর্পণ করিয়া গোপীরা, ভয় দ্বারা কংস, দ্বেষের দ্বারা চেদিরাজ উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাই বলিতেছি, তোমার কর্ম্মবিচার লইয়া এখন তত মাথা ঘামাইতে হইবে না; তুমি তোমার প্রাণের যে কোন একটী বৃত্তি, যে কোন কর্ম্ম দ্বারা ভগবানে যুক্ত থাক, যে কোন ভাবের দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকিতে অভ্যাস কর; যাহা তোমার সম্মুখে আছে, যাহাতে তুমি অভ্যস্ত, সেই ভাব, সেই কর্ম্ম তুমি লও। কর্ম্ম, ভাব, এ সকল তোমার অঙ্গে অহর্নিশ স্ফুরিত, এ সকলের অভাব ত তোমার কখনও হয় নাই, তবে তোমার যখন যে ভাব, যে কর্ম্ম মনে পড়িয়া যাইবে, তাহারই ভিতর দিয়া ভগবানে লক্ষ্য স্থাপন করিবে।

ভগবানের উদ্দেশ্যে কি কর্ম্ম করিব, কোন্ বিশেষ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ভগবদ্‌যুক্ত হইতে পারিব—কোন্ প্রকার প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে তবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, তাঁহাকে পাইব—এই চিন্তায় প্রায় মনুষ্যমাত্রকেই সময়ে সময়ে ব্যস্ত থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু এই চিন্তা করিতে করিতেই অনেকের জীবন অবসান হইয়া যায়। কর্ম্মের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, অথচ কর্ম্ম খুঁজিয়া পায় না। মৎস্যের জলতৃষার ন্যায় ইহা অলীক। এরূপ স্থলে সাধারণতঃ আমরা আহার্য্যের অভাব দেখিতে পাই না, ক্ষুধার মাত্র অভাব দেখিতে পাই। ক্ষুধিত ব্যক্তি অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাইলে সর্ব্বপ্রথম যে ব্যঞ্জন খায়, তাহাই যেমন তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু বলিয়া বিবেচিত হয়, যত উদরপূর্ত্তি হইয়া আইসে, তত যেমন ব্যঞ্জনাদির মিষ্টতা তাহার মুখে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, কর্ম্মও ঠিক তদ্রূপ জানিবে। তাঁহাকে পাইবার আকুলতা যতক্ষণ প্রবল থাকে, ততক্ষণ যে কর্ম্মই সম্মুখে উপস্থিত হউক, সে কর্ম্ম করিয়াই তাহার প্রাণ সম্যক্ পরিতৃপ্তি লাভ করে। আকুলতার হ্রাস হইলে আর উহা ভাল

লাগে না, অন্য প্রকার কর্ম্মের জন্য প্রাণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। তোমার স্বীয় ক্ষেত্রে যে সকল স্বাভাবিক কর্ম্ম তুমি পাইয়াছ, সেই সকল কর্ম্ম এবং তৎসঙ্গে গুরুকর্ত্তৃক যদি কোন পন্থা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই কর্ম্ম আকুলতার সহিত কর। তাহাতেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তুমি সুকৃতি ও দুষ্কৃতির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। কোন বিশিষ্ট কর্ম্মের সহিত যুক্ত হইবার জন্য তত ব্যস্ত হইও না, কিন্তু কর্ম্মসকলকে বুদ্ধি দ্বারা ভগবানে যুক্ত করিবার জন্য অগ্রে ব্যস্ত হও।

সুকৃতি ও দুষ্কৃতির হাত হইতে কেমন করিয়া পরিত্রাণ পাওয়া যায়?—মনে কর, আমি একটী পদার্থের দিকে চাহিয়া আছি। যতক্ষণ আমি সেই পদার্থ টীর দিকে চাহিয়া থাকি, ততক্ষণ আমার সমস্ত প্রাণশক্তি ঐ পদার্থ মুখে ধাবিত হইতে প্রয়াস পায়। সমস্ত প্রাণশক্তির উপর আমার এখন সম্যক্ কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া যদিও আমি সম্যক্‌রূপে প্রাণশক্তিকে ঐ পদার্থে চালিত করিতে পারি না, কিন্তু অংশতঃ উহা চালিত হয়; এবং ঐ পদার্থ ক্ষুদ্র সসীম বলিয়া আমার সে প্রাণ-প্রবাহ সঙ্কুচিত হইতে থাকে। আকাশাদি কোন বিস্তৃত পদার্থের চিন্তা করিলে উহার বিস্তার আমাদিগের প্রাণশক্তিকেও বিস্তৃত করে, বিরাট্ চিন্তায় প্রাণশক্তি বিস্তৃত হয়, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভগবৎচিন্তায় ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তার লাভ করে। প্রাণশক্তি দেহের প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর স্ফুরিত হইতে থাকে। অনন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়া আর স্থির হইয়া যাওয়া, একই কথা। তখন আর কোন দিক্‌বিশেষে প্রাণশক্তি ছুটে না বা ছুটিবার অবসর পায় না। কেন না অনন্ত অর্থে সর্ব্বদিক্ ব্যাপিয়া যে বিশাল বিস্তৃতি, উহার ব্যাপ্তিহীন মূলদেশ অর্থাৎ আত্মা। সুতরাং প্রণশক্তি সঙ্কুচিত অথবা বিস্তৃত, কোনরূপ গতিই প্রাপ্ত হয় না। ইহাই কু ও সুর বহির্ভূত হওয়া।

যাহা হউক, এখন দেখা যাউক, কি উপায় অবলম্বন করিলে, সকল কর্ম্ম বুদ্ধি-যুক্ত হইয়া করা যাইতে পারে। আমরা দিনে লক্ষ লক্ষ কর্ম্ম করি, কিন্তু সকল-গুলি লক্ষ্যহীন অথবা নিম্নলক্ষ্য। বাহ্যিক এমন কোন উপায় কি নাই, যাহার অভ্যাসের দ্বারা কর্ম্মসকল সম্পাদনকালে আমাদের লক্ষ্যের কথা মনে পড়িবে এবং তখন তাঁহার মুখ চাহিয়া সে কর্ম্ম সম্পাদন করিব? কি কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিলে কর্ম্মে কর্ম্মে আমরা মাতৃ-সন্নিধানে অগ্রসর হইব—মাতৃ দর্শনে কৃত-কৃতার্থ হইব? সে উপায় জপ। সে কথা পরে বলিব। কাষ্ঠে কাষ্ঠে

ঘর্ষণ করিলে তাহার অভ্যন্তরস্থ নিগূঢ় অগ্নি যেমন প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ দেহ বা প্রাণ ও মন্ত্রে বা বীজে অহর্নিশ ঘর্ষণ অভ্যাস করিলে কর্ম্মসকল ভগবৎ-তাপে তাপিত হয় এবং সহসা সে নিগূঢ় সত্য বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়কে আলোকিত করে।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্‌ ॥ ৫১

বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ হি নিশ্চিতং কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি।

ব্যবহারিক অর্থ।—বুদ্ধি দ্বারা ঐরূপে যুক্ত হইতে থাকিলে মনুষ্য, কর্ম্মজাত ফলসকল পরিত্যাগ করিয়া, জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, অনাময় পদ বা মোক্ষ লাভ করেন।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ভগবানে বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হইলে এই জন্মেই জীব সুকৃত-দুষ্কৃতের বাহিরে চলিয়া যায়। কিন্তু সে যাওয়া কি শুধু এই জন্মের মত? পুনরায় কি তাহাকে জন্ম পরিগ্রহণ করিতে হইবে? তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব যে সমস্ত পুঞ্জীভূত সংস্কার আছে, সেগুলির উপায় কি? সেগুলি কেমন করিয়া বিদূরিত হইবে? উপস্থিত আর না হয় নূতন বন্ধন বা সংস্কার জন্মিয়া তাহাকে আবদ্ধ ও আবৃত করিতে পারিবে না, কিন্তু পূর্ব্ব-সংস্কার? সেই আশঙ্কা দূর করিবার জন্যই এই শ্লোকের অবতরণিকা; নতুবা এ শ্লোক বলিবার ভগবানের অন্য তাৎপর্য্য নাই। ঐ আশঙ্কা দূর করিতে ভগবান্‌ বলিতেছেন, তাহার জন্ম-বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে, কর্ম্মজাত ফলসকল পরিত্যাগ করিয়া সে জীব পুনর্জন্মের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবে। বেগযুক্ত শর যেমন পত্রাদি ভেদ করিয়া গিয়া আকাশে উপস্থিত হয়, সেই প্রকার মাতৃ-আবেগযুক্ত প্রাণ, পত্রাদিভেদের ন্যায় জন্মাদি উপদ্রব বা কুজ্ঝটিকা-সকল ভেদ করিয়া, উপদ্রবরহিত অনাময় পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে। শাস্ত্রে ইহার এই প্রকার তুলনা আছে যে, যেমন দশ কুড়িখানি পত্র একত্রে ধরিয়া, তাহার ভিতর দিয়া একটি সূচি বেগে প্রবর্ত্তিত করিলে মনে হয়, যেন সূচিটি একেবারে এক সঙ্গে পত্রগুলি বিদ্ধ করিয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ যেমন সমস্ত পত্রই একটার পর একটা করিয়া সূচি বিদ্ধ করে, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। মাতৃ-আবেগে প্রাণ পূর্ণ হইলে গতি অসম্ভব মাত্রায় পরিবর্দ্ধিত হয়। আমাদিগের সংস্কার-

ক্ষেত্রে পর পর আমাদিগের জন্ম ও কর্ম্মশৃঙ্খলা সাজান আছে, আমাকে নিশ্চয়ই সেইগুলির ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু সেগুলি যদি একত্রে পুঞ্জীভূত করিয়া, বেগে ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রগুলি আর ভোগ হয় না। বাজীকরেরা যেমন অগ্নির ভিতর দিয়া লাফাইয়া যায় অথচ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয় না, তদ্রূপ সে ক্ষেত্রগুলির ভিতর ভোগ প্রাপ্ত না হইয়াই আমরা মাতৃক্রোড়ে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিব। যে পরিমাণে আমরা মাতৃ-আবেগযুক্ত হইব, সেই পরিমাণে আমাদিগের গতি ত পরিবর্দ্ধিত হইবেই, তাহা ছাড়া মাতৃ-আকর্ষণও পরিবর্দ্ধিত হইবে, এবং সেই জন্য এই উভয় দিকের আকর্ষণের চাপে মধ্যস্থ আমার সংস্কার-ক্ষেত্র কুঞ্চিত, পুঞ্জীভূত হইয়া যাইবে। তখন মনে হইবে, সকল জন্মগুলি যেন এক সঙ্গে এক মুহূর্ত্তে ভেদ করিয়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলাম। মেল ট্রেণ যেমন মধ্যবর্ত্তী সকল ষ্টেসনে না থামিয়া বেগে বহির্গত হইয়া যায়, তদ্রূপ ভাবে তুমি ইহজন্মেই সেই সমস্ত ঘটনারাশির ভিতর দিয়া ভেদ করিয়া চলিয়া যাইবে। ইহজন্মেই একান্ত শেষ না হয়, বড় বেশী এক আধ জন্ম—এই পর্য্যন্ত।

অনেক জন্মের কর্ম্মফলগুলি এক জন্মেই ভোগ হইয়া নিঃশেষিত হইয়া যাইতে পারে, ইহাই মাতৃ-আবেগের একটী অপূর্ব্ব লক্ষণ। আমরা সময়ে সময়ে অনেক ধার্ম্মিক লোককে দারিদ্র্যাদি বিবিধ উপদ্রবের দ্বারা প্রপীড়িত হইতে দেখিতে পাই। ইহার অন্যতম কারণ, ওই এক জন্মের ভোগ-ক্ষেত্র-মধ্যে অন্যান্য পরবর্ত্তী জন্মের ভোগগুলি আসিয়া পড়া। আবার অনেক বিরাগযুক্ত পুরুষকে ধনকুবের হইয়া থাকিতেও দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাও পূর্ব্বোক্ত কারণেই হইয়া থাকে। অনেক সিদ্ধপ্রায় পুরুষ স্বপ্নের দ্বারা এক একটী জন্ম অতিক্রম করেন। একদিন দিবাভাগে কোন মহাপুরুষ আহারাদির পর আপনার প্রিয়শিষ্য সহ বিশ্রাম করিতেছিলেন। শিষ্য গুরুসেবা করিয়া, গুরুর আদেশ অনুসারে তাঁহার অনতিদূরে শায়িত ছিল। গুরুও উপবিষ্ট থাকিয়া শিষ্যের ভবিষ্যৎ দর্শন করিতেছিলেন। শিষ্য শুইয়া থাকিতে থাকিতে ক্ষণকাল মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল। নিদ্রিতাবস্থায় দুরন্ত বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্নে তাহার প্রাণ কম্পিত হইতে লাগিল; সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে অভিষিক্ত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ সে স্বপ্নের মাত্রা এত প্রগাঢ় ভীতিপ্রদ হইল যে, শিষ্য সেই স্বপ্নাবস্থাতেই "গুরু রক্ষা কর, গুরু রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; সে চীৎকার মনে

মনে নহে, বাহ্য জগতেও সে শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। গুরু বসিয়া বসিয়া হাসিতেছেন, এমন সময় অন্য এক শিষ্য সেখানে আসিয়া, এই দৃশ্য দেখিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া, একবার গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া, দ্রুত সেই স্বপ্নাবিষ্ট শিষ্যকে ধরিবার উপক্রম করিল; কিন্তু গুরু হাসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেন। দ্বিতীয় শিষ্য স্তম্ভিত হইয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। আর সেই নিদ্রিত শিষ্য সেই ভাবে অনেক ক্ষণ ধরিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদাদি করিতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া দেখিল, গুরুদেব হাসিতেছেন এবং তাহার সমবয়স্যও গুরুর দেখাদেখি হাসিতেছে। সে উঠিয়া দ্রুত সেই সমবয়স্যের নিকট একটু জল প্রার্থনা করিল ও তাহাকে হাসিতে দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল,—"আমি স্বপ্নে মরিতে বসিয়াছিলাম, আর তুমি হাসিতেছ, আমাকে ডাকিতে পার নাই।"

গুরু হাসিয়া বলিলেন,—"বৎস, তুমি মর নাই—তুমি সৌভাগ্যবান্—একটা জন্ম তোমার অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই বহিয়া চলিয়া গেল। তোমার শুভদিন আগতপ্রায়।" শিষ্যদ্বয় গুরুর হাস্যের কারণ উপলব্ধি করিল।

যাহা হউক, এইরূপে বিনা ভোগে অথবা স্বপ্নময় ভোগে আমরা আমাদিগের ভবিষ্যৎ জন্মগুলিকে অগ্রাহ্য ভাবে পরিত্যাগ করিয়া দ্রুত মাতৃ সন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইতে পারি। সুরথ রাজার এইরূপে লক্ষ জন্ম মুহূর্ত্তে অতিক্রম করিবার দৃষ্টান্ত আছে। শুনিতে পাই, সুরথ রাজা লক্ষ বলি দিয়া মাতৃপূজা সমাধান করিবার পর যখন তিনি মাতৃলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তখন সহসা তিনি দেখিলেন, সেই লক্ষ পশু ঘাতকের মত তাঁহাকে হনন করিতে উদ্যত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। লক্ষ ঘাতক-বেষ্টিত সুরথ "মা মা" করিয়া মাতৃচরণে লুণ্ঠিত হইল। লক্ষ অস্ত্র এক সঙ্গে এক মুহূর্ত্তে মাতৃ-ইঙ্গিতে সুরথের শিরে পড়িল। সুরথ লক্ষ মৃত্যু একবারমাত্র মৃত হইয়াই মাতৃকৃপায় অতিক্রম করিলেন।

মাতৃ-আবেগ প্রাণে ফুটাইতে পারিলে তাহার ফলস্বরূপ এত সুবিধা আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২

যদা তে বুদ্ধিঃ মোহকলিলং ব্যতিতরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ নির্ব্বেদং গন্তাসি।

ব্যবহারিক অর্থ।—এইরূপে যখন তোমার বুদ্ধি মোহকলিল সম্যক্‌রূপে অতিক্রম করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ে নির্ব্বেদ ভাব প্রাপ্ত হইবে।

যৌগিক অর্থ।—বুদ্ধির দ্বারা, কল্পনার দ্বারা মায়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যুক্ত হইয়া চলিতে চলিতে যখন সম্যক্‌রূপে তুমি সমস্ত মোহকলিলের বাহিরে গিয়া পড়িবে, যখন মাতৃস্মরণে তোমার প্রাণের গতি সহস্রগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, তোমাকে দ্রুত ভাবে তোমার সংস্কারাত্মক মোহসকল ভেদ করিয়া লইয়া, মোহের বাহিরে গিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তুমি তোমার একমাত্র যাহা শ্রোতব্য এবং যাহা তুমি অস্ফুট ভাবে, বিকৃত ভাবে, আভাস ভাবে শুনিয়াছ, সে বিষয়ে নির্ব্বেদ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভগবদ্‌বেদনই প্রাণকে ছুটাইয়া লইয়া যায়; উহাই বেদ। বেদন যত বলবান্ হয়, গতি তত বর্দ্ধিত হয়। বুদ্ধির দ্বারা সেই বেদন আরম্ভে উপলব্ধি করিতে হয় এবং উহার নামই বুদ্ধির দ্বারা মায়ে যুক্ত হওয়া। ঐ ভাবে বুদ্ধির দ্বারা মাতৃভাব প্রাণে ফুটাইয়া যত প্রখরতরভাবে মায়ের দিকে প্রাণ ছুটিবে, তত ক্রমশঃ একমাত্র যাহা আমাদের শ্রোতব্য, সেই মাতৃ-আহ্বান আভাসে আমরা শুনিতে পাইব। সে মহা মাতৃ-আহ্বানের নাম প্রণব। সেই প্রণবের সুগভীর অনন্তদিগ্‌বিস্তৃত ধ্বনি প্রাণে ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে। শুন, গুরু দ্বারা কোন প্রকার পন্থা যদি তুমি এখন পর্য্যন্ত না পাইয়া থাক, যদি এখন পর্য্যন্ত ভগবদুদ্দেশ্যে কোন বিশেষ ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবার অবসর তোমার না আসিয়া থাকে,—নিরাশ হইও না; তোমার সাধারণ কর্ম্মসকল যে ভাবে সম্পন্ন করিতে বলিয়াছি, সেই ভাবে বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সম্পন্ন কর, ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা যত পার, কর্ম্মসকলকে মাতৃমুখী কর; দেখিবে, ক্রমশঃ একটী উদার ভাব তোমার প্রাণে ফুটিয়া উঠিতেছে, ক্রমশঃ যেন তোমার প্রাণটা প্রসারতা লাভ করিতেছে; এবং সেই সঙ্গে এক একবার নিস্তব্ধ অবস্থায়, বহু দূরে—দিক্‌প্রান্ত হইতে যেন কি একটী অস্ফুট—বিরামহীন আহ্বান আসিতেছে, এইরূপ তোমার মনে হইবে। বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হওয়া যত গাঢ়তর হইবে, সে আহ্বান তত স্ফুটতর ও তত ঘন ঘন তুমি পাইতে থাকিবে। ক্রমশঃ সে শব্দ নানাপ্রকার বিকৃত ভাবে

উপলব্ধি হইবার পর—কখনও ঘণ্টাধ্বনিবৎ, কখনও সাগরগর্জ্জনবৎ, কখনও বংশীনিনাদবৎ, কখনও বিহঙ্গমকূজনবৎ—এইরূপ নানা ভাবে তোমার অনুভবে আসিবার পর—উহা প্রণবোচ্চারণের মত বা প্রণবের মত তোমার কাণে বাজিবে। বুঝিবে, উহা মাতৃআহ্বান। সাগরের গর্জ্জন যেমন জড়বাদীরা অর্থহীন মনে করে, বায়ুর মর্ম্মর শব্দ যেমন অর্থহীন বলিয়া বিবেচিত হয়—ওই শব্দকে সেরূপ বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডবিবর্ত্তনের একটী বিরাট্ অর্থহীন শব্দ বলিয়া মনে করিও না। মনে করিও না, উহাও কোন নৈসর্গিক শব্দতরঙ্গ মাত্র। বিশেষ করিয়া বলিতেছি, উহাকে মাতৃআহ্বান বলিয়া ধারণা করিতে অভ্যাস করিও; উহাকে আকুল স্নেহপূর্ণ জানিও—উহার পশ্চাতে মূর্ত্তিমতী মায়ের মুখমণ্ডল কল্পনায় দেখিও; তবে গতি আরও খরতর হইতে থাকিবে—তবে বেদন প্রাণে আরও গভীরভাবে বিদ্ধ হইতে থাকিবে, তবে বেদ প্রাণে আরও অননুভূতপূর্ব্ব ভাবে প্রকটিত হইতে থাকিবে এবং তবে মোহ-সাগরের পরপার তোমার নিকটস্থ হইতে থাকিবে। তখন নির্ম্মল চিদাকাশ অন্তর্বাহ্য ব্যাপিয়া ভাসমান হইবে।

আর যদি সদ্‌গুরু লাভ হইয়া থাকে, যদি তাঁহার নিকট বিশেষ প্রক্রিয়া পাইয়া থাক, তাহা হইলেও সেই ক্রিয়ানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ যখন সেই অনাহত নাদ পূর্ব্বোক্ত নানাপ্রকার বিকৃতভাবাপন্ন অবস্থার পর প্রণবাকারে শ্রুত হইবে —সেই একমাত্র শ্রোতব্য অনাহত নাদ যখন প্রাণকে বেদনপূর্ণ করিবে, তখন তাহাকে ওইরূপ মাতৃআহ্বান বলিয়া উপলব্ধি করিও; নিকটে মাতৃ-অস্তিত্বের সুদৃঢ় আশ্বাস প্রাণের সে বেদনকে যাহাতে গভীরতর করিয়া তুলে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিও।

যাহা হউক, এইরূপে গুরুদত্ত প্রক্রিয়া ও সাধারণ কর্ম্মসকল, এই উভয় সাহায্যে বা যে কোনটীর সাহায্যে ক্রমশঃ এইরূপে শুনিতে শুনিতে অগ্রসর হইয়া, সময়ে এমন এক মহা অবসর আসিবে, যখন তোমার বুদ্ধি মোহকলিলের বাহিরে গিয়া উপস্থিত হইবে, বুদ্ধির কল্পনার সাহায্যে এই ভাবে ছুটিতে ছুটিতে একদিন যখন তুমি সমস্ত মোহজঞ্জাল অতিক্রম করিবে, তখন সম্পূর্ণ ভাবে তুমি এই আহ্বান চেতনস্ফুট বলিয়া বুঝিয়া কৃতার্থ হইবে; এ নাদকে যথার্থই মাতৃ-আহ্বান বলিয়া উপলব্ধি করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিবে। শুধু এ আহ্বান নহে—শাস্ত্রাদিতে যাহা শুনিয়াছ, এবং যাহা জীবমাত্রের একান্ত শ্রোতব্য, সেই সমস্ত তখন মীমাংসিত হইয়া যাইবে; যাহা কল্পনার সাহায্যে মীমাংসা করিতে কত প্রয়াস

পাইয়াও সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পার নাই, যাহার মূল মীমাংসা করিতে অসংখ্য অসংখ্য জীবন ব্যয়িত করিয়াছ—সেই মহাতত্ত্ব—সেই মহাসত্য জানিয়া—দেখিয়া উপলব্ধি করিয়া প্রাণের বেদন দূর হইবে। শব্দ শব্দমাত্র নহে, উহা চিতিশক্তির ঈশ্বরী বা অক্ষরা মূর্ত্তির স্ফুট বা ক্ষরণ—উহাই মায়ের সৃষ্টিস্থিতি-লয়াত্মক হৃদয়প্রকাশ বা আদান-প্রদানময় লীলাবিলাস—উহা স্বাধীন স্ব-সম্বেদন—বেদ। বেদ লইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছ—বেদনের বলে ছুটিয়াছ—সে বেদন পূর্ণভাবে পাইবে। পূর্ণত্ব পাওয়া ও নির্ব্বেদ হওয়া একই কথা। তোমার পুত্র হারাইয়া গেলে তোমার স্নেহের যেমন চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, আবার সেই পুত্রের পুনঃ প্রাপ্তিতে সে স্নেহ-চাঞ্চল্য যেমন দূর হইয়া যায়, কিন্তু চাঞ্চল্য দূর হইলেও প্রাপ্তির পর যে স্নেহ থাকে না, এমন নহে, তবে তখন উহা যেমন বেদনপ্রদ থাকে না, ইহা তদ্রূপ সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি—বেদনহীন।

চড়াতেই বাণ ডাকে, এ বেদনও তদ্রূপ বুঝিবে ; গভীর জল প্রশান্ত, এ নির্ব্বেদও তদ্রূপ।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে বুদ্ধিঃ যদা সমাধৌ নিশ্চলা অনাকৃষ্টা অচলা স্থাস্যতি, তদা যোগম্ অবাপ্স্যসি।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না শ্রুতিভির্নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রবণৈর্বিপন্না ইতঃপূর্ব্বং বিক্ষিপ্তা সতী তব বুদ্ধিঃ যদা সমাধৌ স্থাস্যতি, তদা যোগমবাপ্স্যসি।

ব্যবহারিক অর্থ।—যখন বেদন বা প্রণব দ্বারা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন তোমার বুদ্ধি ভগবানের অন্যত্র অনাকৃষ্ট হইয়া অচল ভাবে অবস্থান করিবে, তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে। অথবা শাস্ত্রার্থসকল নানা প্রকারে শুনিয়া শুনিয়া তোমার যে বুদ্ধি এত দিন বিক্ষিপ্ত ছিল, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভগবানে নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিতে যখন সক্ষম হইবে, উহার তখন যোগপ্রাপ্তি ঘটিবে।

যৌগিক অর্থ।—অভ্যাসের দ্বারা মাতৃ-আহ্বান শুনিতে পাইবে সত্য, কিন্তু একবার শুনিলেই তাহাতে যে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে, এমন নহে। প্রথমতঃ বহু বিলম্বে বিলম্বে একবার একবার হয় ত শুনিতে পাইবে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রিয়াদি পথে আকৃষ্ট হইয়া নামিয়া পড়িতে হইবে, সে ধ্বনি হারাইয়া ফেলিবে। মুহূর্ত্তমাত্রও হয় ত সে অবস্থায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না। বিজলী-

রেখার ন্যায় সে শব্দ-তরঙ্গ শুনিতে না শুনিতে মিলাইয়া যাইবে। কিন্তু অভ্যাস যত ঘন হইতে থাকিবে, তত এ শব্দ শীঘ্র শীঘ্র তুমি পাইবে, এবং তত উহা স্থায়িত্বও লাভ করিবে। ক্রমশঃ দুই মিনিট চারি মিনিট কাল তুমি আত্মহারা হইয়া, সেই ধ্বনির ঝঙ্কারে মগ্ন হইয়া থাকিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু তার পরই যেন চমক ভাঙ্গিয়া গেল, যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে গিয়াছিলাম, যেন সহসা অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ড হইতে নামিয়া পড়িলাম, এইরূপ ভাব তোমার জন্মিবে। বার বার এই-রূপে ওই ধ্বনিতে অভ্যস্ত হইবার পর যখন আর তুমি নামিয়া পড়িবে না, যখন ইন্দ্রিয়াদির পথে আকৃষ্ট হইয়া তোমার বুদ্ধি বিচ্যুত হইবে না, তখন সেই অচল অবস্থায় তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে।

এত দিন তুমি যে যুক্ত হইতেছিলে, উহা বুদ্ধির দ্বারা, উহা ঠিক যুক্ত হওয়া নহে, উহা যুক্ত হওয়ার নকল মাত্র, শিক্ষালাভ মাত্র—যথার্থ যোগ এইবার হইবে। এত দিন বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হইতেছিলে, এইবার আত্মার দ্বারা যুক্ত হইবে। ইহাই যথার্থ যোগ—ইহাই মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা। এ যোগ দুই প্রকারে হইতে পারে,—এক আত্মাতে; অন্য বৃত্তিতে; অথবা অন্তরে ও বাহিরে। বস্তুতঃ অন্তর ও বাহির বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন কিছু পরমার্থতঃ নাই; বিশেষতঃ সে সময়ে থাকে না। কিন্তু তবু আমাদিগের সাধারণ কথায় আমরা বিভেদ পরিদর্শন করি। সেই জন্য বলিতেছি, দুই প্রকারে উহা উপলব্ধি হইয়া থাকে। গুরুনির্দ্দিষ্ট কেবল কোন বিশেষ মন্ত্র বা নাদযুক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা আকাশ প্রকাশ করিয়া, শুদ্ধ অস্মিবোধে বিরাজ করিয়া, পরে তাহা বিলীন করিয়া সে যোগ প্রাপ্ত হওয়া সাক্ষাৎভাবে অন্তরেই বা আত্মাতেই ঘটিয়া থাকে। এবং গুরুনির্দ্দিষ্ট বা নিজ প্ররোচনাজনিত বুদ্ধির দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্মের ভিতর দিয়া তাঁহাতে যুক্ত হইবার জন্য যে যত্ন করে, সে দ্বৈতবোধে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে সারূপ্য-বোধ লাভ করিয়া বাহিরেও যুক্ত হয়। বাহিরে বৃত্তিতে ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি-যোগ্য হইয়া ইষ্টদেবতা আবির্ভূত হয়েন। তখন জীবন সার্থক হয়, যেমন সার্থক ধ্রুব প্রহ্লাদ হইয়াছিল, তেমনই স্বার্থকতাতে প্রাণ ভরিয়া যায়—দেহের প্রত্যেক পরমাণু যেন তখন চৈতন্যময় দেবতা হইয়া আমার প্রাণকে আলিঙ্গন করিতে থাকে, কোন চিন্ময়ে যুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত আলিঙ্গনে বদ্ধ হওয়া যে কি, তাহা একমাত্র তখনই উপলব্ধি হয়। আমাদিগের জাগতিক আলিঙ্গনে দেহের ব্যবধান থাকে; সে আলিঙ্গনে এ ব্যবধান ঘুচিয়া যায়।

বাক্যের দ্বারা বা লেখনী দ্বারা সম্ভোগ বর্ণনা করা অসম্ভব। তার পর সে অমূল্য যোগের বিচ্যুতি ঘটিলেও, প্রজ্ঞা তাহাতে অবস্থান করে। এত দিন প্রাপ্তির পূর্ব্বে চেষ্টা করিয়া যেমন বুদ্ধি দ্বারা কর্ম্মে কর্ম্মে যুক্ত হইতে হয়, এখন আর চেষ্টা করিয়া তেমন বুদ্ধিযুক্ত হইতে হয় না। বুদ্ধি অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মিকা যে প্রজ্ঞা, তাহার দ্বারা সে মহাপুরুষ সতত সে অঙ্কে যুক্ত থাকে। এই যে বাহিরে যোগস্থ হওয়ার কথা বলিলাম, ইহাকে সম্প্রজ্ঞাত অবস্থা এবং আত্মাতে বলিয়া যাহা বলিলাম, তাহা অসম্প্রজ্ঞাত নামে যোগশাস্ত্রে কথিত।

ভোগের পর যে পরিতৃপ্তি, নিশ্চয়াত্মিকা প্রজ্ঞা সেই। সম্যক্‌রূপে সম্ভোগের পর তৃপ্তির যে স্নিগ্ধ ভাব প্রাণে জাগে, ইহা সেই ভাব। জগতের ভোগে সে পরিমাণে তৃপ্তি পাওয়া যায় না; কেন না, এই সকল সীমাবদ্ধ ভোগ, সীমাবদ্ধ তৃপ্তিমাত্র প্রদান করে; তাই কালক্রমে মুহূর্ত্তে উহা ক্ষয় হইয়া যায়; অসীমের ভোগে অসীম পরিতৃপ্তি, তাই উহার ক্ষয় নাই। জগতের ভোগ উপভোগ মাত্র—ইহা সম্ভোগ। পূর্ব্বে যে উপাসনা, উহা উপ-আসন মাত্র, ইহা যথার্থ আসন। এই আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তবে যথার্থ জীব প্রতিষ্ঠাবান্ বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য হয়।

আমি পূর্ব্বে যে ভোগের কথা বলিয়াছি, তাহা এই ভোগ। জগতের যে কিছু পদার্থের মধ্যে আমরা ভোগ্য বলিয়া যাহা পাই, তাহা সেই পদার্থের নিজস্ব ভাবিয়া আমরা তৎপদার্থ সঞ্চয়ে যত্নবান্ হই; কিন্তু বস্তুতঃ সেটুকু কিসের, সেটুকুর যথার্থ অধিকারী কে, তাহা আমরা অন্বেষণ করিয়া দেখি না। একটি সুন্দর ফুল দেখিলে সে সৌন্দর্য্যটুকুকে আমরা ফুলেরই সৌন্দর্য্য বলিয়া বুঝি; কিন্তু যখন তোমার ক্রীড়াচপলা বালিকা কন্যাটি, মুক্ত কুন্তলরাশি নাচাইতে নাচাইতে তোমার নিকট খেলা ছাড়িয়া দৌড়াইয়া আসে, হয় ত তার সেই গতিটুকু তোমার চক্ষে সহস্র জগতের সৌন্দর্য্য আনিয়া মাখাইয়া দেয়, তুমি বালিকাকে ক্রোড়ে কর। বল দেখি—ক্রোড়ে করিলে কাহাকে, সেই গতিকে, না তোমার বালিকা কন্যাকে? তোমার কন্যার প্রত্যেক হাব ভাবটি, প্রত্যেক উদ্যম-চাঞ্চল্যটুকু তোমার প্রাণে মনোমোহিনী ছবি ফুটাইয়া দেয়, তুমি প্রত্যেক বার কন্যাকে বুকে ধর; বল দেখি, তুমি বার বার কাহাকে বুকে ধরিতেছ? কন্যাকে, না কন্যার সেই প্রকৃতিকে? বালিকার প্রত্যেক লীলাভঙ্গি বালিকাকেই তোমার হৃদয়ে মধুময় করিয়া তোলে। বালিকার দেহটুকু

তোমার পক্ষে মধুময় হয় না; তাহা হইলে মৃতদেহ কেহ ফেলিয়া দিত না। তদ্রূপ জগতের প্রত্যেক ভোগ্য পদার্থ—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ,স্পর্শ কার্য্যতঃ জগজ্জননীকেই তোমার হৃদয়ে মধুময় করিয়া দিত, যদি তুমি তোমার কন্যার মত তাহাকে ভালবাসিতে। ফুলের সৌন্দর্য্যটুকু বস্তুতঃ ফুলের নহে, আমার সেই কন্যা যোগেশ্বরীর; গগনের নীল-কান্তি বস্তুতঃ গগনের নহে, আমার সেই শ্যামাঙ্গিনীর; সাগরের শ্যামকান্তি বস্তুতঃ সাগরের নহে আমার সেই শ্যামচাঁদের—এইরূপ তোমার চক্ষে প্রতিফলিত হইত, যদি তুমি ফুলটী ফলটী, মুদ্রাটী পাইবার ধান্ধায় ব্যতিব্যস্ত না হইয়া, যথার্থ অধিকারীকে বুকে ধরিতে সচেষ্ট হইতে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমরা ভোগ করি না, সঞ্চয়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকি। বস্তুতঃ ভোগ করিব কি, ভোগ্য পদার্থ ত পাই না, রসনা মাত্র লোভে সিক্ত করিয়া মরি। আমরা শব্দ,স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধকে বিষয়-সকলের নিজস্ব ভাবি, বিষয়-সকলকেই উহার যথার্থ অধিকারী ভাবি এবং তাহাই গ্রহণ করিতে, সঞ্চয় করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি। কেন না, ওই সমস্ত বিষয় স্বচ্ছন্দে অন্যে আমায় বঞ্চিত করিয়া অধিকার করিতে পারে। পদার্থকেই অধিকারী ভাবি, পদার্থের পশ্চাতেই ধাবিত হই।

কিন্তু আমরা বুঝি না, উহাতে মাতৃ-অধিষ্ঠানবশতই উহা আমার চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ। আমার দেহে আত্মা অবস্থান করিয়া, তবে যেমন আমাকে জগতের অন্যান্য মনুষ্যের সহিত সম্বন্ধবদ্ধ করিয়া রাখে, তদ্রূপ বিষয়-সকলে মা আমার অধিষ্ঠিতা থাকিয়াই আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছেন ও আমাদিগকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করিতেছেন। মোট কথা, আমি স্বচ্ছন্দে ভোগ করিব, কিন্তু ভোগকে পদার্থ-জাত ভোগ বলিয়া ভোগ করিব না, মাতৃ-অঙ্গসম্বন্ধ ভোগ বলিয়া ভোগ করিব। পদার্থ-জাত ভোগকে পদার্থ-জাত বলিয়া জানিয়া যে ভোগ, তাহাই শাস্ত্রে নিবারিত, মাতৃ-অঙ্গধর্ম্ম বলিয়া যে ভোগ, তাহাই মায়ের উদ্দেশ্য।

বাল্যে গল্প শুনিতাম, কোন রাজকন্যা হাসিলে মুক্তা ঝরিত। কোন রাজপুত্র সে কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিলে, সে তাহাকে বলিত,—তোমার যত ইচ্ছা,তুমি মুক্তা লইয়া গৃহে যাও, আমায় পাইবে না। কিন্তু রাজপুত্র তাহাতে স্বীকৃত হইত না; বালিকা তত হাসিত, তত মুক্তা ঝরিত—রাজপুত্র তত সে মুক্তারাশি

সরাইয়া, সেই বালিকাকে পাইবার জন্য অধীর হইত। তদ্রূপ মা ভালবাসা প্রকাশ করিতে গিয়া, ভালবাসিয়া আমাদিগকে হৃদয়ে পোষণ করিতে গিয়া ভোগরূপ মণিমুক্তা ছড়াইয়া পড়িয়াছে; উহাদিগের কার্য্যই মায়ের দিকে আকৃষ্ট করে; মায়েতেই যত তুমি ওই সকল উপলব্ধি করিবে, ততই মা প্রিয় অপেক্ষা প্রিয়তর হইয়া তোমার প্রাণকে আকুল করিবেন, ততই মাকে পাইবার জন্য তোমার প্রাণ অধীর হইবে; তুমি মুক্তা কুড়াইতে ব্যস্ত থাকিবে না; তুমি মাতৃক্রোড়ের জন্য লালায়িত হইবে।

শুন, মা আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছেন ও করিবেন; যত আমরা মা মা করিয়া ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার নিকটস্থ হইব, তত হাস্যোল্লাসময়ী হাসিয়া একটু পিছাইবার ভাণ করিবেন, তত সিদ্ধি আদি মণিমুক্তা চারি ধারে ঝরিয়া পড়িবে; তত মুগ্ধ হইব, তত অগ্রসর হইব, তত মাতৃঅঙ্গ আন্দোলিত হইবে। মা মা করিয়া আনন্দে বক্ষঃ স্ফীত হইতে থাকিবে; আনন্দতেজঃপূর্ণ গর্জ্জন করিয়া তত মাতৃমুখে ছুটিব। ইন্দ্রিয়সকল, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাবর্গ সম্ভ্রমে সন্ত্রাসে বিস্ময়ে মাতাপুত্রের এ ক্রীড়া পরিদর্শন করিয়া স্তব্ধ থাকিবে। যত দিন না যোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তত দিন এ মাতাপুত্রের ক্রীড়া, আনন্দময়ীর এ আনন্দোল্লাস কে বুঝিবে? পুত্র যত মাকে ধরিতে চায়, মা তত মুগ্ধা হন, মা আমার তত মোহাচ্ছন্না হন, মা আমার তত আনন্দ সম্ভোগ করেন। শিশু পুত্রকে লইয়া মা যেমন ক্রীড়া করেন—এ তদ্রূপ। মা হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া, পুত্র মায়ের মুখ চাহিয়া ছুটিতেছে; যত নিকটস্থ হয়, মা একটু হাত কুঞ্চিত করেন, বালকের প্রাণে তত আবেগ বর্দ্ধিত হয়, তত সে বেগে অগ্রসর হইতে প্রয়াস পায়। বুদ্ধিযোগ হইতে যোগে পৌঁছান এই ভাব। এ ভাব চণ্ডীতে আরও বিশদভাবে প্রকটিত। মা পুত্রকে বলিতেছেন,—

"গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহং।
ময়া ত্বয়ি হতেহত্রৈব গর্জ্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ॥"

ডাক, মুগ্ধ শিশু! আরও ক্ষণকাল ডাক, আরও ক্ষণকাল অপেক্ষা কর; তোমায় যে ক্রোড় দিতেছি না, তোমায় যে ধরিতেছি না, ইহা আমার মধুপান। আমি তোমার এ কুর্দ্দনে মোহাচ্ছন্না হইতেছি, আনন্দের মদিরায় আমি মত্তা হইতেছি। আনন্দের তেজে তুমি গর্জ্জন কর, আরও ক্ষণকাল গর্জ্জন কর,

মাতৃস্নেহমুগ্ধ মাতৃক্রোড়-অধিকার-লাভব্যগ্র বৎসটি আমার! এখনই তোমায় ক্রোড়ে লইব, এখনই তোমার ভূমিত্ব হত্যা করিব, এখনই তোমায় ক্রোড়ে ধরিয়া আমাতে আত্মহারা করিয়া ফেলিব; সেই অপূর্ব্ব আনন্দমিলনের শুভ মুহূর্ত্তে তোমার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাবর্গ এ অপূর্ব্ব আনন্দে বক্ষঃ স্ফীত করিয়া প্রণব গর্জ্জনে দিগন্ত মুখরিত করিয়া উঠিবে!

শুন—আমরা যতক্ষণ মাকে না পাই, যতক্ষণ আমরা মাতৃ-অঙ্কে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে না পারি, ততক্ষণ চল—কূর্দ্দনভরে ছুটি। চল, মাকে মুগ্ধ করি। উত্তাল আনন্দমধুপানে মা প্রমত্তা হইতেছেন—ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র মা পিছাইতেছেন—মহ, জন, তপঃ, সত্য আদি লোকের পর লোকসকল আমার চক্ষে উদ্ভাসিত হইতেছে, চল মাকে ধরি। ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মে তুমি মগ্ন আছ—জানিও ইহা মায়ের আমার মধুপান। কুটিল বাসনায় তোমার প্রাণ পূর্ণ বলিয়া হতাশ হইও না,—জানিও, মা আমার মধুপান করিতেছেন। মাকে ডাক—মা আরও মধুপান করিবেন। মায়ের মধুপান তখন পূর্ণমাত্রায় হইবে, মা মুহ্যমানা হইয়া পড়িবেন, আর স্থির থাকিতে পারিবেন না। খেলার মোহ আর ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না। আপনার প্রাণের তাড়নায় আপনি অধীরা হইয়া তোমার বক্ষঃ আক্রমণ করিবেন। তখন তুমি অচল হইবে—তদা যোগমবাপ্স্যসি—তখন তুমি যুক্ত হইবে। এত দিন বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হইতেছিলে, এইবার কায়মনঃপ্রাণে আত্মায় যুক্ত হইবে।

যাহা হউক, নানা প্রকার শাস্ত্রার্থ, নানা মত, নানা পন্থা শুনিয়া শুনিয়া চিত্ত এত দিন বিক্ষিপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ ছুট ছুটি করিতেছিল, সেই চিত্ত যখন এইরূপে বুদ্ধিযোগের দ্বারা নিশ্চল হইয়া যাইবে, তখন যে কোন পন্থা, যে কোন মত, যে কোন যুক্তি তোমার সম্মুখে উপস্থিত, তুমি তাহারই মধ্যে সত্য নিহিত দেখিতে পাইবে। তখন জানিবে, তুমি যোগ প্রাপ্ত হইয়াছ।

এই যে বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হইবার কথা বলিতেছি, ইহা হইতে কি প্রকারে ভগবৎলাভ হয়? কোন্ আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া আমাদিগের ইষ্টদেব সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বুদ্ধিমাত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আমাদিগের জীবন চরিতার্থ করিতে সমর্থ হন? আমাদিগের দেহ পর পর পাঁচটী কোষের দ্বারা গঠিত, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই পাঁচটী কোষের মধ্যে আনন্দময় কোষ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। বিজ্ঞানময় কোষ—প্রজ্ঞা হইতে নিশ্চয়া-

ত্মিকা বৃত্তি বা বুদ্ধি পর্য্যন্ত যাহার বৃত্তি, সেই কোষ আমাদিগের আনন্দময় কোষ ব্যতীত অন্যান্য কোষ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। সূক্ষ্ম জিনিষ সূক্ষ্মের সহিত অতি সহজে মিশাইয়া যায়। ধূলা ধূলার সহিত যেমন মিশে, জল জলের সহিত তদপেক্ষা আরও সহজে মিশিয়া যায়। বায়ু জলাপেক্ষাও সূক্ষ্ম বলিয়া মিশ্রিত আরও সহজে হয়। আমাদিগের বুদ্ধিময় কোষ বা বুদ্ধি সূক্ষ্মতানিবন্ধন ভগবানে যুক্ত হইতে মন অপেক্ষা সহজে সক্ষম হয়। মনে কর, তুমি বাহিরে একটী বৃক্ষে অথবা একটী প্রতিমায় ভগবদ্‌বুদ্ধি আরোপ করিতেছ; তুমি বুদ্ধির দ্বারা অহর্নিশ সেইটীকেই ভগবান্ বলিয়া ধারণা করিতেছ। অথবা অন্তরে তুমি তোমার ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি গঠিত করিয়া, হৃদয়ে তাহাকে ধারণা করিবার জন্য যত্ন করিতেছ। বুদ্ধির দ্বারা এই প্রকারে যত্ন যখন তোমার ঘনীভূত হইবে, তখন তোমার সে কল্পনা মনোময় কোষে প্রতিফলিত হইবে; তোমার মনোময় কোষ, বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময় কোষ অপেক্ষা ঘন বলিয়া, যত দিন না বুদ্ধিবৃত্তি খুব ঘনভাবে কার্য্য করে বা বুদ্ধিবৃত্তির চালনা খুব ঘনীভূত হয়, তত দিন চঞ্চল মনোময় কোষে প্রতিফলিত হইবার উপযুক্ত উহা হয় না। ধারণা যত স্থূল হইতে থাকে, তত তুমি তোমার অন্তরে সেই মূর্ত্তি স্থির ও সম্পূর্ণ সুগঠিতভাবে ধারণ করিতে সমর্থ হও। অথবা বাহিরে তোমার ঐ যে বৃক্ষে বা মূর্ত্তিতে ঈশ্বরধারণা, উহার সাহায্যেও তুমি তোমার ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি সম্যক্‌রূপে প্রত্যক্ষ করিতে পার। এই শিলাময় মূর্ত্তি আমার দেবতা, বুদ্ধির দ্বারা এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তোমার অন্তরেই উনি অবস্থিত, এইরূপ তোমার কল্পনায় আসিবে। অর্থাৎ কার্য্যতঃ তখন তুমি মনোময় কোষের দ্বারা যুক্ত হইয়াছ বুঝিতে হইবে। কিন্তু অন্তরের ঐ মনোময় মূর্ত্তিতে তখন তুমি সজীব ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবে না। মনে মূর্ত্তি সুগঠিতভাবে দেখিতে পাইবে সত্য, কিন্তু যেন উহা নির্জ্জীব, যেন উহা পাষাণে নির্ম্মিত, যেন উহাতে প্রাণশক্তি নাই, যেন মাটির প্রতিমা। বাহিরের মত ওই মূর্ত্তিতে নির্জ্জীব প্রাণহীন ভাবমাত্রই উপলব্ধি হইবে। কিন্তু দৃঢ় অধ্যবসায়ের দ্বারা ক্রমশঃ যখন তোমার ঐ চিন্তা আরও ঘনীভূত হইবে, তখন আরও তোমার কল্পনা স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইবে। তখন মনে হইবে, তোমার ঐ অন্তরের ভগবন্মূর্ত্তি যেন তুমিই অর্থাৎ কার্য্যতঃ তখন তোমার সেই মনোময় মূর্ত্তি তুমিময় হইয়া উঠিয়াছে বা তুমি তৎসারূপ্যবোধে যুক্ত হইয়াছ। সূক্ষ্ম বুদ্ধিময় কোষ হইতে যুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূলতর প্রাণময় কোষের

দ্বারা ভগবদ্‌যোগ লাভ করিয়াছ। আমরা সময়ে সময়ে আবেশ, ভাবসমাধি প্রভৃতির কথা যাহা শুনিতে পাই, তাহা এই অবস্থার ঘটনাবিশেষ মাত্র।

যাহা হউক, তার পর তোমার ঐ যোগ আরও প্রগাঢ় হইলে, সূক্ষ্মতম বুদ্ধিময় কল্পনা আরও স্থূলত্ব লাভ করিলে, তখন কখন কখন তুমি দেখিবে, তোমার অন্তরের বা বাহিরের সেই দেবতা স্থূলরূপে তোমার সম্মুখে বিরাজিত। তোমার অন্তরের সেই মূর্ত্তিকে আর ভাবমাত্র বলিয়া একেবারেই মনে হইবে না। তুমি উহাকে তোমার মত স্থূল শরীরধারী, সজীব, সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিত মূর্ত্তিতে সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইবে। অর্থাৎ কার্য্যতঃ তখন তুমি অন্নময় কোষের দ্বারা তাঁহাতে সংযুক্ত হইবে। ইহারই নাম বাহ্যে যোগপ্রাপ্তি। বুদ্ধির দ্বারা এইরূপে যুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়া, অবশেষে সূক্ষ্মতম কোষ অবধি তুমি তাঁহাতে যুক্ত করিতে সমর্থ হইয়া কৃতার্থতা লাভ করিবে। ভাবুক সাধকদিগের এইরূপ দেবতাদর্শন প্রায়ই হয়। কিন্তু উহা সর্ব্বোচ্চ লাভ মনে করিও না।

বুদ্ধির দ্বারা বা বিজ্ঞানময় কোষের দ্বারা যখন যুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলে, তখন তোমার চিত্ত বিক্ষিপ্তভাবে থাকায় মূর্ত্তি বা ভগবদ্ভাব খণ্ড, বিক্ষিপ্তভাবে উদয় হইত। ভাব স্থূলতর হইয়া যখন মনের দ্বারা তাঁহাতে যুক্ত হইলে, তখন আর সে ভাব খণ্ডিত হইত না, সম্পূর্ণভাবে মনে বিরাজ করিত। আরও স্থূল হইয়া যখন প্রাণময় কোষে যুক্ত হইলে, তখন সে ভাব বা মূর্ত্তি প্রাণময় হইয়া উঠিল, অন্নময় কোষে যখন যুক্ত হইলে, তখন উহা স্থূল ইন্দ্রিয়ময় হইয়া তোমার ভোগে আসিল। অথবা যতক্ষণ তুমি তোমার দেবতার মূর্ত্তি বা ভাব কোন পদার্থের উপর বা তোমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে ফুটাইয়া তুলিতে না পার, তত দিন জানিবে, তুমি মনোময় কোষের দ্বারা যুক্ত হইতে পার নাই। যত দিন তোমার হৃদয়ে সে মূর্ত্তি সর্ব্বাঙ্গীন গঠিত হইলেও নির্জীব পাষাণ-গঠিতের মত অবস্থান করে, তত দিন জানিবে, তুমি মনোময় কোষের দ্বারা যুক্ত হইলেও প্রাণময় কোষের দ্বারা যুক্ত হইতে পার নাই। যত দিন না সেই দেবতা স্থূল সজীব ভাবে তোমার সহিত ভাবের আদান প্রদান করেন, তোমার স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যত দিন তাঁহাকে ভোগ করিতে সমর্থ না হও, তত দিন জানিবে—তোমার অন্নময় কোষ যুক্ত হয় নাই বা তোমার সম্যক্ সম্প্রজ্ঞাত যোগপ্রাপ্তি ঘটে নাই। অসম্প্রজ্ঞাত যোগের কথা পরে বলিব।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪

স্থিতপ্রজ্ঞস্য (প্রতিষ্ঠিতোঽহমস্মি ব্রহ্মেতি প্রজ্ঞা যস্য, স স্থিতপ্রজ্ঞঃ তস্য) স্বাভাবিকে সমাধৌ স্থিতস্য কা ভাষা, ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণং। কেশব। স্থিতধীঃ স্বয়ং বা কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং,কথং ভাষামাসনং ব্রজনঞ্চ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ।

ব্যবহারিক অর্থ।—অর্জ্জুন কহিলেন, কেশব! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ কি? তাঁহার বাক্য, উপবেশন, গমন আদি কি প্রকার?

যৌগিক ব্যাখ্যা।—অর্জ্জুন প্রশ্নকর্ত্তা। পার্থ সর্ব্বদা জগতে মঙ্গলানুষ্ঠান করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম অর্জ্জুন। আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রাণশক্তিস্বরূপ অর্জ্জুন অহর্নিশ মঙ্গলমুখে ধাবিত এবং মঙ্গলানুষ্ঠানই তাঁহার ধর্ম্ম। মঙ্গলময়ী মায়ের আমার মঙ্গলদূতস্বরূপ এই প্রাণশক্তি কল্যাণের পথে চির অগ্রসর। যেখানে মঙ্গলের অভিব্যক্তি, যেখানে মঙ্গল প্রতিফলিত, যেখানে মঙ্গল প্রতিষ্ঠিত, প্রাণশক্তি সেইখানেই বিমুগ্ধ হয়; উদার, সরল আনন্দে সেই-খানেই বিভোর হইয়া পড়ে। মঙ্গলক্ষেত্রের সন্ধান পাইলে যেন তাহার প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হইবার জন্য আসক্ত হয়। সেই জন্য আমাদিগের মঙ্গলময় প্রাণ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের কথা শুনিয়া বিমুগ্ধ হইয়া,উদার সরল বালকের মত হইয়া পড়ে এবং সেই জন্য অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"তিনি কি রকম কথা কহেন, কেমন করিয়া চলেন, কেমন করিয়া উপবেশন করেন?" প্রশ্নটিতে সরল শৈশব ভাব পূর্ণভাবে প্রকটিত। মহামঙ্গলে যে পুরুষ স্বাভাবিক ভাবে যুক্ত, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির নাম শুনিয়া অর্জ্জুন যেন বিগলিত হইয়া পড়িয়া-ছেন। তাঁহার নিজের নাকি উহাই আদর্শ, উহাই লক্ষ্য, ঐ অবস্থাকেই নিজস্ব করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা নাকি উন্মুখী, সেই জন্য স্থিতপ্রজ্ঞ শব্দটি অর্জ্জুনের প্রাণকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতই সাধকের প্রাণ নিত্য-মঙ্গলের সান্নিধ্যের কথা শুনিলে বিমুগ্ধ সরল বালকটীর মত হইয়া পড়ে,অর্জ্জুনের এই প্রশ্নে সেই জন্য শৈশব ভাব। কিন্তু বাহ্যতঃ প্রশ্নটী সামান্য সরল ভাবের অভিব্যঞ্জক হইলেও উহা তীক্ষ্ণ দর্শনের পরিচায়ক। সত্যবাদী মহাপুরুষের মুখ হইতে নির্গত বাক্য-মাত্রই যেমন সত্য হয়, অসম্ভব হইলেও সত্য হইয়া পড়ে, অর্জ্জুনের মত সাধকের

মুখনির্গত এ প্রশ্নটিও সরল হইলেও গভীর ভাব, যুক্তি ও বিজ্ঞান-সম্মত। স্থিত-প্রজ্ঞ পুরুষ কি প্রকার কথা কহেন, কেমন করিয়া চলেন, কেমন করিয়া উপ-বেশন করেন, এ প্রশ্নগুলি শুনিতে অতি সামান্য হইলেও আমরা দুইটী প্রধান লক্ষণ ইহাতে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাই। একটী উক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থার উপর প্রাণের একান্ত অনুরাগ এবং দ্বিতীয়—সেই অনুরাগবশতঃ প্রশ্নটী বাহ্যতঃ সরল সামান্যবৎ প্রতীয়মান হইলেও উহার দ্বারা উক্ত অবস্থার নিগূঢ় মর্ম্মানুসন্ধান। প্রবল অনু-রাগটুকুই এ প্রশ্নের মুখ্য উদ্দীপক কারণ। অনুরাগবলেই এ প্রশ্ন অর্জ্জুনমুখ হইতে নির্গত, কিন্তু তত্রাচ তাঁহার মত মহামঙ্গলময় পুরুষের প্রশ্ন বলিয়া উহা গভীর অর্থযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে প্রাণ জিজ্ঞাসু, আত্মা মীমাংসক—সেখানে এ অপূর্ব্ব ভাবই সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে।

প্রাণ বা মঙ্গলময় পুরুষ অর্জ্জুন প্রশ্নকর্ত্তা, আবার স্বয়ং কেশব ইহার উত্তরকর্ত্তা। প্রাণের এ প্রশ্ন অপাত্রের নিকট উত্থাপিত হয় নাই, কেশবকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। কেশব বলিয়া ভগবান্‌কে সম্বোধন অর্জ্জুন করিলেন কেন? অর্জ্জুনের মুখ দিয়া এ স্থলে ভগবানের কেশব নাম কেন উচ্চারিত হইল? কারণবারিতে শয়ন করিয়া থাকেন বলিয়া মায়ের আমার একটী নাম কেশব। মহাপ্রলয়ে সমস্ত যখন কারণ-বারিতে লীন হইয়া যায়, যখন ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া আর কিছু স্থূল থাকে না তখন সেই কারণ-সমুদ্রে নিশ্চয়াত্মক ভাবরূপ বটপত্রে যিনি মাতৃক্রোড়ে শিশুবৎ অবস্থিত থাকেন, সেই মহাশিশু অবস্থার নাম কেশব। সমস্ত কারণের একমাত্র যিনি জ্ঞাতা, প্রশ্নের সম্যক্ মীমাংসা করিতে তিনিই পারদর্শী। সেই জন্য অর্জ্জুনের মুখ দিয়া কেশব নাম উচ্চারিত হইল। মায়ের নিকট যখন আমাদের যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ ভাবে, সেইরূপ নামে মাকে ডাকিলে, মা আমার সেই-রূপ গুণে গুণময়ী মূর্ত্তিতে অবির্ভূতা হইয়া প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করেন, ইহা একটী সাধনা-রহস্য। এ স্থলে আত্মস্বরূপ মহান্ অবস্থার পর্য্যালোচনা করিতে হইবে বলিয়া, মহাকারণে প্রতিষ্ঠিতরূপে মাকে ভাবিয়া অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন। মায়ে নিত্য-প্রতিষ্ঠিত পুরুষের কথা ভাবিতে গেলেই এই সক্রিয় সৃষ্টি অবস্থার অতীত লয় অবস্থার কথা স্বতঃ প্রাণে আসিয়া পড়ে। কেন না, স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা লয় অবস্থাকেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে। প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত অবস্থা লয় অবস্থারই অনুরূপ। সুতরাং জীব যখন মায়ে লীন হইয়া থাকে, মায়ে যখন বিভোর হইয়া

অবস্থান করে, যখন তাহার সমস্ত বৃত্তি, সমস্ত ভাব মায়ে মিলাইয়া যায়, যখন জীবের সমস্ত ভাব কারণ আকারে মিলাইয়া গিয়া, একমাত্র বিশ্বকারণ-সত্তা প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখনকার লক্ষণ-সকল জানিতে হইলে সেইরূপ গুণে গুণময়ী মাকে ভাবিতে হয়। অর্থাৎ প্রলয়াবস্থায় কেশবমূর্ত্তিই এরূপ প্রশ্নের মীমাংসক। কেশব বলিয়া সম্বোধন করিবার ইহাই তাৎপর্য্য।

কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি—অর্জ্জুন সরলভাবে প্রশ্ন করিলেও তাঁহার মত মঙ্গল-মুখী মহাপুরুষের প্রশ্ন অসত্য বা অপাত্রে আরোপ হইতে পারে না। মহাপুরুষ মিথ্যা বলিলেও সত্য হইয়া দাঁড়ায়। তদ্রূপ অর্জ্জুনের ভাবাবেশের এ মহাপ্রশ্ন শৈশবোচিত হইলেও, উহা গভীর তলদৃষ্টিসম্পন্ন যথোপযুক্ত ভাবে উত্থাপিত হইয়াছে।

প্রশ্নটী কিরূপে মহাপ্রশ্ন হইয়াছে, এইবার তাহা বলি। প্রশ্নটীতে দুইটী ভাগ আছে—দুই ভাগে ইহা বিভক্ত। "স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা" এইটুকু এক অংশ, এবং "স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্" এইটুকু দ্বিতীয় অংশ। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির সাধারণ লক্ষণ কি? এইটুকু প্রথম অংশ এবং তিনি কি রকম কথা কহেন, কি প্রকার উপবেশন বা অবস্থান করেন, কি প্রকারে গমন করেন, ইহাই দ্বিতীয় অংশ। কোন মন্ত্র স্মরণকালে যেমন মন্ত্রার্থ ও তাহার চৈতন্যশক্তি অবগত না থাকিলে উহা সিদ্ধি প্রদান করিতে পারে না বা উক্ত মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে যত দিন না মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্য জানিতে পারা যায়, তত দিন যেমন উহা সিদ্ধিপ্রদ হইতে পারে না, তদ্রূপ স্থিতপ্রজ্ঞ শব্দটির বা অবস্থাটীর সাধারণ মর্ম্ম এবং উহার চৈতন্যশক্তি না জানিলে, উহার সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে না। শুধু মন্ত্রের নহে, সমস্ত ভাষা ও বাক্যাদির ভিতর হইতে এইরূপে ভাব আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি। সে কথা পরে বলিতেছি। মন্ত্রচৈতন্য অর্থে মন্ত্রাধিষ্ঠিত বা মন্ত্র-প্রতিপাদ্য দেবতা বা শক্তি। "স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি?" এই কথায় অর্জ্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের মর্ম্মার্থ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। "স্থিতধী কি প্রকারে কথা কহেন, কি প্রকারে অবস্থান করেন; কি প্রকারে গমন করেন," এই অংশে অর্জ্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের চৈতন্য-শক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন, এই জন্য ইহা একটী সম্যক্ শাস্ত্র, ভাব ও বিজ্ঞান-সম্বলিত মহাপ্রশ্ন—অতি সুন্দর, অতি যুক্তিযুক্ত মহাবিজ্ঞের প্রশ্ন।

প্রথম অংশের দ্বারা যে সাধারণ মর্ম্মার্থ উল্লেখ করা হইয়াছে—ইহা সহজেই

জানা যায়—"স্থিতপ্রজ্ঞরূপ" মন্ত্রটির অর্থই যে জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, ইহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা বা লক্ষণ কি? ইহাই প্রথমাংশ। ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা—সুতরাং অর্থই লক্ষ্য। অর্থ ও লক্ষণ একই কথা। সুতরাং স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ কি জিজ্ঞাসা করায়, স্থিতপ্রজ্ঞ শব্দ বা মন্ত্রের অর্থই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে।

প্রত্যেক শক্তি তিন প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে বা প্রত্যেক শক্তি-বিকাশে তিন প্রকার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়,—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়; উৎপত্তি, অবস্থিতি ও বিলয় বা নাশ। শক্তিবিকাশের ক্রমপরম্পরা সর্ব্বত্রই এই ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, এই তিন প্রকার কর্ম্মাবস্থাকে সাধারণতঃ যেন পরস্পর বিপরীতধর্ম্মী বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বস্তুতঃ উহা ক্রমপরম্পরা মাত্র; উহা একই শক্তির মাত্রার বিভিন্নতা মাত্র। লয়কে কার্য্যতঃ বিপরীত ধর্ম্ম বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহা নহে; লয় বা ধ্বংস বলিয়া যাহা আমরা বুঝি, উহা সৃজনের বা পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ব অবস্থা মাত্র। যাহা হউক, প্রত্যেক শক্তির বিকাশ এই তিন প্রকারে কার্য্য করে বলিয়া মন্ত্র-চৈতন্য-শক্তিও উক্ত তিন প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে। মন্ত্র স্মরণাদি করিতে করিতে তাহাতে সে চৈতন্য-শক্তির আবির্ভাব, অবস্থান ও পূর্ণতা বা চরম গতি, এই তিন প্রকার অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। অর্জ্জুন সেই জন্য স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা-টিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উক্ত অবস্থা জীবহৃদয়ে যখন আসে, তখন উহার কি প্রকার লক্ষণ, যখন অবস্থান করে, তখনকার লক্ষণই বা কি প্রকার এবং যখন সেই পুরুষকে লয়ে বা চরম তত্ত্বে লইয়া যায়, তখনকার অবস্থাই বা কি প্রকার? কিং প্রভাষেত, কিমাসীত, কিম্ ব্রজেত,—এই তিন প্রশ্ন অর্জ্জুন করিলেন। উক্ত অবস্থার আবির্ভাব, অবস্থান ও শেষ ক্রিয়া বা লয়ে লইয়া যাওয়া কিরূপ—ইহাই অর্জ্জুনের জিজ্ঞাস্য।

স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থাটী অর্জ্জুন এত প্রিয় বলিয়া বোধ করিলেন, স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থাটির স্মরণ মাত্র তাঁহার প্রাণকে এতই বিমুগ্ধ করিয়া তুলিল যে, তিনি ও শব্দটীকেই একটী চৈতন্যবাহী মন্ত্রবিশেষ বলিয়া যেন বোধ করিলেন; বিমুগ্ধ-প্রাণে সেই অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন; প্রাণের উদার সরল ভাব সে প্রশ্নকে মহাসত্যমুখী, বিজ্ঞানময় প্রশ্নে পরিণত করিয়া তুলিল।

খুলিয়া বলি। দেবতার ও মন্ত্রের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ, তৎসম্বন্ধে এই স্থলে

একটু আভাস দিই। যখন কোন উদ্দেশ্য অন্তরে লইয়া, কোন সাধক ভগবানে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে, প্রাণ একান্ত ভাবে মায়ের দিকে যখন ধাবিত হইতে থাকে, মায়ের সিংহাসন সাধকের ভাবের অনুরূপে তখন বিচলিত হয়; সাধক যে প্রকার সঙ্কল্প প্রাণে লইয়া মাকে ডাকে, চিদ্‌রূপিণী সেই সঙ্কল্পোচিত গুণে গুণময়ী রূপে রূপময়ী হইয়া উঠেন। তখন মায়ের সাধারণ অবস্থার যে প্রণব-বাচক রূপ, তাহাও সাধকের হৃদয়ের অবস্থানুসারে অন্য ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহার অনুভবে আসে। প্রণবের সাধারণ শব্দ "ওম্" এই প্রকার এবং অর্থ—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্রী। সাধক যখন মাকে ডাকে, মায়ের এ স্নেহময়ী আকর্ষণী শক্তি তখন আরও উদ্দীপ্তা হইয়া উঠিয়া সাধকের প্রাণে গিয়া আঘাত করে; কিন্তু সাধকের হৃদয়ের অবস্থাক্রমে অর্থাৎ সঙ্কল্পের ও ভাবের তারতম্যে, উহাই হ্রীং শ্রীং ইত্যাদি যে রূপের বাচক, সেই রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাণের ভিতর ফুটিতে থাকে। সেই শব্দ শুনিয়া বা রূপ দেখিয়া সাধক বুঝিতে পারে—ইহাই তাহার দেবী বা মন্ত্র। সেই শব্দ হৃদয়ে ধরিয়া থাকিতে থাকিতে মা আবির্ভূতা হইতে থাকেন। সে বীজ বা মন্ত্রের জপের সঙ্গে সঙ্গে সাধক তৎসারূপ্য লাভ করে এবং অচিরে মাতৃ-লাভে কৃতার্থ হয়—মা তাহার ভাবানুযায়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হন। তবেই বিশেষ বিশেষ প্রকার সঙ্কল্পের জন্য মায়ের আমার মূর্ত্তি বিশেষ বিশেষ প্রকারে প্রকটিত হয়, এবং সেই বিশেষ বিশেষ প্রকার মূর্ত্তির বিশেষ বিশেষ প্রকার বীজ বা মন্ত্র রচিত হয়। সে সাধক আবার তাঁহার প্রিয় জনকে সেই বীজ সাধন করিতে শিক্ষা দেন বা সেই বীজ অন্যান্য ক্ষেত্রে রোপিত করেন। এই প্রকারে বীজ ও মূর্ত্তি আদি প্রচার হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে দেবতাবৃন্দ ও সিদ্ধর্ষি আদি হইতে সূচনা করিয়া মনুষ্যচূড়ামণিরা পর্য্যন্ত যে যে প্রকারের বীজ ও মূর্ত্তি পাইয়াছেন, সেই সকলই আমাদিগের শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়া রহিয়াছে।

যাহা হউক, মা আমার এই প্রকারে কাতর সন্তানকে দীক্ষিত করেন ও দর্শন দেন। ইহারই নাম প্রকৃত দীক্ষা লাভ। তবে যে সকল সিদ্ধ পুরুষ এই প্রকারে দীক্ষা লাভ করিয়া সিদ্ধ লাভ করিয়াছেন, তঁাহাদিগের কৃপা হইলে, তাঁহাদিগের সাধনা দ্বারা সঞ্জীবিত ঐ বীজ যদি কাহাকেও দেন, তাহা হইলেও সহজে মাতৃলাভ ঘটিতে পারে; কেন না, তাঁহাদের ঐ বীজ চৈতন্যযুক্ত। নতুবা যিনি উক্ত বীজের সাধনা করেন নাই, সে প্রকার ব্যক্তি হইতে বীজ লাভ করিলে—তাহাতে, আর আপনি পুস্তকাদি দেখিয়া বীজ লইয়া সাধনা সূচনা করায় ইতর-

বিশেষ নাই। দর্শনশাস্ত্রে বৃক্ষ হইতে বীজ, কি বীজ হইতে বৃক্ষ—এই প্রকারের একটা প্রশ্ন আছে। দর্শন ইহার যেরূপ মীমাংসাই করুক, আমরা দেখিতে পাইলাম, কি প্রকারে বীজ ও বৃক্ষ সম্বন্ধযুক্ত। বীজ ও বৃক্ষ—একই তত্ত্বের দুই প্রকার অভিব্যক্তি মাত্র।

যাহা হউক, মন্ত্র বা বীজ লাভ হইতে আরম্ভ করিয়া দেবতার আবির্ভাব বা সিদ্ধি লাভ অবধি সাধকের সাধনার যে অবস্থাটুকু, উহা তিন ভাগে বিভক্ত। সেই মন্ত্র চৈতন্যযুক্ত হওয়া অর্থাৎ সেই দেবশক্তির সারূপ্য লাভ করিয়া তাহার আভাস পাওয়া, সেই চৈতন্যযুক্ত অবস্থায় স্থিতি ও তাহার চরম ফলস্বরূপ—সিদ্ধি। মন্ত্র উচ্চারণ মাত্রে সাধক যদি অনুভব করে যে, যেন কি একটা জ্যোতির আভাসের মত মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে ও সে আপনিও তাহাই হইয়া যাইতেছে, আবার মিলাইয়া যাইতেছে, যেন অভীষ্ট দেবতা কি একটা আবরণের পশ্চাতে রহিয়াছেন, অথচ যেন আমিও তিনিই, তখন বুঝিতে হইবে, মন্ত্র চৈতন্যশক্তিবিশিষ্ট হইতেছে ; ইহাই প্রথম অবস্থা। তার পর যখন ওইরূপ সারূপ্যবোধ স্ফুটতর হইতে থাকিবে ও আর মিলাইয়া যাইবে না এবং উক্ত প্রকারের তেজ স্থায়িভাবে সঞ্চারিত হইতে থাকিবে, প্রাণ যেন কি একটা শক্তির প্রভাবের মধ্যে ঠিক অবস্থান করিবে, তখন বুঝিতে হইবে, দ্বিতীয় বা স্থিতি অবস্থা। এবং তার পর সঙ্কল্প পূরণ বা তৃতীয় অবস্থা, অর্থাৎ আভাস-সারূপ্য হইতে দেবতত্ত্বে গমন। এই তিনটি অবস্থাকেই "কি বলেন," "কি প্রকারে অবস্থান করেন" এবং "কি প্রকারে গমন করেন" বলিয়া অর্জ্জুনের প্রশ্নে উল্লিখিত হইয়াছে। "কিং প্রভাষেত" অর্থে কি প্রকারে তাঁহার ভাব-সকল বিকশিত হইতে থাকে ; "কিমাসীত" অর্থে কি প্রকার ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, "ব্রজেত কিম্" অর্থে—কি প্রকারে অভীষ্টতত্ত্বে বিচরণ করেন ; এই অভীষ্ট কোন দেবতত্ত্বই হ'ক বা ব্রহ্মতত্ত্বই হ'ক।

স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থার কথা শুনিবামাত্র প্রাণশক্তিরূপী অর্জ্জুন, তাহাকেই সাধনার মন্ত্রস্বরূপ মূল্যবান্ বিবেচনা করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন, এবং মন্ত্রের চৈতন্যশক্তির ত্রিধা স্ফুরণের মত স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থার ত্রিধাস্ফুরণ সম্বন্ধেও তিনি জিজ্ঞাসু হইয়া পড়িয়াছেন। যত দিন স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থার কথা শুনিয়া আমাদিগের প্রাণ এমনই ভাবে তাহার জন্য মুগ্ধ না হইবে, তত দিন বুঝিব, সাধনায় আমরা অগ্রসর হইতে পারি নাই—বিলম্ব আছে। ইহা একটী সাধারণ স্থূল লক্ষণ বলিয়া বুঝিও।

অর্জ্জুন স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের স্মরণে যে প্রকার বিমুগ্ধতা ও নির্ম্মল সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, সাধারণ লোক স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেও বোধ হয়, সে প্রকার আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে না। আমরা নির্জীবপ্রায়—প্রাণ নাই—প্রাণের সে মাতৃ-লালসা নাই—সুতরাং মাতৃলাভোন্মুখী সন্তানের কথা স্মরণে সে নির্ম্মল বেদনও নাই। বেদনময়ী বেদমাতার ইচ্ছা।

সাধকের প্রাণে যখন মাকে ডাকিতে ডাকিতে বুদ্ধিযোগের কথা উদয় হয়, অর্থাৎ সারথিরূপে মা আমার যখন বুদ্ধিযোগ সম্বন্ধে জ্ঞান প্রাণে ফুটাইয়া দেন, তখন ক্রমশঃ তাহার এই স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থার কথা মনে পড়ে; তাহার যেন আভাস পাইতে থাকে; এবং সে অবস্থা কি প্রকার—এই রকমের প্রশ্ন স্বতঃ তাহার প্রাণের ভিতর ফুটিতে থাকে। তার পর ক্রমে ক্রমে সেই অবস্থার আভাস পায়; সে অবস্থাগুলি কি প্রকারের, অবস্থাগুলির লক্ষণ কি, সেইগুলি মা প্রাণে ফুটাইয়া দেন। এখানে সেই অবস্থার কথাই আলোচিত হইতেছে। প্রাণ এ অবস্থায় স্থির, সুদূর অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইয়া তবে প্রশ্নোত্তর পায়—এই জন্য কেশব শব্দ ব্যবহৃত পূর্ব্বে বলিয়াছি।

যাহা হউক, সাধনা বলিয়া বিশিষ্ট কার্য্যকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্য দিয়া কেমন করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায়, ইহা জানিবার আকুলতা আসে এবং সেই আকুলতার আবেশেও জিজ্ঞাসু হইতে হয়। সুতরাং সার্ব্বজনীন ভাবেই অর্জ্জুনের মুখে আমরা চারিটি প্রশ্ন পাইয়াছি। প্রথম, স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থার সাধারণ লক্ষণ কি? দ্বিতীয়, স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায় যে শক্তি সঞ্জাত হয়, তাহা কি প্রকারে প্রথম বিকাশ পায়? তৃতীয়, কি প্রকারে তাহা ঘনীভূত হইয়া প্রাণে অবস্থান করে? চতুর্থ, কি প্রকারে তখন সাধক মাতৃঅঙ্কে লীন হইতে থাকে? এইবার একে একে প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেছেন।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫

পার্থ, আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টঃ যদা মনোগতান্ সর্ব্বান্ কামান্ প্রজহাতি, তদা স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—পার্থ! আত্মাতে সন্তুষ্ট হইয়া যখন কেহ আপনার মনোগত সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন।

যৌগিক অর্থ।—এইটি স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের সাধারণ লক্ষণ। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, মনুষ্য ভোগী অপেক্ষা সঞ্চয়ী অধিক। মনুষ্য যদি যথার্থ ভোগী হইত, তাহা হইলে অভাব বলিয়া কোন জিনিষ মনুষ্যকে ভোগ করিতে হইত না। মা আমাদিগকে এমন জিনিষ দিয়াছেন, যাহা আমাদিগকে কল্পতরুর মত সমস্ত ভোগই অযাচিত ভাবে সমর্পণ করিত, অথবা বিশ্বব্যাপিনী মা আমার নিত্য ভোগরূপে ব্যাপিয়া থাকায় আমার অন্য ভোগস্পৃহা আসিত না। জীব যত মাতৃমুখী হইতে থাকে, তত সে আপনার ভিতর আপনারই অঙ্গে ভোগ-সমস্ত খুঁজিয়া পায়, অথবা ভোগ্য কোন বস্তু বাহ্য নহে,আমার নিজ সত্তাতে ভোগ-সকল জাত, ইহা যত বুঝিতে পারে, তত বহির্জ্জগতের দিক্ হইতে তাহার ইন্দ্রিয়সকল প্রতিনিবৃত্ত হইতে থাকে। এইরূপে যখন পূর্ণভাবে জীব আপনার ভিতর সমস্ত সন্তোষ লাভ করে—চিত্ত যখন আনন্দে আপনাতেই বিভোর হইয়া ভোগ-সমস্ত মিটাইতে থাকে, যখন তাহার ভোগের জন্য আর তাহাকে বহির্জ্জগতের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না, তখন তাহার স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা লাভ হয়, অথবা সেই অবস্থাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা বলে।

তখন কার্য্যতঃ হয় কি? তাহার মনোগত সমস্ত বাসনা নিবৃত্তি হইয়া যায়। একমাত্র চিৎসমুদ্রে সে ভাসমান থাকে। আমাদিগের বিবিধ বাহ্য বিষয়ে বাসনা উৎপত্তি হইবার কারণ, চিৎসাগরের অনভিজ্ঞতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। চিৎসমুদ্রে অহর্নিশ সর্ব্বভোগ রক্ষিত—অনন্ত দিঙ্মুখে স্ফুটনোন্মুখ। যেমন স্রোতের মুখে উপলখণ্ড পতিত হইলে, সেখানে সে স্রোত তরঙ্গিত ও উদ্বেলিত হইতে দেখিতে পাই; তদ্রূপ জগতের বিষয়-সকল আসিয়া আমাদিগের সেই চিৎসমুদ্রে সংঘাত দেয় বলিয়া বিবিধ কামনারূপে সে স্রোত উথলিয়া উঠে। যাহা কিছু আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, আমরা তাহাকেই আমাদিগের ভোগদাতা বলিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ বুঝিয়া লই। তাই সেই বাহ্য বস্তু অধিকার করিতে প্রয়াস পাই, এবং সেই জন্যই আমরা জগৎমোহে আবদ্ধ হইয়া পড়ি। আমরা যদি জানিতাম, যাহা কিছু বাহে দেখি, সে সমস্তই প্রজ্ঞাতে ও অন্তরে আছে, তাহা হইলে শব্দ স্পর্শ, রূপ রস গন্ধাদি যাহাই আমাদের সম্মুখে

উপস্থিত হইত, তাহাতেই মুগ্ধ না হইয়া, আমরা তাহারই ভিতর দিয়া অনন্ত চিৎসমুদ্ররূপিণী মাকেই পরিদর্শন করিতাম; এবং আমাদের চিত্ত ক্ষুদ্র বাহ্য বিষয় ছাড়িয়া প্রজ্ঞাতে বিস্তৃত হইয়া পড়িত। অর্থাৎ কার্য্যতঃ আমাদের স্থূল বাসনাসকল দূর হইত বা আমরা বাসনাত্যাগী হইতাম। এইরূপে বাসনা-ত্যাগীকেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ বলা যায়। স্থূলতঃ ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থার সাধারণ লক্ষণ। প্রজ্ঞাতেই যে নিজ সত্তা হইতে সমস্ত ভোগ ও ভোগ্য পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পায়, তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬

দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ মুনিঃ স্থিতধীরুচ্যতে।

ব্যবহারিক অর্থ।—যাঁহার চিত্ত দুঃখে উদ্বিগ্ন হয় না, সুখের জন্য স্পৃহা যাঁহার প্রাণে জাগে না, অনুরাগ, ভীতি, ক্রোধ যাঁহার প্রাণ হইতে দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহাকেই স্থিতধী মুনি বলা যায়।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

যঃ সর্ব্বত্র অনভিস্নেহঃ তত্তৎশুভাশুভং প্রাপ্য ন অভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

ব্যবহারিক অর্থ।—যিনি সকল বিষয়ে স্নেহশূন্য, সুতরাং শুভ অশুভ প্রাপ্ত হইয়াও যিনি আনন্দিত ও বিষাদিত হন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

যৌগিক অর্থ।—এই শ্লোক দুইটি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ কি বলেন, ইহাই অর্জ্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ এই শ্লোক দুইটী বলিলেন। বাক্য ভাবের প্রকাশক মাত্র। প্রাণের ভাব যখন উথলিত হয়, তখনই উহা বাক্যাকারে প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রাণের ভাব সাধারণতঃ অনু-রাগ, ভয়, ক্রোধ, আনন্দ ও দ্বেষ, এই কয়টী বৃত্তির দ্বারা উথলিত হইয়া থাকে। যিনি অনুদ্বিগ্ন এবং বীতস্পৃহ, তাঁহার চিত্তে অনুরাগ, ভয় বা ক্রোধ আসিতে পারে

না। তদ্রূপ যাঁহার অনুরাগ, ভয় বা ক্রোধ নাই, তিনি সুখে বা দুঃখে বিচলিত হন না। যাঁহার স্নেহ বাহ্য জগতে কোথাও বিজড়িত নহে, তিনি শুভাশুভে আনন্দ বা দ্বেষ প্রকাশ করেন না। তদ্রূপ যিনি শুভ প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ, অশুভ প্রাপ্তিতে বিদ্বেষ প্রকাশ না করেন, তিনিই জগতে সর্ব্বত্র মমতাশূন্য ভাবে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়েন। সুতরাং যাঁহার অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ, আনন্দ ও বিদ্বেষ নাই; তাঁহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না। যাহার সমস্ত অনুরাগ মায়ে অর্পিত হইয়াছে, স্নেহময়ী মা আমার যাহার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন, জগতের পদার্থবৃন্দে অর্পণ করিবার জন্য অনুরাগবিন্দু সে কোথায় খুঁজিয়া পাইবে? অভয়া মা আমার অভয় কর প্রসারণ করিয়া যাহার শিরোদেশে অহর্নিশ অভয় আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন,—যাহার চক্ষে মুহুর্ম্মুহু মায়ের অভয়া মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইতেছে—যাহার কর্ণকুহরে মাতৃমুখনিঃসৃত অভয়বাণী নিনাদিত, তাহার আবার ভয়ের সম্ভাবনা কোথায়? যাহার সমস্ত কামনা একমাত্র মাতৃলাভ উদ্দেশ্যে মাতৃমুখে ধাবিত, যে প্রাণে প্রাণে, মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝে, মা আমাদিগের তিলমাত্র লালসা প্রত্যাখ্যান করেন না, তাহার প্রাণে ক্রোধ কেমন করিয়া জন্মাইবে? কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে। কামনা যেখানে প্রতিরোধ পায়, সেইখানেই উহা ক্রোধের আকার ধারণ করে। সাধক ক্রোধের কবলে পড়ে না; কেন না, তাহার হৃদয়ের সমস্ত আদান প্রদানই মায়ের সঙ্গে; এবং সে মাকে নিত্য মঙ্গলময়ী মা বলিয়াই সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম করে। সুতরাং তাহার প্রাণে কোন কামনাবিশেষ থাকে না ও তাহাকে প্রতিরোধের সংঘাতে ক্রোধাভিভূত হইতে হয় না। যিনি অহর্নিশ মাকে আমার প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করেন, ব্রহ্মাণ্ডের চারিধারে প্রত্যেক পদার্থে যিনি মাতৃ উপলব্ধি করেন, শুভঙ্করী মাকে আমার মা বলিয়া যিনি প্রাণে যথার্থ বিশ্বাস ও অনুরাগ ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হয়েন, জগতে এমন শুভ কি আছে, যাহার জন্য তাঁহার প্রাণ চঞ্চল হইবে? সর্ব্বাশুভনাশিনী মা যার হৃদয়েশ্বরী, তাহার চক্ষে অশুভ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার কি থাকে? সুতরাং স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ ঐ সকল ভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়েন না। তাঁহার হৃদয় ওই সকল ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া কোন প্রকার বাক্য প্রকাশ করিবার অবসর পায় না। তিনি মুনি হইয়া নিরুদ্বিগ্নে জীবন অতিবাহিত করেন।

ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিয়া, ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া যিনি মনেই অবস্থান করেন, বাক্যাকারে আর ভাবাদি প্রকাশ করেন না, তাঁহার নাম মুনি। মৌনত্ব বা বাক্-

সংযমই মুনির প্রধান লক্ষণ। মাকে জানিলে, মাকে হৃদয়ে বসাইলে বাক্য বহি-র্ম্মুখে না ছুটিয়া অন্তর্ম্মুখেই ধাবিত হয়। এই জন্য সাধারণতঃ যাহারা বাক্যসংযম করিয়া থাকে, তাহাদিগকে মৌনী বলিয়া অভিহিত করা হয়। মুনির বাহ্যিক ভাব সে পায় বলিয়াই তাহাকে মৌনী বলি। স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায় বাক্যসকল অন্তর্ম্মুখেই থাকে। অন্তর্ম্মুখেই তাহার বাক্যসকল ধাবিত হয়, সেই জন্য স্থিতধী ব্যক্তির অন্য নাম—মুনি।

অন্তর্মুখে মায়ের সঙ্গে কথা কহিও—অন্তর্মুখে আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া এক একবার মা বলিয়া ডাকিও আর কান বাড়াইয়া উত্তরের অপেক্ষা করিও—আবার ডাকিও। এই ভাবে অন্তর্ম্মুখে কার্য্য হইলে তখন বাহিরের বাক্য রোধ হইয়া আসিবে, বহির্জ্জগতের ক্ষুদ্র কথায় তোমার মন আর অভিভূত হইবে না। বহি-র্মুখের একটি কথা ১০।২০ হাত তফাতের বেশী আর শুনা যায় না; আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় সে শব্দতরঙ্গ আর ধরিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু অন্তর্মুখের কথা বহু দূর অবধি শুনিতে পাওয়া যায়; এমন কি, একটী শব্দ যত ক্ষণ ইচ্ছা, অনুভব করা যাইতে পারে; বাহিরের ব্যোমক্ষেত্র অপেক্ষা চিত্তক্ষেত্র সূক্ষ্ম, সুতরাং তাহার বিকম্পনও বহুক্ষণস্থায়ী।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিলেন যে, স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ মুনি হন—মৌনিপ্রায় হইয়া পড়েন, তাঁহার বাহিরে কথাবার্ত্তার বড় একটা কিছু থাকে না। তার পর কি প্রকারে তিনি অবস্থান করেন, এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮

কূর্ম্মঃ যথা অঙ্গানি স্বভাবেনৈব আকর্ষতি, তদ্বৎ যদা অয়ং ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ ইন্দ্রি-য়াণি সর্ব্বশঃ সংহরতে স্বভাবেনৈব আকর্ষতি, তদা তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

ব্যবহারিক অর্থ।—কূর্ম্ম যেমন স্বীয় অঙ্গসকল আপনার অভ্যন্তরে গুটাইয়া লয়, সেইরূপ বিষয়-সকল হইতে স্বভাবতঃ যাহার ইন্দ্রিয় সংহৃত হইয়া যায়, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বুঝিবে।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে করিতে জীবের ক্রমশঃ বিষয়ের দিক্ হইতে দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; তাহার ইন্দ্রিয়-সকলের স্বাভাবিক গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তীব্র তীক্ষ্ণতা লাভ করে—

প্রত্যেক বিষয়াভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম তত্ত্বের ভিতর সংযুক্ত হয়; পদার্থসকলের স্থূল শরীর, স্থূল গুণ তাহার গতি রোধ করিতে সমর্থ হয় না। আমাদিগের ইন্দ্রিয়-সকল সাধারণতঃ বিষয়-সকলের স্থূল অবস্থায় আমাদিগকে মুগ্ধ করে।' আমরা পদার্থ-সকলের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ,এই তন্মাত্রা-সকলে মুগ্ধ হই, কিন্তু তন্মাত্রা-সকলকে ভেদ করিতে পারি না; তন্মাত্রাসকলের সূক্ষ্মতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। শব্দ আসে, শব্দ অনুভব করি, কিন্তু শব্দ কি প্রকারে ব্যোম হইতে উৎপত্তি লাভ করে, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। রূপ দেখি, কিন্তু রূপ, তেজ হইতে কি প্রকারে সঞ্জাত হয়, তাহা দেখিতে পাই না। তেজের ধর্ম্মই রূপ, এইরূপ সিদ্ধান্ত ধরিয়া লই। গন্ধ আঘ্রাণ করি, পৃথিবীর গুণ গন্ধ জানি, কিন্তু ক্ষিতিতত্ত্ব হইতে গন্ধ কিরূপ বিশ্লেষণে আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে আসে,তাহা জানি না; আমরা ক্ষিতিতত্ত্বের গুণ গন্ধ, এই সিদ্ধান্ত জানিয়াই নিশ্চিন্ত থাকি। ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম হইলে, সূক্ষ্ম তত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইলে তখন আদিতত্ত্ব বা এই সকলের সূক্ষ্ম কারণতত্ত্ব আমাদিগের উপলব্ধিতে আসে; আমাদিগের ইন্দ্রিয়সকল সংকীর্ণ স্থূল বিষয়সকলের ভিতর উদার বিস্তৃত কারণসমুদ্র দেখিয়া প্রাণকে বিস্তৃত করিয়া দিতে সমর্থ হয়। আমরা এখন একটি সুগন্ধি কুসুম পাইলে, তাহার গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পাইয়া, "সুন্দর" এইটুকু মাত্র পরিতৃপ্তি পাই; কিন্তু ইন্দ্রিয় সূক্ষ্মত্ব লাভ করিলে, গন্ধের ও গন্ধটুকু আমাকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না; তাহার অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম গন্ধতন্মাত্রা আমাদিগের উপলব্ধিতে আসিয়া, উহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক তৃপ্তি প্রদান করে। এইরূপ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে। বিষয়সকলের যে সকল গুণ এখন আমাদিগের প্রাণকে আকর্ষণ করে, ইন্দ্রিয়সকল সূক্ষ্মত্ব লাভ করিলে আর ওই সকল গুণ আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারিবে না; ওই সকলের অভ্যন্তরস্থ এক মহান্ তত্ত্ব প্রত্যেক বিষয়ের ভিতর আমাদিগের প্রত্যক্ষীভূত হইবে। দেখিব, যে তত্ত্ব-সমুদ্র হইতে ইন্দ্রিয়-সকল উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সেই তত্ত্ব-সমুদ্র হইতেই বিষয়সকল উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। গ্রাহ্য ও গ্রাহক এক বলিয়া তখন অনুভব করিব। এখন গন্ধ বা রূপ বা রস যেমন একটী মাত্র সংকীর্ণ ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া মনকে উদ্বেলিত করে, তখন আমার সর্ব্বাঙ্গ, আমার সমস্ত দেহ সেইরূপ সুখানুভূতিতে পূর্ণ হইবে। একটী প্রচলিত উদাহরণ শুনিতে পাই, অনেকে বলিয়া থাকেন, "চিনি হওয়া ভাল নহে, চিনি খাওয়া ভাল।" কথাটা সংকীর্ণ কথা। চিনিতে যদি

ভোগশক্তিসংযুক্ত চৈতন্য-শক্তি থাকিত—নিজের আস্বাদ যদি নিজে বুঝিত, তাহা হইলে চিনি খাওয়া অপেক্ষা চিনি হওয়া যে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ, এ কথা চিনি সহস্র বার বলিত। তাহা হইলে চিনি আপনার সর্ব্বাঙ্গে, আপনার প্রত্যেক পরমাণুতে তাহার চিনিত্ব আস্বাদ করিয়া কৃতার্থ হইত। আমি যে অবস্থার কথা বলিতেছি, তাহা এই চিনি হওয়ার অবস্থা। স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা লাভ হইলে ইন্দ্রিয়বিশেষ-মাত্রে আর সুখবিশেষমাত্র উপলব্ধি না হইয়া, আপনার সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বসুখ-সমন্বিত এক অপূর্ব্ব পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ হইয়া থাকিবে। প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইলে ইন্দ্রিয়সকল বিষয়সকলকে ভেদ করিয়া, সেই সূক্ষ্মাবস্থার ভোগ লাভ করে।

কিন্তু বিষয়াদি হইতে ইন্দ্রিয়সকলের এই সঙ্কোচন কি প্রকারে করিতে হইবে? বহু যত্ন করিয়া শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকল হইতে বেগের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকল রোধ করিয়া কি স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা লাভ করিতে হইবে? তাহা বলা ভগবানের অভিপ্রায় নহে। বুদ্ধিযোগে থাকিতে থাকিতে স্বতঃ এইরূপ অবস্থা লাভ হইবে। স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়সকল যখন সূক্ষ্মমুখী হইয়া পড়িবে, তখন বুঝিতে হইবে, স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা লাভ হইয়াছে। ইহাই গীতার অভিপ্রায়। পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোকে সেই কথাই বিশেষ করিয়া বলিয়া—ভগবান্ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের "অবস্থান" কিরূপ, তাহা বুঝাইয়াছেন। স্থিতপ্রজ্ঞত্ব লাভ হইলে বিষয়সকলের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম ক্ষেত্রে পুরুষ অবস্থান করে। ইন্দ্রিয়সকল বিষয়সকল হইতে তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ার্থসকলের গ্রাহক আর থাকে না। বিষয়ের সহিত সংস্রবে আসিলেই বিষয়ের আস্বাদ না পাইয়া ইন্দ্রিয়সকল আপনারা কিরূপে বিষয়াঘাতে ঝঙ্কার করিয়া উঠে, স্ব স্ব সেই আস্বাদনেই মত্ত হয়। কিন্তু মায়ে যুক্ত না হইয়া শুধু ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবার প্রয়াস বৃথা। অনেকের ধারণা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ না করিলে ভগবদ্‌ভাব প্রাণে আসে না, সুতরাং মায়ের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত থাকেন—এটিই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হইয়া পড়ে। ভগবান্ বলিতেছেন, উহা ভগবদ্‌ভাবে যুক্ত হওয়ার লক্ষণ-বিশেষ মাত্র। নতুবা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলেই স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় না।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥৫৯

বিষয়াননাহরতঃ আতুরস্য অপি ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তন্তে, ন তু তদ্বিষয়ো রাগঃ।

নিরাহারস্য অনাহ্রিয়মাণবিষয়স্য দেহিনঃ দেহাভিমানিনঃ ভগবদ্‌ভাবহীনস্য রসবর্জ্জং বিনিবর্ত্তন্তে। ভগবদ্‌ভাবহীনঃ যঃ হি বিষয়প্রবণঃ ন ভবতি, তস্য অপি বিষয়াঃ বিনির্ত্তবন্তে, তথাপি রাগঃ অবশিষ্যতে। অস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য ভগবদ্‌ভাবযুক্তস্য রসোঽপি রাগোঽপি পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।

ব্যবহারিক অর্থ।—আহারাদি বিষয়-সম্ভোগে অসমর্থ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ না করিলে বিষয়ানুভব নিবৃত্তি পায় সত্য, কিন্তু বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি পায় না। ভগবদ্‌ভাবহীন ব্যক্তি বিষয় গ্রহণ রোধ করিলেও বিষয়রাগটুকু অবশিষ্ট থাকে; কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ভগবদ্‌যুক্ত পুরুষের সে অনুরাগটুকু অবধি স্বতঃ নিবৃত্ত হইয়া যায়।

যৌগিক অর্থ।—মায়ে যুক্ত না হইলে, সমস্ত অনুরাগ মা আকর্ষণ করিয়া না লইলে, শুধু বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে ধরিয়া রাখিলে কাজ হয় না। মাধুর্য্যাদি ষড়্‌বিধ রস একরসে পরিণত না হইলে সূক্ষ্মতত্ত্বে অবস্থান হয় না। ইন্দ্রিয় নিরোধ করিতে যাঁহারা অধিক মনোযোগী, ইন্দ্রিয়-ভয়ে ভীত হইয়া যাঁহারা অহর্নিশ তাহাদিগের কবল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বিষয় হইতে দূরে অবস্থান করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের অভ্যন্তরে প্রবাহিত সে রস মরিবে না। প্রাণপণে ইন্দ্রিয়জয়ে অভ্যস্ত হও—জানিও, সে রসাকাঙ্ক্ষা তোমার অভ্যন্তরে সঞ্চিত আছে ও আবহমান কাল থাকিবে; সে রসের প্রবাহ একদিন ছুটিবেই, একদিন আবার তোমায় তরঙ্গাভিভূত করিবেই, একদিন আবার তোমায় বিষয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটাইবেই। তোমার সহস্র অধ্যবসায় বন্যামুখে বালুকাস্তূপের মত ভাসিয়া যাইবে।

এ রসের কবল হইতে একমাত্র বুদ্ধিযোগাবলম্বী ব্যক্তি পরিত্রাণ পাইতে পারে। একমাত্র রসে প্রাণকে পূর্ণ করিলে, তবে উহা তোমার পক্ষে বিষ না হইয়া অমৃত হইতে পারে। তবে তুমি নীলকণ্ঠ মহেশ্বরের মত সে রস-হলাহল পানে মৃত্যুঞ্জয় হইতে পার; নতুবা বৃথা তোমার অধ্যবসায়, বৃথা তোমার জ্ঞান বিচার, বৃথা তোমার কঠোর তপস্যা। যেমন গবাক্ষান্তর্গত সূর্য্যরশ্মিরেখা কাচ ভেদ করিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া বিবিধ বর্ণরঞ্জনা আমাদিগের চক্ষে প্রতিফলিত করে, কিন্তু উন্মুক্ত আকাশে যেমন দীপ্ত শুভ্র জ্যোতি মাত্র পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ যতক্ষণ আমরা মুক্তকেশী মায়ের মুক্ত অঙ্গের দিকে চাহিয়া না দেখিব, ততক্ষণ মাতৃ-অঙ্গনিঃসৃত রসপ্রবাহ ইন্দ্রিয়াদিরূপ গবাক্ষপথে বিচিত্র বর্ণে

আমাদিগের গৃহে প্রবেশ লাভ করিবে। গবাক্ষমধ্য দিয়া যে রশ্মিপ্রবাহ আসিতেছে, তাহা রোধ করিতে প্রয়াস পাইও না, সেই গবাক্ষের ভিতর দিয়া মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া থাক, বর্ণরঞ্জনা দূর হইবে; নতুবা নহে। পর শ্লোকে ইহাই বলবৎ করিয়া বুঝাইতেছেন।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥৬০

কৌন্তেয়, যততঃ বিপশ্চিতঃ অপি পুরুষস্য মনঃ প্রমাথীনি ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং হরন্তি।

ব্যবহারিক অর্থ।—প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ যত্নশীল বিবেকী পুরুষেরও মন বলপূর্ব্বক হরণ করে।

যৌগিক অর্থ।—এই শ্লোকটীকে মহাত্মা শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই ইন্দ্রিয় সংযমের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য কথিত হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কিন্তু বস্তুতঃ ঠিক তাহাব বিপরীত ভাব ইহাতে স্পষ্ট প্রতিভাত। একমাত্র ভগবদ্‌ভাবে যুক্ত হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই, যাহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জীব, ইন্দ্রিয়সকল ও বিষয়সকলের সূক্ষ্ম তত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে পারে, এ শ্লোকটী এ স্থলে উল্লেখ করায় ইহাই স্পষ্টরূপে ভগবান্ বলিতেছেন বলিয়া বুঝা যায়। যত্নশীল—এমন কি, বিবেকী পুরুষের পর্য্যন্ত মন স্থূল বিষয়ে অপহৃত হইয়া পড়ে। সুতরাং মাকে না দেখিলে আর গত্যন্তর নাই, এবং একমাত্র বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া দেখিতে সূচনা করিয়া, ক্রমশঃ স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিদৃষ্ট হওয়ার মত মাকে উপলব্ধি করিয়া, তবে স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে পারা যায়। এই পন্থাই একমাত্র অবলম্বনীয়। বাহ্য হইতে ভিতরে যাইবার জন্য ইন্দ্রিয়াদি নিরোধের যে পথ, উহা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ, ইহা বলাই ভগবানের অভিপ্রায়। বিষয়সকল—রসসকল ভেদ করিয়া, তবে ইন্দ্রিয়সকল স্বতঃ রুদ্ধ হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১

যুক্তঃ মৎপরঃ (সন্) তানি সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি সংযম্য আসীত; হি যস্য ইন্দ্রিয়াণি বশে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

ব্যবহারিক অর্থ।—যোগী মৎপরায়ণ হইয়া, ইন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া অবস্থান করিবেন। এই প্রকারে যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল বশে আসিয়াছে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যৌগিক অর্থ।—"কিমাসীত" প্রশ্নের উত্তর এইখানে শেষ হইল। বুদ্ধিযুক্ত অবস্থা হইতে সূচনা করিয়া যখন জীব এই প্রকারে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম তত্ত্বে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রিয়াদি সকলকে আপনার অধীনে পায়, যখন রাজরাজেশ্বরের মত আপনার ইন্দ্রিয়-রাজ্যের উপর অধিকার লাভ করিয়া সানন্দে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়, সেই অবস্থাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা বলা যায়।

তাহা হইলে আমরা স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের সাধারণ লক্ষণ তাঁহার বাক্যাবলি বা ভাব প্রকাশ এবং তাঁহার অবস্থান সম্বন্ধে উত্তর পাইলাম। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের কামনাসকল আপনাতেই মিটিয়া যায়—জগতের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না; ইহা সাধারণ লক্ষণ। তাঁহার ভাবসকল আপনার প্রাণের ভিতরই আবদ্ধ থাকে, বাক্যাকারে প্রকাশ পায় না; বাক্যসংযমরূপ বাহ্যিক লক্ষণ তাঁহাতে প্রকটিত হয়; তিনি মাতৃপরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন বলিয়া, তাঁহার প্রাণ ইন্দ্রিয়সকলে বিচরণ না করিয়া, ইন্দ্রিয়সকলের অভ্যন্তর দিয়া সূক্ষ্ম তত্ত্বের দিকে প্রসারিত হইয়া থাকে; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বিষয়সকল হইতে সঙ্কুচিত হইয়া সুদূর অন্তর্দ্দেশ দর্শন করিতে থাকে; সুতরাং বাহ্যিক লক্ষণরূপে ইন্দ্রিয়সংযম উহাঁতে পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকারে তিনি অবস্থান করেন।

এইবার "ব্রজেত কিম্" প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। কি প্রকারে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ বিষয়সকলে এবং ব্রহ্মে বা স্থূলে সূক্ষ্মে বিচরণ করেন, তাহাই ভগবান্ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩

ধ্যায়তঃ চিন্তয়তঃ বিষয়ান্ শব্দাদিবিষয়বিশেষান্ পুংসঃ পুরুষস্য সঙ্গঃ উপজায়তে উৎপদ্যতে,সঙ্গাৎ কামঃ তৃষ্ণা সঞ্জায়তে, কামাৎ (প্রতিহতাৎ অভাবাৎ বা) ক্রোধঃ অভিজায়তে (প্রতিরোধনপ্রণাশেন বা প্রতিহতিঃ) ক্রোধাৎ

(প্রতিহতাৎ) সম্মোহঃ ভবতি ; সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ (ভবতি), স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ ভবতি, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—বিষয় চিন্তা করিলে পুরুষের বিষয়সঙ্গ করা হয় ; বিষয়-সঙ্গ হইতে তাহার জন্য কামনা বা তৃষ্ণা সঞ্জাত হয়। কামনা হইতে (কামনার প্রতিরোধ বা কাম্য বস্তুর অভাবে) ক্রোধ জন্মাইয়া থাকে। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিলোপ ঘটে এবং বুদ্ধিলোপ হইতে বিনাশ সংঘটিত হয়।

যৌগিক অর্থ।—ভগবান্, স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ কি প্রকারে ব্রহ্মে ও বিষয়ে বিচরণ করেন বলিতে গিয়া, প্রথমে জীবের বিষয়সঙ্গের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন। বিষয়সকল কি প্রকারে বন্ধন সংঘটন করে, অথবা ব্রহ্মই যখন বিষয় হন,—ভগবান্‌ই জীবের যখন বিষয়স্বরূপ হন, তখন তাহা কি প্রকারে মুক্তিদান করে, ইহাই দেখাইবার অভিপ্রায়ে ভগবান্ বিষয়সঙ্গের ক্রিয়ার ক্রমপরম্পরাগুলি উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছেন। এই দুইটী শ্লোকে এই দুই ভাবের অর্থ উপলব্ধি হয়। বিষয় যখন বিষয়মাত্র, তখন উহা যে প্রকারে বন্ধন করে, বিষয় যখন ব্রহ্ম হন অর্থাৎ বিষয়সকলকে যখন জীব ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়, তখন উহা সেই একই প্রকারেই তাহাকে সাযুজ্যপদ প্রদান করে ; অথবা জীব যখন অন্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট না হইয়া, ভগবানেরই ধ্যাননিরত হয়, তখন সেই একই প্রণালী অবলম্বনে তাহাকে আপন অঙ্গে যুক্ত করিয়া লয়েন, ইহাই ভগবান্ দেখাইতেছেন। অর্থাৎ বিশ্বরূপিণী জগজ্জননী মাকে আমার মা না বলিয়া—বিষয় বলিয়া ধারণা করিলে উহাতে আমরা যে যুক্ত হই, তাহা স্থূল বৈষয়িক যোজনা, এবং তাহাই বন্ধনপদবাচ্য ; আবার এই বিষয়সমস্তকেই মা বলিয়া উপলব্ধি করিলে, অথবা বিষয় দর্শন ছাড়িয়া মাতৃদর্শনে প্রাণ নিযুক্ত করিয়া রাখিলে, তাহাতেও আমরা মায়ে নিযুক্ত হই ; তাহা আত্মিক যোজনা, তাহার নাম মুক্তি—সাযুজ্য। বস্তুতঃ বিষয়সকল ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ নহে, আমাদিগের প্রাণ যে ভাবে তাহাতে যুক্ত বা আসক্ত হইয়া পড়ে, মা আমাদিগকে সেই ভাবে আকর্ষণ করিয়া রাখেন।

এখানে আর একটী কথা বলিয়া, তবে শ্লোকটীর অর্থ আলোচনা করিব। শ্লোকটিতে "ক্রোধ" শব্দটীর উল্লেখ আছে। গীতার এই স্থলে ভগবান্ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ-সকল বর্ণনা করিতে প্রধানতঃ বাহ্যিক কর্ম্মসকলের অপকর্ষতা,

এবং আন্তরিকতাটুকুই যে উৎকৃষ্ট এবং প্রধান, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। পূর্ব্ব হইতে এ আভাস আমরা বিশেষ ভাবে পাইয়া আসিতেছি। এবং এ স্থলে কেমন করিয়া প্রধানতঃ স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া বন্ধনমুক্ত হইতে পারা যায়, তাহাই বর্ণনা করিতেছেন। এই শ্লোক দুইটীতেও সুতরাং ঠিক সেইরূপ লক্ষ্য যে ভগবানের আছে, ইহা স্থির সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিষয়সঙ্গ ও ব্রহ্মসঙ্গ, এই দুই সঙ্গ বুঝান উদ্দেশ্য না করিলেও কেমন করিয়া বিষয়সঙ্গ হইতে আমরা বন্ধন প্রাপ্ত হই, ইহা প্রধান ভাবে এ শ্লোকের মর্ম্ম বলা এবং সমীচীন হইয়া পড়ে; কিন্তু ক্রোধ শব্দটীর সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলে সে প্রধান উদ্দেশ্য হইতে দূরে গিয়া পড়িতে হয়। ক্রোধ হইতে কি করিয়া বুদ্ধিনাশ হয় সে কথা এ স্থলে আলোচনা করিবার কোন আবশ্যকতাই ছিল না। ধ্যান হইতে বিষয়সঙ্গ হয়, বিষয়-সঙ্গ হইতে কামনা হয়, কামনা হইতে মোহ মোহ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ, এইরূপ বলিলেই যুক্তিসঙ্গত হইত, কিন্তু মধ্যের ক্রোধ শব্দটীর সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলে ক্রোধ হইতে কি প্রকারে বিনাশ হয়, ইহাই যেন বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ক্রোধ হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনা করিবার অভিপ্রায় এ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ক্রোধ শব্দ ঠিক ক্রোধ অর্থে না লইয়া, ক্রোধের কারণ-মূলক উদ্বেলন অর্থে গ্রহণ করিয়া মর্ম্মের ভাবসংলগ্নতা রক্ষা করাই যুক্তিসঙ্গত।

বিষয়ের ধ্যান বা চিন্তনে বিষয়-সঙ্গ করা হয়। বিষয় ভোগ করিলেই যে বিষয়-সঙ্গ হয়, তাহা নহে। অনুচিন্তনের দ্বারাও সঙ্গ হইয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, আহার্য্যাদির দ্বারা যেমন আমাদিগের স্থূল দেহ পরিপুষ্টি লাভ করে, চিন্তা দ্বারা তদ্রূপ আমাদিগের মনোময় কোষ পুষ্ট হয়। চিন্তা মনোময় কোষের আহার। যাহা কিছু আমরা চিন্তা করি না কেন, উহা আমাদিগের মনোময় দেহের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। সুতরাং উহা আমাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। বার বার কোন বিষয়ের চিন্তা করিলে, উহার আধিপত্য ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়া কামনারূপে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। তত্তৎ বিষয় প্রাপ্তির জন্য প্রাণে তৃষ্ণা জাগাইয়া দিতে থাকে। কামনা—সেই তৃষ্ণা মাত্র। উপর্য্যুপরি চিন্তনের দ্বারা তৃষ্ণা ফুটাইয়া তোলা যাইতে পারে। এই জন্যও অন্ততঃ ঈশ্বর-নাম স্মরণ, ঈশ্বর চিন্তা নিত্যক্রিয়ারূপে আমাদিগের করণীয়। অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, ভগবানের জন্য প্রাণ কাঁদে না—আকুলতা আসে না,

কি করিব ?' তাঁহারা অন্ততঃ যদি ভগবদ্‌বেদন পাইবার জন্য আকুল তৃষ্ণা প্রাণে ফুটাইতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, শ্রদ্ধা যেরূপেই হউক, কর্ত্তব্যের অনুরোধেও নিত্যক্রিয়াদি করিতে করিতে সে তৃষ্ণা পাইতে পারেন।

যাহা হউক, বিষয় চিন্তন হইতে উপজাত সে তৃষ্ণা, সে কামনা, উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। বিষয়ের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিতে সে তৃষ্ণা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না; বরং বিষয়প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সে তৃষ্ণা পরিবর্দ্ধিত হয়, উদ্বেলিত হয়, আবার সে প্রাপ্ত বিষয়ের নাশ, অভাব বা প্রতিরোধেও সে তৃষ্ণা উদ্বেলিত হয়। এই উদ্বেলন অবস্থাই ক্রোধ-পদবাচ্য। কামনা হইতে প্রাণের একটি উদ্বেলিত গতিপ্রাপ্তি অনিবার্য্য। প্রাণ যখন এইরূপে উদ্বেলিত হয়, তখন তাহা হইতে মোহ আসে। তখন সে গতির আর স্বাভাবিক প্রবাহ থাকে না। স্রোতঃ-প্রবাহ যতক্ষণ নদী-গর্ভে প্রবাহিত থাকে, তত ক্ষণ উহা আপন প্রণালী অবলম্বনে বহে; কিন্তু বন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইলে সে উদ্বেলিত স্রোত প্রণালী অতিক্রম করিয়া দিগ্‌বিদিকে গ্রাম নগরাদি ভাসাইয়া ছুটিতে থাকে। তদ্রূপ যখন কামনা ক্রুদ্ধা হয়, অভাবে হউক, প্রাপ্তিতে হউক, প্রতিরোধ হইতে হউক, বিনাশ হইতে হউক, কামনা কোন প্রকারে যখন উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তখন আর কিছু তাহার চক্ষে প্রতিফলিত হয় না। তাহার সমস্ত প্রাণ সেই এক কামনাতেই অভিভূত হইয়া পড়ে।

সেই অভিভব হইতে স্মৃতিবিভ্রম আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রাণ মোহাভিভূত হইয়া পড়িলে তখন স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া থাকে। সে কামনা পরিপূরণের পথে যে সমস্ত প্রতিবন্ধক থাকে, তত্তৎ সম্বন্ধে সম্যক্ স্মৃতি আর প্রাণকে সঙ্কুচিত, কুণ্ঠিত করে না। সে কামনার সঙ্গে অন্যান্য যাহাদিগের সম্বন্ধ থাকে, তাহাদিগের ইষ্টানিষ্ট প্রভৃতি আর তাহার মনকে বিচঞ্চল করে না। হয় ত সে কামনা পূরণে কোন ব্যক্তির স্বার্থে আঘাত পড়িবে, অথবা হয় ত সে কামনা পূরণে তাহার নিজেরই মান যশঃ স্বাস্থ্য ধর্ম্ম আদি সর্ব্বদা রক্ষণীয় পদার্থে আঘাত লাগিবে; কিন্তু সে সকলের স্মৃতি লোপ হইয়া যায় অথবা বিভ্রান্তভাবে প্রতিফলিত হইতে থাকে।

এইরূপ স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধি নষ্ট হয়। স্মৃতি পূর্ণভাবে প্রকটিত থাকিলে মোহাচ্ছন্ন প্রাণ সে কামনা পূরণে হয় ত অগ্রসর হইতে পারিত না, বুদ্ধিকে উজ্জীবিত করিয়া সে কামনা পূরণের বিপক্ষে উত্তেজিত করিত বা সে সঙ্কল্প

হইতে [illegible] করিত; কিন্তু স্মৃতি লুপ্তপ্রায় অথবা বিকৃতভাবাপন্ন হওয়ায় সে বুদ্ধি অবধি নষ্ট হইয়া যায়। আর কাণ্ডাকাণ্ড, কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান থাকে না, হিতাহিত বোধ অন্তর্হিত হইয়া যায়। জীব, সমস্ত উপেক্ষা করিয়া, সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া সে কামনা পূরণরূপ গহ্বরে ঝাঁপ দেয়—সে পূর্ণরূপে আবদ্ধ হয়—ইহাই নাশ। বহু দিনের জন্য তাহার প্রাণগতির এক অংশ গহ্বর-মধ্যে স্রোতের মত আবদ্ধ হইয়া নিরুদ্ধ, গতিহীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই গতি-হীনতার নামই নাশ। এইরূপে আমরা বিষয়ে বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া শক্তিহীন, গতিহীন, মৃতের মত জন্মের পর জন্ম মোহাচ্ছন্ন হইয়া অতিবাহিত করিতেছি।

আবার এই বিষয় যখন ব্রহ্ম হন—অর্থাৎ যখন মা আমাদিগের ধ্যেয় বিষয় হইয়া থাকেন,যখন পুণ্যবান্ সাধক,মাতৃচরণরূপ পরম বিষয় ধ্যানে অভ্যস্ত হয়েন, তখনকার কথা বলি। তাহার নাশের প্রণালীও ঠিক এইরূপ। ধ্যান করিতে করিতে তাহার মাতৃ-সঙ্গ করা হয়। সেইরূপ সঙ্গ হইতে মাকে পাইবার জন্য, মাকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণে কামনা বা আকুল তৃষ্ণা সঞ্জাত হইতে থাকে। তাহার প্রাণ চারি ধারে মাকে খুঁজিতে থাকে। যত তাহার সন্ধান না পায়, যত জাগতিক স্থূল বিষয়সকল বা তত্তৎ সংস্কারসকল তাহার প্রাণের গতিকে বাধা দেয়, যত তাহাকে মাতৃচরণে আশ্রয় লইতে না দেয়, তত সে তৃষ্ণা ক্ষুব্ধা, ক্রুদ্ধা হইয়া উঠিতে থাকে। অথবা যত সে মাতৃ-নিদর্শনসকল পাইতে থাকে, মাতৃ-অনুভূতি চারি ধার হইতে যত ফুটিতে থাকে, তত তাহার প্রাণও উদ্বেলিত হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ সে মায়ে মোহাচ্ছন্ন হয়। মা ছাড়া আর কিছু সে যেন দেখিতে পায় না। পদার্থে পদার্থে সে তার লুক্কায়িতা মঙ্গলময়ী মাকে প্রতিষ্ঠিতা বলিয়া যেন অনুভব করে। তখন যেন দারুণ কুজ্ঝটিকার দ্বারা ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। তাহার জীবন নিবিড় অন্ধকারময় বলিয়া বিবেচিত হয়। সে কল্পনায় সর্ব্বত্র মাকে দেখে, অথবা তাহার প্রাণ চারি ধারে সমস্ত বিষয় উপেক্ষা করিয়া এক মাতৃ-মুখে প্রধাবিত হইতে থাকে, অথচ সম্পূর্ণরূপে তখন বিষয়-বুদ্ধি তিরোহিত হয় না বলিয়া সেই বিষয়সকলই অন্ধকার কুজ্ঝটিকার মত তাহার মনের চারি ধার বেষ্টন করিয়া থাকে। তুষারমণ্ডিত মেঘাচ্ছন্ন পর্ব্বত-মেখলার মধ্যে পথভ্রান্ত সাধক যেন স্তব্ধ হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছে, তাহার প্রাণের তখন এই ভাব হয়। যেন পায় পায় অথচ পায় না—যেন স্থূল বিষয়-সংস্কার ছাড়ে ছাড়ে অথচ ছাড়ে না। যেন ভগবদ্‌ভাব তাহার

প্রাণকে চারি ধার হইতে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে. ব্রহ্মাণ্ডের এমন কোন পদার্থ যেন নাই—মুহূর্ত্তের জন্য একমাত্র ঐ মাতৃরূপে ছাড়া অন্য প্রকারে যাহা সুখ দিতে পারে। যাহা কিছু সুখ শান্তি, আশা ভালবাসা, সমস্ত উপেক্ষা করিয়া তাহার প্রাণের গতি. প্রণালী অতিক্রম করিয়া বন্যার মত, অন্ধের মত, উন্মাদের মত মা মা করিয়া ছুটিবার প্রয়াস পায়। সাধারণ মানুষ সংসার-মোহে যেরূপ আবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মে উপেক্ষা করে, সে সাধক মাতৃভালবাসার মোহে সেইরূপ আচ্ছন্ন হইয়া জগৎকে উপেক্ষা করে। অর্থাৎ একাগ্রমুখী চিত্তক্রিয়া ক্রমশঃ সমস্ত বুদ্ধিটিকে ব্যাপৃত করিয়া তখন তাহার স্মৃতিবিভ্রম ঘটাইতে থাকে। ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদির স্মৃতি তাহার প্রাণ হইতে মুছিয়া যাইতে আরম্ভ করে। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস. এ সকলের বিশেষ বিশেষ অনুভূতিসকল লোপ হয়। জগতের বন্ধন-সকল ইন্দ্রজালের মত মিলাইয়া যাইতে থাকে। হিতাহিত জ্ঞান, বুদ্ধি, মানাপমান, যশ, লজ্জা, সমস্তের স্মৃতি অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই স্মৃতি-ভ্রংশ অবস্থা হইতে বুদ্ধিনাশ হয়। তখন আর অন্য কোন নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি তাহার প্রাণে থাকে না। এমন কি, যে বুদ্ধির দ্বারা মাকে কল্পনা করিয়া লইয়া—তাহার সাধনার সূচনা করিয়াছিল, সে বুদ্ধি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। আর কোন বুদ্ধি বা নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির সাহায্যে তাহাকে—তাহার প্রাণকে সজীব উত্তেজনাপূর্ণ করিয়া রাখিতে হয় না। প্রাণ তখন বিনা সাহায্যে, বিনা কল্পনায়, বিনা উদ্দীপনায় মাতৃভাবে যুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে বুদ্ধিনাশের পর তাহার নাশ হয়—তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ঘুচিয়া যায় অর্থাৎ মাতৃ-সারূপ্যবোধে সে উপনীত হয়—সে মাতৃঅঙ্কে লীন হয়. ইহাই নাশ।

নাশ, শুনিতে যত ভয়ানক, বস্তুতঃ নাশ সেরূপ নহে। নাশ নবজীবন লাভের অভিষেক-মন্দির। নাশ নূতন উপভোগের সূচনা। নাশ নব প্রভাতের উষা। বিষয়ে হউক অথবা মায়ে হউক, যেখানেই আমাদিগের বুদ্ধি নাশ হউক, যেখানেই উহা আমাদিগের গতিরোধ করুক, জানিও, উহার পশ্চাতে নবীন জীবন লুক্কায়িত। তবে বিষয়ে নাশ—আংশিক নাশ। মায়ে নাশ মহালয়। বিশ্লেষিত মাতৃ-অঙ্গরূপ রূপ রস আদিতে যখন বুদ্ধি নাশ হয়, তখন উহা আংশিক বিনাশ। সুতরাং উহা বিশৃঙ্খলাময়, সুখদুঃখমিশ্রিত। উহা বিশ্লেষিত বহ্নি-রশ্মিবৎ বর্ণ-রঞ্জনাময়। পূর্ণা অবিচ্ছিন্না অবিকৃতা মায়ে যখন সে নাশ ঘটে, তখন উহা শুভ্র রবিকিরণবৎ রঞ্জনাশূন্য।

যাহা হউক, বিষয় ধ্যান হইতে কি প্রকারে লয় অবধি সংঘটিত হয়, তাহা দেখিলাম। আবার যৌগক্রিয়ারূপ ধ্যান অবলম্বনেও ঠিক এই ভাবে সমাধি লাভ হয়। হৃদয়ে যখন আমরা সংযতচিত্তে মাকে ধ্যান করিতে বসি, সে ধ্যান যে মাত্রায় করিতে আমরা সমর্থ হই, সেই মাত্রায় মাতৃ-শক্তি হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে থাকে, সেই মাত্রায় আমাদিগের মাতৃ-সঙ্গ করা হয়। তুমি হয় ত বার বার প্রগাঢ় অভিনিবেশের সহিত মাকে হৃদয়ে প্রতিফলিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছ, অথচ তোমার বিক্ষিপ্ত চিত্তে সে প্রয়াস বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে; তাই বলিয়া ভাবিও না, তোমার সে প্রয়াস বৃথা যাইতেছে। সে ধ্যানে মাতৃ-সঙ্গ করা হইতেছে। সে সঙ্গ কখনও বৃথা যাইবে না। যে পরিমাণে ধ্যান প্রগাঢ় হয়, সেই পরিমাণে মাতৃশক্তি উদ্দীপিতা হইয়া উঠিয়া হৃদয়ে একটা শক্তির আবর্ত্তন রচনা করে। যে শক্তি আমাদিগের চিরসঙ্গিনী, যে শক্তি আমাদের চিরমঙ্গলানুবর্ত্তিনী, সেই শক্তির সঙ্গ করা হয়। ধীশক্তি আবির্ভূতা হইয়া আমাদিগের পথপ্রদর্শিকা সঙ্গিনীর মত দাঁড়ায়। যে ধীশক্তি ত্রয়ী বিদ্যার মূল, যাহা গায়ত্রীরূপে প্রকটিতা হইয়া ব্রাহ্মণ-হৃদয়ে সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেই ধীশক্তি উজ্জীবিতা হইয়া জীবের মঙ্গল অন্বেষণ করে। সুতরাং বুঝা উচিত, ধ্যান ধ্যানমাত্র নহে, ধ্যানই বেদমাতা, ধ্যানই স্রষ্টা, ধ্যানই সবিতা। ধ্যানে ব্রহ্মা এ ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন। ধ্যানে তুমি তোমার অবস্থা-সকল রচনা করিতেছ। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বক্ষেত্রে—স্থূল, সূক্ষ্ম, ভৌতিক, আধ্যাত্মিক সমস্ত তত্ত্বে আমরা যত কিছু পরিণাম, প্রকার-ভেদ, যত কিছু বিভিন্নতা উপলব্ধি করি, উহা ধ্যানের ফলস্বরূপে প্রকটিত বুঝিতে হইবে। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ইত্যাদি ধ্যানেরই পরিণতি। সৃজন ধ্যানেরই পরিণাম। তবে আমরা শক্তিহীন বলিয়া আমাদের ধ্যানসকল ভাবময় মূর্ত্তিতেই অবস্থান করে। ব্রহ্মাদি জগৎস্রষ্টাদিগের শক্তি অতুল বলিয়া—তাঁহাদিগের ধ্যান জড়মূর্ত্তি পরিগ্রহণে বা জড় ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইতে সমর্থ। আমাদিগের ধ্যান প্রগাঢ়তা লাভ করিলে, আমরাও জড় সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইব। আমরা ব্রহ্মাদির পদ লাভ করিব। সৃজন অর্থে কোন জিনিষ একবারে ছিল না, নূতন তৈয়ারি হইল, এরূপ নহে। সৃজ্ ধাতুর অর্থ ত্যাগ। সমস্তই আছে বা সম্ভবপর, অব্যক্ত জ্ঞানশক্তিরূপে অবস্থান করিতেছে; সেই অব্যক্ত অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্ত হয় বলিয়া উহার নাম সৃজন। ধ্যানের

প্রগাঢ়তার দ্বারা উহা ব্যক্ত করার নাম সৃজন। আমরা যাহা চিন্তা করি, যাহার ধ্যান করি, তাহা এখন স্থূলরূপে প্রকটিত হয় না বলিয়া কখনও হইবে না, এমন নহে। এক দিন না এক দিন তাহা প্রগাঢ়তা লাভ করিবেই। এক দিন না এক দিন তাহা স্থূলরূপে আমার ভোগে আসিবেই আসিবে। ধ্যানশক্তির ফল অনিবার্য্য। ধ্যান অপ্রকাশকে প্রকাশিত করে, ধ্যান প্রকাশকে অপ্রকাশিত করে, ধ্যান-বিচিত্র-তাই জগদ্‌বিচিত্রতা। ধ্যান আমাদিগের মাতা।

যোগাক্রিয়ানুষ্ঠানের সময়ে এই ধ্যানই ধ্যেয় বস্তুরূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। যখন জানিবে, ধ্যান আসিতেছে, তখন জানিবে যে, ধ্যেয় আগতপ্রায়। যখন দেখিবে, ভাবনাময় দেহ রচিত হইতেছে,তখন জানিবে,তাহার স্থূল কোষ অবিলম্বে রচিত হইবে। ধ্যান যেন কারণ-শরীর। যে বস্তুর ধ্যান কর, সেই বস্তুরূপিণী মাতৃশক্তি, যেন কারণ-শরীর পরিগ্রহণ করিয়া প্রকটিত হয়েন। ইহারই নাম ধ্যানের দ্বারা বিষয়-সঙ্গ করা। তার পর উহা প্রগাঢ় হইলে সে মূর্ত্তির ভাবদেহ রচিত হয়, উহা কামদা, উহার নাম কামদেহ। ইহাই গীতায় "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তার পর সে কামদায়িনী লীলা-বিলাস-চাঞ্চল্য লাভ করিলে উহার ভৈরবী মূর্ত্তি প্রকটিত হয়। রাগ-চর্চ্চিতা সে মূর্ত্তি লীলা-প্রকটন-নর্ত্তনশালা হয়েন, ইহাই "কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।" সে ভৈরবীর তাণ্ডব নৃত্যে আমরা জগৎ সংসার ভুলি। আমরা সে ভৈরবীর ভৈরব তেজে যেন দিশাহারা, যেন কেমন এক প্রকার হইয়া পড়ি। যেমন প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইলে, তাহার বিরামহীন নিঃস্বনে অন্যান্য শব্দসকল আচ্ছাদিত হইয়া যায়, কেহ উচ্চৈঃস্বরে কোন শব্দ করিলে ইঙ্গিতে বুঝিতে পারি—শব্দ করিতেছে, অথচ শুনিতে পাই না, সেইরূপ এ ভৈরব উল্লাসময়ী কামমূর্ত্তি প্রাণে প্রকটিত হইলে, জগৎ মনে থাকিলেও, স্মৃতিতে উহা বিরাজিত থাকিলেও, সব যেন আচ্ছাদিত হইয়া যায়। সব আছে জানি, ভাল মন্দ সব বুঝিতে পারি, কিন্তু তত্রাচ সে ভৈরবোল্লাস হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারি না, কামনার প্রবল ভাবে আকৃষ্ট হইতে থাকি। ইহা সেই মহাশক্তির প্রাণময় দেহ। তখন সে শক্তি মোহিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করেন। ইহাই "ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ"। ভৈরবী ষড়্‌রসরাগে রঞ্জিতা হইয়া মোহিনী স্থূল ধ্যেয় মূর্ত্তিতে সাধককে বা জীবকে বিমুগ্ধ করিয়া,তাহার স্মৃতি-বিভ্রম উপস্থিত করে। এত ক্ষণ জগৎ-স্মৃতি ছিল, এখন তাহা থাকে না, ছিন্ন ভিন্ন মেঘখণ্ডের মত চিদাকাশের বক্ষঃ হইতে

সে স্মৃতিসকল ভাসিয়া ভাসিয়া উড়িয়া যাইতে থাকে বা জীবের প্রাণরসে ডুবিয়া যাইতে আরম্ভ করে। আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা একটী জীবধর্ম্ম। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে আপন বুদ্ধির দ্বারা আপন অস্তিত্ব অনুভব করে, তাহার সে স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত থাকে; কিন্তু মোহিনী মূর্ত্তিতে সেই স্মৃতিবিভ্রম হইলেই তাহার স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি তিরোহিত হয়—তাহার লয় হইয়া যায়। তখন আর জীব আপনাকে খুঁজিয়া পায় না। জ্ঞানশূন্য মুগ্ধ জীব সে মোহিনীতে লীন হইয়া পড়ে।

সকল বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার ধ্যানে এইরূপ ঘটে। এই একই নিয়মপ্রবাহ অবলম্বন করিয়া জীবের ধ্যানানুসারে মা আমার জীবকে মুগ্ধ, অঙ্কযুক্ত করেন। ধ্যানের এই প্রকারের স্তরগুলি যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারা বলিতে পারেন কত দিনে কোন্ ধ্যানবিশেষ স্থূলে বা কার্য্যে পরিণত হইবে। এবং ধ্যান-প্রবাহ কোন স্তরে কোন প্রকারে শক্তির অভাববশতঃ রুদ্ধ, গতিহীন হইয়া পড়িলেও, তিনি সেই স্তর হইতে সুকৌশলে সে ধ্যানকে আবার বেগময়ী গতি প্রদান করিতে পারেন। যদি সাধক হইতে চাহ, যদি মায়ের জন্য প্রাণ তোমার কাঁদিয়া থাকে, যদি ইচ্ছা হয়, মায়ের এ বিচিত্র লীলাবিলাস প্রত্যক্ষ কর।

শুধু মূর্ত্তি নহে, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বর্ণরঞ্জনাও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তত্ত্বসকল পর পর আবির্ভূত হইয়া বিচিত্র বর্ণবেশে প্রাণকে মুগ্ধ করিতে থাকে। সে বর্ণরঞ্জনা দেখিতে পাওয়া যায়। ললাটক্ষেত্রে, হৃদয়ে, সর্ব্বাঙ্গে উহা পরিদৃষ্ট হয়। তত্ত্ব বিচারকালে সে জ্যোতির্গোলকের কথা সবিস্তারে কথিত হইবে।

যাহা হউক, স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের বিচরণ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া, ধ্যান হইতে কি প্রকারে বন্ধন ও মুক্তি আসে, তাহা বলিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ বিষয়সকলে কি প্রকারে বিচরণ করেন, তাহা বলিতেছেন।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥৬৪

তু রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ (বিযুক্তৈঃ ইতি বা পাঠঃ) আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ-মুক্তৈঃ আত্মবশ্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ চরন্ বিধেয়াত্মা প্রসাদং অধিগচ্ছতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—রাগদ্বেষহীন আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ে বিচরণ করিয়াও বিধেয়াত্মা পুরুষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে বিষয়-সকলের ধ্যানের তারতম্যে কিরূপে গতির

তারতম্য হইয়া থাকে, তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা মাতৃ-ভাবে বিভোর, যাঁহারা অহর্নিশ মাতৃ-চিন্তনেই ব্যস্ত বা যাঁহারা বিষয়মাত্রেই মাতৃসত্তার আভাস দেখেন, তাঁহারা কি তবে বিষয় ভোগ করিতে পারেন না? পূর্ব্বে যেমন বলা হইয়াছে, যাহাদিগের মন স্বভাবতঃ বা বুদ্ধিযোগের দ্বারা মায়ে যুক্ত না হইয়া বিষয়রাগে মত্ত, তাহারা বিষয়-সকল হইতে দূরে থাকিলেও, তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র হইতে বিষয়ানুরাগ যায় না, ঠিক তদ্বিপরীত অবস্থা মাতৃ যুক্ত পুরুষে পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধিযোগের দ্বারা মাতৃযুক্ত পুরুষ বিষয়-সকলে বিচরণ করিয়াও, বিষয় ভোগ করিয়াও শান্তি মাত্র, আত্ম-প্রসাদ মাত্র লাভ করিয়া থাকেন; স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে ও সাধারণ পুরুষে এই পার্থক্য। একজন বিষয়-সকল হইতে দূরে অবস্থান করিয়াও, তাহাদিগের আকর্ষণের হাত হইতে মুক্তি পায় না; আর একজন বিষয়নিবহের মধ্যে স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না; বরং তাহা হইতেই শান্তি অধিক মাত্রায় লাভ করে। এই দুই বিপরীত গতি বুঝাইবার উদ্দেশেই মূল শ্লোকে "তু" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বিষয়সকলকে যাঁহারা বিষয়রূপেই পরিদর্শন করেন এবং বিষয় বলিয়াই তাহাতে আকৃষ্ট হয়েন, বুঝিতে হইবে, বিষয়ের বিষয়ত্বেই তাঁহাদের অনুরাগ। বিষয়সকলকে ব্রহ্ম বা মা বলিয়া যাঁহাদিগের ধারণা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, মাতৃভাবেই তাঁহাদিগের অনুরাগ। বিষয়ের কোন দোষ বা গুণ নাই। আমাদিগের ধ্যানের অবস্থা-ভেদ মাত্র। শব্দ স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ার্থসকলে যাঁহারা অনুরাগাপন্ন, তাঁহাদিগের প্রধানতঃ যেমন ভগবানে প্রবল অনুরাগ থাকে না, স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ বা মায়ে যাঁহারা অনুরাগাপন্ন, তাঁহাদিগের বিষয় সম্বন্ধীয় বৃত্তি-সকলও তদ্রূপ অনুরাগশূন্য। বিষয়কে তাঁহাদিগের চিত্ত আকর্ষণও করে না, সুতরাং প্রত্যাখ্যানও করে না। কোন জিনিষকে প্রত্যাখ্যান জীব তত ক্ষণ করে, যত ক্ষণ প্রাণের স্পৃহা তাহার জন্য থাকে না, বরং তাহা প্রাণের পক্ষে বিরক্তিকর বলিয়া বিবেচিত হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়সকল যাহা কিছু বহন করিয়া ভিতরে আনিবে, তাহাই যদি মাতৃপ্রেরিত বলিয়া বা মাতৃ-সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বুদ্ধিযোগাবলম্বী গ্রহণ করে, তবে তাহা বিরক্ত না করিয়া বরং চিত্তে মাতৃভাব আরও প্রবলতর করিয়া দেয় এবং সে সমস্ত বিষয় ভোগেও বিষয়ে যুক্ত না হইয়া, যোগী বরং মায়েই অধিকতর আত্মহারা হইয়া উঠে। সুতরাং তখন বিষয়সকল বিষবৎ বিবেচিত না হইয়া, পরম শান্তিপ্রদ হইয়া সাধকের সাধনায় সহায়তা করে।

আমরা কোন জিনিষকে যত ক্ষণ প্রত্যাখ্যান করিতে সচেষ্ট থাকি, কোন জিনিষে প্রাণের যত ক্ষণ বিদ্বেষ থাকে, বুঝিতে হইবে, ততক্ষণ প্রাণে সে জিনিষের সংস্কার বদ্ধমূল আছে। সুতরাং অনুরাগের মত উহাও বন্ধনের হেতু মাত্র। বিষয়-সকল হইতে তফাৎ হও বলিয়া যত ক্ষণ আমরা ধারণা রাখি, তত ক্ষণ আমি বিষয়ী মাত্র, এ কথা যেন স্মরণ থাকে। ত্যাগ ভাল—কিন্তু ত্যাগ পর্য্যন্ত যাহার ত্যাগ হইয়াছে সেই মহাপুরুষ—সেই স্থিতপ্রজ্ঞ। যত দিন না জীব বুদ্ধির দ্বারা মায়ে যুক্ত হইতে পারে, তত দিন তাহার প্রাণ ত্যাগ ত্যাগ করিয়া ব্যস্ত থাকে; শত্রু যত ক্ষণ, তত ক্ষণ যেমন অস্ত্রচালনা, জীবের এ ত্যাগ ধারণাও তদ্রূপ। শত্রু ঘুচিয়া গেলে, বুদ্ধির দ্বারা মায়ে লগ্ন হইলে, তখন আর উহার আবশ্যকতা থাকে না। সেই জন্য ভগবান্ অনুরাগ ও দ্বেষ, উভয় প্রকার সংস্কার হইতে বিমুক্ত বলিয়া মহাপুরুষকে বর্ণনা করিলেন।

আমরা ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মে আসক্ত, ব্রহ্মময়ীকে আমরা ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়মাত্ররূপে উপভোগে সিদ্ধ, সেই জন্য আমাদিগের ধ্যান সাধারণতঃ বিষয় ধ্যান মাত্র এবং উহা বিষয়রূপেই আমাদিগকে আবদ্ধ করিতেছে। বুদ্ধিযোগের দ্বারা মাতৃযুক্ত হইয়া যদি অবস্থান করিতে সক্ষম হই, তবে এ বিষয়রাগ ও বিষয়দ্বেষ হইতে বিযুক্ত হইয়া, ইহার মধ্যে বিচরণ করিয়াও মায়েই সংযুক্ত থাকিব। আবার আমার ব্রহ্মময়ী মাই যদি ধ্যেয় বিষয় হন, তাহা হইলে তাঁহাতেই যুক্ত হইব সত্য কিন্তু তাঁহাতে যুক্ত হইলে যে বিষয়-সকলের সহিত ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ থাকিবে না, এমন নহে। তখন রাগ-দ্বেষশূন্য ভাবে সে সকল ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মে বিচরণ করিতে সক্ষম হইব, এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি থাকিলেও তাহা হইতে পরম শান্তি লাভ করিব। "তু" শব্দ প্রয়োগে এই দুই প্রকারে পূর্ব্বশ্লোকের সহিত এ শ্লোকের সংযোগ রক্ষা করা হইয়াছে।

যাহা হউক, কেমন করিয়া এ প্রকার সম্ভব হয়? যে ইন্দ্রিয়ের সুখমোহে আমাদিগকে আবদ্ধ করে, সেই ইন্দ্রিয়-সকল সেই সকল ভোগের ভিতর থাকিয়াও কেমন করিয়া শান্তি লাভ করে? কেমন করিয়া ইহা সম্ভবপর হয়? আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ-শক্তির অভাবে। আমি স্পন্দনতত্ত্ব বুঝাইবার সময় বলিয়াছি যে, আমাদিগের জড় তত্ত্বসকল আকুঞ্চন ও প্রসারণ বা আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দুই প্রকারে কার্য্য করে বলিয়া আমরা দুই প্রকারের ইন্দ্রিয় পাইয়াছি—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় আকর্ষণের জন্য এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রসারণের জন্য গঠিত

হয়। মন ওই সকল ইন্দ্রিয়ার্থ বা বিষয়ে অহর্নিশ এত আকৃষ্ট থাকে যে, ইন্দ্রিয়-সকল যেন মুহূর্ত্তের জন্য নিস্তরঙ্গ থাকিবার অবসর পায় না। এবং যেমন প্রভু নিকটে থাকিয়া অবিরাম কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে ভৃত্যেরাও কার্য্য না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না, তদ্রূপ মন এইরূপে বিষয় বিষয় করিয়া লালায়িত থাকে বলিয়া, ইন্দ্রিয়-সকলও বিষয়ের জন্য যন্ত্রবৎ সচেষ্ট থাকে। মন বিষয়ে মগ্ন বলিয়া ইন্দ্রিয়গণও বিষয়েই ওইরূপে অভিনিবিষ্ট থাকে। বিষয়ের সংস্পর্শ-মাত্রেই আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হইয়া মনকে অভিনিবিষ্ট করিতে থাকে। কিন্তু মন যদি আবার ভগবানে যুক্ত হয়, তখন ইন্দ্রিয়-সকলও আর বিষয়ে আকুঞ্চিত বা প্রসারিত না হইয়া, শুধু যেখানে যেখানে ভগবদ্‌ভাব উদ্দীপক বিষয় বর্ত্তমান, সেই সেই ক্ষেত্রের সান্নিধ্যেই আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হইতে থাকে। আমরা এমন অনেক সময়ে উপলব্ধি করিয়াছি, যে যেরূপ ভাবাবলম্বী, তাহার ইন্দ্রিয়াদি সেইরূপ বিষয়-সকলেরই সন্ধান সত্বর পায়; একই স্থানে যদি একজন ভগবদ্-ভক্ত ও একজন সাধারণ বিষয়ী লোক যায়, তবে সেখানে ভগবদ্‌ভাবোদ্দীপক পদার্থসমূহই সর্ব্বাগ্রে সে সাধুর ইন্দ্রিয়গোচর হইবে, এবং স্থূল বিষয়-সকল সেই সাধারণ লোকটীর ইন্দ্রিয়ে অগ্রে প্রতিফলিত হইবে। তাহাদিগের মনকে কে যেন টানিয়া আনিয়া স্ব স্ব অভ্যস্ত বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া দিতেছে, এইরূপ সচরাচর বোধ হইয়া থাকে। ভাবিও না, সমস্তই মনেরই ধর্ম্ম। মন প্রধান হইলেও মন অপেক্ষা জড়ীভূত ইন্দ্রিয়েরও স্ব স্ব সামান্য শক্তি অনুযায়ী ধর্ম্ম আছে। মন যে প্রকার ভাবে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়-সকলকে পরিচালন করে—ইন্দ্রিয়-সকলও সেই সকল ভাবোদ্দীপক গুণে গঠিত হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়বর্গ কেন, স্থূল দেহ অবধি এইরূপে মনের গুণানুযায়ী গুণযুক্ত হইয়া থাকে। সেই জন্য বিষয়-সকলের মধ্যে বিচরণ করিয়াও ভগবদ্‌ভাবাচ্ছন্ন পুরুষ অভিভূত হন না।

ভগবদ্‌ভাবাচ্ছন্ন পুরুষ একমাত্র ভগবানে ছাড়া অন্য কোথাও হৃদয়ের ভাব জড়াইয়া রাখেন না, কোন বৃত্তি দিয়া বিষয়-সকলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রাখেন না। ছেলেরা যেমন খেলাঘর পাতিয়া খেলা করে, আবার পর মুহূর্ত্তে অনাবিল চিত্তে তাহা পরিত্যাগ করে, সাধু পুরুষেরা সংসারেও সেই ভাবে বিচরণ করেন। বস্তুতঃ দোষ ওই সম্বন্ধ স্থাপনে। অনুরাগ বা বিদ্বেষ, যে প্রকার বুদ্ধি-বৃত্তির দ্বারাই বিষয়ে লিপ্ত থাক না, জানিও—উহা বন্ধনের কারণ। একটী গল্প

বলি। এক দিন, মহর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে গান করিতে করিতে গোলোকে গিয়া উপস্থিত; জগৎপতির চরণ দর্শন অভিলাষ করিয়া পুরে প্রবেশ করিতেছেন। সহসা দেখিলেন, নারায়ণ ব্যস্তভাবে কোথায় চলিয়াছেন। প্রভুকে প্রণাম করিয়া মহর্ষি তাঁহার ব্যস্তভাবে গমন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারায়ণ বলিলেন, মর্ত্তে কোন এক ভক্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সেবা করিতে যাইতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য দ্রুত চলিয়াছি। নারদ স্তম্ভিত! মরলোকে এমন কে মহাপুরুষ আছে, প্রভু স্বয়ং যার সেবা করিতে ছুটিয়াছেন। নারদ বলিলেন,—"প্রভু, যদি অনুমতি করেন, আমি সে মহাপুরুষ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে আপনার সহিত যাই।" নারায়ণ বলিলেন,—"তুমি যদি দ্রুত বেগে আমার সহিত চলিতে পার, এস; আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না।" জগৎপতি চলিলেন; নারদ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলেন।

মধ্যাহ্ন কাল, প্রচণ্ড রৌদ্রে পৃথিবীবক্ষঃ দগ্ধপ্রায়; তপ্ত বায়ু অগ্নিস্রোতের মত প্রবাহিত, নারায়ণ চলিয়াছেন, পশ্চাতে নারদ। রৌদ্রে ছুটিয়া ছুটিয়া নারদের কণ্ঠ বিশুষ্ক হইয়াছে; ঘর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত হইতেছে; নারদ তৃষ্ণায় কাতর হইয়া ভগবান্‌কে বলিলেন,—"প্রভু, তৃষ্ণায় প্রাণ যায়, আগে একটু জলের সন্ধান করি, আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন।" নারায়ণ কাতরভাবে বলিলেন,—"নারদ, আমার অপেক্ষার সময় নাই; তুমি সম্মুখস্থ ওই গ্রামে গিয়া সাধু গৃহস্থদের আশ্রমে জলপান করিয়া আইস, আমি তত ক্ষণ অগ্রসর হই। তোমার পথ ভুল হইবে না, আমি ওই দিক্ দিয়াই যাইব।" নারদ গ্রামাভিমুখে চলিলেন।

দিব্য আশ্রম; বৃক্ষ-মণ্ডপের মধ্য স্থলে সুন্দর সুপরিষ্কৃত দেবালয়; তাহারই সম্মুখে কোন ভক্ত ভাগবত পাঠ করিতেছেন, শ্রোতৃমণ্ডলী অদূরে উপবিষ্ট হইয়া বিমুগ্ধভাবে সে অমিয়ধারা পান করিতেছেন। নারদ গিয়া উপস্থিত; বৃক্ষ-চ্ছায়ায় নারদের দেহ স্নিগ্ধ হইল; ভগবদ্‌গাথা শ্রবণে নারদ তৃষ্ণা ভুলিয়া গেলেন, অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল, ভাবিলেন, "ধন্য এই মহাপুরুষ, ধন্য ইহার ভাগবত আলোচনা, ধন্য ভক্ত; ইহার পরশে জগৎ পবিত্র; বুঝি, প্রভু আমার এই মহাপুরুষকে কৃতার্থ করিতেই আসিতেছেন; ছলনা করিয়া, আমায় অগ্রেই এইখানে প্রেরণ করিয়াছেন।

সহসা একটী বালক সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকটী সে

সভামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া, চারি ধারে নিরীক্ষণ করিয়া, পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া সেই ভক্তের সম্মুখে দাঁড়াইল। নগ্ন বালক—দেখিলে নিম্নজাতীয় বলিয়া বোধ হয়। তাহার উন্মাদবৎ এই আচরণ দেখিয়া সকলে যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল; উন্মাদ বালক সেই ভক্তের সম্মুখে হাসিতে হাসিতে এ দিকে ও দিকে দেখিতে লাগিল। ভক্ত তখন পর্য্যন্ত স্তম্ভিত ভাবে নিস্তব্ধ। সহসা সেই উন্মাদ বালক, সেই ভাগবতখানির উপর একটী পদ উত্তোলন করিয়া দিল। তখন সেই ভক্ত চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আরে আরে, কোথা হইতে বালক আসিয়া সর্ব্বনাশ করিল! সব অপবিত্র হইল—সব অপবিত্র হইল—দূর—দূর!" বালক ছুটিয়া পলায়ন করিল।

নারদ দেখিলেন, সে বালক অন্য কেহ নহে, স্বয়ং নারায়ণ। তিনি এ লীলা বুঝিতে পারিলেন না। তিনিও বেগে বালকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহির্গত হইয়া গেলেন। কিছু দূরে গিয়া, নারায়ণ পাছু ফিরিয়া নারদকে ডাকিলেন; নারদ নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি ভক্তকে কৃপা করিয়া দেখা দিতেই আসিয়াছিলেন, তবে এরূপ ছলনায় তাহাকে প্রতারিত করিবার কি আবশ্যক ছিল? যখন গোলোকপুরী হইতে আসিয়াছিলেন, তখন আপনার ব্যস্ত ভাব দেখিয়া মনে হইয়াছিল, আজ মর্ত্তে আপনার কৃপায় অভিনব লীলা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব। কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে কৃপা অপেক্ষা ছলনাই অধিক প্রত্যক্ষ করিলাম, স্নেহ অপেক্ষা নিষ্ঠুরতাই উপলব্ধি হইল। চিরনিষ্ঠুর তুমি—বুঝিলাম, তোমার প্রাণে কৃপার আবির্ভাব হইলেও স্বীয় স্বভাব-দোষে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়া ফেল। নতুবা আজ এ ভক্তের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াও এমন করিয়া প্রবঞ্চিত করিবার কি উদ্দেশ্য ছিল জগন্নাথ!"

তখন ভগবান্ ঈষৎ হাস্য সহকারে, তাঁর সে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভক্ত নারদের অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,—"নারদ, যে ভক্তকে সেবা করিবার জন্য গোলোক হইতে মর্ত্তে আসিয়াছি, এ সে ভক্ত নহে; তাহার নিকট অগ্রেই গিয়াছিলাম; তোমায় সঙ্গে লইয়া যাইতে বিলম্ব হইতেছিল দেখিয়া, স্থির হইতে না পারিয়া, তোমার প্রাণে তৃষ্ণার সঞ্চার করিয়া দিয়া, ছলে তোমায় এখানে প্রেরণ করিয়াছিলাম; আমি একা গিয়া আমার সে প্রিয় ভক্তের পরিচর্য্যা করিয়া আসিয়াছি।"

"নিষ্ঠুর ছলনাময়! আমায় এত কষ্ট দিয়া মর্ত্তে আনিয়া, শেষ আমাকেই তোমার সে পরম ভক্তের সঙ্গ করিতে দিলে না—বঞ্চনা করিলে? তাহা হইবে

না, এখনই আমায় সে ভক্তকে দেখাইতে হইবে। আমি কোন কথা শুনিতে চাহি না, আমি এখনি তাহাকে দেখিব। চল, আমায় লইয়া চল।" নারদ কাঁদিয়া আকুল। তখন নারদকে সঙ্গে লইয়া নারায়ণ সেই প্রিয় ভক্তের আলয় অভিমুখে চলিলেন।

কিয়দ্দূর গিয়া তাঁহারা দেখিলেন, এক ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ লইয়া শীকার উদ্দেশ্যে অরণ্য অভিমুখে চলিয়াছে। নারায়ণ নারদকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—"তুমি এই ব্যাধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোপনে যাও, যেন তোমাকে ব্যাধ দেখিতে না পায় বা বুঝিতে না পারে, তুমি উহার অনুসরণ করিতেছ। ব্যাধ যত ক্ষণ না ফেরে, তুমি উহার সঙ্গ ছাড়িও না আমি এইখানে রহিলাম; এই পথেই প্রত্যাগমন করিবে; তোমার সহিত এইখানেই আমার সাক্ষাৎ হইবে।" নারদ প্রথমে ভাবিলেন, ভগবান্ পূর্ব্ববারের মত তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া, আবার তাঁর প্রিয় শিষ্যের নিকট যাইতেছেন, তিনি প্রথম ভীষণাকৃতি ব্যাধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু অবশেষে ভগবদাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ক্ষুণ্ণমনে ব্যাধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

ব্যাধ অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, স্থানে স্থানে জাল বিস্তৃত করিয়া, ধনুর্ব্বাণ হস্তে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া, পক্ষী আদি হত্যা করিতে লাগিল, পিশাচের মত পক্ষীর নীড় হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাবক-সকল বিনষ্ট করিল। নৃশংসতার সে বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া মহামুনি নারদের প্রাণ কাঁদিতে লাগিল; কি করেন, ভগবানের আদেশ। সুতরাং পুত্তলিকার মত সে নরকের প্রেতক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। ব্যাধ হাস্যময়।

ব্যাধ, সমস্ত অপরাহ্ণ এইরূপে নৃশংস ভাবে পশুহত্যা করিয়া, সন্ধ্যার সময় সেই সমস্ত আহত পশু ও জাল স্কন্ধে লইয়া, ধনুর্ব্বাণ হস্তে অরণ্য হইতে বিনিক্রান্ত হইয়া, পুনরায় সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল; দেবর্ষিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিলেন ও নির্দ্দিষ্ট স্থলে আসিয়া দেবর্ষি ভগবানের সাক্ষাৎ পাইলেন। ব্যাধ অগ্রসর হইবামাত্র ভগবান্ নারদকে বলিলেন,—"এস আমার সঙ্গে, এই ব্যাধের অনুধাবন কর।" নারদের কৌতূহল বৰ্দ্ধিত হইল, ভাবিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! এই সমস্ত অপরাহ্ণ জীবহত্যা দেখিয়া দেখিয়া প্রাণ দগ্ধ হইয়া গেল, ক্রূর নৃশংস হীনকর্ম্মা এ ব্যাধের সঙ্গ করিয়া কলুষে হৃদয় কালিমাময় হইল, আবার ঠাকুর ইহারই পশ্চাদ্ধাবন করিতে বলিতেছেন।" যাহা

হউক, অগত্যা তিনি ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অবশ্য ব্যাধ ইহঁাদিগকে দেখিতে পাইতেছিল না।

কয়খানি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর—শতচ্ছিদ্র। দারিদ্র্য ও তামসিকতার জ্বলন্ত ছবি। ব্যাধ সেই আশ্রমে প্রবেশ কবিল; কতকগুলি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী ব্যাধের পরিবার ও পোষ্য; শীকাবলব্ধ পক্ষী আদি নামাইয়া ব্যাধ স্নান করিতে চলিয়া গেল; ব্যাধের স্ত্রী সেই সমস্ত মাংসাদি বন্ধন আয়োজনে ব্যাপৃতা হইল।

নারায়ণ নারদকে বলিলেন,—নাবদ, চল স্নান করিয়া আসি; আজ ভক্তের প্রদত্ত অন্ন তোমায় দিব।

নারদের প্রাণে অভিমান উথলিয়া উঠিল; বলিলেন,—"ভক্ত দেখিবার জন্য মধ্যাহ্ন কাল হইতে ফিরিতেছি, নানা প্রকাব ছলনায় আমায় সে আশাপূরণে বঞ্চিত করিতেছেন। শেষ এই নরকসদৃশ অপবিত্র স্থানে আনিয়া বলিতেছেন, নারদ! ভক্তপ্রদত্ত পবিত্র আহার গ্রহণ করিবে!"

নারায়ণ হাসিতে হাসিতে নারদকে সঙ্গে লইয়া, ব্যাধেব স্নানাদি সমাপনান্তে পুনরায় সেই ব্যাধের আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন রন্ধনাদি প্রস্তুত, ব্যাধ স্নান হইতে ফিবিয়া আহাবের জন্য আসনে উপবিষ্ট। ক্রূর ব্যাধের এই নিয়ম ছিল, যাহা কিছু পাক করা হইবে, সমস্ত ব্যাধকে ধবিয়া দিতে হইবে, ব্যাধের আহার শেষ হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই তাহার স্ত্রীপুত্রাদি আহার করিবে। আহারকালে সে কুটীবে কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। ব্যাধস্ত্রী আহার্য্যাদি লইয় ব্যাধের সম্মুখে সাজাইয়া দিয়া গেল। শিশু পুত্রসকল প্রাঙ্গণে অপেক্ষা কবিতে লাগিল—দয়াময় পিতার আহার কত ক্ষণে সাঙ্গ হয়, এবং কতহ বা অবশিষ্ট থাকে। অন্তরীক্ষে নারদ ও নারায়ণ দাঁড়াইয়া। প্রভু বলিতেছেন,--নারদ! বৎস! বিলম্ব করিও না—প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা কর, ভক্ত এখনি আহারার্থে সম্ভাষণ করিবে। নারায়ণের চক্ষে জল-ধারা। নারদ অবাক্। বাক্যরহিত।

গৃহটি নিস্তব্ধ, ক্ষীণ দীপের ম্লান আলোকরশ্মিতে অন্ধকার সম্যক্ বিদূরিত হয় নাই। সেই আলো আঁধারের সঙ্গমে, সেই পাপ-পুণ্যের মিলন-মন্দিরে ব্যাধ, স্তিমিতনয়নে অন্নসম্ভার সম্মুখে লইয়া আত্মহারা! কি বলিব—তুমি সর্ব্বস্ব সর্ব্বেশ সর্ব্ব-স্বরূপ, তোমার মহিমা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কি ধৃষ্টতার পরিচয় দিব! তুমি আমার, তুমি সকলের—এই মাত্র জানি। তোমায় যে পাইয়াছে,

সেও তোমায় জানে না, যে পায় নাই, সেও তোমায় জানে না। তোমার অপূর্ব্ব লীলারহস্য আমরা কি বুঝিব? তোমার করুণার কণামাত্র আমরা কিরূপে ধারণা করিব? তোমার লীলারহস্য কি বর্ণনা করিব? নারদ দেখিলেন, জগন্নাথ বালকবেশে সেই ব্যাধের সহিত আহার করিতেছেন; আর সেই সমস্ত পক্ষী সজীব হইয়া, গৃহ ভেদ করিয়া অরণ্যে পলায়ন করিতেছে। নারদ মূর্চ্ছিত হইলেন।

ব্যাধ আহারান্তে নিদ্রিত হইয়াছে; নারায়ণ নারদকে বলিতেছেন,—"নারদ! আমার প্রিয় ভক্তের তুমি সঙ্গ করিয়াছ। ভক্ত এখন নিদ্রিত, চল প্রত্যাগমন করি।" নারদ করজোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভু! আমি মোহাচ্ছন্ন, আমি কোন ক্রমে এ ব্যাধের ভক্তির লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না। আমায় চক্ষু দিন। আমি ব্যাধকে একবার দেখি।"

যাঁহার ইচ্ছায় লয়মোহ ঘুচিয়া সৃষ্টি সূচিত হয়, হরি-হর-বিরিঞ্চি সুপ্তোত্থিত হন, তাঁহার কৃপায় নারদের মোহ দূর হইল। নারদ ব্যাধের সূক্ষ্ম শরীর দেখিলেন। দেখিলেন, পক্ষী ধরিয়া ব্যাধ, ব্রহ্মাঙ্গে তাহা নিক্ষেপ করিতেছে। সেই অমর আত্মাসকল প্রভুর অঙ্গে গিয়া আশ্রয় লইতেছে। যেন শ্যাম তরুবর অবলম্বন করিয়া বিবিধ চিত্রিত বিহঙ্গমকুল সুখে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। সর্ব্বদা সমস্ত পদার্থ ভগবানে অবস্থিত, ব্যাধ এই ধ্যানে বিভোর। নারায়ণকে অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট হইতে সমস্ত জীবসঙ্ঘ অবস্থান করিতেছে। কেহ ব্রহ্মচ্যুত নহে। কোন অবস্থায় তাহা হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না। কেহ কদাচ কোন প্রকারে কোন জীবকে সে অভয় আনন্দময় আশ্রয় হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। জন্ম মৃত্যু আদি স্বপ্নে, সে আনন্দময় মন্দির হইতে জীব কখনও বিক্ষিপ্ত হয় না—হইতে পারে না। চারি ধারে অনন্ত আনন্দ-সাগর। মাতৃক্রোড়ে শিশুবৎ সমস্ত তাঁর অঙ্গে। ইহাই ব্যাধের সাধনা। ব্যাধ দিবানিশি এই ভাবে ভগবানে যুক্ত। তাই ব্যাধের হস্তে যে সকল পশু হত হইতেছে, তাহাদিগের স্থূল কোষ অবধি বিনষ্ট হইতেছে না। ব্যাধ যেন সহস্র প্রকারের ক্রূরতা প্রকাশ করিয়াও কাহাকেও ব্রহ্মচ্যুত করিতে পারিতেছে না। ইহাই তাহার হত্যাক্রীড়া।

নারদ দেখিলেন। ভগবান্ নারদকে বলিলেন, নারদ! দেখ, আমার নিত্য-যুক্ত ভক্তকে পরিদর্শন কর। ইহার হৃদয়ে জাগতিক পদার্থের জন্য অনুরাগ

বিরাগ কিছুই সঞ্চিত নাই। সমস্ত বৃত্তি একীভূত হইয়া একমাত্র আমার রাগে রঞ্জিত। জীবহত্যারূপ নৃশংস কার্য্যেও ইহার বিদ্বেষ নাই, স্ত্রী পুত্রাদি প্রিয় পদার্থে অবধি ইহার অনুরাগ নাই। একমাত্র আমি উহার প্রিয়, সেই জন্য ব্যাধ আমারও একান্ত প্রিয়। আর সেই যে ভক্তকে ভাগবত পাঠ করিতে দেখিয়া, তুমি আমার প্রিয় ভক্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছিলে, তাহার অনুরাগ আমাতে তত নহে, যত শাস্ত্রে, শাস্ত্র-ব্যাখ্যায়। বিদ্বেষ—শাস্ত্র ছাড়া সমস্তে। শুন নারদ, শাস্ত্রাদি, অন্যান্য সমস্ত পদার্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও অনুরাগ তাহাতে জড়াইয়া থাকিলে হইবে না, বৃত্তি আমাতে অর্পিত হওয়া চাই। শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যাকালে উহার প্রাণ সময়ে সময়ে আমাতে যুক্ত হইয়া যায় সেই পুণ্যে আমি আজ উহার সম্মুখে স্থূলদেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ হইয়াছিলাম, কিন্তু চিনিতে পারিল না। ধ্রুবের সম্মুখে ব্যাঘ্ররূপে গিয়াছিলাম, তবু সে চিনিয়াছিল। বস্তু বা বিদ্বেষ প্রবল ভাবে থাকিলে, আমাকে পাওয়া যায় না। প্রাণ আমাতে মুগ্ধহইলে, অন্য কোন পদার্থে বা ভাবে, অনুরাগ বা বিদ্বেষ-সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা আমার প্রসাদ পায়—অপূর্ব্ব প্রসন্নতায় সে অহর্নিশ মগ্ন থাকে। সেরূপ প্রসন্নতা আসিলে কি হয়?

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫

প্রসাদে অস্য সর্ব্বদুঃখানাং আধ্যাত্মিকাদীনাং হানির্ব্বিনাশঃ উপজায়তে। প্রসন্নচেতসঃ হি আশু শীঘ্রং বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে নিশ্চলা ভবতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—ওইরূপ প্রসন্নতা লাভ হইলে সর্ব্ববিধ দুঃখ তিরোহিত হয়। এবং প্রসন্নচেতার বুদ্ধি অতি শীঘ্র নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়।

যৌগিক অর্থ।—রাগদ্বেষ-বিমুক্ত অবস্থায় যে প্রসন্নতা আছে, তাহা লাভ করিলে, কোন প্রকার দুঃখই আর জীবকে যন্ত্রণা দেয় না। প্রসন্নময়ীতে বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হইলে বিষয়-রাগ ও বিষয়-বিদ্বেষ, এই উভয়ের কবল হইতেই বিমুক্ত হইতে পারে। বিষয়ের মধ্যে বিচরণ করিয়াও তাহার প্রসন্নতার কোন বিঘ্ন ঘটে না। প্রসন্ন-চিত্ত পুরুষের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক, কোনপ্রকার দুঃখই আর উপলব্ধি হয় না। তাহার বুদ্ধি অতি শীঘ্র ঘায়ে সমাহিত হইয়া যায়।

পূর্ব্বে বিষয় ধ্যানে কি প্রকারে জীবের বন্ধন সংসাধিত হয়, তাহা বলা হইয়াছে। এবং সে বিষয় ব্রহ্মময়ী হইলে, তাহার দ্বারা কি প্রকারে মায়ে সন্তান লীন হয়, তাহাও ভগবান্ বলিয়াছেন। "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ বাহ্যিক বিষয়-সকলের ধ্যান ও বন্ধন-কৌশলটুকু মাত্র ধরিলে, আমরা "রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু" শ্লোকের আর এক প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। অনুরাগ বা বিদ্বেষ ইত্যাদির দ্বারা অর্থাৎ যে কোন প্রকারে অনুরাগের দ্বারাই হউক বা বিদ্বেষের দ্বারাই হউক, কোন রকমে—কোন বৃত্তির দ্বার "বিমুক্ত" হইলে, অর্থাৎ বিশেষ প্রকারে মুক্ত বা ভগবানে যুক্ত হইলে, বিষয়-সকলে সঞ্চরণ করিয়াও পুরুষ স্বচ্ছন্দে প্রসন্নতা লাভ করেন। বিষয় ধ্যানে বিষয়সঙ্গ হয়, সে বিষয় যখন স্থূল বিষয় মাত্র, তখন তাহা হইতে বিষয়-বন্ধন সূচিত হয়। ধ্যান উভয় প্রকারেই হইতে পারে। অনুরাগ অথবা দ্বেষ, দুই প্রকারে বিষয়ধ্যান সম্পাদিত হয়। অনুরাগ বা বিদ্বেষ, যে কোন প্রকারে বিষয়ধ্যান হইলেই তাহা বন্ধনের কারণ হয়, কিন্তু সেই অনুরাগ বা বিদ্বেষের দ্বারা ভগবানে যুক্ত হইলে, স্থূল বিষয়সকল হইতে বিশেষ প্রকারে জীব বিমুক্ত হয়। তখন বিষয়-সকলের মধ্যে বিচরণে তাহার প্রসন্নতা লাভ হইয়া থাকে। এবং সেই প্রসন্নতা লাভ হইলে, তবে তাহার সমস্ত দুঃখের অবসান হয়। তাহার ত্রিতাপের জ্বালা বিদূরিত হয়। তাহার অনন্ত মর্ম্মদাহ চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হয়।

মায়ের আমার এমনই কৃপা। মা আমার তোমার নিকট ভক্তি বা প্রেমের কাঙ্গাল নহেন। মা আমার শুধু তোমার প্রাণসমুদ্র মন্থন করিয়া যে পবিত্র নির্ম্মল ভক্তিটুকু সঞ্জাত হইতে পারে, সেই ভক্তিটুকুর মুখ চাহিয়া নাই। মা তোমার নিকট তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিটুকু গ্রহণ করিতে চাহেন না। হায়, তাহা হইলে আমাদিগের ভরসা বুঝি ছিল না। তাহা হইলে আজিকার এ ঘোর বিপ্লবে, মাতৃচরণ লাভের আশা সুদূরপরাহত হইয়া পড়িত। করুণার সে অনন্ত প্রস্রবণ, ভালবাসার সে উত্তাল সমুদ্র, তোমার যে কোন বৃত্তি দিয়া তাঁহাতে যুক্ত দেখিতে চাহেন। যাহা হয় দাও, যাহা ইচ্ছা অর্পণ কর। যাহা তোমার শক্তিতে কুলায়, যাহা তোমার প্রাণ চায়, সেই রকমেই তুমি আমায় যুক্ত হও। ভক্তির দ্বারা হউক, ভয়ের দ্বারা হউক, হিংসা, দ্বেষ, অনুরাগ, বিরাগ, যে কোন বৃত্তি দিয়া, যে কোন ভাব দিয়া, তোমার প্রাণের যে কোন একটী শাখা দিয়া তুমি মাকে আমার স্পর্শ করিয়া থাক। মা আমার তাহাতেই সন্তুষ্টা।

মা আমার তাহাতেই সুলভা। যাহা হয় একটা কিছু দিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাক। বল—"মা নাই"—নাস্তিক্যবাদ অবলম্বন, তাহাও তোমার উপেক্ষিত হইবে না; কিন্তু ধরিয়া থাকা চাই। প্রাণের বেগ দিয়া যে কোন একটা ভাবরূপ অবলম্বনী বাড়াইয়া মায়ের দিকে চাহিয়া থাকা চাই। সেটা তোমার অনুরাগ, কি সেটা তোমার বিদ্বেষ, সেটা তোমার ভক্তি, কি সেটা তোমার বিরক্তি, সেটা তোমার ভালবাসা বা সেটা তোমার ঈর্ষা—মা আমার সেটা দেখেন না—দেখিতে চাহেন না। মা শুধু অপেক্ষা করিতেছেন, কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে কি না—কেহ তাঁহার দিকে চাহিয়াছে কি না। ভালবাসার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিদর্শন আর কোথাও পাওয়া যায় কি না, জানি না।

এই প্রকারে যে কোন বৃত্তি দিয়া, রাগ বা বিদ্বেষ, যাহা হউক দিয়া যে মায়ে আমার যুক্ত, সে পুরুষ বিষয়ের মধ্যে বিচরণ করিয়া আত্মপ্রসাদ মাত্র লাভ করেন। সে প্রসন্নতা লাভ হইলে সমস্ত দুঃখের অবসান হয়। চিত্ত প্রসন্ন হইলে বুদ্ধি সম্যকরূপে মায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। মায়ে যে কোন বৃত্তির দ্বারা তুমি যুক্ত হও, প্রাণপণে মায়ে আমার সেই বৃত্তিপ্রবাহ ঢালিয়া দাও—তোমার সমস্ত ধান্ধা দূর হইবে, তোমার সমস্ত তাপ জুড়াইয়া যাইবে, তোমার সমস্ত বুদ্ধি মায়ে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া লাগিয়া থাকিবে।

প্রহ্লাদ আজন্ম সর্ব্বত্র ভগবান্‌কে দর্শন করিতেন, ক লিখিতে কৃষ্ণ দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেন। আদর্শ ভক্তি লইয়া, আদর্শ ভালবাসা লইয়া জগতে আসিয়া আজন্ম ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন—ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন। ধ্রুব, কামনার তাড়নায়—প্রতিহিংসার প্রেরণায় ভগবান্‌কে ডাকিয়া ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন। প্রহ্লাদের ও ধ্রুবের ফলপ্রাপ্তি কিন্তু এক, সেই মাতৃ-অঙ্কে মিলাইয়া যাওয়া। অথবা যদি কিছু তাঁহাদের ফলে বিভিন্নতা থাকে, তাহা আমাদিগের মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। তুমি কামনার তাড়নাতেই হউক, ভালবাসার উন্মাদনাতেই হউক, ঈর্ষার তাড়নাতেই হউক, যে প্রকারে পার, অদম্য বেগে ভগবানের মুখাপেক্ষী হও। তুমি সমস্ত সন্দেহ সংশয়, মোহ যন্ত্রণা অবসাদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে এবং ওইরূপে যুক্ত হইয়া থাকিতে থাকিতে তবে সম্যক্‌রূপে তাঁহাতে যুক্ত হইতে সমর্থ হইবে। এই প্রকারে যুক্ত না হইলে, তোমার বুদ্ধি, তোমার ভাবনা, তোমার জ্ঞান, তোমার বিচার, সমস্তই অনর্থক বলিয়া বুঝিও।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥৬৬

অযুক্তস্য বুদ্ধিঃ নাস্তি, অযুক্তস্য ভাবনা চ ন (বিদ্যতে) ; অভাবয়তঃ শান্তিঃ চ ন (বিদ্যতে), কুতঃ অশান্তস্য সুখম্, (ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ)।

ব্যবহারিক অর্থ।—অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি থাকে না, তাহার ভাবনা বা ধী-শক্তির পরিচালনাও সম্ভব হয় না। সেরূপ ধ্যান না থাকিলে শান্তিলাভ হয় না। শান্তিহীন মনুষ্যের সুখসম্ভাবনা কোথায় ?

যৌগিক অর্থ।—এই প্রকারে তাঁহাতে যুক্ত না হইলে, ভগবদ্‌বুদ্ধি মনুষ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ভগবদ্ভাবনাই তাহার আসে না। আমরা দুখানা শাস্ত্রগ্রন্থ অভ্যাস করিয়াই জয়ঢক্কা বাজাইতে আরম্ভ করিয়া দিই ; মনে করি, বুঝিতে বুঝি আর বাকি নাই। কিন্তু তাঁহাতে বৃত্তির দ্বারা যুক্ত না হইলে, তৎ-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার বুদ্ধিই আমরা লাভ করিতে পারি না, এ কথা আমরা ভুলিয়া যাই। আমাদিগের এ বুদ্ধি বুদ্ধিপদবাচ্যই নহে। তাঁহাতে যুক্ত হইলে, তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকা অভ্যাসে পরিণত করিলে, তবে ধীরে ধীরে ধী-শক্তি—যাহার আরাধনায় ব্রাহ্মণেরা নিত্য অভ্যস্ত, সেই মহতী পবিত্রা ব্রহ্ম-প্রেরিতা ধী-শক্তি উদ্বোধিত হয়। তবে তিলে তিলে আনন্দ আসে, তবে তিলে তিলে যেন কি একটা আলোকের ছায়া প্রাণের উপর পড়িতে থাকে, তবে মা কি, যেন একটু একটু বুঝিতে সূত্রপাত করি। বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হইতে না পারিলে, সে বৃথা বুদ্ধি লইয়া কোন কাজই হয় না। একমাত্র তাঁহার দিকে প্রেরণা ছাড়া কোন চরিতার্থতা সে বুদ্ধি আমাদিগকে দিতে সমর্থ হয় না।

অযুক্তের বুদ্ধি থাকে না। বুদ্ধি না থাকিলে ভাবনাও থাকিতে পারে না, —ভাবের আবির্ভাব প্রাণে হইতে পারে না, যতক্ষণ না বুদ্ধিকে ঘুরাইয়া মায়ের দিকে বাড়াইয়া রাখি। প্রাণে ভাব না আসিলে, শান্তি কোন প্রকারেই লাভ করিতে পারা যায় না। এবং শান্তি লাভ না করিলে সুখ কোথায় ? তোমার শান্তির আশা বিড়ম্বনা মাত্র, তোমার সুখের আশা স্বপ্ন মাত্র, যত দিন না তুমি অন্য সকল প্রকার পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, মায়ে আমার বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হও। বুদ্ধির অপব্যবহার করিও না। যতটুকু বুদ্ধি থাক্, যতটুকু বুদ্ধি আমরা পাইয়া

থাকি, তাহার পরিমাণের তারতম্য লইয়া আমরা হুড়াহুড়ি না করিয়া—এস, সেই বুদ্ধি আমরা মায়ের দিকে প্রেরণা করি। সে বুদ্ধিকে বিতর্কে বৃথা অপব্যয় না করিয়া—এস, তাহাই মায়ের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করি—তবে শান্তি ও সুখ আমাদিগের করতলগত হইবে।

বুদ্ধিযোগ অবলম্বন না করিলে, প্রাণে ভগবদ্‌বেদন অনুভূত হইতে আরম্ভ না হইলে, ভগবদ্‌বিচার ভ্রান্তি ও তর্কপূর্ণ হইয়া থাকে। বেদনের পর বিচার তর্কহীন ও ভক্তিরসাত্মক হয়। তখন মীমাংসা আপনা হইতে হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক খরচ করিয়া মীমাংসা করিতে হয় না। বুদ্ধিযোগ অবলম্বন না করিলে প্রাণে ভাবও উপজাত হয় না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভাবই ভগবদ্‌গতি। প্রাণে ভগবদ্‌ভাব আসিয়েছে বলিলে বুঝিতে হইবে, ভগবৎচরণ প্রক্ষেপ ঘটিতেছে। তুমি কাতর প্রাণে, সতৃষ্ণ নয়নে শূন্যের দিকে চাহিয়া, কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে চক্ষু ও প্রাণ সংস্থাপিত করিয়া মায়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছ। ভাবিতেছ, হয় ত প্রাণের এ আকাঙ্ক্ষা মা আমার বুঝিতে পারিতেছেন না; হয় ত আমার দুর্ব্বল কণ্ঠের ক্ষীণ আহ্বান স্নেহময়ীর হৃদয়ে স্নেহ জমাইতে সক্ষম হইতেছে না। যেন কোন্ সুদূর রাজ্যে মা আমার প্রতিষ্ঠিতা, আমার প্রাণ আমায় সেখানে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিতেছে না; কিন্তু বুঝিও, মা তোমার সম্মুখে, নিকট অপেক্ষা নিকটে তোমার সে ভাবে উদ্বেলিতা হইতেছেন, তোমার জন্য তাঁহার ভাবময় দেহ রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে, শীঘ্রই তোমার চক্ষে প্রতিফলিতা হইবেন। ভাবকে স্বাপ্নিক সুখমাত্র বলিয়া বুঝিও না। ভাব যথার্থ সত্য অমৃত-প্রবাহ। এ ভাব তাঁহাতে যুক্ত না হইলে হয় না। ভাব না আসিলে শান্তি আসে না। প্রাণে শান্তি না আসিলে সুখের সম্ভাবনা নাই।

শান্তি না হইলে সুখ লাভ হয় না। শান্তিতে এক পরম সুখ আছে। সে সুখ আমাদিগের জাগতিক সুখ অপেক্ষা সহস্রগুণে আনন্দদায়ক। জগতের সুখ-দুঃখের অবস্থার অতীত অবস্থায় এক প্রকার সুখ আছে। এ সুখ উদ্বেলন-পূর্ণ, তরঙ্গ-চঞ্চল, সে সুখ পূর্ণত্ব বিধায় উদ্বেলনহীন, নিস্তরঙ্গ—প্রশান্ত। উহাই প্রকৃত সুখ, জগতের সুখ—সুখের আভাস মাত্র। অনেকে বলিয়া থাকেন, শান্তির অবস্থায় সুখ নাই; কেন না, তাহা সুখ-দুঃখাতীত। কিন্তু বস্তুতঃ জাগতিক সুখের অতীত হইলেও সে অবস্থায় সুখেরই সুপ্রতিষ্ঠা মাত্র উপলব্ধি হইয়া থাকে। সুখ—অনন্ত—পূর্ণ—সুখের অবধি নাই—সুখই ব্রহ্মস্বরূপ।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥৬৭

হি বিষয়েষু চরতাম্‌ ইন্দ্রিয়াণাং যৎ মনঃ অনুবিধীয়তে অনুপ্রবর্ত্ততে, তৎ ইন্দ্রিয়বিষয়বিকল্পেন প্রবৃত্তং মনোঽস্য পুরুষস্য প্রজ্ঞাং হরতি, (কথং) বায়ুর্নাবমিব অম্ভসি।

ব্যবহারিক অর্থ।—বায়ু যেমন জলে ভাসমান তরণীকে আপনার গতির অভিমুখে তাড়না করিয়া লইয়া যায়, তদ্রূপ মন, বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যেটির অনুগমন করে, সেইটিই তাহার প্রজ্ঞাকে হরণ করে।

যৌগিক অর্থ।—অযুক্ত পুরুষের মন, বায়ুতাড়নায় কর্ণধারহীন শূন্য তরণীর মত বিষয়ে বিষয়ে চারি ধারে বিচরণ করে। বাসনার বায়ু যখন যে ইন্দ্রিয়-পথে মনকে চালিত করে, সে অযুক্ত পুরুষ, সমস্ত প্রজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া সেই বিষয়েই ধাবিত হইতে থাকে। ইন্দ্রিয়সকল বিষয়ে পরিভ্রমণ করে। ইন্দ্রিয়-সকল বিষয়ের সহিত অহর্নিশ সংযুক্ত থাকে। মন তন্মধ্যে যেটির অনুধাবন করে, সেই পথেই জীব আপনার প্রজ্ঞাকে হারাইয়া ফেলে। জীব আপনার সমস্ত অস্তিত্বটুকুকে সঙ্কুচিত করিয়া, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, সাময়িক ভাবে তাহাতে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। ইহাই মঙ্গলময়ী মায়ের মঙ্গল নিয়ম।

কেন এমন হয়? কেন জীব এত সহজে বিষয়ে সংযুক্ত হইয়া পড়ে? কেন জীব বিষয়ে এত অনুরক্ত? এ নিয়ম সংস্থাপনের আবশ্যকতা কি ছিল? বিষয় হইতে সে অহর্নিশ পুষ্ট হয় বলিয়া। বিষয়ের দ্বারাই সে আপনার অস্তিত্ব অনুভব করে বলিয়া। বিষয় না থাকিলে সে আপনাকে খুঁজিয়া পায় না বলিয়া। সূর্য্যালোক না থাকিলে যেমন জগৎ প্রকাশ পায় না, বিষয় না থাকিলে তদ্রূপ জীব-প্রকাশ ঘটে না। বিষয়ই জীবের জীবত্ব। বিষয়ের দ্বারা জীব আপনার অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে করিতে তবে নিজের অপরিণামী অস্তিত্ব খুঁজিয়া পায়। ভোগশূন্য অস্তিত্ব হইতে ভোগপূর্ণ অস্তিত্ব লাভ করিতে জীবের এই বিষয়ানুরাগ। বিষয় অন্য কিছু নহে—মাতৃ-অনুরাগ, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ব্রহ্মময়ী বিরাট্‌ আকর্ষণের দ্বারা অহর্নিশ আমাদিগকে আপন মহিমাতে সংযুক্ত করিয়া রাখিতেছেন। এ সংযোগের অপলাপ মুহূর্ত্তের জন্য

হইতে দেন না। এ সংযোগের ফলে যে পরিমাণে আমার ভোগশক্তি পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হয়, এই বিষয়ই আমার আবশ্যক অনুযায়ী সেইরূপে প্রতিফলিত হইতে থাকে, মা আমার সেইরূপে প্রকটিতা হইয়া আমাদিগকে স্তনধারা পান করান। একই বিষয় অর্থাৎ মা আমার অবস্থার তারতম্যে নানারূপে আমার প্রজ্ঞা হরণ করেন। নারায়ণ, মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া মহেশ্বরকে যেমন উন্মাদ করিয়াছিলেন, ইহাও তদ্রূপ। মা আমায় চারি দিকে যখন যে প্রকারে সম্ভব, যখন যে প্রকার আবশ্যক, যখন যে প্রকার উপযুক্ত, সেই প্রকারে আকর্ষণ করিতেছেন। এক দিন এমন দিন আসিবে, যে দিন তুমি আপনাকে ওতপ্রোতভাবে চৈতন্যময়ী মায়ে নিমগ্ন বলিয়া অনুভব করিবে। সে দিন যত দিন না আসে, তত দিন কখনও ইন্দ্রিয়ভাবে, কখনও অর্থভাবে, কখনও ধর্ম্মভাবে, নানা ভাবে মায়ে আমরা মুগ্ধ হইব।

এ আকুল বিষয়-সমুদ্রে মাতৃ-আকর্ষণের প্রবল বাত্যা প্রবাহিত। মা বিষয়-রূপিণী হইয়া, অনুরাগের প্রবল বাত্যা তুলিয়া, আমাদিগের প্রজ্ঞা হরণ করিতেছেন। আনন্দসাগরের স্নেহের বাত্যা হৃদয়-পালে প্রতিঘাত করিয়া জীব-তরণীকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। কে বলে তরণী ডুবিবে? কে বলে তরণী ধ্বংস হইবে? যাহারা নূতন তরণী ভাসাইয়াছে—যাহারা নূতন মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে—যাহারা নূতন কর্ণধার হইয়া, উদ্যমরূপ হাল ধরিয়া অনবরত ঝিকা মারিতেছে, তাহাদের প্রাণ তরঙ্গে আকুল হয়। তাহারা পাল টাঙ্গাইতে জানে না। তাহাদের পাল এখনও খোলে নাই। হৃদয়-পালে একটু আধটু বিষয়রূপ যে মাতৃ-স্নেহ-বায়ু প্রবিষ্ট হয়, তাহা সম্যক্ বিস্তৃত হইবার স্থান না পাইয়া উদ্যম-হালের ঝিকায় আন্দোলিত তরণীখানিকে আরও চঞ্চল করে। তাহারা হৃদয়-পাল আরও গুটায়, খুলিতে ভয় পায়– বলে, ডুবিলাম ডুবিলাম। অনেক দিন ওইরকম করিয়া তরণী চালাইলে, তবে সে স্নেহ-বায়ুর প্রবাহ ধরিতে পারে। তবে পাল সে সেই দিকে ঘুরাইয়া ধরে। তবে সে পাল একবারে পূর্ণ স্ফীত হইয়া তরণীকে নক্ষত্রবেগে ছুটাইয়া লইয়া যায়। তখন আর সে ঝিকা মারে না। উদ্যম-হালের প্রান্তে পালের রজ্জু বাঁধিয়া, নির্ভীক চিত্তে নীলিমার সৌন্দর্য্যে, আনন্দ-হিল্লোলে নাচিতে নাচিতে যাইতে থাকে। তাহার চক্ষু শুধু ধ্রুবতারার দিকে চাহিয়া থাকে, তাহার প্রাণ শুধু গাহিতে থাকে,—

"অগাধ সলিলে শ্যামা ডুবা মা জনমের মত।"

আর তখন যে বিষয়ের ছদ্মবেশ পরিধান করিয়াই মাতৃস্নেহ-বায়ু আসুক, তাহা পালে লাগিয়া তরণীর গতি বর্দ্ধিত মাত্র করে। ইন্দ্রিয়পথে যে বায়ুটুকু হৃদয়ে ঢুকিয়া পড়ে, তাহাই সঙ্কীর্ণ প্রাণে আবদ্ধ হইয়া থাকিয়া যায়, তাহাই ভীতি সঞ্চার করে। কিন্তু সম্যক্ স্ফুরিত-হৃদয়ে যে মাতৃভাবে অহর্নিশ সংযুক্ত, সে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-পথ-প্রবিষ্ট বায়ুতে সাহায্যমাত্রই পাইয়া থাকে। ভগবান্ বলিতেছেন, মন যে ইন্দ্রিয়-পথে প্রবিষ্ট হইবে, সেই পথেই প্রজ্ঞা অপহৃত হইবে। ইহা ত তোমার অপূর্ব্ব কৃপা! এমন করিয়া যদি না মজাইতে, এমন করিয়া যদি আগে আমাদিগকে মজিতে না শিখাইতে, তবে 'মজার" মজা ত পাইতাম না। আজ স্ত্রীপুত্রাদিরূপে, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপে, শব্দস্পর্শাদিরূপে মজাইতেছ একটু একটু করিয়া তোমার বাঁশরীর ঝঙ্কার আমার শ্রবণে প্রবিষ্ট করাইতেছ, শ্যামচাঁদ! তোমার চরণের নুপুর-ধ্বনি আমার কর্ণে ধ্বনিত করিতেছ, বালিকে! একটু একটু করিয়া আমায় ভালবাসিতে শিখাইয়া আপনার ভালবাসার আস্বাদ পাওয়াইতেছ, স্নেহময়ি! এক দিন আমায় তোমার অপরিমেয় ভালবাসার আস্বাদ দিয়া মূর্চ্ছিত করিবে বলিয়া।

ইন্দ্রিয়-পথে আমাদের প্রজ্ঞা হরণের এই অভিপ্রায়। হরণই তাঁহার ধর্ম্ম। হরণই তাঁহার মূলশক্তি বলিয়া তাই মা আমার হরহৃদিবিলাসিনী। তাই মাতৃপদাধিকারী জীব শিবত্ব বা হরত্ব লাভ করে। প্রলয়ে হরতি ইতি হরঃ। মায়ের মহাহরণ কার্য্যের প্রধান সহায় বলিয়া মহেশ্বরের নাম হর। হরণই এ ব্রহ্মাণ্ডের ধর্ম্ম। আকাশের নীলিমায়, বায়ুর কোমল পরশে, সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে, বারিধি-বক্ষে, সর্ব্বত্র মা আমার হর হৃদে প্রতিষ্ঠিতা—হরণ-কার্য্যে ব্যাপৃতা। কুসুম-গন্ধবিস্তারে প্রাণ হরণ করে। বিহঙ্গমের কল কূজনে প্রাণ হরণ করে। চন্দ্রের কৌমুদী-বিলাস প্রাণ হরণ করে বিপন্নের অশ্রু প্রাণ হরণ করে। পীড়িতের আর্ত্তনাদ প্রাণ হরণ করে। "কু" "সু" যে পায়, আমাদের প্রাণটীকে যেন গ্রাস করিয়া লয়। যেন এটার কোন মূল্য নাই—যেন কোন কদর নাই। এ হরণ কেহ রোধ করিতে পারে নাই। এ হরণ-কার্য্যে কেহ কখনও বিঘ্ন ঘটাইতে সমর্থ হয় নাই। তবে বৃথা কেন ধরিয়া রাখিবার প্রয়াস? বৃথা কেন প্রাণকে লইয়া টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি। চল, উপকথার রাক্ষসীর আহারের জন্য প্রত্যহ যেমন রাজা

একজন করিয়া মনুষ্য প্রেরণ করিত—সে প্রাণভয়ে কাতর জীব প্রাণটুকুর মায়া বিসর্জ্জন দিয়া যেমন সে রাক্ষসীর সম্মুখে উপস্থিত হইত, চল, তেমনি করিয়া আমাদের সমস্ত প্রাণটুকু লইয়া এ মহারাক্ষসীর মহা অট্টহাস্ত-মুখরিত মুখে প্রবিষ্ট হইবার জন্ত তার সম্মুখে গিয়া তাহাকে উপহার দিই। "এমন তিলে তিলে কেন গ্রহণ করিবে—এমন পলে পলে কেন মিলনের মেলা দেখাইয়াও বিরহের অনলে দগ্ধ করিবে? লও, বিশ্বপ্রাণ-সংহারিণি! আমার সমস্ত প্রাণটুকু আপনা হইতে তোমার চরণে অর্পণ করিলাম—গ্রহণ কর।" চল! মাকে আমার প্রাণ এমনই করিয়া সমর্পণ করি।

সমস্ত পদার্থের এই হরণকার্য্য পরিদর্শন করিয়া সর্ব্বত্র মাকে আমার প্রতিষ্ঠিতা দেখ। এইরূপ দেখার নাম, মায়ে যুক্ত হওয়া। এইরূপ দেখিলেই বিষয়ের বিষয়ত্বে আর প্রাণ আবদ্ধ না হইয়া, যে বিষয়রূপিণী হইয়া আছে, তাহাতে প্রাণ আকৃষ্ট হইবে। যে বিষয়ের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া হরণ-কার্য্যে ব্যাপৃতা, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে। যত দিন এইরূপ না দর্শন করিবে, তত দিন প্রাণ গেল—প্রাণ গেল করিয়া তোমার আর্ত্তনাদ বিদূরিত হইবে না। চোরের হাতে পরিত্রাণ নাই। সেই জন্য পর-শ্লোকে বলিতেছেন।

তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮

তস্মাৎ মহাবাহো, যস্ত ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ বিষয়েভ্যঃ সর্ব্বশঃ নিগৃহীতানি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।

ব্যবহারিক অর্থ।—সুতরাং হে মহাবাহো। বিষয়-সকল হইতে যাঁহার ইন্দ্রিয় সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যৌগিক অর্থ।—সমস্ত বিষয়ের অভ্যন্তর হইতে কর প্রসারণ করিয়া মা যাহার ইন্দ্রিয়-সকলকে নিগৃহীত করিয়াছেন বা সম্যক্প্রকারে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে। ভগবান্, মহাবাহো বলিয়া সাধককে সম্ভাষণ করিতেছেন। বায়ুতত্ত্বের গুণ স্পর্শ, উহার জ্ঞানেন্দ্রিয় ত্বক্ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়—কর, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বাহু দ্বারা আমাদিগের স্পর্শ করিবার স্পৃহা, গ্রহণ করিবার স্পৃহা চরিতার্থতা লাভ করে। মা মহাবাহু বলিয়া সম্বোধন করিয়া

সেই স্পর্শস্পৃহাকে লক্ষ্য করিতেছেন। মা যেন বলিতেছেন,—"আরে বৎস! তুমি ত ক্ষুদ্র বাহুযুক্ত নহ। তুমি আমার সান্ত বিষয়-স্পর্শেরই ক্ষুদ্র সুখে মুগ্ধ থাকিবার যোগ্য নহ। অনন্তরূপিণী আমাকে স্পর্শ করিবার উপযুক্ত বাহু তোমার আছে। তুমি কর প্রসারিত কর। মা বলিয়া হাত বাড়াও। আমি কর প্রসারণ করিয়া তোমায় অঙ্কে ধরিবার জন্য সর্ব্বত্র অপেক্ষা করিতেছি। তুমি আমায় স্পর্শ করিতে তোমার স্পর্শ-স্পৃহা জাগাইয়া কর প্রসারণ কর। যে বিষয়ই তোমার সম্মুখে প্রতিফলিত হউক, তুমি তাহারই ভিতর দিয়া তোমার স্পর্শস্পৃহা বাড়াইয়া দাও, বিষয়-রূপ স্খলিত হইয়া পড়িবে। ইন্দ্রিয়সকল আমার দ্বারা নিগৃহীত হইবে। আমার স্পর্শ-সুখ পাইয়া তোমার প্রজ্ঞা আমাতে প্রতিষ্ঠিতা হইবে। মহাবাহো বৎস! কর প্রসারণ কর—আমায় আলিঙ্গন কর—আমার স্নেহোদ্বেলিত বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়।"

ইহারই নাম ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ অর্থে ইন্দ্রিয় ধ্বংস নহে—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ অর্থে ইন্দ্রিয়-শক্তির সঙ্কোচ নহে—ইন্দ্রিয় নিগ্রহ অর্থে মায়ের দ্বারা ইন্দ্রিয় পরিগ্রহণ। সাধারণ বিষয়সকল হইতে ইন্দ্রিয়সকল অপসৃত হয় বলিয়া, বিষয়-সকল হইতে মায়ের দিকে প্রবৃত্তি ঘুরিয়া দাঁড়ায় বলিয়া সাধারণতঃ বিষয়ের দিক দিয়া দেখিলে সঙ্কোচ, সংযম ইত্যাদিই পরিলক্ষিত হয়। নিবৃত্তি অর্থে মায়ে প্রবৃত্তি। নিগ্রহ অর্থে মায়ের দ্বারা পরিগ্রহণ। বিষয়ে সঙ্কোচ অর্থে মায়ে বিস্তার।

ইহা একবারে হয় না। একটু একটু করিয়া ঘটিয়া থাকে। মা ধীরে ধীরে আমাদিগকে গ্রহণ করেন। যখন সর্ব্বত্র সর্ব্ব বিষয়ের অভ্যন্তরে এইরূপে মা আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন, তখন প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন অচল অটল অচ্যুত ভাবে তাঁহাতে সংলগ্ন থাকিব।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯

সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং অযুক্তানামিত্যর্থঃ যা নিশা তমঃস্বভাবা, তস্যাং সংযমী জাগর্ত্তি প্রবুধ্যতে, যস্যাং ভূতানি জাগ্রতি প্রবুধ্যন্তে, সা পশ্যতঃ মুনেঃ নিশা।

ব্যবহারিক অর্থ।—সাধারণ জীব-সকলের পক্ষে যে মাতৃনিষ্ঠা নিশাস্বরূপ

অর্থাৎ যে মাতৃনিষ্ঠায় সাধারণ জীবসংঘ কার্য্যকারী না থাকিয়া প্রসুপ্ত থাকে, যুক্ত পুরুষ তাহাতেই জাগিয়া থাকেন—তাহাতেই দিবাভাগের স্থায় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। যাহাতে সাধারণ ভূতসকল জাগ্রত অর্থাৎ যে বিষয়-নিষ্ঠায় সাধারণ জীবসকল কার্য্যযুক্ত থাকে, মুনির পক্ষে উহাই নিশাস্বরূপ, অর্থাৎ যুক্ত পুরুষ সেই সকল বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থাকেন, সুপ্ত থাকেন।

যৌগিক অর্থ।—ইহাই মহা উদ্বোধন—মহা জাগরণ। ভগবান্ শঙ্কর বলিয়াছেন, আত্মনিষ্ঠায় সাধারণ জগৎ নিদ্রিত, অলস, নিশ্চেষ্ট। উহাই তাহাদিগের পক্ষে নিশা এবং উহাতে সংযমী জাগরিত হয়। বিষয়াদিই সাধারণ জীবসংঘের দিবাস্বরূপ ; কেন না, তাহারা উহাতেই সক্রিয় থাকে। মুনিদিগের উহাই নিশা। তাঁহারা বিষয়াদিতেই নিষ্ক্রিয়---উদাস, স্পৃহাশূন্য। সত্যই তাই। আত্মনিষ্ঠা—মাতৃনিষ্ঠা বা ঈশ্বরনিষ্ঠা একই কথা ; এই মাতৃ-নিষ্ঠায় জাগ্রত—প্রবুদ্ধ হইতে হইলে, মহানিশায় সাধনা করিতে হয়। সমস্ত ভূতের, সমস্ত প্রাণীর মৃত্যু মহানিশাস্বরূপ। সমস্ত প্রাণী আপন আপন সমস্ত উদ্যম, উদ্বোধন, সক্রিয়তা বিদূরিত করিয়া মৃত্যুর মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়ে। সাধারণ জীবমণ্ডলীর ইহাই মহানিশা। সাধক এই মহানিশায় জাগরিত হয়। মরণের বিকট ছবি হৃদয়ে প্রকটিত করিয়া, বিভীষিকার জ্বলন্ত মূর্ত্তি প্রাণে অঙ্কিত করিয়া সাধক মহাধ্যানে নিযুক্ত হয়। তাহারই অভ্যন্তরে মায়ের সন্ধান করে। মরুর মধ্যে বারি অন্বেষণের মত মরণের ভিতর সাধক, মাতৃস্নেহ আস্বাদন করিতে চাহে। এ স্থূল ব্রহ্মাণ্ড ত মাতৃ-স্নেহে ভরা। ইহাতে মাতৃ-স্নেহ ত পূর্ণ প্রকটিত। কিন্তু মরণ ? এ স্নেহের রাজ্যে মরণ কেন ? মাতৃক্রোড় ত অবশ্যম্ভাবী প্রলয় কেন ? এ সুখের জাগরণে আবার লোপ কেন ? তবে কি অন্য কোন পিশাচ এ স্নেহ-মন্দিরকে শ্মশানে পরিণত করিতে নিত্য সচেষ্ট ? তবে কি এই বিচিত্র জগৎ শুধু ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নবৎ উদ্বোধিত হইয়াছে ? জীব-সকলের অস্তিত্ব শুধু একটা স্বপ্ন মাত্র ? আমরা কি স্বাপ্নিক ? আমরা কি থাকিব না ? মৃত্যু কি আমাদিগের অস্তিত্বের অবসান করিবে ? তবে আবার স্নেহ কোথায় ? তবে আবার মা কোথায় ? মৃত্যুর ছায়া, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর চিন্তা জীবকে এই প্রকারে বিশুষ্ক করিয়া ফেলে বলিয়া, মাতৃভক্ত সন্তান কাঁদিয়া আকুল হইয়া মৃত্যুর ভিতর উঁকি মারিতে প্রয়াস পায়।

ক্রূরতা ও স্নেহ একাধারে থাকিতে পারে না। মরণ যদি যথার্থ বিলোপই

হয়, তাহা হইলে জগৎ নৃশংসতার আগার হইত। এইরূপে সাধক মরণের ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তখন মায়েরই কৃপায় মরণের ভিতরই মাকে স্ফুটতর দেখিতে পায়। মরণের ভিতর মেঘশূন্য আকাশের মত সে আনন্দ-সাগর পরিদর্শন করে। তখন সে সাধক এই মরণেই বিচরণ করিতে থাকে। মরণই তাহার আনন্দ-ক্রীড়ার নিকেতন হইয়া পড়ে। মরণেই সে জীবন উপলব্ধি করিতে থাকে। মরণই সুখপ্রদ অমৃত বলিয়া তাহার মরণ-সঙ্গই প্রিয় হইয়া উঠে। এই মরণই সাধারণ ভূতসকলের নিশা, এবং মুনিদিগের দিবাস্বরূপ।

পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি, আমরা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মরিতেছি। আমরা একটু প্রাণ ব্যয় না করিলে সুখের সন্ধান পাই না। মূল্যস্বরূপ প্রাণ না দিলে কেহ সুখ আমা-দিগকে দেয় না। সবারই লক্ষ্য যেন এই প্রাণটুকুর উপর। প্রতি পদার্থ আগে প্রাণ না পাইলে আমাদিগের ভোগে আসে না। ইন্দ্রিয়-পথে যাহা কিছু আমরা ভোগ করি, সমস্ত একটু একটু প্রাণ দিয়া, একটু একটু মরিয়া তবে সংগ্রহ করিতে হয়। ভাবের দ্বারা যে কল্পনা-সুখ অনুভব করি, তাহাতেও প্রাণ ব্যয়িত হয়, তাহাতেও একটু মরিতে হয়—না মরিলে কিছু পাই না। এইরূপে মরিতে মরিতে চলিয়াছি। মরণ আশ্রয় করিয়া জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করিতেছি, মাকে ভোগ করিতেছি, একটু মরণের অবসাদ না আসিলে, একটু না ঘুমাইলে, মাকে খুঁজিয়া পাই না। মুগ্ধ হওয়া অর্থে মরণ। মরণ অর্থে নব জাগরণ, নব জন্মের উপাদান সংগ্রহ।

এইরূপে মরিতে মরিতে জীব যখন সাধক হইয়া উঠে, যখন মায়ের নিকটস্থ হয়, তখন এই মৃত্যু সমালোচনা করিয়া দেখিতে থাকে ও এক নূতন তত্ত্বের সন্ধান পায়। যখন এক তিল মরিলে এক তিল আনন্দ পাই, তখন পূর্ণভাবে মরিতে পারিলে ত পূর্ণানন্দ পাওয়া যাইবে। এ পূর্ণভাবে মরি কোথায়? জাগতিক বিষয়-সকল কিছুই আমায় পূর্ণভাবে মারিতে পারে না। কিছুক্ষণ মারিয়া, তার পরই তাহার আকর্ষণ-শক্তি ফুরাইয়া যায়, অথবা তাহাতে আর আমার প্রাণের স্রোত প্রবাহিত হয় না, বিতৃষ্ণা আসিয়া উপস্থিত হয়। তবে এমন কে আছে—যে আমায় পূর্ণভাবে মারিতে পারে, আমার সমগ্র প্রাণ হরণ করিতে পারে? হে মৃত্যু—তুমি আমায় পূর্ণভাবে মার। আমায় পূর্ণভাবে পরিগ্রহণ কর। সাধক, জগৎময় মরণের সন্ধান করে। সাধক প্রাণ লইয়া, পত্রে পুষ্পে, আকাশে নক্ষত্রে, সর্ব্বত্র তাহার সমস্ত প্রাণকে গ্রহণ করিতে পারে, এমন মরণের সন্ধান করে। ইহারই নাম মাতৃ-

অন্বেষণ। সে দেখে, মরণ সর্ব্বত্র রহিয়াছে—অণু হইতে মহৎ, সর্ব্বত্র সে মহামৃত্যু বিরাজিত। তাহার নিজের অভ্যন্তরে সে মৃত্যু অহর্নিশ প্রতিষ্ঠিত। স্নেহময়ী মৃত্যুরূপিণী মা সমস্তে—সমস্তে ব্যাপৃতা। মৃত্যুরূপে সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিতা থাকিয়া প্রত্যেক অণুটিকে পর্য্যন্ত অনন্দ প্রদান করিতেছেন। সাধক সমস্ত প্রাণটুকু লইয়া সেই মরণের শরণাগত হয়। লও মা, আমার প্রাণ গ্রহণ কর মা। আমার সমস্ত লও মা। আমার আত্মা হইতে সুচনা করিয়া যাহা কিছু আছে, সমস্ত তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে তুলিয়া লও মা। তোমার নিশ্চিন্ততাময় উদ্বেগশূন্য ক্রোড়ে শায়িত করিয়া আমায় স্তনধারা দাও মা। এইরূপে সাধক সেই মৃত্যুতেই সমস্ত ধীশক্তি পরিচালিত করে।

কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, মরণ অর্থে নব জাগরণ। পূর্ণভাবে মরিতে যে পারে, সে আর মরে না—মৃত্যুঞ্জয় হয়। পূর্ণভাবে মরিয়াছে অর্থে পূর্ণভাবে জাগ্রত হইয়াছে। মৃত্যুসাধনায় যে যত পারদর্শী, সে সেই পরিমাণে মৃত্যুঞ্জয় হয়—সে সেই পরিমাণে আনন্দস্বরূপ হয়—সে সেই পরিমাণে আনন্দময়ীর লীলা-নিকেতন হইয়া পড়ে। সাধক চাহে মরণ—সজীব সচেতন। মরিয়া সঙ্গে সঙ্গে জীবন বা জাগরণ লাভ হয়। ক্রোড়ে উঠিলেই স্তন্য পাওয়া যায়। জয় মা!

মরণের সাধনা কর, উহারই মধ্যে মায়ের আমার বরাভয় কর দেখিতে পাইবে। মরণের সাধনা কর, উহাতেই চিদানন্দস্বরূপ হইবে। মরণের সাধনা কর—তোমার সমস্ত পরমাণু নব জাগরণে জাগ্রত হইবে। মরণের বিভীষিকা-মূর্ত্তি তিরোহিত হইয়া আনন্দময় মূর্ত্তি তোমার প্রাণে জাগিবে। সাধক এই মরণে জাগে। সাধারণ জীব মরণে নিদ্রিত, মরণ-চিন্তা-বিস্মৃত। ভয়ে ইচ্ছা করিয়া বিস্মৃত হয়। মরণ যে মায়েরই আমার স্নেহ-লীলা, এ কথা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া মরণভয়ে সঙ্কীর্ণভাবে স্ফুরণহীন জীবন অতিবাহিত করে। আর সাধক সে ভীতিবিভীষিকাময় মরণেরই ভিতর অভয়ার সন্ধান পাইয়া সর্ব্বভয় হইতে পরিত্রাণ পায়। সাধারণ মনুষ্য মরণ সম্বন্ধেই নিদ্রিত। অসাধারণ পুরুষ মরণেই জাগ্রত। সাধারণ মনুষ্য মরণের নাম শুনিলে সে স্থান পরিত্যাগ করে, সাধু—মরণের ধ্যানেই অহর্নিশ বিভোর। সাধারণ মনুষ্য, শ্মশানক্ষেত্রকেও সংসারের মত সাজাইয়া গুছাইয়া লইতে চাহে; সাধু সংসারমধ্যেও শুধু শ্মশানের দৃষ্টি দেখিতে প্রয়াস পায়। মাকে জানিয়া মরাই বাঁচা, মাকে না জানিয়া বাঁচা মরণই।

শুধু ইহা নহে। শুধু জীবিতাবস্থায় মৃত্যুধ্যান ও তাহা হইতে আত্মনিষ্ঠা বা মাতৃনিষ্ঠা লাভ করা মাত্র, সাধারণ ও অসাধারণ পুরুষে পার্থক্য নহে। বস্তুতঃ বিষয়ানন্দে, সুপ্তিতে, মরণে আমরা মায়েতেই যুক্ত হই—শুধু দেখিতে পাই না যে, মায়েতেই আমরা ফিরিতেছি। এই দেখিতে পাওয়া ও না পাওয়াই সাধক ও সাধারণ ব্যক্তিতে প্রভেদ। বস্তুতঃ মরণের পর যখন ওই সাধারণ পুরুষ এ স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, তখন তাহার চেতনা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায়; কাহারও ঈষৎ চেতনা প্রেত ও স্বর্গলোক অবধি থাকে, কিন্তু প্রায় সকলেরই অজ্ঞানাধিকার আসে। ঘোর অন্ধকারের করাল ছবি দেখিতে দেখিতে তাহার চৈতন্য গুটাইয়া আসিতে থাকে, সেই সুগভীর আঁধারের মধ্যেই ইহ জন্মের মত তার চৈতন্য নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। বায়ু-তাড়নায় জড় ধূলিকণার মত তার আত্মা অনুভবশূন্য অবস্থায় উর্দ্ধলোক-সকল অতিক্রম করিয়া, আবার নিম্নে—স্থূল জড়ে ফিরিয়া আসিয়া, তবে চৈতন্যে স্ফুরিত হয়। কিন্তু মরণ-সাধনায় যিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তিনি সমস্ত দেখিতে দেখিতে যান। দেহ পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানময় কোষে আনন্দের সহিত স্বীয় মহিমা অনুভব করিতে করিতে গিয়া, জ্ঞানের দ্বারা নিজের কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া লইয়া, আবার কর্ম্মসাধনার জন্য মর জগতে ফিরিয়া আসেন অথবা আর তাঁহাকে ফিরিতে হয় না—মায়ে মিশিয়া মাতৃত্ব লাভ করেন। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু, উভয়ই জ্ঞানপূর্ণ—উভয়ই আনন্দপূর্ণ—তাঁহার ইহলোক ও পরলোক উভয়ই তীর্থ পরিভ্রমণের মত আনন্দ ও চিত্তশুদ্ধিদায়ক।

এইরূপে মরণে জাগিতে হয়—এইরূপে কালভয়ে আপনার ঘুম ভাঙ্গাইতে হয়। সাধক মায়ের মৃত্যুরূপিণী করাল-মূর্ত্তির সাধনায় এইরূপে অমৃতের সন্ধান লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়।

সাধক আর জাগে—মাতৃ-আকর্ষণে। পূর্ব্বে যেমন উল্লিখিত হইয়াছে, এই বিষয়-সকল, যাহাতে সাধারণ লোক অহর্নিশ জাগ্রত এবং সচেষ্ট—যে বিষয়-সকলের বিষয়ত্বটুকু সাধারণ জগৎকে চঞ্চল ও সক্রিয় করিয়া রাখিয়াছে, সেই বিষয় ঐরূপ ইন্দ্রিয়োপলব্ধ বিষয়ত্ব ছাড়িয়া, মাতৃরূপে পরিণত হইয়া সাধকের চক্ষে প্রতিভাসিত হয়—বিষয়-সকল মা হইয়া তাহাকে আকর্ষণ করে। সাধারণ জগৎকে যাহা বিষয়-রাক্ষসীরূপে আকর্ষণ করিয়া মোহাবদ্ধ করিতেছিল, তাহাই সাধককে মাতৃরূপে আকর্ষণ করিয়া স্নেহাবদ্ধ করে। সাধারণ জগৎ নিদ্রিত শিশুর

মত মাতৃস্নেহের অনুভূতি না পাইয়াই মাত্র বিষয়-জনিত ক্ষণিক সুখ উপলব্ধি করে এ-সাধক বিষয়-ভোগের ক্ষণিক সুখের উপলব্ধিমাত্র না করিয়া, তাহার ভিতর হইতে আর এক অপরিমেয় স্নেহানন্দ ভোগ করিয়া থাকে। লৌহখণ্ড চুম্বকে সংঘৃষ্ট হইলে উহা যেমন চুম্বকত্ব লাভ করে, তদ্রূপ সে সাধক মাতৃস্বরূপত্ব ধীরে ধীরে লাভ করিতে থাকে। তখন দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের চুম্বকখণ্ড ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও উহা যেমন অহর্নিশ সর্ব্বাবস্থাতেই চুম্বকের কেন্দ্রস্থল উত্তরদিকে অবস্থান করে, তদ্রূপ সে সাধক যত ক্ষুদ্র হউক, জগতের অবস্থাচক্রে যেরূপেই আন্দোলিত হউক, মাতৃরূপিণী মহাচুম্বকের দিকে তাহার মুখ ফিরিয়া থাকে। পেচকাদি জীব যেমন নিশাতেই চক্ষুযুক্ত হয়, সাধক তেমনই মাতৃনিষ্ঠাতেই সক্রিয় ও চক্ষুযুক্ত হইয়া পড়ে। মাতৃভোগে অনুভূতিশূন্য অজ্ঞানাবদ্ধ জীব-জগৎ নিশাকালীন সুপ্ত জগতের মত তাহার চক্ষে প্রতিভাত হয়।

সাধকের সূক্ষ্মদেহ সঙ্গে সঙ্গে জাগরিত হইয়া পড়ে। তাঁহার প্রাণশক্তির কেন্দ্রসকল, যাহা মূলাধারাদি চক্র নামে অভিহিত, সেইগুলি রবি-রশ্মিসম্পাতে কুসুম-সম্ভারের মত কুসুমিত হইয়া পড়ে। সূক্ষ্ম কোষে সাধারণ জীব সুপ্ত। রজনীর ঘন অন্ধকারে জীবসকল তমাচ্ছন্ন হইয়া যেমন অজ্ঞান হইয়া থাকে, সাধারণ জীব সূক্ষ্ম শরীরে তদ্রূপ তমাচ্ছন্ন—অজ্ঞান। সেখানে তাহাদিগের কর্তৃত্ব, তাহাদিগের উদ্যম—তাহাদিগের সক্রিয়তা তিলমাত্র থাকে না। কিন্তু সাধকের সমস্ত উদ্যম, সমস্ত কর্তৃত্ব, সমস্ত ক্রিয়াশীলতা সূক্ষ্ম শরীরেই ন্যস্ত হয়। মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী কল্পনা বিদূরিত হইয়া, অমরত্বের নব অরুণরাগ তাহার হৃদয়কে আলোকিত করে।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥৭০

আপূর্য্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রম্ আপঃ সর্ব্বতো গতাঃ প্রবিশন্তি স্বাত্মস্থমবিক্রিয়মেব সন্তং যদ্বৎ, তদ্বৎ কামা বিষয়সন্নিধাবপি সর্ব্বত ইচ্ছাবিশেষং যং মুনিং সমুদ্রমিব আপঃ অবিকুর্ব্বন্তঃ প্রবিশন্তি সর্ব্বে আত্মন্যেব প্রলীয়ন্তে ন স্বাত্মবশং কুর্ব্বন্তি, স শান্তিম্ আপ্নোতি, ন ইতরঃ কামকামী।

ব্যবহারিক অর্থ।—অচলপ্রতিষ্ঠ পরিপূর্ণ সমুদ্রে নদনদী-বাহিত জল প্রবিষ্ট হইয়াই যেমন তাহাতে লীন হইয়া যায়, সেইরূপ যাঁহার হৃদয়ে কামনাসকল

প্রবিষ্ট হইয়াই লীন হয়, তিনিই শান্তি লাভ করেন। কামনাশীল ব্যক্তি উহা লাভ করিতে পারে না।

যৌগিক অর্থ।—আর তখন সমস্ত কামনা তাহার মহৎ চরিতার্থতায় লীন হইতে থাকে; জগতের বৈষয়িক কামনাসকল তাহার হৃদয়কে আন্দোলিত করিতে সমর্থ হয় না। আপূর্য্যমাণ সমুদ্রে নদনদী-প্রপাতের মত বিষয়সকল বাহির হইতে আসিলেও কোথায় হৃদয়ের অন্তস্তলে লীন হইয়া যায়, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

মর জগতের এ সুখদুঃখ-তরঙ্গ-চঞ্চল ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যিনি স্থৈর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর বুঝিতে হইবে। পূর্ণ অচল উদ্বেলনহীন অগাধ ভাবসমুদ্রে তিনি অহর্নিশ নিমজ্জিত। মায়ের শান্তিময় ক্রোড়ে তিনি বিরাম-সুখে বিভোর। কামনাসকল উদ্বুদ্ধ হইতেছে কি না, উহা তাঁহার অনুভবে আসে না। তাঁহার দৃষ্টি অন্তর্ম্মুখ হইতে বহির্ম্মুখে ফিরিতে চাহে না। তাঁহার প্রাণ অন্য রসের আস্বাদন ভুলিয়া যায়। সে দেখে শুধু মা—সে বোঝে শুধু মা—সে অনুভব করে শুধু মা আত্মা। মাতৃ-ভাবের উদ্দীপনায় সে অহর্নিশ পূর্ণ। পরিপূর্ণ হৃদয়ে তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ অন্য কোন বাসনা কখন্ উঠিল, কখন্ মিলাইয়া গেল, সে তাহার সন্ধান রাখে না। এ মর জগতে তাহার ব্যবহার কিরূপে, কি ভাবে প্রতিফলিত হইল, তাহার প্রাণ তাহা জানিতে ব্যস্ত থাকে না। সে আপনার অনন্ত জীবনের ছবি দেখে। সে আপনার নিত্য অপরিণামী আত্মসত্তার উপর দিয়া লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরিয়া কত অবস্থা—কত ঘটনা—কত পরিণাম চলিয়া গিয়াছে—কত ঘটনা পরিণাম চলিয়া যাইতেছে ও যাইবে, তাহাই যেন বসিয়া বসিয়া দেখে ও তন্মধ্যেও আপনার নিত্যত্ব অনুভব করে। শুধু ইহ জন্মের সুখ দুঃখ বা অবস্থান্তরগুলি নহে, তাহার বহু বহু পূর্ব্বজন্মের অবস্থাগুলিও সে মনে করে, যেন কতকগুলি চিত্রের মত তাহার নয়নসম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সে দেখে, আপনি এক পূর্ণতম আত্মতত্ত্বে যুক্ত; সে দেখে, আপনি যুক্ত হইতে যুক্ততর হইতেছে; সে আপনার সত্তা এক অনির্ব্বচনীয় আত্মসত্তায় মিলাইয়া গিয়াছে বলিয়া অনুভব করে। আর সুখ দুঃখ, বাল্য যৌবন জরা, জন্ম মৃত্যু ইত্যাদিকে, পর্ব্বতাঙ্গ স্পর্শ করিয়া যেমন মেঘসকল বহিয়া যায়, তেমনি ভাবে বহিয়া যাইতেছে বলিয়া অনুভব করে। শুধু তাহা নহে, অবস্থান্তর-সকল যত প্রবাহিত হয়, ততই আপনাকেই সেই সমস্তের আশ্রয়রূপে দেখিয়া তাহার

পূর্ণত্ব অধিক হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। সাধারণ মনুষ্য সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু আদি অবস্থার পরিবর্ত্তনে আপনাকেই পরিবর্ত্তিত অবস্থান্তরিত বলিয়া অনুভব করে; কিন্তু উহাদের অবস্থা ঠিক বিপরীত। এবং তখন সমস্ত কামনা আত্মকামত্বে—আপ্তকামত্বে পর্য্যবসিত হয়।

এইরূপে ক্রমশঃ তিনি আপূর্য্যমাণ হইতে থাকেন। তাঁহার নিজ অস্তিত্ব ইহ জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়াইয়া, সপ্ত লোক ভেদ করিয়া, পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টি ভেদ করিয়া, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালস্রোত ভেদ করিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বিরাট্ মাতৃ-সত্তায়—যাহাতে কাল হইতে সূচনা করিয়া ক্ষুদ্র ধূলিটী অবধি অক্ষমালাবৎ সংলিপ্ত, তাঁহাতে সে আপন সত্তা অনুভব করে। এক অপূর্ব্ব শান্তির বেদন স্ফুরিত থাকে।

যুক্ত পুরুষের প্রাণে যখন কোন কামনা জাগে, সে কামনা তাহাকে অন্তর্মুখেই পরিচালিত করে। সাধারণ মনুষ্যের প্রাণে কামনা জাগিলে সে সেই কামনা পূরণের দিকে অগ্রসর হয় ও কাম্য দ্রব্য প্রাপ্তির উপায় সন্ধান করে। যুক্ত পুরুষের প্রাণে কামনা জাগিলে, তিনি সেই কামনাকে মাতৃশক্তি বলিয়া অনুভব করেন; এবং মা কেমন করিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছেন, সেই চিন্তাতেই বিভোর হইয়া পড়েন। কামনা পূরণের জন্য তাঁহার আর প্রাণে অভাব বোধ থাকে না। কামনাসকল এইরূপে তাঁহাকে সংকীর্ণ জাগতিক বস্তুর দিকে না ছুটাইয়া, অনন্তবিস্তৃত মাতৃস্নেহের দিকে ছুটাইয়া লইয়া যায় এবং শেষ আত্মতত্ত্বে উপনীত করিয়া দেয়। আমরা যখন কোন বস্তুর ধ্যান বা কামনা করি, তখন আমাদিগের প্রাণশক্তি ভিতর হইতে ইন্দ্রিয়সকল অবলম্বন করিয়া বাহির্ম্মুখে ছুটিতে থাকে। চক্ষুকর্ণাদিরূপ ইন্দ্রিয়দ্বারে আসিয়া প্রাণ যেন সেই বস্তুর জন্য অপেক্ষা করে। অন্তঃপুর হইতে অন্তঃপুরচারিণী মহিলা যেন কোন প্রিয় বস্তু লাভের জন্য বহিঃপ্রাঙ্গণের দ্বারে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে, এইরূপ বোধ হয়। কিন্তু যুক্ত পুরুষের প্রাণে যখন কামনা জাগে, তিনি তখন আরও অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া পড়েন। তিনি বাহিরের সেই কাম্য বস্তুকে টানিয়া লইয়া মাতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হয়েন ও সেই কামনাকে আত্মারই ভিন্ন মূর্ত্তি বলিয়া ধারণা করিয়া আনন্দে আত্মহারা হয়েন।

সাধক স্থূল জড় জগৎ হইতে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম যাহা কিছু উপলব্ধির দ্বারা সন্ধান পায়, তাহাই অন্নপূর্ণাস্বরূপ বলিয়া পরিদর্শন করে। অন্নপূর্ণার দ্বারে

মহেশ্বরের মত সে জীব তখন অমৃত ভিক্ষা লাভ করে। শিবত্ব—পূর্ণত্ব তখন ক্রমশঃ জীবের লাভ হয়। চিরভিক্ষুক জীব বিষয় ভিক্ষায় চিরপটু। অনন্ত জীবন ধরিয়া মায়ের নিকট শব্দ স্পর্শাদি ভিক্ষা করিয়া আসিতেছে; এত দিনে সে ভিক্ষাদায়িনীকে মোক্ষদায়িনী বলিয়া চিনিতে পারে ও মোক্ষের প্রার্থী হয়। কৌশাস্তঃক্ষরিণী জননী তখন সে শিবস্বরূপ জীবের শিরে অভিমন্ত্রিত মোক্ষবারি অভিষেক করেন। জীব শিব হয়। আপন আত্মাকেই বিশ্বাত্মা বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করে।

তাই মহেশ্বর ভিক্ষুক। যতক্ষণ জীব জীবমাত্র, ততক্ষণ মা আমার বিষয়-স্বরূপিণী। যখন জীব—শিব, তখন সেই বিষয়রূপিণী মা মোক্ষদায়িনী অন্নপূর্ণা। উভয় অবস্থাতেই জীব ভিক্ষুক, ইহা যেন মনে থাকে। উভয় অবস্থাতেই জীব পরিপূর্ণ হইবার জন্য সচেষ্ট। জীব হউক বা শিব হউক, যতক্ষণ নামরূপ উপাধি থাকিবে, যতক্ষণ মাতৃ-অঙ্গ হইতে বিভিন্ন সত্তা ধারণায় আসিবে, ততক্ষণ জীব ভিক্ষুক। তাই ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক। জীবসংঘের ভিক্ষা-ব্যবস্থা দেখাইয়া ব্রাহ্মণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। জীব-জগতের আদর্শ হইবার জন্যই ব্রাহ্মণ সমস্ত সম্পদ্‌ দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভিক্ষাব্রতী হয়েন। সমস্ত জীবসংঘের জন্য বিরাট্‌ জ্যোতির্ম্ময়ীর দ্বারে "ধী" ভিক্ষা করিতে হইবে বলিয়া, সমস্ত জীবসংঘের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া সে বিরাট্‌ রাজরাজেশ্বরীর দ্বারে গিয়া অমৃতজ্যোতিঃ প্রত্যহ ভিক্ষা করিতে হইবে বলিয়া, অন্ততঃ তিন বার করিয়া তাঁর হিরণ্ময় পুরের দ্বারে গায়ত্রী আকারে সমস্ত জীবের জন্য অমৃত ভিক্ষা করিতে হইবে বলিয়া তাই ব্রাহ্মণ, জগতে ভিক্ষাই আপনার জীবিকাস্বরূপ অবলম্বন করেন। ব্রাহ্মণ আপনার একার জন্য ভিক্ষা করেন না—ব্রাহ্মণ একার মোক্ষের ধান্ধা মাথায় লইয়া মাতৃদ্বারে উপস্থিত হয়েন না। ব্রাহ্মণ—সমষ্টির জন্য ভিক্ষুক। ব্রাহ্মণের মন্ত্রে তাই সমষ্টির জন্য প্রার্থনাই পরিলক্ষিত। সে সাম্রাজ্ঞীর দ্বারে রীতিমত ভিক্ষুক হইতে না পারিলে যাইবার উপায় নাই; তত বড় দানক্ষেত্রে একটী ক্ষুদ্র প্রার্থনা লইয়া ব্রাহ্মণ উপস্থিত হন না। ব্রাহ্মণ যখন গায়ত্রী পাঠ করেন, তখন দেখেন, অনন্ত জীব তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার মুখ চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছে। অনন্ত জীব-সমুদ্র অকূল বিষয়-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে দিশাহারা—স্তব্ধ। বিষয়-সমুদ্রের আবর্ত্তে তাহারা যেন নাথহীন, কর্ণধার-হীন—ভরসাহীন—নিমগ্নপ্রায়, শুধু ব্রাহ্মণের আশ্বাসবাণী তাহাদিগকে বলে,

"ভয় নাই—আমাদিগের নাথ আছেন, কর্ণধার আছেন,—আমরা অনাথ নহি।" সে অনন্ত কোটি জীব, ব্রাহ্মণের সে বাণীতে বিস্মিত হইয়া আশা যেন ফিরিয়া পায়। ব্রাহ্মণ মঙ্গলজ্যোতিতে স্নান করিয়া শিশির-স্নাত শুভ্র কুসুমের মত হৃদয়খানিতে সেই অনন্তকোটি জীবের জন্য অমৃতের প্রার্থনা ভরিয়া মাতৃ-দ্বারে প্রার্থী হয়—ভিক্ষা লাভ করে। ব্রাহ্মণ উপনয়নের সময় এ ভিক্ষা আরম্ভ করে। সংস্কার-শুদ্ধ কলেবর, নবসংস্কারপূত হৃদয়, মুণ্ডিত মস্তক, কাষায় বস্ত্র পরিধৃত, যজ্ঞসূত্রশোভিত দণ্ডধারী বা দণ্ডী হইয়া, গায়ত্রীরূপ মহাভিক্ষার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পুণ্য দৃষ্টিতে মাতৃ-মুখপানে চাহিয়া যখন বলে,—"ভবতি, ভিক্ষাং দেহি," দাও মা, ভিক্ষা দাও, সেই পবিত্র দৃশ্য দর্শনে চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়—হৃদয় উদ্বেলিত হয়। শিশু বিরাট্ বিশ্বজননীর সম্মুখে গিয়া যে প্রকারে মহাভিক্ষা প্রার্থনা করিবে, তাহারই নিদর্শনস্বরূপ এই ভিক্ষা যেন সূচিত হয়। এই ভিক্ষা মহাভিক্ষায় পরিণত হয়। ব্রাহ্মণের উপনয়ন-সংস্কার অন্য কিছু নহে, অন্নপূর্ণেশ্বরীর দ্বারে মহেশ্বরের মত গিয়া অমৃত ভিক্ষার উদ্বোধন মাত্র। মা গো! ব্রাহ্মণের এ মহাভিক্ষা পূর্ণ কর! পুণ্য ক্ষেত্রে—পুণ্য সময়ে, পুণ্য গুরুসন্নিধানে—পুণ্য জনক-জননীর তত্ত্বাবধানে—পুণ্য ব্রাহ্মণ-শিশু মহাপুণ্য ভিক্ষা লাভ করিবার জন্য স্কন্ধে ভিক্ষা-ঝুলি লইয়া ভিক্ষু-জীবনের এইরূপে প্রতিষ্ঠা করে।

ব্রাহ্মণ পূর্ণে এইরূপে ছড়াইয়া পড়ে, ব্রাহ্মণ এইরূপে পূর্ণতম হইয়া অন্ন-পূর্ণেশ্বরীর অঙ্গে মিলাইয়া যায়। সাধারণ জীবের বিষয়ের দ্বারে নিজ ক্ষুদ্র বিষয়ভাবরূপ কামনা পূরণের ভিক্ষার মত ব্রাহ্মণের ভিক্ষা নহে। সাধারণ জীব পঞ্চ তন্মাত্রার দ্বারে ভিখারী, নিজ ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার জন্য ভিক্ষুক। ব্রাহ্মণ পঞ্চমুণ্ডনিবাসিনী অন্নপূর্ণেশ্বরীর দ্বারে ভিক্ষুক—জীবসমষ্টির জন্য ভিখারী, পূর্ণত্বের জন্য পূর্ণের দ্বারস্থ। "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"—ইহাই ব্রাহ্মণের ভিক্ষা। ব্রাহ্মণ বলে—"আমাদিগকে" ভিক্ষা দাও, "আমাকে" বলে না।

এইরূপে ব্রাহ্মণের মত বা যুক্ত পুরুষের মত পূর্ণে সংযুক্ত হইলে তবে পূর্ণত্ব লাভ হইতে থাকে—তবে কামনারূপ কর্দ্দমে শিবলিঙ্গ নির্ম্মিত হয়। তবে শান্তি-রূপ সার্থকতা লাভ হয়। তবে অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া জীব আপনার চিরস্থৈর্য্য লাভ করে।

আমাদিগের শিরোদেশ হইতে গুহ্যদেশ অবধি শ্রেণীবদ্ধরূপে কতকগুলি চক্র বা প্রাণশক্তির কেন্দ্র আছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইন্দ্রিয়-সকল বাহির হইতে

বিষয় বহন করিয়া যখন ভিতরে লইয়া আইসে, আমাদিগের শক্তি সেই বিষয়-সংস্কারকে বহন করিয়া, চক্রে চক্রে আবর্ত্তিত হইয়া, সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল ও নিম্ন চক্র মূলাধার অবধি প্রবাহিত হয়, যেন মূলাধার চক্রে গিয়া সেই শক্তি সঞ্চিত হইতে থাকে। যেমন পর্ব্বতপৃষ্ঠে বারিবর্ষণ হইলে পর্ব্বতাঙ্গস্থ ছিদ্রাদি প্রণালী দিয়া সে জল পর্ব্বতের অভ্যন্তরে তলদেশে গিয়া সঞ্চিত হয়, তদ্রূপ আমাদিগের শক্তি, বিষয়সকল হইতে নূতন শক্তি লাভ করিয়া, উহাকে মূলাধারে বহন করিয়া লইয়া যায়। তখন সেই শক্তিপ্রবাহ নিম্নমুখী বলিয়া চক্রগুলিও নিম্নমুখে অবস্থান করে। এইরূপে বিষয়োদ্বদ্ধ শক্তি মূলাধারে বহুল পরিমাণে সঞ্চিত হইতে থাকে। অন্যান্য উপরিস্থ চক্রগুলির অস্তিত্ব তখন বুঝিতে পারা যায় না। ইহাই সাধারণ মনুষ্যের অবস্থা। মূলাধারচক্র যখন পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে, প্রাকৃতিক নিয়মে তখন সে জীবের কামনাসকল হ্রাস হইতে থাকে; এবং সেই জন্য উপর হইতে নিম্নমুখে প্রবাহিত শক্তিপ্রবাহ মন্দীভূত হইয়া যায়।

যাহা হউক, মূলাধারের পুঞ্জীভূত শক্তি তখন ঐ উক্ত শক্তিপ্রবাহের দ্বারা সঞ্চালিত হইতে থাকে ও বহির্গত হইবার পথ পাইলে সেই পথে উঠিতে আরম্ভ করে। যেমন পর্ব্বতের তলদেশে পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে জল সঞ্চিত হইয়া, তাহা অন্যান্য প্রণালী দিয়া প্রস্রবণের আকারে উঠিতে থাকে, উক্ত শক্তিও তদ্রূপ উঠিতে থাকে; এবং উহার উত্তেজনায় চক্রসকল ঊর্দ্ধমুখী হইতে থাকে। তখন জীবের চক্রসকল ঊর্দ্ধমুখী হয় বলিয়া তাহার কামনাসকলও উচ্চাংশের ও ভেদশক্তিসম্পন্ন হয়। তখন তাহার কামনা বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া বিষয়ের অন্তস্তল অবধি প্রবাহিত হয়। এই অবস্থার জীবকেই আমরা জগতে প্রতিভা-সম্পন্ন বলিয়া পরিদর্শন করি। এই ঊর্দ্ধস্রোত আরও প্রবল হইলে কামনাসকল আরও তীক্ষ্ণভেদী হয়। এবং বিষয়ের অভ্যন্তরস্থ মূল মাতৃসত্তার অনুধাবন করে—বিষয়ে বিষয়ে মাকে অন্বেষণ করে। বিষয়ের বিষয়ত্বে তাহার আকাঙ্ক্ষা আবদ্ধ থাকে না। এই অবস্থার জীব যোগি-পদবাচ্য।

কেহ হয় ত মনে করিতে পারেন, কামনাজাত শক্তি নিম্নমুখে প্রবাহিত হইয়া ও মূলাধারে শক্তি সঞ্চিত হইয়া যখন প্রস্রবণাকারে ঊর্দ্ধমুখী হয়, তখন উচ্ছৃ-ঙ্খলভাবে যথেচ্ছা কামনা দ্বারা পরিচালিত হওয়াই ত সুবিধাজনক। যত কামনা দ্বারা প্রপীড়িত হইব, বিষয়-কামনা যত পরিবর্দ্ধিত করিব, ততই মূলা-ধারে শক্তি সঞ্চিত হইবে। এবং ততই মূলাধারস্থ সে শক্তি উক্ত কামনার

সন্ধানে উর্দ্ধমুখে প্রবাহিত হইবে? বস্তুতঃ তাহা নহে; কামনা অপরিমেয়রূপে স্বতঃই আমাদিগের মনোময় ক্ষেত্রে প্রবাহিত। উর্দ্ধ হইতে নিম্নে মূলাধারে কামনা-সঞ্জাত শক্তি প্রবাহিত হইবার দুইটী মাত্র প্রণালী বা পথ আছে। সে প্রণালীতে উক্ত শক্তি অতি সূক্ষ্ম ধারায় প্রবেশ করে। কেন না, সে প্রণালীর রন্ধ্র অতি সূক্ষ্ম। যেমন কোন সঙ্কীর্ণমুখ আধারে বারি প্রবিষ্ট করিতে সূক্ষ্ম ধারায় জল ঢালিতে হয়, বেগে ও স্থূল ধারায় যতই ঢালা যাউক না কেন, উহা যেমন আধারে প্রবিষ্ট না হইয়া বাহিরে পড়ে, তদ্রূপ কামনার মাত্রা অতিরিক্ত হইলে উহা বাহিরে স্ফুরিত হয়, সে প্রণালী দিয়া সূক্ষ্ম ধারায় সামান্য মাত্র প্রবিষ্ট হইতে থাকে। অবশিষ্ট সমস্তই বাহিরে ছুটিয়া আসে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় অবলম্বনে প্রবাহিত হইয়া আমাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ফেলে। কার্য্যের আকারে আমাদের সে শক্তি ব্যয়িত হইয়া যায়; সুতরাং কামনা অপরিমিত বর্দ্ধিত হইলে উহা মূলাধারে শক্তি সঞ্চয়ের পক্ষে অসুবিধাই করিয়া থাকে।

যাহা হউক, আমরা এই বুঝিলাম যে, মূলাধারস্থ ঐ শক্তি উর্দ্ধমুখে উদ্বোধিত হইতে সূচিত হইলে তবে জীব ভগবন্মুখী হইতে থাকে। সুতরাং যদি আমরা মাতৃকৃপায় কৌশলাদি অবলম্বন করিয়া উক্ত শক্তিকে উর্দ্ধমুখী করিতে পারি, অথবা যদি মাতৃ-অনুগ্রহে মাতৃমুখে যাইবার জন্য কামনা ফিরাইতে সচেষ্ট হই, তাহা হইলে উক্ত শক্তি বেগে উর্দ্ধমুখী হইতে পারে ও আমাদের জীবনকে ধর্ম্মমুখী করিয়া তুলিতে পারে। এইরূপে মূলাধারস্থ শক্তির উর্দ্ধগতি হইতে আমাদিগের জীবনের মাতৃমুখী গতিলাভ এবং মাতৃমুখী কামনার গতি হইতে মূলাধারস্থ শক্তির উর্দ্ধগতির পরিবর্দ্ধন, এইরূপ পরস্পর সাহায্যকারী সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। এবং ক্রমশঃ উর্দ্ধগতিতে আমাদের সুষুম্না-পথ পরিপূর্ণ করিয়া, আমাদিগের চক্রসকলকে উর্দ্ধমুখী রাখিয়া, কামনাসকল পরিত্যাগ করিয়া—কামনার ভিতর মাতৃ-সত্তা উপলব্ধি করিয়া—কামনা-সকলকে একমাত্র শক্তিপ্রবাহরূপে পরিণত করিয়া লইয়া শান্তি লাভ করিতে পারি। কামনার কামনাত্ব দূর হইয়া গিয়া, উহা আমার পরিপূরণকারী শক্তিরূপে পরিণত হইতে পারে।

উক্তরূপে কামনা-সকল সুষুম্না-পথে প্রবেশ করিলে তবে জীবের শান্তি আসে; যতক্ষণ তাহা না হয়, ততক্ষণ শান্তির আশা নাই। সুষুম্না-পথের ছিদ্র অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও তাহার অভ্যন্তরস্থ অনুভূতি সমুদ্র বা

আকাশ অপেক্ষাও বিস্তৃত। সে বিস্তৃতির পরিসীমা পাওয়া যায় না; এবং উক্ত কামনাসঞ্জাত শক্তিস্রোত উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া, উহাকে চঞ্চল বা সংক্ষুব্ধ করিতে পারে না, সমুদ্রে নদীপ্রবাহের মত লীন হইয়া যায়।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৭১

যঃ পুমান্ সর্ব্বান্ কামান্ বিহায় নিস্পৃহঃ নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ সন্) চরতি (বিষয়েষু), সঃ শান্তিং অধিগচ্ছতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—যে পুরুষ সমস্ত কামনা পরিহার করিয়া, নিস্পৃহ নিরহ-ঙ্কার ও মমতাশূন্য হইয়া বিষয়-সকল ভোগ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করেন।

যৌগিক অর্থ।—আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বাহির হইতে কাম বা কামনা-শক্তি একটা সূক্ষ্ম প্রণালী অবলম্বন করিয়া মূলাধারে ধাবিত হয় এবং যতটুকু সম্ভব, সে চক্রে সঞ্চিত হইয়া, অন্য মুখে উহা উপর দিকে উঠিতে থাকে এবং তাহার দ্বারাই আমাদিগের বহিরিন্দ্রিয়-সকল পরিচালিত হয়। ঠিক মূলাধারের উপরে সুষুম্না নামক সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট আর একটি সরল পথ থাকে, মূলাধার পরিপূর্ণ হইলে তবে সে ছিদ্র-পথে সে শক্তি উঠিবার অবসর পায়। নতুবা সে শক্তিপ্রবাহ এক দিক্ দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া, অন্য দিক্ দিয়া বহির্মুখে চলিয়া যায়। এইরূপে আমাদিগের মূলাধার চক্রকে ভাসাইয়া ভোগজনিত শক্তি অহর্নিশ চক্রাকারে আমাদিগের সুষুম্না-পথকে বেষ্টন করিয়া চলিয়া যাইতেছে। মূলাধারগহ্বরস্থ সঞ্চিত শক্তি উদ্বেলিত হইয়া মধ্যস্থ সুষুম্না-পথে উঠিবার অবসর পাইতেছে না। কৌশলবিশেষ অবলম্বন করিলে এই শক্তিপ্রবাহকে স্থগিত করিয়া, মূলাধার চক্রকে ভাসাইয়া দেওয়া যায়, এবং তখন সে শক্তি সুষুম্নাপথে অনায়াসে উঠিতে পারে। সে উপায়, যে কেন্দ্র দিয়া বাহির হইতে ঐ শক্তি প্রবিষ্ট হইতেছে, এবং মূলাধারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, পুনরায় বহির্মুখে গিয়া আবার ফিরিয়া নিম্নমুখে আসিতেছে, সেই কেন্দ্রমুখে প্রতিরোধ স্থাপন করা।

মন সেই কেন্দ্র, মনের স্থান ললাট। বুদ্ধিযোগের দ্বারা অথবা পূর্ব্বকথিত উপায়ে ভগবানে যুক্ত হইয়া থাকিলে, ঐ কেন্দ্রের সঙ্কোচনাক্রিয়া রোধ হইয়া যায়; সুতরাং শক্তির এই আবর্ত্তন শুদ্ধ হয়। তখন মূলাধারে শক্তিপ্রবাহ

প্রবেশও করে না, এবং বহির্গতও হইয়া যায় না। এইরূপে উক্ত কামনাশক্তি-প্রবাহ বুদ্ধিযুক্ত দ্বারা বুদ্ধিতেই ন্যস্ত থাকিয়া স্তব্ধ হইলে, তখন সে শক্তি আপনার সঞ্চাপে সুষুম্নাপথে বেগে উঠিতে থাকে। তখন পুরুষ সংসারে মমতাশূন্য, আত্মাতে অহঙ্কারশূন্য এবং সমস্ত বিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়া জগতে বিচরণ করেন। আত্মাতেই সমস্ত, এই বুদ্ধি প্রবুদ্ধ হইলে বিষয়-সকল ভোগ করিয়াও তিনি অমৃত-মাত্র প্রাপ্ত হন। তখন জড় জগৎকে যেন চৈতন্যশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয় —চৈতন্যময় জগৎকে যেন স্তব্ধ যোগযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। তখন আকাশ যেন তাঁহারই শিরে ছত্র ধারণ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়—তখন গ্রহমণ্ডল যেন তাঁহাকেই প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিয়া বিবেচিত হয়—তখন জলধির উত্তাল উর্ম্মি-মালা যেন তাঁহারই চরণ পরশের জন্য উল্লসিত হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তখন বায়ু তাঁহারই জন্য প্রবাহিত—তখন পাদপরাজি তাঁহারই জন্য কুসুমিত —তখন জীবসমষ্টির সমস্ত মায়া তাঁহাকেই আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত—তখন তাঁহার নিজের দেহ নিজের বোধে থাকে না। তাঁহার নিজের সত্তাকে মনে হয়, যেন কোন দ্বৈতবিহীন সত্তাবোধের স্নেহ-পাশের আলিঙ্গন—যেন স্নেহভরে সে নিজেকেই আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ সে তখন মায়ের শান্তি অভি-ষেচনে রাজরাজেশ্বরের পদে অভিষিক্ত হয়।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ, হে পার্থ! এনাং স্থিতিং প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি, স্থিত্বাস্যাং অন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি লয়মৃচ্ছতি।

ব্যবহারিক অর্থ।—ইহার নাম ব্রাহ্মী স্থিতি। ইহা পাইলে আর জীবকে বিমুগ্ধ হইতে হয় না; এবং অন্তকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে পারিলে ব্রহ্মে লীন হইতে পারা যায়।

যৌগিক অর্থ।—পূর্ব্বে অর্জ্জুন যে তিনটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ কিরূপে বিচরণ করেন। সেই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বশ্লোকে পরিসমাপ্ত হইল।

স্থূলতঃ আমরা এই সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় আলোচনা করিয়া ভগবানের এই উপদেশ লাভ করিলাম, মরলোক নামক এই ব্রহ্মক্ষেত্রে মা

আমার জীবাত্মা ও প্রকৃতি, দুই রূপে প্রতীয়মানা হয়েন। ইহা এই লোকের কুল-ধর্ম্ম। একটি পরিণামযুক্ত, জন্মমৃত্যুযুক্ত, ব্যক্তাব্যক্তময় এবং অন্যটি অপরিণামী, জন্মমৃত্যু-রহিত, নিত্য, নিজবোধরূপ। এই নিত্য-প্রতিষ্ঠিত আত্মসত্তা সাধারণকে বিনা তর্কে, বিনা বিচারে, প্রগাঢ় বিশ্বাসের সহিত প্রথমে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তার পর প্রত্যেক পরিণামশীল বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে সেই নিত্য অপরিণামী সত্তাটি বুদ্ধিযোগের দ্বারা অবধারণ করিতে হইবে। এইরূপ ধারণা করিতে করিতে ক্রমশঃ সাধকের চক্ষু হইতে পরিণামযুক্ত জগৎ লুপ্ত হইয়া যাইবে, এক অপরিণামী বোধরূপ অস্তিত্বের আভাস প্রতিভাসিত হইবে। প্রথমে ইহা সামান্য কল্পনামাত্র বলিয়া বিবেচিত হইলেও সাধক পরে দেখিবে এই কল্পনাই মহাসত্য। পরে দেখিবে, এই বোধ-সত্তাই অনন্ত জগৎসত্তা-রূপে প্রকাশ পান ও স্বাধীন সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মক লীলাবিলাস সত্য সত্যই এই বোধ-রূপ মহিমাতেই রচিত হয়। জগতে অনিত্য বলিয়া, অসৎ বলিয়া কিছু নাই তারপর এই বোধরূপ মহিমা আত্মারই মহিমা বলিয়া জানা যায় ও ব্রহ্মবোধ প্রকাশ পায়। মহামঙ্গলের মহাস্ফুরণে জগৎ প্রস্ফুরিত। সাধক সেই মঙ্গল-সমুদ্রে মঙ্গলস্নান করিয়া মহামঙ্গলময় ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করে।

কল্পনাময়ী মা আমার কল্পনার সাহায্যে সাধকের হৃদয়ে এইরূপে প্রতি-ফলিতা হয়েন। কারণ, কল্পনা বলিয়া কিছুই নাই, কল্পনাও মহাসত্য,—মহা-সত্যই কল্পনা আকারে প্রতিভাত হয়। কল্পনাময়ী মা আমার, কল্পনায় আমা-দিগকে নাচাইয়া নাচাইয়া, পুত্রকে যেমন জননী স্বীয় স্নেহ বেশে আদর করেন, তেমনি ভাবে বক্ষে টানিয়া লইয়া মুখচুম্বন করেন। তাঁহারই স্নেহক্লান্তির ঘর্ম্ম সাধকের চক্ষে পড়িয়া অশ্রুজলরূপে প্রবাহিত হয়। তাঁহারই আলিঙ্গনের স্পন্দন সাধকের দেহে কম্পন আকারে পরিলক্ষিত হয়—তাঁহারই সাদর আহ্বানের প্রত্যুত্তরে সাধকের মুখে মাতৃনাম উচ্চারিত হয়।

ব্রহ্মময়ী মায়ের অঙ্কে এই অবস্থিতি লাভ করিলে, বুদ্ধিযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মে যুক্ত হইতে অভ্যাস করিয়া যুক্ত অবস্থায় অবস্থান করা অভ্যস্ত হইলে, সেরূপ ভাগ্যবান্ সন্তানকে আর মোহগ্রস্ত হইতে হয় না। সে সন্ন্যাসীই হউক অথবা গৃহীই হউক, তাহাকে বিমূঢ় ভাব আর পাইতে হইবে না। কোন কোন টীকাকার এই ব্রাহ্মী স্থিতিকে সন্ন্যাসের লক্ষণ মাত্র বলিয়াছেন, গৃহীর এ ব্রাহ্মী স্থিতি হওয়া দুরূহ। গৃহীর বিমূঢ় হইবার অধিক সম্ভাবনা বলিয়া মত

প্রকাশ করিয়াছেন ও সন্ন্যাসেরই প্রকৃষ্টতা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গীতার টীকা- করিতে বসিয়া এরূপ সাম্প্রদায়িক ভাব বস্তুতই হাস্যকর। ব্রাহ্মী স্থিতিই সন্ন্যাস সত্য—কিন্তু কর্ম্মসন্ন্যাস ; গৃহী বা গৃহত্যাগী আদি জাগতিক অবস্থা ইহার তারতম্য ঘটাইতে পারে না। কাহারও গৃহী অবস্থাতেই ঘটে, কাহারও গৃহত্যাগ না করিলে ঘটে না। উক্ত অবস্থাদ্বয়ের কোনটির প্রকর্ষতা দেখান এ শ্লোকের উদ্দেশ্য নহে। গৃহস্থের ধনাদির দ্বারা বিমুগ্ধ হইবার যেরূপ আশঙ্কা আছে, সন্ন্যাসীরও ত্যাগের দ্বারা বিমূঢ় হইবার আশঙ্কা তদ্রূপ প্রবল। এ কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। আবার গৃহীও ত্যাগ ত্যাগ করিয়া বিমূঢ় হইতে পারে, সন্ন্যাসীও বিষয়াদির জন্য বিমূঢ় হইতে পারে। বস্তুতঃ অন্তরের জ্ঞানকর্ম্মসমন্বয়রূপ কর্ম্মসন্ন্যাসই এ ব্রাহ্মী স্থিতি।

অথবা এ সন্ন্যাসই গৃহধর্ম্ম। স্থূল জগতের স্থূল বিষয়সকল সাধারণ জীবকে যেমন বিমুগ্ধ করে, সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্ম বিষয়ে তদ্রূপ যোগী আপনার গৃহ রচনা করে। ভগবান্‌কে লইয়া যোগী—সংসারী হয়। পুত্র-দারাদির সহবাস যেমন জীবকে তাহাতে আবদ্ধ করিয়া রাখে, ভগবৎসহবাসও তদ্রূপ যোগীকে আবদ্ধ করে। তবে পূর্ব্বের আবদ্ধ অবস্থাটা ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে কল্পিত হয়, দ্বিতীয়টি অনন্তে-মুক্তে ; সুতরাং ইহা বন্ধন নহে, এবং সেই জন্য ইহা জাগতিক সীমাবদ্ধ পদার্থে মূঢ়তা আনিতে পারে না। উপনিষদে গৃহস্থা-শ্রমীর ব্রাহ্মী স্থিতির কথা পুনঃ পুনঃ বলা আছে।

যাহা হউক, এইরূপ অবস্থায় অভ্যস্ত হইলে, ব্রহ্মনিষ্ঠায় জীব এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইলে—বুদ্ধিযোগের দ্বারা জীব এইরূপে মায়ে যুক্ত হইতে শিক্ষা করিলে, দেহ ত্যাগের সময় উক্ত অবস্থায় অবস্থান করিয়া জীব, ব্রহ্মে লীন হইতে সক্ষম হয়। বুদ্ধিযোগের দ্বারা মায়ে আমরা যুক্ত হইতে অভ্যাস করিয়া আমরা যে কৃতকার্য্যতা লাভ করি, অন্তকালে তাঁহাতে সেইরূপ যুক্ত থাকিতে পারাই তাহার সার্থকতা। অভিনেত্রীরা বহু দিন ধরিয়া অভিনয়ের অভ্যাস করিয়া যে কৃতকার্য্যতা লাভ করে, রঙ্গমঞ্চে সে অভিনয় প্রদর্শনের সময়ই যেমন তাহার সার্থকতা, ইহাও তদ্রূপ। সমস্ত জীবনব্যাপী বুদ্ধিযোগে অবস্থান, অভিনয়ের অভ্যাসমাত্র। মৃত্যুর মহামুহূর্ত্তই এই অভিনয় প্রদর্শনের কাল। যতই অভ্যাস করিয়া থাকি না কেন, যদি ঐ মুহূর্ত্তে এই সার্থকতা দেখাইতে না পারি, তবে আমার সমস্তই বৃথা। সেই মহাজীবন-মরণের সঙ্গমস্থলে যদি আমার অভ্যস্ত

অভিনয় সুচারুরূপে প্রদর্শন করিতে পারি, তবেই মুক্তিরূপ মহাপুরস্কারের অধিকারী হইব।

আমরা জীবনকাল ব্যাপিয়া এই সংসারে থাকিয়া যত কিছু সংস্কারের রেখা আমাদিগের চিত্তক্ষেত্রে অঙ্কিত করি, সেগুলির মধ্যে যেটী অধিকতর গভীর ও সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে শুধু সেটী সমধিক কার্য্যকারী থাকে। মৃত্যুসময়ে স্থূল হইতে আমাদিগের সূক্ষ্মতম কোষসকলে যত আমরা প্রবেশ করিতে থাকি, ততই অজ্ঞানতা আসিয়া আমাদিগের সংস্কারের সে দাগগুলিকে সাময়িক ভাবে ডুবাইয়া দেয়। শুধু যেটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল দাগ, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গভীরতাবশতঃ উহাই জাগিয়া থাকে, এবং উহাই আমাদিগের পর-জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং যদি আমরা জীবিতকালে ভগবদারাধনায় পূর্ণমাত্রায় অভ্যস্ত হই, তাহা হইলে শেষ মুহূর্ত্তে সমস্ত চিন্তা আমার হৃদয়ক্ষেত্র হইতে মুছিয়া যাইবে, একমাত্র তাঁহার চিন্তায় প্রাণ স্ফুরিত হইতে থাকিবে। তাঁহারই মোহন ছবি প্রাণের ভিতর আলো করিয়া আমার সে নিরাশ্রয় অবস্থায় আশ্রয় দিবে, আমায় তাঁহার স্নেহ-অঙ্কে মিলাইয়া লইবে।

অন্তকালে এক মুহূর্ত্ত ব্রহ্মবোধে অবস্থান করিতে পারিলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হইতে পারে, সারা জীবন ব্যাপিয়া যে থাকিতে পারে, তাহার ত কথাই নাই, অনেকে এই শ্লোকে এইরূপ ইঙ্গিত করেন সত্য, কিন্তু ইহা স্থির সত্যরূপে জানা উচিত যে, অন্তকালে সেই এক মুহূর্ত্ত থাকা সমস্ত জীবনব্যাপী অভ্যাসেরই ফল-স্বরূপ। জীবনে অভ্যাস করিলাম না, কোটি কোটি মুহূর্ত্তব্যাপী জীবন লইয়া তাঁহার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলাম না, পূর্ণ চেতনাযুক্ত সমস্ত জীবনটি ভগবদ্‌ভাবের রেখামাত্রে অঙ্কিত হইল না, আর মৃত্যুকালীন সেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন মুহূর্ত্তে তিনি চিত্তক্ষেত্রে আসিয়া বিরাজ করিবেন, এ আশা দুরাশা মাত্র।

মহেশ্বর বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য যেমন কাতর হইয়াছিলেন, জীব—তুমিও মায়ের আমার এইরূপ মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া কাতর হইতেছ। মা আসিয়া মহেশ্বরকে সে মোহিনী মূর্ত্তির যথার্থ পরিচয় দিয়া মহেশ্বরের হৃদয়ে শান্তি ঢালিয়া দিয়াছিলেন, মা আসিয়া তোমারও এ আকাঙ্ক্ষা-উদ্বেলিত প্রাণে শান্তিবারি সেচন করিবেন, তুমি শিষ্যরূপে তাঁহার শরণাগত হও। জানিও, তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার না করিলে তোমার হৃদয়ের বিষাদ দূরীভূত হইবে না; তুমি এ পরিণামযুক্ত অনিত্যরূপে পরিদৃষ্ট বিষয়ের

তিনি নিত্যের সন্ধান পাইবে না। তুমি তোমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিবার জন্য, তোমার প্রাণের অবসাদ ঘুচাইবার জন্য তাঁহার শরণাগত হও—তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ কর। তিনি তোমায় ব্রাহ্মী স্থিতি প্রদান করিবেন।

ভাবিও না, কেমন করিয়া তাঁহার শরণাগত হইবে। সাংখ্যযোগে শুধু তোমার এই আত্মিক উন্নতি করিবার জন্য ভগবান্ এই বুদ্ধিযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেখানে ইচ্ছা—যেমন করিয়া ইচ্ছা, যে পদার্থে ইচ্ছা, তুমি নিত্যসত্তা কল্পনা করিয়া লইয়া, তাহাতেই তোমার গুরু অবস্থিত ভাবিয়া, তুমি সেইখানে তোমার হৃদয়ের প্রার্থনা ঢাল। যোগী আপনার দেহের অভ্যন্তরে যেমন আপনার আত্মার অনুসন্ধান করেন, তুমি সর্ব্বত্র পদার্থের দেহাভ্যন্তরে তদ্রূপ সেই মহানাত্মার অনুসন্ধান কর, তুমিও যোগী হইবে। তুমিও তাঁহাকে আপন আত্মাতেই পাইবে।

শুন, তুমি তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন কর। তাঁহাতে ডুবিয়া থাকিয়া, তাঁহার প্রেমিক আনন্দ-সম্ভোগে মগ্ন থাকিয়া তাঁহাকে ভুলিও না। তুমি তাঁহাকে পাইবার জন্য তোমার ইন্দ্রিয়রাশিকে সর্ব্বদা সজাগ রাখ। তুমি দিবাভাগে কাজ করিতে করিতে মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখ, তিনি তোমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন কি না। তুমি শ্রমক্লান্ত অবস্থায় তোমার সম্মুখে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখ, তোমার ক্লান্তিবিশিষ্ট বদনমণ্ডল দেখিয়া তাঁহার চক্ষে অশ্রু ঝরিতেছে কি না। তুমি নিদ্রাকালে স্বপনে জাগিয়া অন্বেষণ কর, তিনি স্বপনে তোমার হৃদয়ে উদিত হইয়াছেন কি না। তুমি ভোজনে অন্নসত্তার সম্মুখে পাইলে একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিও, তিনি তোমার ক্ষুধানিবৃত্তি দেখিয়া স্নেহানন্দে মগ্ন হইতেছেন কি না। ইহাই বুদ্ধিযোগে যুক্ত পুরুষের বাহ্যিক লক্ষণ। তুমি ক্রোড় পাইবে।

এস, গুরু বলিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া কাঁদি—এস, ত্রিতাপ-বিদগ্ধ হইয়া যখন আপনাকে কল্পনা করিতেছি, তখন সে তাপ নিবারণ করিতে স্নেহ-বারির জন্য তাঁহার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহি। আমাদের সমস্ত যন্ত্রণা দূরীভূত হইবে। আমরা তাঁহার অঙ্কে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিব। আমরা অর্জ্জুনের মত গুরু লাভ করিয়া, পরিণামের ভিতর অপরিণামের সন্ধান পাইয়া শান্তিলাভ করিব। তিনি আত্মরূপে হৃদয়ে প্রকাশ হইয়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্তরময় করিয়া দিয়া, আমাদিগকে ব্রাহ্মী স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

মায়ের শান্তিবারি আমাদের শিরে বর্ষিত হউক।

ইতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগ নামক
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।